ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি

সুচিন্ত্য ভট্টাচার্য

উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার ■ আগরতলা

ত্রিপুরার ইতিহাস
ও
সংস্কৃতি

সুচিন্ত্য ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০১৭ ইং।

প্রকাশক : অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র,
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা।

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

দাম :-১৬০ টাকা।

মুদ্রণে:- ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, আগরতলা, ত্রিপুরা
দূরভাষ (২৩০-৭৫০০, ৯৪৩৬১২১১০৯)
ই-মেল :- jraksharpub@gmail.com

ভূমিকা

উত্তর-পূর্ব ভারতে অবস্থিত ত্রিপুরা একটি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ রাজ্য। এক সময়ে এখানে মাণিক্য উপাধিধারী রাজারা রাজত্ব করতেন।

আধুনিক ত্রিপুরার জনক মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য এবং পরবর্তী রাজারা যথাক্রমে রাধাকিশোরমাণিক্য, বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য ও বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য তাঁরা সকলেই বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংগীত এবং সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন।

ত্রিপুরার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায় 'রাজমালা' নামে চারখণ্ডে বিভক্ত একটি সুপরিচিত গ্রন্থে। ইতিহাসবেত্তাদের মতে রাজমালার প্রথম খণ্ডটি নির্ভরযোগ্য না হলেও পরবর্তী তিনটি খণ্ডের বিবরণ মুদ্রা এবং অন্যান্য সূত্রের দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় তাঁদের উক্তি গ্রহণযোগ্য। ইতিহাস সম্বন্ধে ত্রিপুরার দুখানি তৎকালীন প্রমাণিক গ্রন্থ 'কৃষ্ণমালা' ও 'চম্পকবিজয়'। 'কৃষ্ণমালা' রাজধর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৭৮৫-১৮০৪খ্রিঃ) বাংলা পদ্যে রচনা করেন রামগঙ্গা বিশারদ। এই গ্রন্থে কৃষ্ণমাণিক্য (১৭৬০-১৭৮৩ খ্রিঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। 'চম্পকবিজয়' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা শেখ মহাদ্দি। সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিকরা, যেমন মহম্মদ খাঁ রচিত 'মুক্তুল হোসেন', আকবরের সভাসদ ও ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী', আজাদ-অল-হুসাইনি রচিত 'নৌবহর-ই মুরশিদ কুলি খান' গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। বিদেশি পর্যটক এবং দূতরা যেমন রেভারেন্ড জেমস লং, ফরাসি পর্যটক টাভার্নিয়ের, রালফ ফিচ প্রভৃতির বিবরণ এবং আসামের রাজা রুদ্রসিংহ কর্তৃক ত্রিপুরার রাজদরবারে প্রেরিত রাজদূত রতন কন্দলী, সার্মা কটকী ও অর্জুনদাস বৈরাগীর লেখা 'ত্রিপুরা দেশর লেখ' গ্রন্থে ত্রিপুরার রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, ধর্মীয় রীতিনীতি এবং ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজাদের প্রত্নতাত্ত্বিক

উপাদান সমূহ ত্রিপুরার ইতিহাস রচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা অনেকেই রাজমালার প্রাচীনত্বে এবং ঐতিহাসিক যথার্থতা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বের ইতিহাস সম্পর্কে রাজমালার বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। অন্যদিকে আধুনিক যুগে ত্রিপুরার ইতিহাস রচনার উপকরণের বাহুল্যে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আয়াসসাধ্য ব্যাপার। তবে আশাব্যঞ্জক বিষয় হল বর্তমান ত্রিপুরায় যে কিছু সংখ্যক গবেষক এ কাজে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের একজন অধ্যাপক সুচিন্ত্য ভট্টাচার্য। আলোচ্য 'ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গবেষণামূলক গ্রন্থটি রচনায় তিনি বিপুল পরিশ্রম করে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ধার করেছেন। চৌদ্দটি অধ্যায় এবং পরিশিষ্ট সম্বলিত বাংলা ভাষায় লিখিত বইটি ত্রিপুরার এক সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস।

লক্ষণীয় বিষয় হল যারা ইতিহাস রচনা করেন তাঁরা অনেকেই অতীতের ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের সময় প্রায়শই বর্তমানের পরিবেশ পরিস্থিতির দ্বারা এবং শাসককুলের দ্বারা প্রভাবিত হন। এর ফলে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণটি হয়ে যায় একটি দ্বিমুখী পদ্ধতি। যেমন কখনো বর্তমানের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে অতীতের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা আবার কখনো বা অতীতের ধারণাকে বর্তমানের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে হিন্দু ও মুসলমানের নিয়ে দ্বিজাতি তত্ত্বের রাজনৈতিক মিথ্ সাহায্য করেছিল পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে। এই তত্ত্বটি যে আসলে ভুল তা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা প্রমাণিত। মোটের উপর একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনাটির কোন সাধারণ যোগসূত্র নির্ণয় না করতে পারা পর্যন্ত সেটি ইতিহাস হয়ে ওঠে না। অধ্যাপক সুচিন্ত্য ভট্টাচার্যে সাফল্য এখানেই। আমি তাঁর প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

সুরঞ্জন দাস

সুরঞ্জন দাস
উপাচার্য
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা
১২ মার্চ, ২০১৫

'প্রকাশকের কথা'

ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থটি রচনায় নিয়োজিত অধ্যাপক সুচিন্ত্য ভট্টাচার্য মহাশয়ের দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখেই ত্রিপুরা, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সার্বিক পরিচিতি বৃহৎ পাঠক সমাজের কাছে যথাযথ মূল্যায়নের জন্য তুলে ধরা।

প্রাচীন ত্রিপুরার সার্বিক অবস্থা মূল্যায়নে গবেষণামূলক গ্রন্থটি আশাকরি বৃহত্তর পাঠক গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সহজবোধ্য গ্রন্থটি পাঠকের কাছে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আশাকরি সুধী পাঠক সমাজে গ্রন্থটি খুবই সমাদৃত হবে।

তারিখ-জানুয়ারী,২০১৭ইং
আগরতলা।

(সুনীল দেববর্মা)
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার
লেইক চৌমুহনী, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।

প্রাক্‌কথন

উত্তর-পূর্ব ভারতে ত্রিপুরা একটি বহু প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ রাজ্য। ইতিহাসবেত্তাদের মতে মধ্যযুগে এই রাজ্যের ও রাজবংশের ইতিহাস বাংলা পদ্যে রচিত হয়েছিল। ত্রিপুরার রাজা ধর্মমাণিক্যের (১৪৩১ খ্রিঃ-১৪৬২খ্রিঃ) আদেশে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামক দুজন প্রধান এবং একজন চন্তাই (প্রধান পূজারি) দুর্লভেন্দ্র তিনজনের উপর রাজ্যের ও রাজবংশের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পাদনের জন্য দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল। বাংলা পয়ার ছন্দে গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল। উল্লেখ্য, বাণেশ্বর এবং শুক্রেশ্বর উভয়েই শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ঢাকাদক্ষিণ পরগণার ঠাকুরবাড়ি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁদের উপাধি ছিল 'চক্রবর্তী'। গ্রন্থটি তৎকালীন সময়ে বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ ছিল। এ গ্রন্থের মূল সংস্করণ এখন দুর্লভ। তবে পরবর্তীকালে গ্রন্থটি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে যেটি প্রকাশিত হল সেটিই বর্তমানে 'রাজমালা' নামে পরিচিত। রাজমালার বর্ণনা অনুসারে চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি স্বীয় পুত্র দ্রুহ্যকে কিরাত দেশে রাজা নির্বাচিত করে পাঠান। এই বংশে ত্রিপুর নামক রাজার জন্ম হয়। রাজা ত্রিপুর থেকেই রাজ্যের নাম হয় ত্রিপুরা। কথিত আছে রাজা ত্রিপুর দ্বাপরের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। উপরোক্ত কাহিনির যে ঐতিহাসিক মূল্য নেই তা বলাই বাহুল্য।

ত্রিপুরের পরবর্তী ৯৩ জন রাজার পরে ছেংথুম বা কীর্তিধরের নাম পাওয়া যায়। কথিত আছে কীর্তিধরের রাজত্বকালে হীরাবন্ত খান নামে গৌড়েশ্বরের এক কর্মচারী ত্রিপুরা রাজ্যে লুণ্ঠিত হলে ক্রুদ্ধ গৌড়েশ্বর ত্রিপুরার বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ত্রিপুরার রাজা কীর্তিধর যুদ্ধে যেতে সাহসী হলেন না। রানি স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস জোগান এবং অনুপ্রাণিত করেন। রানি নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে ত্রিপুরার সেনাদল জয়লাভ করে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই সময় থেকেই ত্রিপুরায় ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ হয়। ছেংথুম ফার প্রপৌত্র ডাঙ্গার ফার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র রত্নফা গৌড়ের রাজদরবারে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং গৌড়েশ্বরের সহায়তায় ত্রিপুরায় সিংহাসন লাভ করেন। বিনিময়ে রত্নফা গৌড়েশ্বরকে একটি বহুমূল্য রত্ন

উপহার দেন এবং গৌড়েশ্বর রত্নফাকে মাণিক্য উপাধি প্রদান করেন। স্থানীয় ভাষায় 'ফা' অর্থ পিতা। অতঃপর 'ফা'র পরিবর্তে রাজাদের নামের শেষে মাণিক্য ব্যবহৃত হয়। রত্নফা হলেন রত্নমাণিক্য। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে গৌড়েশ্বর বনাম ত্রিপুরার ছেংথুমফা'র সংঘর্ষ ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয় এবং এই যুদ্ধটি ছিল বাংলার তুর্কীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ইন্দো-মোঙ্গালীয়দের প্রথম বিজয়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে ছেংথুম ফা বা কীর্তিধর ও মহামাণিক্য আসলে একই ব্যক্তি। ভাষাগত দিক থেকে ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজারা বোরো জাতিভুক্ত তিপ্রা হলেও তাঁরা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। উল্লেখ্য, ভারতে প্রাচীনকালে শক্তিশালী রাজারা ক্ষত্রিয় শ্রেণিভুক্ত হতেন এবং ব্রাহ্মণ পন্ডিতরাও তাঁদের স্বীকৃতি জানাতেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে বিদেশাগত গুর্জর, প্রতিহাররা নিজেদের অযোধ্যার সূর্যবংশীয় বলে দাবি করতেন। দ্রাবিড় চালুক্যরা সূর্য বা চন্দ্রবংশীয় বলে পরিচয় দিতেন। সেদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে ত্রিপুরার মাণিক্য বংশীয় রাজারাও ক্ষত্রিয় এবং চন্দ্রবংশীয়।

সমকালে যে-কজন ইতিহাসবিদ্ জ্ঞান-চর্চার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার ইতিহাসকে সবিশেষ সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের অন্যতম ত্রিপুরচন্দ্র সেন। পেশায় তিনি একজন আইনজীবী হলেও ত্রিপুরার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৭০ সালে আগরতলা থেকে প্রকাশিত তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ Tripura in Transition এবং বাংলা গ্রন্থ 'ত্রিপুর দেশের কথা' ইতিহাস গবেষকদের কাছে এক বড় সম্পদ। 'ত্রিপুর দেশের কথা' একটি অসমিয়া পান্ডুলিপির বঙ্গানুবাদ। উল্লেখ করা যেতে পারে রত্ন কন্দলী সার্মাকটকী, অর্জুনদাস বৈরাগী ১৭০৯ থেকে ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে সময়কালের মধ্যে অহম রাজা স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের প্রতিনিধি হিসাবে তিনবার ত্রিপুরা রাজ্য পরিভ্রমণ করেছিলেন। মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের (১৬৮৫-১৭১২), মহারাজা মহেন্দ্রমাণিক্যের(১৭১২-১৭১৪) এবং মহারাজ দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের (১৭১৪-১৭২৯) রাজত্বকালে এই সফর হয়েছিল। উপরোক্ত সময়ের ভ্রমণ কাহিনির ওপর ভিত্তি করেই অসমিয়া ভাষায় লেখা হয়েছিল 'ত্রিপুর দেশের কথা'। আগরতলা থেকে লন্ডনে 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম'—এর সঙ্গে যোগাযোগ করে ত্রিপুরচন্দ্র সেন মাইক্রোফিল্ম-এর মাধ্যমে উপরোক্ত পান্ডুলিপি আনিয়ে অনুবাদ ও প্রকাশ করেছিলেন। মহারাজা ছত্রমাণিক্যের (১৬৬১) সময় ট্যাভার্নিয়ার ও বার্নিয়ার নামে দুজন বিখ্যাত ফরাসি পর্যটক বঙ্গদেশ এসেছিলেন। এঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ত্রিপুরার মহারাজ ছত্রমাণিক্যের নাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য রয়েছে।

আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার মধুর সম্পর্কের বিষয়ে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের ঘনিষ্ঠ ত্রিপুরার এক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আনন্দিরাম মেধির ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

তিনি তৎকালীন আসামের রঙপুর এ অহম দরবারে রুদ্রসিংহের সঙ্গে দেখা করেন। আসামের রাজ রুদ্রসিংহ ত্রিপুরার সঙ্গে যোগাযোগের কারণে আনন্দিরামের সঙ্গে রত্নকন্দলী, সার্মা কটকী ও অর্জুনদাস বৈরাগীকে ত্রিপুরার দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক ঘটনার দিক থেকে সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবল প্রতাপান্বিত মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়। সেই সুযোগে মুঘল বিরোধী শক্তি জোট গঠনের অভিপ্রায়ে আসামের স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ দুজন দূত পাঠিয়েছিলেন ত্রিপুরার দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজ দরবারে। ওই সময়ে ত্রিপুরার রাজধানী ছিল উদয়পুর। আসামের দূতগণকে স্বাগত জানিয়ে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে রামেশ্বর ভট্টাচার্য ন্যায়ালঙ্কর ও উদয়নারায়ণ বিশ্বাসের নেতৃত্বে মোট ১০ জনকে রুদ্রসিংহের দরবারে পাঠান। এক বছর বাদেই আসামের দূতদের ত্রিপুরার দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজধানীতে দ্বিতীয়বার পাঠানো হল। উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরার সামগ্রিক অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য দুজন গুপ্তচর নিযুক্ত করা। এইসব গুপ্তচরদের বিবরণের উপর নির্ভর করেই আসামের দূতরা ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরের অনেক গোপন কথা তাদের বিবরণীতে স্থান দিয়েছিলেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন এতদিন ত্রিপুরার ইতিহাস ছিল 'রাজমালা' নির্ভর যাতে রাজবন্দনা গুরুত্ব পেত। দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের আমল থেকেই প্রকৃত বাস্তব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অহম রাজাকে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ফলে ত্রিপুরার দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য, মহেন্দ্রমাণিক্য ও দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের প্রথম দিকের রাজত্বকাল সম্পর্কে 'ত্রিপুর দেশের কথা'—এর গুরুত্ব ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস 'ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থটির উপর প্রয়োজনীয় বিষয়গত বিশ্লেষণ ও অভিমত দিয়ে বাধিত করেছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। বইটির সংকলনের ব্যাপারে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং পরম হিতৈষী শ্রীবিমান ধর।

পরিশেষে আমার অনুজ-প্রতিম সুলেখক এবং প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার শ্রীধীমান ভট্টাচার্যের সুপরামর্শ, আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তার নিরলস প্রচেষ্টা উল্লেখের দাবি রাখে।

ড: সুচিন্ত্য ভট্টাচার্য

(ডঃ সুচিন্ত্য ভট্টাচার্য)

সূচীপত্র

১) প্রথম অধ্যায় ঃ ত্রিপুরার ইতিহাস রচনার উপাদান ১-২২

ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি, প্রাক মাণিক্যযুগ, মাণিক্যবংশীয় রাজাদের আদি পরিচয়, রাজ্যসংগঠনে বিভিন্ন প্রক্রিয়া সমূহ, কালের বিবর্তনে ত্রিপুরা।

২) দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ত্রিপুরা জনসম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ২৩-৪৪

ত্রিপুরি, রিয়াং, জমাতিয়া, চাকমা, হালাম, মগ/মঘ, লুসাই, কুকি, গারো, মণিপুরি, নোয়াতিয়া।

৩) তৃতীয় অধ্যায় ঃ মাণিক্য যুগের সূচনা ৪৫-৬২

মহামাণিক্য, ধর্মমাণিক্য, প্রথম প্রতাপমাণিক্য, মুকুটমাণিক্য, দ্বিতীয় প্রতাপমাণিক্য, ধন্যমাণিক্য, ধ্বজমাণিক্য, দেবমাণিক্য, ইন্দ্রমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, অনন্তমাণিক্য, উদয়মাণিক্য, জয়মাণিক্য, অমরমাণিক্য, রাজধরমাণিক্য।

৪) চতুর্থ অধ্যায় ঃ সমতল ত্রিপুরায় মুঘল আধিপত্য বিস্তার ৬৩-৮২

যশোধরমাণিক্য, গোবিন্দমাণিক্য, রামদেবমাণিক্য, দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য, মহেন্দ্রমাণিক্য, দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য, মুকুন্দমাণিক্য, জয়মাণিক্য, সমসের গাজীর নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ।

৫) পঞ্চম অধ্যায় ঃ ত্রিপুরায় ইংরেজ শক্তির আবির্ভাব ৮৩-৯৬

কৃষ্ণমাণিক্য, রানি জাহ্নবী দেবী, দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য, দুর্গামাণিক্য, রামগঙ্গামাণিক্য, কাশীচন্দ্রমাণিক্য, কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য, ঈশানচন্দ্রমাণিক্য।

৬) ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ত্রিপুরায় বিদ্রোহ ৯৭-১১১

তিপ্রা বিদ্রোহ (১৮৫০), সিপাহী বিদ্রোহ ও ত্রিপুরা (১৮৫৭), কুকি অভ্যুত্থান (১৮৬০-৬১), স্বাধীনতা আন্দোলনে ত্রিপুরা।

৭) সপ্তম অধ্যায় ঃ আধুনিক যুগ ১১২-১৪৪

বীরচন্দ্রমাণিক্য, রাধাকিশোরমাণিক্য, বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য, বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য, ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের রিয়াং বিদ্রোহ।

৮) অষ্টম অধ্যায় ঃ রাজন্য যুগের শাসন পদ্ধতি ১৪৫-১৬১

উত্তরাধিকার আইন, স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা, রাজস্ব ব্যবস্থা, ভূমিরাজস্বও জরিপ ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, পুলিশ বিভাগ, সামরিক বিভাগ, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন।

৯) নবম অধ্যায় ঃ ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলন ১৬২-১৯২

গোলাঘাটি বিদ্রোহ, ত্রিপুরার পাকিস্তান-ভুক্তির ষড়যন্ত্র, অসম জনবিন্যাস, অপরিকল্পিত পুনর্বাসন ব্যবস্থা,জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে জমি দখলের তীব্র প্রতিযোগিতা, সরকারী ব্যর্থতা ও দুর্নীতি, সংকীর্ণ রাজনৈতিক মানসিকতা,উপজাতি সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা।

১০) দশম অধ্যায় ঃ ত্রিপুরার প্রত্নতত্ত্ব ১৯৩-২০৮

পিলাকের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, দেবতামুড়ার ভাস্কর্য , ত্রিপুরার লিপি, ত্রিপুরার মুদ্রা।

১১) একাদশ অধ্যায় ঃ ত্রিপুরার অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সচেতনতা ২০৯-২২৭

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, মাণিক্য শাসনাধীন অর্থনীতি, স্বাধীনোত্তর ত্রিপুরার অর্থনীতি,উন্নয়নের সমস্যা।

১২) দ্বাদশ অধ্যায় ঃ মিশ্র সংস্কৃতি ২২৮-২৮৪

ত্রিপুরার ভাষাতত্ত্ব, কক-বরক ভাষা,সাহিত্য, উপজাতি সাহিত্য, লোকসঙ্গীত, নাট্যচর্চা, চারুও কারুশিল্প এবং আরণ্যক সংস্কৃতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি, উপজাতি সমাজ ধর্ম ও নৃত্যকলা, ধর্মচর্চা,কের পূজা, লোকনৃত্য কলা,সামাজিক দলবদ্ধ নৃত্য, নৃত্যকলায় সমতল ত্রিপুরা।

১৩) ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ বিবিধ ঐতিহাসিক বিষয় ২৮৫-২৯১

ত্রিপুরাব্দ, সতীদাহপ্রথা, দাসত্বপ্রথা, নরবলিপ্রথা।

১৪) চতুর্দশ অধ্যায় ঃ মাণিক্যশাসনাধীন আধুনিক ত্রিপুরার কতিপয় আইন ২৯২-২৯৯

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ত্রিপুরা।

পরিশিষ্ট ৩০০-৩৪০

ত্রিপুরার রাজাদের বংশ তালিকা,মুদ্রায় প্রাপ্ত ত্রিপুরার রাজগণের শকাব্দের মুদ্রাঙ্ক, মুদ্রায় লিখিত ত্রিপুরার মহিষীদের নাম, ত্রিপুরার মুদ্রা, চিত্র পরিচিতি- গ,ঘ,ঙ, এবং চ, ঐতিহাসিক দলিল-ঔরঙ্গজেব কর্তৃক গোবিন্দমাণিক্যের নিকট লিখিত পত্রের প্রতিলিপি, ত্রিপুরার কালানুক্রমিক তালিকা, হিজরীসন ও খ্রিস্টাব্দের তুলনামূলক তালিকা, ঔরঙ্গজেব কর্তৃক গোবিন্দমাণিক্যের নিকট লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ, গ্রন্থপঞ্জী।

প্রথম অধ্যায়

ত্রিপুরার ইতিহাস রচনার উপাদান

ত্রিপুরা যে প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী তা শুধুমাত্র ত্রিপুরার সিংহাসনে সমাসীন রাজপুরুষদের কাহিনী আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি। এই সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ভান্ডার যুগ পর্যায়ে বহু ঐতিহাসিক বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ। বস্তুত, এককালে ত্রিপুরা জেলাই প্রাচীন সমতটের প্রাণকেন্দ্র ছিল। মুসলমান রাজশক্তির অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে যে কয়টি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং যাদের ইতিহাস বাদ দিয়ে বাঙালির ইতিহাস অকল্পনীয়, তাদের প্রায় সবগুলি তথাকথিত অনার্য অধ্যুষিত। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কামরূপ, কম্বোজ, কামতা, কুমিল্লা প্রভৃতি নামের 'কাম' বা 'কম' শব্দগুলি আর্যভাষার পদ নয়। এগুলি হচ্ছে অনার্য জাতির নাম, তাদের নাম থেকে অধ্যুষিত প্রদেশের নামকরণ হয়েছে। এই তথাকথিত অনার্যগণ এই অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ—এঁদের বৃহৎ অংশ কালক্রমে বৃহত্তর বঙ্গ সমাজের অঙ্গীভূত হয়েছেন।

বিভিন্ন ধারার জীবনরীতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ত্রিপুরার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পূর্বভারতে আর্যদের এবং হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ক্রম প্রসারের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মানসলোকে ভাবগত বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। ধর্মীয় চিন্তা ও আচরণ-বিধিতে, শিল্প ও ভাস্কর্যে এই সাংস্কৃতিক রূপান্তরের স্বাক্ষর সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।

কুমিল্লা শহরের সংলগ্ন ময়নামতীর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত করেছে। খননকার্যের ফলে প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদি নানাবিধ মূল্যবান নিদর্শনের সঙ্গে কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। এই

তাম্রশাসনগুলিতে উৎকীর্ণ লিপি থেকে এই স্থানের এক সম্পূর্ণ অপরিচিত ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সন্ধান মিলেছে। প্রাপ্ত মুদ্রাগুলির মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি স্বর্ণমুদ্রাসহ গুপ্তযুগের অনুরূপ আরও কয়েকটি মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে লালমাই পট্টিকেরা কমলাঙ্কর প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের অতীত ইতিহাসও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উল্লেখ্য, সম্প্রতি আগরতলা শহরের নিকটবর্তী চম্পামুড়ায় মাটির নীচে একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। মুদ্রাটি ময়নামতীতে প্রাপ্ত পূর্বে উল্লিখিত গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রার অনুরূপ বলে অনুমান করা হচ্ছে। মুদ্রাটি বর্তমানে আগরতলার সরকারি মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

রাজমালার বর্ণনা অনুসারে ত্রিপুরার রাজারা সকলেই হিন্দুধর্মাবলম্বী। ইদানীং এই রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে বিলোনীয়া বিভাগের অন্তর্গত পিলাক নামক স্থান থেকে অনেকগুলি মূর্তি আগরতলা মিউজিয়ামের জন্য সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে বুদ্ধের মূর্তিও অনেকগুলি পাওয়া গিয়েছে। এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে ত্রিপুরার একটি অজ্ঞাত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। আশা করা যায় এই সম্পর্কে গবেষণা সম্পূর্ণ হলে ত্রিপুরার ইতিহাসের একটি মূল্যবান দিক উদঘাটিত হবে।

ইতিহাসমূলক অবদান সমূহ

সাহিত্যক্ষেত্রে ত্রিপুরার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য অবদান ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজাবলী'। বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপুরার দ্বিতীয় অবদান একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত ভবানী দাসের 'ময়নামতীর গান'। বৌদ্ধ রাজা মানিকচন্দ্রের রানি ও শিবযোগী গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর কাহিনী অবলম্বনে এই কাব্য রচিত হয়েছিল। কথিত আছে কুমিল্লার দক্ষিণ-পশ্চিম ময়নামতী পাহাড়ের নামকরণও হয়েছিল এই রানির নামানুসারেই। 'লক্ষণ' দিগ্বিজয় বা 'রামাভিষেক' ও 'সরযূ' নামক অপর দুটি কাব্যগ্রন্থ, উক্ত ভবানী দাসের লিখিত বলে প্রসিদ্ধি আছে। সাহিত্যক্ষেত্রে ত্রিপুরার তৃতীয় ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য দান শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর শর্মা রচিত ইতিহাসগ্রন্থ 'রাজমালা'। রাজমালাটি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৪১৭-১৪৩১) রচিত হয়। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন-এর মতে এই পুস্তকটি "সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও উপাদেয় ইতিহাস। যদিও ত্রিপুরা রাজ্যের কথাই এই পুস্তকের মুখ্য বিষয়, তথাপি ইহাতে প্রাসঙ্গিকভাবে আর্যাবর্তের বহুদেশের, বিশেষত বঙ্গদেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের রাজনীতি,

সমাজনীতি প্রভৃতি নানা ঐতিহাসিক তথ্যের খনি বিশেষ"। এই দুই ইতিহাস গ্রন্থ ব্যতীত শেখ মহদ্দি রচিত 'চম্পক বিজয় কাহিনি'(১৬৮৫-১৭১০), বনমালী সিদ্ধান্ত রচিত 'কৃষ্ণমালা', 'শ্রেণীমালা' (১৭৬০-১৭৮৩), দ্বিজ বঙ্গচন্দ্রকৃত 'ত্রিপুরবংশাবলী','সমশের গাজীনামা' প্রভৃতি বহু মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ ও বঙ্গ সাহিত্যে ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য দান। এই সব গ্রন্থে একদিকে যেমন তদানীন্তন ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়, অপরদিকে তেমনি এ সকল সমসাময়িক ভারতের, বিশেষত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি পত্র থেকে জানা যায় যে 'রাজরত্নাকর' নামে ত্রিপুরা রাজবংশের একটি ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস ধর্মমাণিক্যের রাজত্বের সময় থেকে সঙ্কলিত হতে আরম্ভ হয়। উক্ত রাজরত্নাকরে আর একটি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত রাজমালার উল্লেখ আছে। রেভারেন্ড জেমস লং রাজমালার প্রশংসা করে বলেছেন যে রাজমালা চৈতন্যচরিতামৃতের ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের পূর্বে লেখা এবং ত্রিপুরার রাজপরিবারের যথার্থ ইতিহাস। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন রাজমালাকে কলহনের রাজতরঙ্গিনীর চাইতেও অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই রাজমালার প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিক যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে রাজমালা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। সমসাময়িক কালের জন্য রাজমালার গুরুত্ব থাকলেও পূর্বের ঘটনাবলী প্রধানত কিংবদন্তী ও কল্পনার উপর আশ্রয় করে রচিত হয়েছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বের ইতিহাস সম্পর্কে রাজমালার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য নেই। তাছাড়া রাজমালায় প্রধানত ত্রিপুরার রাজাদের কীর্তিকলাপের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। ত্রিপুরার জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ লোকপাত করেনি। কৈলাসচন্দ্র সিংহ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে যে ত্রিপুরার ইতিহাস লিখেছেন তা গদ্যাকারে বাংলা ভাষায় লিখিত। এই পুস্তকটিরও নাম রাজমালা।

সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচনাগুলিও ত্রিপুরার ইতিহাস রচনায় বিশেষ সাহায্য করে। আকবরের সভাসদ ও ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে ত্রিপুরার সমসাময়িক রাজা বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালের

কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ত্রিপুরার অভিজাতদের উপাধি ছিল নারায়ণ এবং রাজার দুই লক্ষ সৈন্য ও এক সহস্র হস্তী ছিল। তবে অশ্বের সংখ্যা ছিল কম। জাহাঙ্গীরের সেনাপতি নাথানের বাহার ই-স্তান গায়েবী নামক গ্রন্থে জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক ত্রিপুরার রাজা যশোধরমাণিক্যের সময়ে মুঘলবাহিনী কর্তৃক ত্রিপুরা অভিযান ও অধিকারের কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে। ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ খাঁ রচিত 'মুক্তুল হোসেন' কাব্যে দেবমাণিক্যের রাজত্বকালে বাংলা ও ত্রিপুরার মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ আছে। 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা', 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' নামক দুটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে আজাদ-অল-হুসাইনি রচিত 'নৌবহর-ই-মুর্শিদকুলিখানি' গ্রন্থ থেকে দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে মুঘলবাহিনীর ত্রিপুরা অভিযানের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।

বিদেশি পর্যটক ও দূতদের বিবরণ থেকেও ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কিত উপাদান সংগ্রহ করা যায়। টাভার্ণিয়ের নামক এক ফরাসি পর্যটক শাহজাহানের রাজত্বকালে বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং সেই সময়ে ত্রিপুরায় ছত্রমাণিক্য রাজত্ব করছিলেন। রালফ ফিচ নামে অপর এক ইউরোপীয় পর্যটক চট্টগ্রাম যাত্রা পথে অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরা পরিদর্শন করেন। সেই সময় আরাকানের সঙ্গে ত্রিপুরার যে প্রায়ই সংঘর্ষ হত তা তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়।

'ত্রিপুরা দেশের কথা' একটি অসমিয়া পাণ্ডুলিপির বঙ্গানুবাদ। রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুনদাস বৈরাগী ১৭০৯ থেকে ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তৎকালীন অহম রাজা স্বর্গদেব সিংহ-এর প্রতিনিধি হিসাবে তিনবার ত্রিপুরা রাজ্য ভ্রমণ করেছিলেন। মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৬৮৫-১৭১২), মহারাজা মহেন্দ্রমাণিক্যের (১৭১২-১৪) এবং মহারাজ দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের (১৭১৪-২৯) রাজত্বকালে এই সফর হয়েছিল। সেদিনের ভ্রমণ কাহিনির ওপর ভিত্তি করেই অসমিয়া ভাষায় লেখা হয়েছিল 'ত্রিপুরা দেশের কথা'। আগরতলা থেকে লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সাথে যোগাযোগ করে মাইক্রোফিল্মের মাধ্যমে এর পাণ্ডুলিপি আনিয়ে অনুবাদ ও প্রকাশ করেছিলেন ত্রিপুরচন্দ্র সেন। ত্রিপুরচন্দ্র সেনের 'গোজেন লামা' নামক গবেষণা পুস্তকটি ত্রিপুরার ও সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসিগণের সমাজব্যবস্থা, ভাষা ও প্রাচীন তথ্যাদিতে পূর্ণ। পুস্তকটি ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত-এর মতে একটি বহু মূল্যবান ইতিহাসের উপাদান হিসাবে সমাদৃত হবে।

আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক মধুর করার ব্যাপারে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের ঘনিষ্ঠ ত্রিপুরার এক বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ আনন্দিরাম মেধির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আনন্দিরাম মেধি তৎকালীন আসামের রংপুর-এ(বর্তমান নাজিরা) অহম দরবারে রুদ্র সিংহের সাথে দেখা করেন। আনন্দিরামের নেতৃত্বে রত্নকন্দলী শর্মাও অর্জুনদাস বৈরাগীকে ত্রিপুরার দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের দরবারে পাঠিয়েছিলেন আসামের রাজা স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ। সময়টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবল প্রতাপান্বিত মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়। সেই সুযোগে মুঘল-বিরোধী শক্তি জোট গঠনের অভিপ্রায়ে আসামের স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ দু'জন দূত পাঠিয়েছিলেন ত্রিপুরার দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের দরবারে। উল্লেখ্য, এতদিন ত্রিপুরার ইতিহাস ছিল রাজমালা নির্ভর, যাতে রাজবন্দনাই গুরুত্ব পেত। কিন্তু আসামের দূত ত্রিপুরায় শুধু রাজবন্দনা করতে আসেন নি। তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃত বাস্তব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা অহম রাজাকে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এরই জন্য দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য, মহেন্দ্রমাণিক্য ও দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের প্রথমদিকের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানতে গেলে 'ত্রিপুরা দেশের কথা' ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় রীতিনীতি ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তারিতভাবে, 'ত্রিপুরা দেশের কথা' সেখানে গ্রন্থটিতে বর্ণিত হয়েছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের ও রাজধানীর বিবরণ, দুর্গ, মন্দির, রূপার দুয়ারি ও সোনার দুয়ারি ঘর, বড়লোক ও পাত্রমন্ত্রীদের বর্ণনা, যেমন—যুবরাজ, বড়-ঠাকুর, উজির, নাজির, নেমুজী, কারকুন, কোতোয়াল, মুছিব, দেওয়ান থেকে শুরু করে পূজা পদ্ধতি ও উপাচার, সিংহাসনের বর্ণনা, পুকুর ও গোমতী নদীর এক জীবন্ত ছবির হদিস পাওয়া যায়।

অসমিয়া পাণ্ডুলিপি 'ত্রিপুরা দেশের কথা' বিবরণীতে শুধু যে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য, মহেন্দ্রমাণিক্য এবং দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালের ছবি এঁকে গেছেন তাই নয় সেই সময়কার রাজ্যের যাতায়াতের নিঁখুত বর্ণনাও এতে দেওয়া হয়েছে। যেমন—"ত্রিপুরার অভ্যন্তরে পথ-ঘাট ছিল না বললেই চলে। রাজধানী উদয়পুর থেকে কৈলাসহর যেতে আট দশদিন সময় লাগত। আসামের দূতরা হয় পদব্রজে, অথবা নৌকাযোগে, মাঝে মাঝে আবার হাতি বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গেছেন, তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে। পথিমধ্যে যে সব স্থানের

নাম তাঁরা উল্লেখ করেছেন তার অধিকাংশই আজ হারিয়ে গেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে তৈজালপাড়া, রাংরুঙ্গা, দেওগাঙ্গা, কুমজাঙ্গা, সাইরেঙ্গা চুক, থাকরাই, ছোট মরিছড়ি ইত্যাদি। যাঁরা স্থানের অতীত নাম নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের কাছে এই সব নাম নিশ্চয়ই কৌতূহল সৃষ্টি করবে। কাছাড় ও ত্রিপুরার সীমানা ছিল রূপিনী নদী। মদন পূজা উপলক্ষে গোমতী নদীতে পরস্পরের প্রতি জল ছিটিয়ে খেলা এবং হাজার হাজার মানুষের মিলনে যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার বর্ণনা যে কোন রসিক ব্যক্তিকে আকর্ষণ করতে বাধ্য। আবার ত্রিপুরা রাজার দৈনিক কাজ কী ছিল তা জানার ঔৎসুক্য কম হবে না। রাজার দৈনিক কাজের বর্ণনা এইরূপ ঃ "রাজা প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া করার পর দন্তধাবন করেন। তারপর মালিশওয়ালা রাজার শরীরে তৈল মালিশ করিলে রাজা নদীর জলে স্নান করিয়া সোনার ঘটিতে করিয়া এক ঘটি গঙ্গাজল মাথায় ঢালেন। রাজার আদেশের বলে এই গঙ্গাজল মাসে একবার নৌকায় করিয়া আনাইতে হইত। তারপর রাজা মন্দিরে গিয়া ইষ্ট দেবতার সেবা পূজা করেন। সেখান হইতে আসিয়া জল পান করিয়া পুরাণ পাঠ শুনেন। তারপরে ভোজন করিয়া বসন পরিধান করেন। সেই সময়ে রাজার সেবক ডাকিয়া বলে—মহারাজের বাহির হইবার সময় হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেলামবাড়ি বাজে। তখন যুবরাজ ইত্যাদি বড় বড় লোকেরা দরবারে উপস্থিত হন। রাজ সভাপন্ডিত ইত্যাদি দরবারি লোকেরাও আসে। তারপর দেড় প্রহর অতিক্রান্ত হইলে রাজা আসিয়া সেই সিংহাসন-ঘরে সিংহাসনের উপরে বসেন। যুবরাজ সেই সিংহাসন-ঘরে আসিয়া রাজাকে প্রণাম করেন। সেই ঘরে গালিচার উপরে একটি সুজনি পাতা থাকে যুবরাজ আসিয়া তাহাতে বসেন। বড় ঠাকুরের জন্য ঐ গালিচার উপরে এক খণ্ড কাপড় পাতা থাকে। বড় ঠাকুর আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া উহাতে বসেন। দুইজন সভাপন্ডিত আসিয়া আশীর্বাদ করিয়া এইরূপে বসেন। রাজপুরোহিতও আসিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া গালিচার উপরে বসেন। উজির, নাজির, নেমুজীর কার্কোন, কতোয়াল মুছিব ও দেওয়ান আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া ঐ ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকেন। এই ঘরের দিকে আসিবার সময় উপরোক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে কেহই অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে লইতে পারেন না।"

"দেশের অন্যান্য বড়লোকেরা তাহাদের লোকজন লইয়া এবং বাংলাদেশ হইতে আসিয়া যাহারা চাকুরি করিতেছে তাহারা রাজাকে প্রণাম করিয়া ঐ ঘরের সম্মুখের খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকে। সেই খোলা জায়গায় সোনার লাঠি

লইয়া দুইজন এবং রূপার লাঠি লইয়া দুইজন—এই চারিজন লোক দাঁড়াইয়া থাকে। তাহাদিগকে গুরু-জবর্দ্দার বলে। দেশ বিদেশের লোক রাজাকে প্রণাম করিতে আসিলে তাহাও গুরু -জবর্দ্দারদের রাজার কর্ণগোচর করিতে হয়। রাজা এইরূপ দুই দণ্ডকাল বসিয়া থাকেন। যে সমস্ত বিষয়ে আলাপ করিবার থাকে তাহা ঐ সময়ে হয়। তারপর একজন সেবক রাজবাড়ির ভিতর হইতে ফুল, চন্দন, সুগন্ধযুক্ত পান ও সুপারি আনিয়া দেয়। একজন ব্রাহ্মণ, যুবরাজ প্রভৃতি সকলকে নিয়মিতরূপে পান সুপারি ইত্যাদি বিতরণ করে। তারপর সকলে এই ঘর হইতে নামিয়া আসিয়া সম্মুখের খোলা জায়গায় রাজাকে প্রণাম করে। ব্রাহ্মণেরা রাজাকে আশীর্বাদ করে। তারপর রাজা উঠিয়া রাজবাড়ির ভিতরে যান এবং অন্যান্যরা নিজ নিজ বাড়িতে যায়। পালাক্রমে একজন বড়ুয়া সোনার দুয়ারি ঘরে এবং একজন হাজারি অনুমান ৪০জন লোক লইয়া রূপার দুয়ারি ঘরে থাকে। তাহারা রাত্রিতেও এই নিয়মে পাহারা দেয়। উপরোক্ত নিয়মে প্রতিদিন কার্য চলে।"

আসামের দূতগণ তাঁদের বিবরণীতে রত্নদেব বনাম ঘনশ্যামের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত জীবন্ত করে এঁকেছেন। দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং রত্নমাণিক্যকে হত্যা করে নিজে মহেন্দ্রমাণিক্য নাম নিয়ে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর প্রাসাদ কলহের নিঁখুত বর্ণনা রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস দিয়েছেন। দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর। এই ঘটনা চীনের শেষ রাজার কাহিনির মত। প্রথমে মামা বলি ভীমনারায়ণ ছিলেন সর্বেসর্বা। এরপর রত্নমাণিক্যকে হটিয়ে রামদেব মাণিক্যের ভাগ্নে নরেন্দ্রমাণিক্য এবং গোবিন্দমাণিক্যের ভাই জগন্নাথ ঠাকুরের পুত্র চম্পক রায় কীভাবে সেদিন ক্ষমতা দখলের জন্য পৃথক পৃথক শিবিরে বিভক্ত হয়েছিলেন— সেই সব কাহিনিরও নিঁখুত বর্ণনা রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস দিয়েছেন। 'রাজমালা'র মতে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য নাকি ১২৫ টি বিবাহ করেন। এই প্রতিবেদনটি পড়লে উপলব্ধি করা যাবে সেদিন সতীদাহ প্রথা কত নির্মম ছিল। এক একজন 'মাণিক্য' রাজার মৃত্যুর পর সহমরণের বিবরণ বড় করুণ এবং মর্মন্তুদ!

সর্বশেষে বলা যায় ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজাদের ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির মধ্যে মুদ্রার গুরুত্ব অপরিসীম। ত্রিপুরার রাজারা সিংহাসন আরোহণ ও বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে মুদ্রা প্রচলন করতেন। এ যাবৎ আবিষ্কৃত ত্রিপুরার রাজাদের মুদ্রার মধ্যে দেখা যায় যে রত্নফা তথা রত্নমাণিক্য প্রথম ১৪৬৪

খ্রিস্টাদে(১৩৮৬ শকাব্দ) তাঁর মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁর প্রবর্তিত মুদ্রায় বাংলার সুলতানদের মুদ্রার সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। রাজমালার তালিকা অনুযায়ী প্রথম রত্নমাণিক্য থেকে দ্বিতীয় ইন্দ্রমাণিক্য পর্যন্ত যে ২৮ জন রাজা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ত্রিপুরায় রাজত্ব করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্তত ২১ জনের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এই মুদ্রাগুলি অধিকাংশই 'সাধারণ' মুদ্রা হিসাবে নির্মিত হলেও এদের মধ্যে অন্তত কতকগুলি স্মারক মুদ্রা হিসাবে মুদ্রিত হয়েছিল। রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ও পরবর্তী কোনো সময় সাধারণ মুদ্রা নির্মিত হত। কাছাড়রাজ ইন্দ্রপ্রতাপনারায়ণের ১৫২৪ শকে নির্মিত 'শ্রীহট্টবিজয়ের' এবং হুসেন শাহের 'কামরূপ, কামতা, জাজনগর ও ওড়িযা জয়ের বিখ্যাত স্মারক মুদ্রাগুলি ছাড়া ত্রিপুরা রাজাদের মত স্মারক মুদ্রা প্রচারের আর বিশেষ সমসাময়িক নজির নেই।

উত্তর-ভারতের মধ্যযুগের মুদ্রাগুলির মধ্যে ত্রিপুরা মুদ্রার স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওই সময়ে একমাত্র ত্রিপুরা মুদ্রাতেই চিত্রণ (device) দেখা যায় বরং ভারতীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে শুধু এগুলিতেই রাজার নামের সঙ্গে প্রায় নিয়মিতভাবেই রাজমহিষীর নামও থাকতো।

ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি

প্রাচীন রাজমালার সংকলকদের মতে মহারাজা ত্রিপুর 'কিরাত' নামের বিলোপ সাধন করে তিন অধিকৃত দেশের সঙ্গে নিজের নাম সংযোগ করে সেই দেশের নাম রাখেন 'ত্রিপুরা' এবং স্বজাতীয়দের 'ত্রিপুর' জাতি বলে প্রচার করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা অবশ্য এই মত স্বীকার করেন না 'শ্রীরাজমালা'র সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন-এর মতে কিরাত দেশের অন্তর্নিবিষ্ট গোমতী নদীর তীরবর্তী ভূভাগ যে অজ্ঞাত কারণেই হউক, ইতিহাসের অগোচর কাল থেকে ত্রিপুরা নাম প্রাপ্ত হয়েছে। ''রাজমালার মতে পরাক্রমশালী রাজা ত্রিপুরের নাম অনুসারে কিরাত দেশের নাম হয় ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরের স্বজাতীয়রা 'ত্রিপুর' নামে পরিচিত হয়। ঐতিহাসিকরা ত্রিপুরকে কিংবদন্তীমূলক ও কাল্পনিক বলেছেন। কোনো কোনো লেখকের মতে উদয়পুরে অবস্থিত পীঠদেবী ত্রিপুরা সুন্দরীর নাম অনুসারে রাজ্যের নাম ত্রিপুরা হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরটি ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল এবং তার এগারো বৎসর পূর্বে ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ এক মুদ্রায় ধন্যমাণিক্য নিজেকে 'ত্রিপুরেন্দ্র' অর্থাৎ ত্রিপুররাজ বলে অভিহিত করেছিলেন। সুতরাং ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ত্রিপুর বা ত্রিপুরা নামটি পরিচিত ছিল। সুতরাং

নিশ্চিতভাবেই বলা যায় দেবীর নাম থেকে এ রাজ্যের নামকরণ হয়নি। বরং বলা যেতে পারে ত্রিপুরা রাজ্যের নাম থেকে দেবীর নাম ত্রিপুরা সুন্দরী হওয়া অসম্ভব নয়। আবার কোনো কোনো লেখকের মতে ত্রিপুরায় মহাদেবের মন্দির ছিল এবং মহাদেব ত্রিপুরেশ্বর বা ত্রিপুরারী নামে পরিচিত। এই ত্রিপুরেশ্বর বা ত্রিপুরারী নাম থেকে এ রাজ্য 'ত্রিপুরা' নামে পরিচিত। লেডইন-এর ধারণা 'টিপারা' শব্দটি বাংলায় 'ত্রিপুরা' উচ্চারণ করা হয়। সংস্কৃত শব্দ 'ত্রিপুরার্দন'-এর অর্থ সূর্য। যেহেতু পার্বত্য ত্রিপুরায় সূর্যের উপাসনা সংস্কৃতির অঙ্গ সে কারণে টিপারা। তিপরা শব্দটি সম্ভবত সূর্য দেবতা 'ত্রিপুরার্দন' শব্দ থেকে উৎপন্ন।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ(১৮৯৬)-এর মতে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তির পেছনে এ রাজ্যের তিপ্রা ভাষার প্রভাব রয়েছে। তিনি বলেছেন, ''যে অনার্য কিরাতদিগকে আমরা তিপ্রা (ত্রিপুরা) আখ্যায় পরিচিত করিয়া থাকি তাহাদের জাতীয় ভাষায় জলকে 'তুই' বলে এবং 'প্রা' শব্দের অর্থ নিকটে। সুতরাং 'তুই' ও 'প্রা' যুক্ত হয়ে 'তুইপ্রা' হয়েছে। 'তুইপ্রা' দুটি শব্দের অর্থ জলের নিকটে। সেই তুইপ্রা হইতে তিপ্রা এবং 'তিপ্রা' হইতে ক্রমে তৃপুরা, ত্রীপুরা ও ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি। ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে তিপ্রা বা ত্রিপুরী উপজাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ত্রিপুরা শব্দটি সম্ভবত তিপ্রা নামক উপজাতির সংস্কৃত রূপ। তিপ্রা বা ত্রিপুরা উপজাতির নাম থেকেই এ রাজ্য ত্রিপুরা নামে পরিচিত হয়েছে। ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে আর একটি যুক্তিগ্রাহ্য মত এইরূপ কথিত আছে আসামের নওগাঁও জেলা থেকে বিতাড়িত রাজা দক্ষিণ বরাক উপত্যকায় কলংমা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। নওগাঁও জেলার কলং ও কপিলি নদীর উপত্যকা থেকে আগত তিপ্রারা বরাক নদীকে সর্বপ্রথম 'কলংমা' অর্থাৎ বড় কলং নামে চিহ্নিত করেছিল। উচ্চারণ বিকৃতির ফলে যা 'খালংমা'র রূপ ধারণ করে। তিপ্রা ভাষায় 'বরক' শব্দের অর্থ, মানুষ। সেই কারণে মানুষের বসতি স্থলের নদীটি 'বরক' শব্দ থেকে দাঁড়ায় 'বরাক'। খালংমা বা বর্তমানে খারংক্ষ অঞ্চলে এর সাক্ষী হিসাবে এখনও প্রাচীন সেই রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। গবেষকদের মতে ত্রিপুরী রাজবংশ যখন বরাক উপত্যকায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, ঐ সময়ে এই উপত্যকার অসমতল ভূমি বছরের বেশিরভাগ সময়ই জলমগ্ন থাকতো বলে 'জলভূমির অধীশ্বর' বুঝাতে তিফ্রা' শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। তিপ্রা ভাষায় জলবাচক শব্দ অর্থে 'তি' 'তই' এবং 'তুই' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় এবং বর্মী 'ফ্রা' শব্দের অর্থ প্রভু। এই 'তিফ্রা' শব্দটি পরে

'তিপ্রা'-তে পরিণত হয় এবং তাদের অধিকৃত এই ভূমিকে তারা সম্ভবত 'তিপ্রা-হা' নামে অভিহিত করতো। এক্ষেত্রে 'হা' শব্দটি ভূমি অর্থে তিব্বতী-বর্মী শব্দ। এই 'তিপ্রা-হা' শব্দটিই পরবর্তীকালে সংস্কৃতায়িত হয়ে 'ত্রিপুরা' নাম ধারণ করে।

প্রাক মাণিক্য যুগ

প্রাক্ মাণিক্য যুগে ত্রিপুরায় কোন সুসংবদ্ধ স্বাধীন রাজ্য ছিল কিনা এই সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে ত্রিপুরার বেশ কিছুটা অংশ প্রাচীনকালে, বিভিন্ন সময়ে পূর্ববাংলা ও সমতটের বিভিন্ন রাজবংশের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে অবিভক্ত বাংলার চারটি সমৃদ্ধ জনপদ, যথা—রাঢ়, পুন্ড্র, বঙ্গ এবং সমতট প্রাচীনকাল থেকেই এক মহান সংস্কৃতির ইতিহাস বহন করে আসছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল তার সঠিক বিবরণী, বিশেষ করে প্রত্যন্ত রাজ্য সমতট সম্পর্কে বিশেষ কিছু এখনও জানা যায়নি। ঐতিহাসিকদের মতে তাম্রলিপ্ত বা মহাস্থানগড়ের মতো এই রাজ্যটিও যে প্রায় সমান মর্যাদার অধিকারী তা আমরা অবগত। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থিতি এবং ডাঃ ক্যানিংহাম-এর অনুমানও অসম্পূর্ণ তথ্য নির্ভর হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জিলায় নির্ণীত হয়ে আসছিল। অথচ এখন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, সমতল ত্রিপুরা এবং সংলগ্ন ভূখণ্ডই ছিল প্রাচীন বাংলার সমতল রাজ্য। চতুর্থ শতকে সমুদ্রগুপ্তের বিখ্যাত এলাহাবাদ Pillar Inscription (স্তম্ভ শিলালিপি)-তে বঙ্গদেশের পাশাপাশি রাজ্য হিসাবে 'সমতটে'র সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় 'সমতট' এবং 'বঙ্গ' এই দুটি যে আলাদা রাজ্য তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সপ্তম শতকে ভারতে পরিভ্রমণরত বিখ্যাত চীনা শ্রমন য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতে এই রাজ্যের বিশেষ বর্ণনা আছে। আশ্রাফপুরে প্রাপ্ত তাম্রলিপি এবং চীনা পরিব্রাজকের প্রদত্ত বিবরণী থেকে জানা যায় যে সপ্তম শতকের দ্বিতীয় ভাগে খড়গবংশ খ্যাত একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ রাজবংশ সমতটে রাজত্ব করত। বাংলাদেশের কুমিল্লায় দেউলবাড়িতে প্রাপ্ত সর্বাণী দেবীমূর্তির পাদদেশে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে এই রাজবংশের চারপুরুষের বংশতালিকা পাওয়া যায়। তাতে জানা যায় রাজাধিরাজ রাজভট্ট এই বংশেরই রাজা এবং তাঁর রাজধানীর নাম ছিল 'কার মাণত'। কুমিল্লার ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত আধুনিক 'বড়কামতা'ই ওই স্থান বলে প্রমাণিত। উপরোক্ত বৌদ্ধ রাজবংশের ঠিক আগে সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে, সমতটে একটি ব্রাহ্মণ রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। সমতল ত্রিপুরা জেলার

কৈলাস গ্রামে আবিষ্কৃত সপ্তম শতকীয় একটি পট্রোলি থেকে এই সংবাদ জানা যায়। এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজবংশোদ্ভব রাজা জীবধারণ। য়ুয়ান চোয়াঙ্-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে তাঁর গুরু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ মহাস্থবির আচার্য শীলভদ্র এই ব্রাহ্মণ রাজবংশেরই সন্তান। আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকটবর্তী বাঘাউড়ায় প্রাপ্ত বিখ্যাত বিষ্ণুমূর্তির মহীপালকে অনেকে সমতটের কোনো সামন্ত নরপতি বলে অনুমান করে থাকেন। দশম শতকের প্রথমার্ধে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব নামে এক বৌদ্ধ রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল বর্ধমানপুর। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন এই স্থানটি শ্রী হট্ট-ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের কোণ স্থান হবে। ত্রয়োদশ শতকের ইতিহাসে খ্যাত দেববংশের চার নামক একটি নগরের উল্লেখ আছে। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরে মেহারকুল পরগণা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনুসন্ধানের অভাবে ওই নগরের স্থান নির্ণয় ১৯৪২ সাল পর্যন্ত হয়নি।

গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতী ছিল নিষিদ্ধ এলাকা। যুদ্ধের প্রয়োজনে আকস্মিক খননের ফলে ময়নমতীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে একটি সুপ্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং অনেক লিপিখণ্ড, পোড়ামাটির ফলক, মূর্তি, মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। ময়নামতী পাহাড়ে ঘেরা এই সুবিস্তৃত ধ্বংসস্তূপই যে প্রাচীন পট্টিকেরা নগরী তা প্রমাণিত হয়েছে। অষ্টসহস্রিকা- প্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপিতে(১০১৫) পট্টিকেরা রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ব্রহ্মদেশীয় উপকথার রাজবৃত্তে 'হমনান' গ্রন্থে এই রাজবংশের উদ্ধৃতি আছে। দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে পট্টিকেরা রাজপুত্রের সহিত ব্রহ্মদেশীয় রাজা অনিরুদ্ধের কন্যার প্রেম এবং বিয়ের কাহিনি এবং তার বিয়োগান্ত পরিণতির কাহিনি নিয়ে ব্রহ্মদেশের নানা লোকগাথা ও ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছিল যা এখনও গ্রামাঞ্চলের বিনোদন-মঞ্চে জনপ্রিয়।

সপ্তম শতকের শেষের দিকে দেবখড়গ-এর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় ত্রিপুরার একটি বড় অংশ খড়গবংশীয় রাজাদের শুধু অধীনেই ছিল না, উপরন্তু এঁদের রাজধানী কর্মপ্তবাসক যার সঙ্গে ত্রিপুরা জেলার বড়কামতা নামক স্থানটি অভিন্ন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।* চৈনিক বিবরণ থেকেও জানা যায় ত্রিপুরা ছাড়াও প্রায় সমগ্র পূর্ব এবং দক্ষিণ বঙ্গ এঁদের অধীনে ছিল। খড়গবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। খড়গ বংশ ছাড়াও সে সময় রাতাবংশীয় জীবধারণ ও তার

পুত্র শ্রীধারণ ত্রিপুরা অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন। শ্রীধারণ নিজেকে সমতটের রাজা বলে প্রচার করেছেন। দেবপর্বতে এঁদের রাজধানী ছিল। এই দেবপর্বত ক্ষিরদা নদীর তীরে অবস্থিত। ক্ষিরদা বা ক্ষিরা নদী গোমতী নদীর শাখা এবং কুমিল্লার পশ্চিমে অবস্থিত। রাজা বংশের পর ভবদেব ও কান্তিদেব নামে দুজন দেববংশীয় রাজা এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন। তাৎপর্যের বিষয় হল এঁদের কাছ থেকেই চন্দ্রবংশীয় রাজারা সমতট অধিকার করেন।

সুতরাং বলা যেতে পারে, ত্রিপুরার রাজবংশ খুবই প্রাচীন এবং মধ্যযুগের পূর্বেও এই রাজবংশ বিদ্যমান ছিল। মধ্যযুগে এই রাজ্যের ও রাজবংশের ইতিহাস বাংলা পদ্যে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটির প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজা ধর্মমাণিক্যের আদেশে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামক দুইজন প্রধান এবং চন্তাই (প্রধান পূজারি) দুর্লভেন্দ্র গ্রন্থটি রচনা করেন। ধর্মমাণিক্য পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব করেন। গ্রন্থটির মূল সংস্করণ দুর্লভ। কিন্তু পরবর্তীকালে এটি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে যে রূপ ধারণ করে তা বর্তমানে রাজমালা নামে পরিচিত। রাজমালার দুটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথমটি শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদনা করেন (১৯৩১-৩৬)। দ্বিতীয়টি ১৯৬৭ সালে ত্রিপুরা সরকার প্রকাশ করে। অবশ্য দুটি সংস্কারণের মধ্যে অনেক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

রাজমালার সূত্রে জানা যায় যে চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি তাঁর পুত্র দ্রুহ্যকে কিরাত দেশে রাজা করে পাঠান। পরবর্তীকালে এই বংশে ত্রিপুর নামক রাজার জন্ম হয়। ত্রিপুর নাম থেকে রাজ্যের নাম হয় ত্রিপুরা। কথিত আছে রাজা ত্রিপুর দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। এই সব কাহিনির যে কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নেই তা বলাই বাহুল্য। ত্রিপুরের পরবর্তী ৯৩ জন রাজার পর ছেংথুম ফা রাজার নাম পাওয়া যায়। গৌড়েশ্বর ছিলেন মুসলমান নরপতি। এই কারণে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ত্রিপুরার রাজা ছেংথুম ফা-এর শাসনকাল থেকেই ত্রিপুরার ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বলে মনে করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে বাংলার মুসলমান সুলতান গিয়াসুদ্দিন ইউয়জ শাহ(১২১২-২৭) পূর্ববঙ্গ ও কামরূপ আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিস(১২২৫-২৬) গিয়াসুদ্দিন ইউয়জ শাহকে দমন করে লখনৌতি রাজ্য জয় করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। ইলতুৎমিস বিহার থেকে লখনৌতির দিকে

রওয়ানা হলে গিয়াসুদ্দিন তাকে বাধা দেবার জন্য এক নৌবাহিনী পাঠালেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে দিল্লির সুলতান-এর সঙ্গে অনেক অর্থ ও হাতি এবং দিল্লির সুলতানের নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করতে ও খুৎবা পাঠ করতে সম্মত হয়ে সন্ধি করেন। কিন্তু দিল্লির সুলতানের প্রত্যাবর্তনের অল্পকালে পরেই গিয়াসুদ্দীন দ্বারা বিহারের শাসনকর্তা ইজ্জুদীন(দিল্লির সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত) জানীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করা হলে ইলতুৎমিসের পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ লখনৌতি আক্রমণ করেন। এই সময় গিয়াসুদ্দিন ইউয়জ পূর্ববঙ্গ এবং কামরূপ জয় করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। সুতরাং নাসিরুদ্দীন অনায়াসে লখনৌতি অধিকার করে ফেলেন। গিয়াসুদ্দীন এই সংবাদ পেয়ে ফিরে আসেন এবং নাসিরুদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁর পরাজয়ের পর তিনি সমস্ত খিলজী আমীরের সহিত বন্দি হন। পরিশেষে গিয়াসুদ্দীনের প্রাণবধ করা হল। ঐতিহাসিকদের মতে সম্ভবত এই ঘটনাটি পরবর্তীকালে কোন গৌড়াধিপের ত্রিপুরা আক্রমণ ও পরাজয়রূপে বর্ণিত হয়েছে।

ত্রিপুরার রাজমালায় বলা হয়েছে ছেংথুম-ফা-এর প্রপৌত্র ডাঙ্গার-ফার আঠারোটি পুত্র ছিল। সর্বকনিষ্ঠ রত্নফা গৌড়ের রাজদরবারে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং গৌড়েশ্বরের সৈন্যের সহায়তায় ত্রিপুরার রাজসিংহাসন লাভ করেন। গবেষকদের মতে উল্লিখিত গৌড়েশ্বর নিঃসন্দেহে বারবক্‌শাহ(১৪৫৫-১৪৭৬)। রত্ন ফা বিনিময়ে গৌড়েশ্বরকে একটি বহুমূল্য রত্ন উপহার দেন। গৌড়েশ্বর খুশি হয়ে রত্ন ফা-কে 'মাণিক্য' উপাধি দেন। এতকাল ত্রিপুরার রাজগণ নামের শেষে 'ফা' উপাধি ব্যবহার করতেন। স্থানীয় ভাষায় 'ফা'-এর অর্থ পিতা। অতঃপর ফা'র পরিবর্তে ত্রিপুরার রাজাদের নামের শেষে মাণিক্য ব্যবহৃত হতে থাকে। সুতরাং রত্নফা রত্নমাণিক্য নামে পরিচিত হলেন।

উল্লেখ্য, রাজমালার এই কাহিনি সত্য বলে মনে হয় না। কারণ রাজা ধর্মমাণিক্য যে রত্নমাণিক্যের পূর্ববর্তী তা মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে জানা যায়। সুতরাং রত্নমাণিক্য যে সর্বপ্রথম 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করে এই উক্তি সত্য নয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রাচীনকালে ত্রিপুরার একটি বড় অংশ পূর্ব বাংলা ও সমতটের বিভিন্ন পরাক্রমশালী রাজবংশের অধীন ছিল। এইসব রাজবংশের অনেকেরই রাজধানী ছিল ত্রিপুরা অঞ্চলে। এদের অনেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং এই সময় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ত্রিপুরাতেও পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরা

এবং বিশেষ করে পিলাক অঞ্চলে বৌদ্ধ সংস্কৃতির যে একটি মূল্যবান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল তা সেখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে জানা যায়। আশ্চর্যের বিষয় হল ওই সময়ে কোনও লিপি বা মুদ্রায় ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীনকালে কোনো লিপি বা মুদ্রায় 'ত্রিপুরা' নামটি না থাকায় গবেষকরা একমত ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব অবস্থান ছিল বর্তমান আসামের কাছাড় সংলগ্ন অঞ্চলে। দেববংশের রাজারা দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে ত্রিপুরা উপজাতির দলপতি 'ফা' উপাধিধারী রাজারা ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে সুসংবদ্ধ রাজ্য গড়ে তোলেন এবং ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উভয়ের মধ্যে একাত্মতা গড়ে ওঠে। ত্রিপুরী দলপতি পূর্বের 'ফা' উপাধির পরিবর্তে মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করে এবং তাদের উপজাতি সম্প্রদায়ের নাম অনুসারে নব্যপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যটি ত্রিপুরা রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে। উইলিয়াম হান্টার তাঁর 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল'-এ বলেছেন ত্রিপুরীরা তিব্বতী-বর্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে ভাষাগত দিক থেকে তিপ্রা জাতি বোরো (Bodo) জাতিভুক্ত। প্রাচীনকালে এই বোরোজাতি ভারতের সমগ্র পূর্বাঞ্চলে বসবাস করতো। এদেরই বলা হত কিরাত। জাতিতত্ত্বের দিক থেকে তিপ্রা,কাছাড়ি, মেচ, কোচ, গারো প্রভৃতি সমগোত্রীয়। অন্যদিকে মেজর ফিশার তিপ্রা ও কাছাড়ি জাতিদ্বয়ের ভাষা, অবয়ব, আচার এবং আচরণ পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে যে তিপ্রা ও কাছাড়িরা একই বংশোদ্ভূত। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ(১৮৯৬)-এর মতে ব্রহ্মদেশের উত্তর ভাগে শ্যান বংশীয় রাজাদের একটি শাখা কামরূপের পূর্বাংশে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন এবং এই রাজবংশেরই জ্যেষ্ঠপুত্র হেড়ম্ব ফা কাছাড় রাজ্যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। অন্যদিকে কনিষ্ঠপুত্র কাছাড়ের উত্তরাঞ্চলে দ্বিতীয় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। উল্লেখ্য, এই দ্বিতীয় রাজ্যটিই বর্তমানের ত্রিপুরা রাজ্য কোন সন্দেহ নেই।

মাণিক্যবংশীয় রাজাদের আদি পরিচয়

ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচিত ছিলেন। রাজমালায় বলা হয়েছে যে এঁদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন পুরাণ বর্ণিত উত্তর ভারতের বিখ্যাত চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি পুত্র দ্রুহ্যের বংশধর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রাচীনকালে ত্রিপুরার রাজাদের আদেশে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে

রাজমালায় রচয়িতাগণ অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ধারাবাহিক ঐতিহাসিক তথ্যাদি ঠিকঠিকভাবে সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সত্যিকারের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করতে গেলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজাদের অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত হবেন—এইরূপ প্রশ্ন লেখকদের ভাবিয়ে তুলেছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। মহাভারতে 'ত্রিপুরা' নামে একটি রাজ্যের নাম দেখা যায়। ত্রিপুরার রাজবংশ যে একটি সুপ্রাচীন রাজবংশ, তা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রাচীন রাজমালার লেখকগণ দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেছেন যে, ত্রিপুরার মহারাজা ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু এই তথ্য সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক দলিল নেই। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মহাভারতে উল্লেখিত ত্রিপুরা রাজ্যকে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য বলেও মনে করেন না। যেহেতু প্রাচীন তথ্যাদি রাজমালার রচয়িতাদের হাতে ছিল না সেই কারণে রাজমালার রচয়িতারা কিংবদন্তি, লোকগাথা, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রাজাদের আদিপুরুষের কাহিনি বলে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে ত্রিপুরার অতীত দিনের মহারাজারা তা বিশ্বাস করে এসেছেন। বর্তমানে ত্রিপুরার সত্যিকারের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করার প্রয়াস চলছে। তবে প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারেই রয়ে গেছে।

রাজমালায় বলা হয়েছে পিতা যযাতি কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে দ্রুহ্য ভারতের পূর্ব দিকে ত্রিবেগে একটি রাজপাট স্থাপন করেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত 'শ্রীরাজমালায়' এই ত্রিবেগের অবস্থান সাগর দ্বীপে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্রুহ্যের বংশধর দৈত্য কিরাতভূমি অধিকার করে কপিল নদীর তীরে (বর্তমান আসামের নওগাঁও) এক নতুন রাজপাট স্থাপন করেন এবং এই রাজ্যের নামও ত্রিবেগ রাখা হয়। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে দ্রুহ্যই কপিল নদীর তীরে ত্রিবেগে রাজপাট স্থাপন করেছিলেন। রাজমালায় এই ত্রিবেগ রাজ্যের সীমা এইভাবে দেওয়া আছে যেমন ঃ'ত্রিবেগ রাজ্যের পূর্বে মেখলি দেশ, উত্তরে তৈড়ঙ্গ নদী, পশ্চিমে বঙ্গদেশ ও দক্ষিণে আচরং নামক রাজ্য। এই বর্ণনা অনুযায়ী দৈত্যের মতান্তরে দ্রুহ্যের ত্রিবেগ রাজ্য ছিল কাছাড় সংলগ্ন কোনও অঞ্চল। দৈত্যের(মতান্তরে দ্রুহ্যের) পুত্র ত্রিপুর ছিলেন পরাক্রমশালী ও অত্যাচারী রাজা। তিনি নিজ নাম অনুসারে রাজ্যের নাম ত্রিপুরা রাখেন এবং তাঁর স্বজাতীয়রা ত্রিপুরা জাতি হিসাবে পরিচিত হয়। ত্রিপুর

শিবের হাতে নিহত হন। ত্রিপুরের মহিষী হীরাবতী শিবের বরে ত্রিলোচন নামে এক পুত্রপ্রাপ্ত হন। শিবভক্ত ত্রিলোচন চতুর্দশ দেবতার পূজার প্রচলন করেন। ত্রিলোচন হেড়ম্ব দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। সেই সুবাদে ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র দৃকপতি অপুত্রক অবস্থায় মাতামহের মৃত্যু হলে হেড়ম্ব রাজ্যের (বর্তমান কাছাড়) অধিপতি হন। কনিষ্ঠপুত্র দক্ষিণ পিতৃরাজ্য ত্রিবেগ প্রাপ্ত হন। কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা দৃকপতি দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ কপিল নদীর তীর থেকে বরবক্র নদীর(বরাক নদী) তীরে রাজপাট স্থানান্তরিত করেন। দক্ষিণের পুত্র ৩য় দক্ষিণ মেখলি (মণিপুর) দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ৩য় দক্ষিণের এক বংশধর কুমার শিবভক্ত ছিলেন। তিনি মনুনদীর তীরে শ্যামল নগরে শিবলিঙ্গ দর্শন করে সেখানেই বাসস্থান নির্মাণ করেন। কুমারের এক বংশধর, প্রতীত হেড়ম্বরাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জুরী নদীর তীরে ধর্মনগরে রাজপাট স্থাপন করেন। প্রতীতের এক বংশধর জুঝারফা লিকা রাজাকে পরাজিত করে রাঙ্গামাটি (বর্তমান উদয়পুর) অধিকার করে সেখানেই রাজপাট স্থাপন করেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনের মতে জুঝারুফা ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করেন। অর্থাৎ তাঁর রাজত্বকাল ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল। জুঝারুফার পঞ্চম বংশধর ধর্মফা বা দানঝুরুফা প্রথমে বৌদ্ধধর্মালম্বী ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনা হয়। কথিত আছে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় ৫১ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে। ধর্মফা মিথিলারাজ বলভদ্রের সমসাময়িক ছিলেন। ছেংথুমফা বা কীর্তিধরের রাজত্বকালে হীরাবন্তখান নামে গৌড়েশ্বরের এক কর্মচারী দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্য লুণ্ঠিত হলে ক্রুদ্ধ গৌড়েশ্বর ত্রিপুরারাজের বিরুদ্ধে এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ভীতসন্ত্রস্ত ত্রিপুরা রাজা যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক হলে রানি স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে সাহস জোগান এবং ত্রিপুরার সৈন্যদের মদ্য মাংস ভোজন করিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে অনুপ্রাণিত করেন। রানি নিজেও হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে ত্রিপুরার সেনাদল জয়লাভ করে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে এই যুদ্ধ ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয় এবং ইহাই সম্ভবত বাংলার তুর্কীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ইন্দো-মোঙ্গলীয়দের 'প্রথম বিজয়'। কোনো কোনো আধুনিক ঐতিহাসিক ছেংথুমফা ও মহামাণিক্য একই ব্যক্তি বলে মনে করেন। উল্লেখ্য, মহামাণিক্যের রাজত্বকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে

অর্থাৎ ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালের (১৫৩১-১৫৬২) পূর্বে বলে মন্তব্য করেছেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ ত্রিপুরার রাজবংশকে তিপ্রা জাতির জ্ঞাতি বলে উল্লেখ করেছেন। হান্টার সাহেবের মতে ত্রিপুরার রাজারা হচ্ছেন তিব্বতী-বর্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত। অপর দিকে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তিপ্রা জাতিকে ভাষাগত দিক থেকে বোরো জাতিভুক্ত বলেছেন। প্রাচীনকালে এই বোরোজাতি ভারতের সমগ্র পূর্বাঞ্চল জুড়ে বাস করতো। এরাই কিরাত নামে পরিচিত। জাতিতত্ত্বের দিক থেকে তিপ্রা, কাছাড়ি, মেচ, গারো এরা সকলেই সমগোত্রীয়। এদের মধ্যে তিপ্রা ও কাছাড়ি জাতিদ্বয়ের ভাষা, অবয়ব, আচার আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে সামঞ্জস্য লক্ষ করে মেজর ফিশার তিপ্রা ও কাছাড়িদের একই বংশোদ্ভব বলে মনে করেন। তিপ্রা ও কাছাড়িরা যে একই বংশসম্ভুত তা রাজমালার বিবরণ থেকেও স্পষ্ট। রাজমালাতে বলা হয়েছে যে মাণিক্য রাজাদের পূর্বপুরুষ ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র হেড়ম্ব ফা কাছাড়ের রাজা হন এবং কনিষ্ঠপুত্রের বংশধররা বর্তমান ত্রিপুরার রাজা হন। ত্রিপুরার রাজাদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে শ্রীঅলীন্দ্রলাল ত্রিপুরা তাঁর 'ত্রৈপুর সংহিতা' কাব্যে উল্লেখ করেছেন ত্রিপুরীরা আরাকানের মুহুং অঞ্চল থেকে এসেছে এই কারণে ত্রিপুরীদের আরাকানবাসীরা মুহুং বলে থাকে। রাজাকে বলে মুহুং মুংগ। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে ব্রহ্মদেশের উত্তরভাগের শ্যানবংশীয় রাজাদের একটি শাখা কামরুপের পূর্বাংশে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই রাজবংশের জ্যেষ্ঠপুত্র হেরম্ব ফা কাছাড় রাজ্যে স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন। কনিষ্ঠ পুত্র কাছাড়ের উত্তরাংশে দ্বিতীয় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই দ্বিতীয় রাজ্যটিই প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্য। সুতরাং বলা যেতে পারে মাণিক্যবংশীয় রাজাদের পূর্বপুরুষরা ব্রহ্মদেশের উত্তরভাগের শ্যানবংশীয়দের উত্তরপুরুষ এবং কাছাড়ের রাজারা একই বংশসম্ভুত।

পরিশেষে বলা যেতে পারে ত্রিপুরার মাণিক্য বংশীয় রাজারা ইন্দোমঙ্গোলীয় বা কিরাত। ভাষাগত দিক থেকে বোরো জাতিভুক্ত তিপ্রা বা ত্রিপুরা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁরা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। ভারতে প্রাচীনকালে শক্তিশালী রাজারা ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হতেন এবং ব্রাহ্মণ পন্ডিতরাও তা সগৌরবে ঘোষণা করতে দ্বিধা করতেন না। রাজপুতনার বহু খ্যাতনামা রাজবংশ শক, হুণ,

প্রভৃতি বিদেশাগত জাতিভুক্ত হলেও ক্ষত্রিয় সমাজভুক্ত হয়েছিলেন এবং চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বিদেশাগত গুর্জর প্রতিহাররা নিজেদের অযোধ্যার সূর্যবংশীয় বলে দাবি করতেন। দ্রাবিড় চালুক্যরা কখনও সূর্য কখনও চন্দ্রবংশীয় বলে পরিচিত হতেন। সেদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজারাও ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং চন্দ্রবংশীয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্য ও হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

রাজ্য সংগঠনে বিভিন্ন প্রক্রিয়াসমূহ

রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ :

ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে কীভাবে রাজনৈতিক সচেতনার উদ্ভব হল এ সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের পঞ্চদশ শতকে যেতে হবে, যে সময়ে ত্রিপুরার প্রধান প্রধান উপজাতি সম্প্রদায়-এর মধ্যে ত্রিপুরী বা তিপ্রা, কুকি, রিয়াং এবং জমাতিয়ারা ইন্দো-মঙ্গোলয়ড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁরা উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম, শ্রীহট্ট এবং কাছাড় হয়ে এক এক সময়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করে। গবেষকদের মতে উত্তর-পূর্ব ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে।

ত্রিপুরার ভৌগোলিক আয়তনের ৫৯ শতাংশ বনভূমি। বনভূমিতে পাঁচটি পাহাড় শ্রেণি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। পাহাড় শ্রেণির মাঝে মাঝে রয়েছে বিস্তীর্ণ বনভূমি যা জুমচাষের জন্য আদিবাসীদের স্বর্গরাজ্য। কিন্তু জুমচাষ যেহেতু অনুদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী অর্থনৈতিক পদ্ধতি, সেই কারণে জুম চাষের উপর নির্ভর করে রাজ্যসংগঠন সম্ভব নয় এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন উপজাতির দলপতিরা। রাজ্যের সংগঠন যে কারণে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং যারা রাজনৈতিক সংগঠনে কর্মভারপ্রাপ্ত পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তি তারা উৎপাদন পদ্ধতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন না। সুতরাং রাজ্য সংগঠনে উপজাতিদের উৎপাদন ব্যবস্থা অবশ্যই উদ্বৃত্ত ঘটাতে হবে। উদ্বৃত্ত উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য অবশ্যই রাজ্যের সমভূমি বিশেষ করে লুঙ্গা ও নদী অববাহিকার পলি মৃত্তিকা যা আঞ্চলিক ভাষায় 'নাল' জমি নামে পরিচিত তা কৃষির আওতায় নিয়ে এল উদ্বৃত্ত ফসল ফলানো সম্ভব। এতদ্ব্যতীত অধীনতার নিদর্শনস্বরূপ প্রজামন্ডলীর কাছ থেকে প্রদত্ত কর আদায় করা এবং কর আদায় করা ছাড়াও স্বাধীন প্রাদেশিক অবস্থাভুক্ত ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীর

সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে উদ্বৃত্ত তহবিল গড়ে তোলা যা বাহ্যিক সংগঠনে আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন। উপরোক্ত বিভিন্ন উপায়ে ধীরে ধীরে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে উপজাতি দলপতির নিরলস প্রচেষ্টায় রাজ্যসংগঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। উল্লেখ্য বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে হালাম সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের নায়ক ছিলেন। *উল্লেখ্য হালাম উপজাতি কুকিদের একটি শাখা। যে সকল কুকি ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করেছিল তারাই হালাম নামে অভিহিত। হালামগণের মতে 'খুরপুইতাতুম' তাদের প্রথম জন্মস্থান। এই স্থানটি মণিপুর রাজ্যের উত্তরে, পার্বত্য প্রদেশে অবস্থিত। নৃতাত্ত্বিক গবেষকদের মতে হালাম তথা কুকি সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা উত্তর-পূর্ব ভারতের খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় অতিক্রম করে উত্তর কাছাড় হয়ে আসামের শিলচর হয়ে মিজোরাম এবং সর্বশেষ ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে। হালামরাই যে প্রকৃত অর্থে ত্রিপুরা পার্বত্য রাজ্যের নায়ক ছিল তার প্রমাণ 'হসম ভোজন' অনুষ্ঠান। 'হসম' শব্দের অর্থ সৈন্য। সৈনিক বিভাগের লোকদের জন্য প্রদত্ত ভোজ 'হসম ভোজন' নামে খ্যাত। এই ভোজের সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বিজয়মাণিক্য(১৫২৮)-এর শাসনকাল উল্লেখ করা প্রয়োজন। ওই সময়ে সাখসেপ ও থাঙ্গাচেপ্ দফায় হালামগণের রাজ্যের উত্তর প্রান্তসীমায় বাসস্থান ছিল। জয়ন্তীয়া রাজা এই হালামদের বশীভূত করতে পারে এইরূপ সম্ভাবনার কথা শুনে মহারাজ বিজয়মাণিক্য পূর্ব থেকেই হালামদের প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ করেন যাতে তারা বিরুদ্ধাচরণ না করে। সেই থেকে হালামগণ পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা পালন করে আসছে।

ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতিদের তুলনায় ত্রিপুরীরা ছিল সমতলমুখী, কিন্তু অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায় ছিল পর্বতমুখী। এর ফলে ত্রিপুরী উপজাতিরা অন্যান্য উপজাতিদের তুলনায় সমতলবাসীর সঙ্গে অধিক পরিচিত হবার সুযোগ হয়। স্বাভাবিক কারণেই সমতলবাসীদের কলাকৌশল করায়ত্ব করার ফলে, তাদের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে রাজ্য সংগঠনের প্রক্রিয়ায় ত্রিপুরীরা এগিয়ে থাকে। রাষ্ট্র সংগঠন ব্যবস্থা ও সহজ হয়।

রাজ্যসংগঠরে প্রক্রিয়ায় ত্রিপুরার বনজ সম্পদের একটি কার্যকরী অর্থনৈতিক ভূমিকা ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমতলবাসীর ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বনজ ঔষধি, বনজ সম্পদ বিক্রয়ের ফলে

তারা আর্থিক দিক থেকে লাভবান হয়েছিল বা রাজ্য সংগঠনের সহায়ক হয়েছিল।

অন্যান্য উপজাতিদের মতো ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায় জুম চাষে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু কৃষি উৎপাদনে ছিল অপারগ। এই ঘাটতি পূরণের জন্য ত্রিপুরী দলপতি জমির ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সমতল অঞ্চলের প্রজাদের জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নেন। এর ফলে প্রতিবেশী সমতল অঞ্চল থেকে বাঙালিদের ত্রিপুরায় বসবাসের সুযোগ করে দিয়ে, তাদের জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রদান করেন। সমতল অঞ্চলের বাঙালিরা হলকর্ষণের দ্বারা জমি চাষ করার কারণে জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে রাজস্বের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে পার্বত্য অঞ্চলের জুমিয়া প্রজাদের কাছ থেকে বনজ সম্পদ কর হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিভিন বনজ সম্পদের বাণিজ্য শুল্ক আদায় করে দলপতি বা রাজা যে সম্পদের অধিকারী হন তার দ্বারা একটি স্থায়ী রাষ্ট্রীয় সংগঠন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কারণে সামরিক বাহিনী গঠন করা সম্ভব হয়।

ত্রিপুরার রাজাদের নেতৃত্বে রাষ্ট্র সংগঠনে হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের একটি বিশেষ ভূমিকা যে ছিল তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। ত্রিপুরার রাজারা সমতল অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছিলেন। এতে ত্রিপুরার রাজারা এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা উভয় পক্ষই লাভবান হন। প্রথমত, সমতল অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজাদের আনুগত্য লাভ করা রাজাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। অন্য দিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ত্রিপুরার রাজাদের পুরাণ বর্ণিত চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত করে ত্রিপুরার রাজাদের বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে তারা অন্যান্য উপজাতি এবং হিন্দু প্রজাদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

নতুন রাজ্য গড়ে তোলার ব্যাপারে রাজ্যের নিরাপত্তা ছিল অত্যন্ত জরুরি। এইজন্য প্রতিবেশী শক্তিশালী রাজ্যের সহায়তা খুবই প্রয়োজন ছিল। ত্রিপুরার রাজারা প্রথম দিকে হস্তী উপঢৌকন দিয়ে শক্তিশালী বাংলা তথা দিল্লির সুলতানদের কিছুটা আনুগত্য স্বীকার করে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। অপরদিকে বাংলার সুলতানদের সামরিক বাহিনীতে ত্রিপুরার হস্তীর চাহিদা ছিল অনেক পূর্ব

থেকেই। ফলে হস্তীর বিনিময়ে সুলতানরা ত্রিপুরা রাজ্যকে করদ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ত্রিপুরার নিরাপত্তা, সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ হন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন ধর্মমাণিক্য তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রত্ন ফাকে গৌড়ের সুলতানের সৈন্যদের সহায়তায় প্রতিভূ হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। রত্নফা গৌড়ের সুলতানের সৈন্যদের সহায়তায় ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করতে সক্ষম হন। সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সুলতানকে ত্রিপুরার হস্তী এবং একটি বহু মূল্যবান রত্ন উপহার দিয়ে তিনি মাণিক্য উপাধি প্রাপ্ত হন। রত্ন ফা বঙ্গদেশে থাকাকালীন সময়ে গ্রামে-গঞ্জে নানা বকম কলাকুশলীদের কাজ করতে দেখেছিলেন। ত্রিপুরায় এমন কলা কুশলীর অভাব উপলব্ধি করে তিনি গৌড়ের সুলতানের কাছে ত্রিপুরায় কিছু সংখ্যক কলাকুশলী পাঠাতে অনুরোধ করেন। সুলতান বঙ্গদেশের নানা গ্রাম থেকে দশ হাজার নবশাক পাঠালেন। নবশাক হল ঃ কর্মকার, কুম্ভকার, গোপ, তেলি, তাঁতী, নাপিত, বারুই, মালাকার ও মোদক। ঢাকার নিকটবর্তী স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও থেকে কতিপয় শ্রীকর্ণ অর্থাৎ লিপিব্যবসায়ী করণিক আনা হল। প্রতিরক্ষার কাজে বঙ্গদেশ থেকে চার হাজার সেনাও পাঠানো হল। রত্ন ফা পরে রত্নমাণিক্যের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে ত্রিপুরা পেল রাজ্যের নিরাপত্তা। এইভাবেই ত্রিপুরা অদূর ভবিষ্যতে এক শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল।

কালের বিবর্তনে ত্রিপুরা

ইতিহাসের পটভূমিকায় দেখা যায় নবাবি বা বাদশাহি আমলে জেলা ত্রিপুরা বা সমতল ত্রিপুরায় ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পলাশী যুদ্ধের পর (১৭৫৭) এক দশকের মধ্যেই। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (ইংল্যান্ড) বাংলা বিহার ওড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে এবং তখনই ত্রিপুরা জেলাটিও এদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রে 'চাকলা রোসনাবাদ' নামে যে বৃহৎ পরগনা ছিল সেটি অবশ্য বাদ দিয়ে। অথচ এক সময় ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ পার্বত্য ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা জেলা অর্থাৎ পর্বত এবং সমতল উভয় অংশেরই অধীশ্বর ছিলেন। এজন্য ত্রিপুরার আয়তনও ছিল বিরাট। এই রাজ্যের গৌরবময় যুগে এর আয়তন পূর্বে ব্রহ্ম, পশ্চিমে সুন্দরবন, উত্তরে কামরূপ ও দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান ত্রিপুরা ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর, ভারতভুক্তির পর এর ভৌগোলিক অবস্থান ২২ ডিগ্রি ৫৬ মিনিট থেকে ২৪ ডিগ্রি ৩২ মিনিট উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯১ ডিগ্রি ১০ মিনিট থেকে ৯২ ডিগ্রি ২১মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমায় বিস্তৃত। ভারতের

পূর্বভাগে বাংলাদেশের কটি-লগ্না ত্রিপুরা। উত্তর দিকে অসম ও পূর্বে মিজোরাম ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গো যুক্ত। বাকি অন্যদিকগুলি ঘিরে বাংলাদেশ। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণে বাংলাদেশের সঙ্গো ত্রিপুরা তথা ভারতের রয়েছে ৮৩৯ কিলোমিটারের এক সুদীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমানা। অন্যদিকে আসাম ও মিজোরামের সঙ্গো রাজ্যের সীমান্ত ১৬২ কিলোমিটার। যথাক্রমে ৫৩ কিমি ও ১০৯কি.মি। ত্রিপুরার মোট আয়তন ১০,৪৮৮ বর্গকিলোমিটার।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গো সমতল ত্রিপুরা এবং পার্বত্য ত্রিপুরার রাজনৈতিক মানচিত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে। ত্রিপুরার যে অংশ জেলা ত্রিপুরা রূপে দীর্ঘকাল চিহ্নিত ছিল অর্থাৎ সমতল ত্রিপুরা বর্তমানে তা একটি নবজাত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ-এর অন্তর্ভুক্ত। এখনও সেই পূর্বতন জেলাই কুমিল্লা জেলা নামে রূপান্তরিত। অন্যদিকে পার্বত্য ত্রিপুরার বৈপ্লবিক রাজনৈতিক রূপান্তর হয়েছে। এখন সুপ্রাচীন রাজতন্ত্র অবলুপ্ত। মহারাজ বীরবিক্রমের রাজত্বের শেষ পর্বে ভারতের স্বাধীনতালাভের অন্তিম মুহূর্তে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্যের দেহান্তর ঘটে (১৭ মে, ১৯৪৭)। বীরবিক্রম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মাণিক্য রাজবংশের শেষ নৃপতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন।

বিবর্তন চলতে থাকে রাজ্যের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়। ভারতভুক্ত ত্রিপুরা প্রথমে 'গ' শ্রেণির রাজ্যের মর্যাদা পায়। একজন চিফ কমিশনার ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর চিফ কমিশনারের কাজের সহায়তা ও উপদেশে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি তিনজন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। এঁরা হলেন শ্রীশচীন্দ্রলা সিংহ,শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ও শ্রীজিতেন্দ্রমোহন দেববর্মা। ১৯৫৬ সালে ভারতের রাজ্যগুলি পুনর্গঠনের সঙ্গো সঙ্গো ত্রিপুরা একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলরূপে ঘোষিত হয়। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের (১৯৫৭) পর আঞ্চলিক পরিষদ আইন অনুযায়ী গঠিত হয় ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ। নির্বাচনে জয়ী হয়ে কংগ্রেস দলনেতা শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এর পরবর্তী ধাপে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ রূপান্তরিত হয় ত্রিপুরা বিধানসভায় এবং রাজ্যে গঠিত হয় নতুন জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা। ভারতভুক্ত ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ। ১৯৭০ সালে ৩১ শে জানুয়ারি আবার শাসনতান্ত্রিক নয়া ব্যবস্থা চালু হয়। ত্রিপুরার চিফ কমিশনারের পরিবর্তে লেঃ গভর্নর বা উপরাজ্যপাল নিযুক্ত হন। এর পরবর্তী ধাপ রাজ্যিক প্রক্রিয়ায় একটি বড় বিবর্তনের ধাপ বলা যেতে পারে। এই ধাপে ত্রিপুরা রাজ্য ভারত ইউনিয়নভুক্ত পূর্ণাঙ্গ একুশতম রাজ্যে অভিষিক্ত হয় ২১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সনে। ওই সময় থেকে প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে একজন রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। ভারতের পূর্ণাঙ্গ রাজ্যরূপে রাজ্যের বিধানসভার সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় ৬০। ত্রিপুরাবাসীর ইচ্ছার রূপায়ণ হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিপুরা জনসম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্যের মধ্যে অন্যতম ত্রিপুরা। ভূ-তাত্ত্বিকেরা এই ত্রিপুরাকে ভূ-ত্বকের প্রাচীনতার দিক থেকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন যেমন উত্তর ত্রিপুরা,দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা। কৌতূহলের বিষয় হল প্রায় দশ হাজার বর্গকিলোমিটার-এর এই ছোট্ট অঞ্চলটির ভূ-ত্বকের গঠন একই সময়ে হয়নি। ভূতাত্ত্বিকদের মতে উত্তর ত্রিপুরার অঞ্চলটির বয়সের উর্দ্ধতম সীমা ১৮০ লক্ষ বছর এবং নিম্নতম সীমা হল ১০ লক্ষ বছর। পশ্চিম ত্রিপুরা তুলনামূলকভাবে প্রাচীন। এর উর্দ্ধতম সীমা ২৫০ লক্ষ বছরের মতো। অবশ্য পৃথিবীর অন্যান্য ভূ-অঞ্চলের তুলনায় বিজ্ঞানীরা ত্রিপুরাকে নবীনাই বলে থাকেন। মহাভারত এবং পুরাণে এই রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। রাজ্যের গৌরবময় যুগে এর আয়তন ছিল পূর্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে সুন্দরবন, উত্তরে কামরূপ ও দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় উত্তর-পূর্ব ভারতের এই অংশটি ত্রিপুর ক্ষত্রিয়গণের অধিকারের পূর্বে 'কিরাতভূমি' নামে অভিহিত হত।

উপরের পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা জনসম্প্রদায়ের পরিচয় সমগ্র মানবজাতির নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা থেকে শুরু করা যেতে পারে। প্রায় দু-শ বছর আগে জার্মান নৃ-তত্ত্ববিদ ফেড্রিখ ব্লুমেনবাক্ বিশ্বের সমগ্র মানব জাতিকে পাঁচটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছিলেন। যেমন (১) ককেশিয়ান (সাদা জাত), (২)মোঙ্গোলিয়ান (হলদে জাত),(৩) ইথিওপিয়ান (কালো জাত),(৪) আমেরিকান ইন্ডিয়ান (লাল জাত) এবং (৫) মালয়ান (তামাটে জাত)। পরবর্তী যুগে নৃতত্ত্ববিদরা আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনটি জাতে মানুষকে ভাগ করার

প্রথা চালু করে। এই তিনটি হল ঃ (১) ককেশিয়ান বা সাদা জাতের মানুষ (২) মোঙ্গোলয়েড বা হলদে জাতের মানুষ এবং (৩) নিগ্রোয়েড বা কালো জাতের মানুষ।

ভারতের জনসম্প্রদায়ের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় আমরা সর্বপ্রথম পাই স্যার হার্বার্ট রিজলের কাছে থেকে। হার্বার্ট রিজলে ককেশিয়ান, মোঙ্গোলয়েজ এবং নিগ্রোয়েড এই ত্রিজাতি তত্ত্বকে ভিত্তি করে ভারতের জনসম্প্রদায়কে ৭ টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। হার্বার্ট-এর পরে গিওফ্রিডা, হ্যাডন ঈকস্টেড এবং ডঃ গুহ ভারতীয় জনসম্প্রদায়কে ৬টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। যেমনঃ (১)নেগ্রিটো বা নিগ্রোয়েড, (২)প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড,(৩) মোঙ্গোলয়েড, (৪) মেডিটেরেনিয়ান, (৫) আলপোদিনারিক এবং (৬) নরডিক। উল্লেখ্য, ডঃ গুহ মোঙ্গোলয়েড শ্রেণিকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন প্যালে-মোঙ্গোলয়েড এবং টিবেটো মোঙ্গোলয়েড।

মোটের উপর হার্বার্ট রিজলে, গিওফ্রিডা, ডঃ গুহ প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্‌দের জাতিগোষ্ঠী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার জনসম্প্রদায়কে মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা ঃ মোঙ্গোলো ড্রাভিডিয়ানস, প্যালে মঙ্গোলয়েড এবং টিবেটো মোঙ্গলয়েড। প্রথমোক্ত শ্রেণিটি রিজলের মতে দ্রাবিড় এবং মোঙ্গলদের সংমিশ্রণ। এই সম্প্রদায়ের শারীরিক বৈশিষ্ট্য হল উচ্চতা মাঝারি, মাথার খুলি চওড়া গোলাকার। গায়ের রঙ কালো বা তামাটে। নাক টিকোলো না হলেও খ্যাঁদা নয়। এই সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ বাংলা এবং উড়িষ্যা অঞ্চলের। ত্রিপুরার জনসম্প্রদায়ের সিংহভাগ এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় মহারাজ রত্নমাণিক্যের আমল থেকেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ ত্রিপুরায় আসতে থাকে। ত্রিপুরার আদিবাসীদের ক্ষেত্রে বলা যায় তারা সকলেই মঙ্গোলয়েড শ্রেণির। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ডঃ গুহ মঙ্গোলয়েড শ্রেণিকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন যেমন প্যালে মঙ্গোলয়েড এবং টিবেটো মোঙ্গোলয়েড, প্যালে মঙ্গোলয়েড—এদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য হল উচ্চতা মাঝারি। মাথার খুলি লম্বাটে, চোখ ছোট,গালের হাড় উঁচু, গায়ের রঙ কালো থেকে হলদে। এই শ্রেণির জনসম্প্রদায়ের বিস্তৃতি দক্ষিণ পূর্ব চীন, পূর্ব হিমালয় অঞ্চল, উত্তরপূর্ব ভারত, ব্রহ্মদেশ অন্য দিকে টিবেটো মোঙ্গলয়েড-এদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য হল মাথার খুলি চওড়া, গায়ের রঙ কালো, চোখ বোজা বোজা, চুল খাড়া। এই সম্প্রদায়

চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরার চাকমা, মগ এবং কালিম্পং-এ লেপচা নামে পরিচিত। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ত্রিপুরার আদিবাসীদের প্যালি মঙ্গোলয়েড এবং টিবেটো মঙ্গোলয়েড সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে।

ভাষাগত দিক থেকে ত্রিপুরা উপজাতি সম্প্রদায় টিবেটো বার্মন গোষ্ঠীর। অবশ্য টিবেটো বার্মন গোষ্ঠীর অনেক শাখ প্রশাখা রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত মৌলিক আলোচনা করেছেন আব্রাহাম গ্রীয়রসন, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া'তে (১৯৭২)। গ্রীয়রসনের মতে ত্রিপুরী সম্প্রদায় ভাষাগত দিক থেকে টিবেটোবার্মন শাখার আসামের বোরো শ্রেণির। উল্লেখ করা যেতে পারে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় (১৯৫০) গ্রীয়রসনের সপক্ষে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, জমাতিয়া, রিয়াং,নোয়াতিয়া সব ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায় যে বোরো শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য ত্রিপুরী উপজাতি সম্প্রদায় যে আসামের বোরো শ্রেণির তার প্রমাণ চতুর্দশ শতাব্দীতে ত্রিপুরী রাজাদের বোরো নাম 'ফা' শব্দটি যুক্ত ছিল। 'ফা' শব্দের অর্থ পিতা। রানিদের ক্ষেত্রে 'মা' যার অর্থ 'মাতা'। উদাহরণস্বরূপ ডুঙ্গুর ফা, খারুং ফা, চেং ফা, মোকাং ফা, ডাংগর ফা ইত্যাদি। এই ডাংগর ফা-এর পুত্রই হলেন মহারাজ রত্নমাণিক্য। সুতরাং জমাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া সহ 'ত্রিপুরী উপজাতি' সম্প্রদায় যে বোরো শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে। অপর দিকে চাকমা, হালাম, কুকি,মগ,লুসাই সম্প্রদায়গুলি 'টিবেটোবার্মন গোষ্ঠীর উপশাখা আসাম-বার্মিজ প্রশাখায় অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন হতে পারে কোন্ কোন্ সম্প্রদায় বা কোন্ গোষ্ঠীর তা কি শুধু বাহ্যিক আকৃতির দ্বারাই নিরূপন করা যায়? নৃতাত্ত্বিকদের মতে বাহ্যিক আকৃতি ছাড়াও আধুনিক কালে আরও একটি বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। যেমন মাথার খুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মেপে সবচেয়ে বেশি যে দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে তাকে সবচেয়ে বেশি প্রস্থ দিয়ে ভাগ করা। পরে ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে সেটিই হচ্ছে ঐ মানুষের গোষ্ঠী পরিচয়ের অন্য আর একটি পন্থা।

উল্লেখ করা প্রয়োজন সংখ্যাটি যদি '৮২'-এর বেশি হয় তা হলে বুঝতে হবে লোকটি ছোট মাথাওয়ালা জাতের বা সম্প্রদায়ের লোক আর যদি সংখ্যাটি ৭৭এর নীচে হয় তবে বুঝতে হবে লোকটি বড় মাথাওয়ালা কোনো একটি সম্প্রদায়ের।

মাথার খুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপা ছাড়াও দেহ-দৈর্ঘ্য বা ব্যক্তির উচ্চতা আর একটি উল্লেখ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শুধু বয়ঃক্রম ও লিঙ্গ অনুসারেই নয় আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন নৃবর্গেও ওই তারতম্য সুচিহ্নিত। বিভিন্ন বর্গের পুরুষদের উচ্চতা ১৪২-১৮১সেঃমিঃ এবং সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রে এর গড় ১৬৫ সেঃমিঃ। যে কোনো বর্গেই মানুষের দেহ-দৈর্ঘ্যের বিভিন্নতা সহজেই নজরে পড়ে। জাতি-চরিত্র পরিমাপের জন্য বিবিধ পদ্ধতি ও বহু রকমের যন্ত্রাদি যেমন দেহের ক্ষুদ্রাংশ ও প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ পরিমাণে ব্যবহার্য স্লাইডিং গেজ, গলিওমিটার এবং গাত্র, কেশ ও চক্ষুর বর্ণ নির্ণয়ের জন্য বিশেষ ধরনের মাপনি ও বহু সংগৃহীত নমুনা ব্যবহৃত হয়।

উপরে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে নৃতাত্ত্বিকেরা অল্প বিস্তর বৃহদায়তন গণবর্গসমূহের (জাতিবর্গ) আঞ্চলিক নৃজাতিরূপের সংজ্ঞা নির্ণয় করেন। এসব জনগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন বসতি অঞ্চলের ঐতিহাসিক নিয়ম-উদ্ভূত পর্যাপ্ত বাহ্য চরিত্র, যেমন-দেহের আকৃতি ও অনুপাত এবং অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। আধুনিক নৃতত্ত্বে জাতি-চরিত্র ও শ্রেণি বন্ধনের মূল্যায়নে বিভিন্ন পদ্ধতি ও মান ব্যবহৃত হয়। বিবর্তনগত, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, জনসংখ্যা সংক্রান্ত ও বংশগতিজনিত কারণগুলি তন্মধ্যে উল্লেখ্য। হোমিনিডদের বিকাশের ফলে নৃবর্ণের উদ্ভবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তিসমূহের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য কোনো কোনো নৃবিজ্ঞানি 'ব্লাডগ্রুপ' ভেদের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস প্রস্তাব করেন। ডব্লিও.সি.বয়েড (১৯৫০) বিভিন্ন ব্লাড সিস্টেমের (এ.ভি.ও., রেসাস ফ্যাক্টর ইত্যাদি 'ব্লাড গ্রুপে' জিন বন্টনের শতকরা মাত্রা গবেষণাপূর্বক মানবজাতিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেন। যেমন ঃ ককেশীয় (শ্বেত), নিগ্রোয়েড (কৃষ্ণ), মঙ্গোলয়েড (পীত), আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান ও অস্ট্রালয়েড।

ত্রিপুরার মঙ্গোলয়েড মহাজাতির নৃজাতিরূপ বর্গসমূহ যেমন মোঙ্গোলো ড্রাভিডিয়ানস,প্যালে মোঙ্গলয়েড এবং টিবেটো মোঙ্গলয়েড শাখা প্রশাখার সংমিশ্রণ ঘটলেও প্রতিটি সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র রয়েছে যে কারণে প্রধান প্রধান কতকগুলি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচয় দেওয়া হলঃ

(১) ত্রিপুরী

সংখ্যার দিক থেকে ত্রিপুরী উপজাতির স্থান শীর্ষে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে এদের সংখ্যা মোট ৫৪৩,৮৪৮। ত্রিপুরীরা বোরো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ (১৯৩৯) তাঁর 'সেন্সাস বিবরণী'তে উল্লেখ করেছেন

ত্রিপুরাবাসী ক্ষত্রিয়গণ সাধারণত 'ত্রিপুর ক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত, তন্মধ্যে বার ঘর ঠাকুর সর্বপ্রধান। ত্রিপুরেশ্বর ত্রিলোচন থেকে এই বার ঘর ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি। মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের শাসনকালে রাজকুমার ও রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে 'ঠাকুর' আখ্যা প্রদান করা হয়। কালক্রমে উপাধিটি 'বারঘরিয়া' গন্ডি অতিক্রম করে রাজপরিবারের আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করেছে। ত্রিপুরা ক্ষত্রিয়গণ পরবর্তীকালে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয় যেমন ঃ পুরাণ ত্রিপুরা, দেশি ত্রিপুরা, জমাতিয়া, রিয়াং এবং নোয়াতিয়া। এই পাঁচটি সম্প্রদায় 'ত্রিপুর ক্ষত্রিয়' এর অন্তর্গত হলেও এদের মধ্যে বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ।

উল্লেখ্য, পুরাতন ত্রিপুরীগণই রাজ্যের প্রাচীন অধিবাসী এবং ঠাকুরলোকদের পরেই এঁদের স্থান।সেন্সাস বিবরণীর প্রতিবেদন দেখা যায় পুরাতন ত্রিপুরীগণ 'বার হদা' বা বার উপাধিতে বিভক্ত। যথা ঃ বাছাল, শিউক, কোয়াতিয়া, দৈত্যসিং, হুজুরিয়া, শিলটিয়া, আপাইয়া, ছত্রতুইয়া কিংবা ছত্রধরেয়া, দেওরাই বা গালিম, সুরেনারায়ণ, সেনা এবং জুলাই। এরা সকলেই রাজন্য ত্রিপুরা নানাবিধ সরকারি কার্যে নিযুক্ত ছিল।

দেশি ত্রিপুরা, হিন্দু বাঙালি ও ত্রিপুরী জাতির সংমিশ্রণ দেশি ত্রিপুরা জাতির উৎপত্তি। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এরা মোঙ্গোলো ড্রাভিডিয়ানস এর প্রকৃত উদাহরণ। দেশি ত্রিপুরীগণ অন্যান্য ত্রিপুরীগণ থেকে ভিন্ন সমাজভুক্ত। পশ্চিম ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় এদের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

ত্রিপুরীগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। চতুর্দ্দশ দেবতা এদের প্রধান আরাধ্য দেবতা। পার্বত্য প্রণালীতে যে সকল দেবতার পূজা অর্চনা হয় তাতে ত্রিপুরী ভাষায় মন্ত্রোচ্চারিত হয় এবং ওঝারা এইসকল পূজার পুরোহিত। সাধারণত প্রধান পুরোহিত চন্তাই-এর নেতৃত্বে পূজার অনুষ্ঠান হয় পুরাতন আগরতলার রাজবাড়ির সন্নিকটে। নৃতত্ত্বের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চতুর্দ্দশ দেবতাদের পূর্ণ বিগ্রহের পরিবর্তে পূজার বেদীতে শুধুমাত্র বিগ্রহের মস্তক স্থাপন করা হয়। এইরূপ মস্তক পূজার নজির দেখতে পাওয়া যায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার কৈলাসহরের উপকণ্ঠে। সেখানে ঊনকোটি পাহাড়ের পর্বত গাত্রে এর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, যেটি অষ্ট্রিক সংস্কৃতির অস্তিত্ব বলে অনুমান করা হয়।

(২) রিয়াং

কুকী ও ত্রিপুরীদের সংমিশ্রণে রিয়াং সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। সংখ্যার বিচারে

রিয়াংরা ত্রিপুরার দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি সম্প্রদায়। ১৯৯১-এর সেন্সাস অনুযায়ী রিয়াংদের সংখ্যা ৮৪,০০৩।

নৃতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা রিয়াংগণ পূর্বে লুসাই প্রদেশের অন্তর্গত মায়ানীথলাং অঞ্চলে বসবাস করত। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব শুরু হওয়ার রিয়াংরা ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমান্তে বর্তমান অমরপুর এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। উল্লেখ্য ঐ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং রিয়াংগণের বসতির কারণে তদঞ্চল 'রিয়াংদেশ' নামে প্রখ্যাত ছিল। বর্তমানে রাজ্যের উদয়পুর,অমরপুর,সোনামুড়া,এবং বিলোনীয়া বিভাগে রিয়াংদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

রিয়াংরা মূলত দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত যেমন মেস্কা বা মেচকা এবং মরছই বা মলছই। মেস্কা বা মেচকা সম্প্রদায়ের সাতটি দফা, যেমন ঃ ১) তুই মুইয়া ফাক, ২) মেস্কা বা মেচকা, (৩) চরকি, (৪) মাসা বা মুছা,(৫) রাইচাক্ বা রাইকাচাক, (৬) তখ্‌মায়্যাক্ বা তংমা ইয়াক্‌চ, (৭) ওয়ারিং বা ওয়াইরেম্। অনরূপভাবে মরছই বা মল্‌ছই সম্প্রদায়েরও সাতটি দফায় বিভক্ত। যেমন-(১) মরছই বা মল্‌ছই,(২) আপেত, (৩)নকখ্যাম বা নগ্‌খাম, ৪) চম্প্রেং বা চুং প্রে, (৫) দরবং, (৬) সগরায় এবং (৭) রিয়াং বা রিয়াং কাচাক।

রিয়াং সম্প্রদায় প্রধানতঃ শাক্ত মতাবলম্বী। কিছু সংখ্যক রিয়াং অবশ্য বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত। যে সব দেব-দেবীর পূজা পার্বত্য প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হয় তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত দেবীরা সমাজে প্রাধান্য লাভ করেছেন। যেমন- মতাই কতর কিংবা শিব দুর্গা;তুইমা ছড়া বা নদীর পূজা। গঙ্গা পূজাকেও তুইমা বলা হয়; সংগ্রমা-পাহাড়ের দেবতা; বুড়া বা বুড়া দেবতা; খুলংমা বা কার্পাসের দেবতা, মাইলং মা-ধানের দেবতা। লাম্প্রা বা ক্ষ্মান্ধি-আকাশের বা সমুদ্রের দেবতা।

রিয়াংরা সমবেতভাবে পূজার অনুষ্ঠান করে। পুজো উপলক্ষে প্রধান প্রধান সর্দারগণের বৈঠক বসে। এইরূপ বৈঠকে সর্বপ্রকার বিবাদের মীমাংসা এবং অপরাধের বিচার হয়। বিচারে অর্থদণ্ড হলে সেই অর্থ জাতীয় ভাণ্ডারে জমা পড়ে। পূজা অনুষ্ঠানের পর উদ্বৃত্ত হলেও জাতীয় ভাণ্ডারে তা সঞ্চিত থাকে। এই অর্থের কিয়দংশ কতর দফার লোকে পায় এবং অবশিষ্ট অর্থ সার্বজনীন কার্যে ব্যয় হয়। এইরূপ সম্মিলিত পূজায় রাজনীতি, ধর্মনীতি এবং সমাজনীতির উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

প্রাচীনকালে রিয়াংদের ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলে বিশেষ সুনাম ছিল। কথিত আছে মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে রিয়াং কাচাগ ও রায় কছম সেনাপতিদ্বয়ের দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বঙ্গেশ্বর হোসেন শাহকে বার বার ত্রিপুরা আক্রমণ করতে গিয়ে উপরোক্ত দুই সেনাপতির কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে সেনাপতি রায় কাচাগ্ এতটা পরাক্রমশালী এবং প্রভাবান্বিত ছিলেন যে মেকেঞ্জি সাহেব তাঁকে ত্রিপুরার রাজা ভ্রমে চয়চাগ-মাণিক্য বলে উল্লেখ করেছেন। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের পরেও ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে রিয়াং জাতির প্রাধান্য অক্ষুণ্ন ছিল।

(৩) জমাতিয়া

জমাতিয়াদের লোকসংখ্যা ১৯৮১ সেন্সাস অনুযায়ী ৪৪, ৫০১। জাতিগত বিচারে জমাতিয়ারা ত্রিপুরীদের মতোই বোরো শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য 'জমায়েত' শব্দটি আরবি; জমায়েত শব্দের অর্থ সমবেত লোকসমষ্টি। অনুমান করা হয় ত্রিপুরীদের একটি অংশ অত্যন্ত সাহসী এবং এদের রাজভক্তি ছিল অপরিসীম। এই কারণে রাজ্যের সেনাবিভাগে বৃহৎ সংখ্যায় তাদের নিয়োগ করার জন্য একটি স্থানে জমায়েত করা হত। সেই থেকে ওরা জমাতিয়া নামে অভিহিত। নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা বঙ্গদেশে নবাবি শাসন চালু হওয়ার পর থেকে আরবি ভাষার প্রভাব এই অঞ্চল প্রবল হয়। বিশেষ করে বাংলায় মুসলমান শাসকদের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজাদের ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় আরবি ভাষা ত্রিপুরাতে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। অবশ্য জমাতিয়া সম্প্রদায়েরই বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতে রাজন্য আমলে জমাতিয়া সম্প্রদায়েরই পূর্বনারায়ণ নামে অসীম সাহসী এক ঐতিহাসিক পুরুষ কুকি অঞ্চল থেকে যথেষ্ট শৌর্য, বীর্য প্রচেষ্টায় গড়িয়া দেবতার বিগ্রহ ত্রিপুরেশ্বরকে উপঢৌকন দেওয়ার পর মহারাজ পূর্বনারায়ণকে আদেশ করেন যে সকলে একসঙ্গে জমায়েত হয়ে গড়িয়া দেবতার যেন যথাযোগ্যভাবে পূজা দেওয়া হয়। যারা পূজায় জমায়েত হয়েছিল তারাই পরবর্তীকালে জমাতিয়া নামে পরিচিত। 'জমাতিয়া' শব্দটি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও ইহা অনস্বীকার্য যে জমাতিয়াগণ রাজ্যের সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবে জমাতিয়া সম্প্রদায়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের মিশ্রণ অমূলক নয়।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় জমাতিয়াগণের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল। আর্থিক

স্বাচ্ছন্দ্যের পশ্চাতে কারণটি হল ওরা জুম চাষ পরিবর্তে হাল চাষ করে চাষ আবাদ করত ফলে ভূমির প্রতি মমত্ববোধ হওয়ায় যাযাবরত্ব ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে জীবন চর্যার শুরু করে। এই কারণে অর্থ সমাগমের পথও প্রশস্ত হয়। সাংসারিক অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়। এই প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ত্রিপুরার রাজধানী যখন উদয়পুর ছিল সে সময় সেনাবিভাগের সদস্যদের মাসিক বেতনের পরিবর্তে রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস এবং চাষআবাদের জন্য জমি দেওয়া হত।সেনাদলের এই সম্মিলিত অবস্থানে বিবাহ এবং রক্তসম্পর্ক গড়ে উঠত এবং পরিশেষে নিজেদের মধ্যে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। স্থায়ীভাবে জীবনচর্যার আবির্ভাবও এই সময় থেকে। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বের প্রারম্ভে (১৮৬৪) ওয়াখিয়ার হাজারি নামে জনৈক রাজকর্মচারীর অত্যাচারে তারা পরিক্ষীৎ জমাতিয়ার নেতৃত্বে ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রাজার ডার্লং কুকিরা জমাতিয়াগণকে নির্যাতনপূর্বক বিদ্রোহ দমন করে । নেতা পরিক্ষীৎ সর্দারকে বন্দি করে আনা হয়। মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এই বিদ্রোহের পর রাজ আজ্ঞায় জমাতিয়াগণ উন্নত হিন্দু আচার গ্রহণ ও উপবীত ধারণ করে। সেই সময় থেকে জমাতিয়ারা অনেকেই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বন করতে শুরু করে।

(৪) চাকমা

চাকমাদের লোকসংখ্যা—৩৪,৭৯৭। চাক্‌মাদের সম্পর্কে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে এদের আদি নিবাস ছিল পশ্চিম ত্রিপুরার চম্পকনগর অঞ্চলে। চম্পকনগর থেকেই চাকমা অভিধার সৃষ্টি। চম্পকনগর থেকে ওঁরা ক্রমে আরাকান, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। নৃতাত্ত্বিকদের মতে এই জনশ্রুতি গ্রহণযোগ্য নয় কেন না, চাক্‌মারা মূলত আরাকানি অভিবাসী। আরাকান অঞ্চল থেকে অপর শক্তিশালী সম্প্রদায় কর্তৃক, বলপূর্বক তাড়িত হয়ে অথবা খাদ্যের অন্বেষণে বাধ্য হয়ে পশ্চিম উপকূলের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে আরাকান পর্বত সংলগ্ন পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যভূখণ্ডে চাক্‌মাদের ঘন বসতি লক্ষ্যনীয়। পরবর্তী সময় জুম চাষের উপযোগী জমির সন্ধানে ওরা বৃহৎ সংখ্যায় ত্রিপুরায় আসে এবং রাজ্যের অমরপুর, কৈলাসহর, সাব্রুম ও ধর্মনগর এলাকায় বসতি স্থাপন করে।

চাক্‌মারা মলীমা, তন্যা, বরুয়া, উয়াংছা, বুমা, কোড়া, কুর্চ্যা, কদুয়া প্রভৃতি

সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যদিও আচার ব্যবহারের দিক থেকে ঐ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এদের মধ্যে 'দেওয়ান' উপাধি সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য উপাধির মধ্যে খিজয়া, তালুকদার, কারবারি প্রমুখ উপাধি প্রচলিত আছে। চাক্‌মাদের সামাজিক বন্ধন দৃঢ়। সামাজিক শৃঙ্খলায় সমাজপতি(সরদার)গণের ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। সামাজিক বিচার এবং চুরি, পীড়া, ব্যভিচার প্রভৃতি অপরাধের বিচার সমাজপতিগণই করে থাকেন।

ত্রিপুরায় অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মতো চাক্‌মারাও কৃষির উপর নির্ভরশীল। জুম চাষের পাশাপাশি ওরা হলকর্ষণ দ্বারা শষ্য উৎপাদন করে। আধুনিককালে এদের মধ্যে জুম চাষ প্রথা খুবই গৌণ এবং হলকর্ষণ প্রথা মুখ্য পেশা।

চাকমা সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা নজরে পড়ে না। বিবাহের প্রস্তাব সাধারণত অভিভাবকগণ দ্বারা উত্থাপিত হয়। ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মতো চাক্‌মাদের দাম্পত্য প্রেম মধুর এবং সংসার শান্তিপূর্ণ। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী। স্বামী-স্ত্রী কৃষি কার্যে এবং বনজবস্তু সংগ্রহ কার্যে একসঙ্গে কাজ করে এবং এক পাত্রে আহার করে। স্ত্রীলোকদের স্বহস্ত বয়িত বস্ত্রের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। ওরা তাঁত এবং চরকা ব্যবহারে অত্যন্ত নিপুণা।

চাক্‌মাদের মৃতদেহ সৎকার কার্যে লক্ষনীয় বিষয় হল সৎকার কার্য বিশেষ সমারোহের সঙ্গে পালন করা হয়। আত্মীয়বর্গরা যাতে শেষ দেখা দেখতে পারে সে কারণে মৃত দেহটি একটি কাষ্ঠাধারে কয়েকদিন রক্ষিত থাকে। মৃত ব্যক্তি অর্থশালী হলে মৃতদেহ রথে স্থাপন করে শ্মশানক্ষেত্রে নেওয়া হয় এবং সেখানে বহুলোকের সমাগম হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ তার সম্মানার্থে শবাধারে যথাসাধ্য অর্থপ্রদান করে, পূর্বে দাহের সুবিধার জন্য মৃতদেহটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করে লওয়া হয়।

চাকমাগণ প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। প্রভু বুদ্ধই ঈশ্বর রূপে পূজিত। চাক্‌মাদের ধর্মীয় জীবনের বিশেষ তাৎপর্য হল তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব এমন কী ইসলাম প্রমুখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচরণের সমন্বয়ে গঠিত।

(৫) হালাম

সংখ্যার দিক থেকে হালাম সম্প্রদায়-এর স্থান পঞ্চম। ১৯৮১ সালের সেন্সাস বিবরণ অনুসারে জনসংখ্যা ২৮,৯৭০। নৃতাত্ত্বিকদের মতে হালামরা উ.পূ.ভারতের কুকী উপজাতি বংশোদ্ভুত। ইহা সর্বজন স্বীকৃত যেসব কুকীরা ত্রিপুরেশ্বরের সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করেছিল তারাই হালাম নামে পরিচিত। তবে 'হালাম' শব্দের উৎপত্তির নির্ণয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিছু সংখ্যক গবেষকদের মতে 'হালাম' শব্দটি উর্দু শব্দ 'সেলাম বা 'সালাম' এর বিকৃত রূপ। 'সেলাম' শব্দের অর্থ কুর্নিশ করা বা অভিবাদন জানানো। যে সব কুকীরা ত্রিপুরেশ্বরকে 'সেলাম' বা সালাম জানিয়েছিল তারা 'সালাম' এর বিকৃত রূপ (স-এর পরিবর্তে 'হ' উচ্চারণ) 'হালাম' রূপে পরিচিত হল। অপর গবেষকদের মতে 'হালাম' শব্দটি ককবরক ভাষার 'হা' এবং 'লাম' দুটি শব্দের সমন্বয়ে উৎপত্তি। ককবরক ভাষায় 'হা' শব্দের অর্থ ভূমি বা 'মাটি' এবং 'লাম' শব্দের অর্থ পথ সুতরাং 'হালাম' শব্দের অর্থ 'মাটির পথ,' অতএব 'হালাম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় যেসব কুকীরা ত্রিপুরীদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে শিকারের পরিবর্তে ভূমিকেই জীবনচর্যার একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিল তারা হালাম নামে পরিচিত হল। হালাম শব্দের উৎপত্তির নির্ণয় নিতে আর একটি মত হল যে সব কুকীরা ত্রিপুরেশ্বরের ত্রিপুরা ভূমি বা ত্রিপুরা রাজ্যকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করতে জীবিকা নির্বাহ করত ওরাই হালাম নামে পরিচিত হল। এই অভিমতের সপক্ষে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর মন্তব্য প্রাসঙ্গিক। তার মতে ত্রিপুরেশ্বরের প্রজা হিসেবে কুকীরা বাংলার মুসলমান নবাবদের, উত্তর পূর্বের কাছাড়ি জয়ন্তিয়া এবং দক্ষিণে আরাকানিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

উপরের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন রাজানুরক্ত হালামদের সেবামূলক কার্যের স্বীকৃতি হিসেবে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ প্রতি বছর বিজয়া দশমীর রাতে, বিশাল নৈশ ভোজের ব্যবস্থা করতেন। এই নৈশ ভোজনকে 'হসম ভুজন' বলা হত। 'হসম' শব্দটি 'ত্রিপুরী' বা 'ককবরক' শব্দ। এর অর্থ 'সৈন্য' বা 'যোদ্ধা'। 'ভুজন' শব্দের অর্থ ভোজ-উৎসব। অর্থাৎ যোদ্ধাদের সম্মানার্থে ভোজ-উৎসব। বিজয়া দশমীর এই উৎসবের রাতে সকল আদিবাসীরা আমন্ত্রিত হতেন। কিন্তু রাজানুরক্ত এবং বীরযোদ্ধা হিসাবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন হালাম

সর্দারগণ। এর থেকে প্রতীয়মান হয় কুকী বা হালামরা ছিল ত্রিপুর সেনাদলের স্তম্ভ স্বরূপ। উল্লেখ্য হালাম সম্প্রদায়ের অনেকেই নামের সঙ্গে 'সিংহ পদবি' ব্যবহার করেন।

হালামদের মতে তাদের আদি বসতি ছিল মণিপুর। অন্যান্য উপজাতিদের দ্বন্দ্ব কলহে বাধ্য হয়ে এবং জুম চাষের সন্ধানে রাজ্যের উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলের খুরপুইতাভূম নামক স্থানে তারা বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ধাপে ধাপে আসে। হালামগণ, মূলত বারটি দফা পা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল এই কারণে ওরা 'বার হালাম' নামে অভিহিত হত। পরে ১৮টি সম্প্রদায়ে বৃদ্ধি পায়। যেমন কলই, কুলু বা খুলুং, কর্বং, কাইপেঙ, কৈরেঙ, চড়ই এরা ছাইমাল (প্রকৃতপক্ষে এরা কুকি), ডাব, থাং চেপ, সাকচেপ; নবীন, বংশেল, মরছুম, মুরতাকাং, রাংখল, রুপিণী, লাঙ্গাই এবং লাংলুং।

উল্লেখ্য হালামদের প্রত্যেকটি দফাই অর্থযুক্ত । সাধারণত ব্যক্তিগণের অবলম্বিত ব্যবসা অনুসারে কোনো কোনো স্থলে সম্প্রদায় বা দফায় নামকরণ হয়েছে। আচার ব্যবহারে এবং ধর্মীয় বিষয়ে তারা কুকি থেকে পৃথক, যদিও ওরা কুকি বংশউদ্ভূত। ধর্মীয় আচরণে অধিকাংশই শাক্ত এবং কিছু সংখ্যক বৈষ্ণব। হিন্দুদের মতো এদের অসংখ্য দেবতা। যদিও সকল দেব দেবীকে পূজা করা হয় না। তাদের প্রধান দেবদেবীরা হলেন শিব দুর্গা,কালী, সুভ্রালপো, সুকন্দ রায়-মুকন্দ রায়, শ্রীকলা রায় শ্রীমুখ প্রভৃতি। এদের সুকন্দরায়-মুকন্দরায়-এর পূজাকে 'বাঁশ পূজা' বলে। একটি বাঁশ প্রোথিত করে এই পুজো হয়। লক্ষণীয় বিষয় হল হিন্দু প্রথা এবং পার্বত্য প্রথা উভয় প্রথায় সমান মর্যাদার সাথে পূজার অনুষ্ঠান পালিত হয়।

হালাম সমাজে বিধবা বিবাহ-এর প্রচলন আছে, বাল্যবিবাহ প্রথা নেই। এদের বিয়েতে পাত্র, পাত্রী উভয়ের পরস্পর সম্মতি প্রয়োজন। পারস্পরিক সম্মতি ছাড়া অভিভাবকের অভিপ্রায়ে বিবাহ হতে পারে না। বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত নেই। স্ত্রী কিন্তু ইচ্ছে করলে এক পতিকে পরিত্যাগ করে পত্যন্তর পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারে।

মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধ কার্য করা হয় কিন্তু শ্রাদ্ধের নিরুপিত সময়ের কোনো বিধান নেই। শ্রাদ্ধকর্তার সুবিধার উপর সময় নির্ধারণ নির্ভর করে। শ্রাদ্ধের প্রধান অধিকারী পুত্র। পুত্রের অনুপস্থিতিতে কন্যা। কন্যার

অভাবে স্ত্রী এবং স্ত্রী অভাবে, ভ্রাতা দ্বারা শ্রাদ্ধ কার্য অনুষ্ঠিত হয়। উপরোক্ত সম্পর্কান্বিত কেউ বর্তমান না থাকলে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধকার্য হয় না। এইরূপ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সকলে বন্টন করে নেয়।

ইহা অনস্বীকার্য যে ত্রিপুরার মাণিক্যবংশের পূর্বে হালামগণই এই রাজ্যের শাসক ছিল। প্রমাণ হিসাবে হসমভোজনে হালাম সম্প্রদায়ের প্রাধান্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভোজে ত্রিপুরা, হালাম এবং কুকিগণ সমবেত হয়ে থাকে।

(৬) মগ/মঘ

ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাস 'মহা রাজোয়াং' গ্রন্থের ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা যায় বুদ্ধদেব (শাক্যসিংহ) যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর জন্মের বহুকাল পূর্বে সেই বংশের অভিরাজ নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর শাসনকালে রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় তিনি স্বীয় রাজধানী কপিলাবস্তু নগর ত্যাগ করে ইরাবতী নদীর তীরবর্তী 'টা গাউন' নগরে নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন রাজ্যের কানরাজজি ও কানরাঞ্জী নামে দুই রাজ ভ্রাতার মধ্যে পিতৃ সিংহাসন নিয়ে বিবাদ বাধে।

পরে উভয়ের মধ্যে মীমাংসার শর্ত হল যিনি এক রাত্রির মধ্যে একটি ধর্ম মন্দির নির্মাণ করতে পারবেন, তিনিই সিংহাসনের অধিকারী হবেন। কনিষ্ঠ পুত্র কানরাঞ্জী প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়াতে জ্যেষ্ঠপুত্র কানরাজগ্জি সৈন্যসামন্ত নিয়ে ইরাবতীর নিম্নদিকে এক নতুন রাজ্য স্থাপন করে স্বীয় পুত্রকে সিংহাসন সমর্পন করে আরাকানের উত্তর দিকে কাউকপাডায়ু পর্বতে রাজধানী এবং দ্বিতীয় রাজ্য স্থাপন করেন। আরাকানিগণ কানরাজগ্জি রাজার ও তাঁর অনুচর সৈন্যসামন্তদিগের বংশধর বলে পরিচয় প্রদান করেন এবং নিজেদের ব্রহ্মদেশবাসিগণ থেকেও প্রাচীন ক্ষত্রিয় শাখাসম্ভূত বলে দাবি করেন। * সোমেন্দ্র দেববর্মা (১৯৩১) তাঁর সেন্সাস বিবরণীতে উল্লেখ করেন ত্রিপুরা রাজ্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সকল মঘ আদিবাসী দেখা যায় তারা সকলেই আরাকানবাসীগণের বংশধর। অন্তর্নিগ্রহ এবং অন্তর্বিপ্লবের কারণে মঘ-রা ত্রিপুরায় উপনিবেশ স্থাপন করে এবং এদেশের স্থায়ী বাসিন্দারূপে পরিণত হয়।

মঘদের বিশেষত্ব হল তাদের মধ্যে সম্প্রদায় বিভাগ নেই। এমন কী বংশগত

উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্টতার ভেদাভেদ নেই। সমাজে শীর্ষস্থান লাভ শুধুমাত্র অবস্থার উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বোমাং, চৌধুরী ও তহশিলদার প্রভৃতি উপাধি লাভ করে থাকেন। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সমাজের প্রধান প্রধান কার্যগুলি এদের নেতৃত্বেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা, হেডম্যান প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট মঘগণ তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট থেকে বিশেষ সম্মান লাভ করতেন। ওরা নিজেদের গৃহবিবাদের মীমাংসা এবং সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনকারীর বিচার নিজেরাই সম্পন্ন করে। জাতি হিসাবে মঘরা শান্ত, নিরীহ এবং আত্মনির্ভরশীল।

স্ত্রীলোকগণ সাংসারিক যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করে। তারা সুস্থ, বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও কর্মঠ এবং সমাজে এদের যথেষ্ট স্বাধীনতা স্বীকৃত। সাংসারিক কাজকর্ম ছাড়াও মহিলারা কৃষিকার্যে পুরুষদের যথেষ্ট সাহায্য করে। অবসর সময়ে ওরা কাপড় বুনে এবং পোশাক তৈরি করে। মেয়েরা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং কেশ বিন্যাসের পরিপাট্য পছন্দ করে।

মঘ জাতির সকল শ্রেণির মধ্যেই বৈবাহিক সম্বন্ধ চলতে পারে। যুবক যুবতীরা নিজেরা নিজেদের অভিপ্সিত বর ও পাত্রী নির্বাচন করে। অভিভাবকগণের এ বিষয়ে কোনো ভূমিকা নেই। ভাবী দম্পতিগণ বিবাহের পূর্বে অবাধে এবং নিঃসঙ্কোচে একত্রে চলাফেরা করতে পারে। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনি-বনা না হলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। আবার স্বেচ্ছায় অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পক্ষে পুরুষ ও স্ত্রীর সমান অধিকার সমাজে স্বীকৃত। বিবাহের পর অভিভাবকগণ পুত্রকে পৃথক হয়ে বসবাসের অনুমতি দিতে কার্পণ্য করে না। মোটের উপর সকল প্রকার বিবাহে পাত্র ও পাত্রীর সম্মতিই মূল কথা। পূর্বে বহু বিবাহ এদের সমাজে অপ্রচলিত ছিল না।

মঘরা, সাধারণত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ত্রিপুরা রাজ্যবাসী সকল মঘই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বুদ্ধ ভিক্ষুরা সম্পাদন করে থাকেন। ফোরা (বুদ্ধ) তাদের প্রধান দেবতা, ফোরা ছাড়াও অন্যান্য দেবতারা হলেন শনি (চিনি), কালী এবং গঙ্গা (মেহং) প্রমুখ। জীবনযাত্রার সর্বকার্যে 'ফোরা' দেবতার পুজো দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। প্রায় প্রতিটি গ্রামে বুদ্ধ মন্দির আছে। মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হল শনঘাস নির্মিত প্যাগোডা ধাঁচে এককক্ষ বিশিষ্ট কুঁড়েঘর। এদের সনাতন প্রথা মন্দিরের

পুরোহিত দার পরিগ্রহ করতে পারেন না। এই পুরোহিত শমফুরা নামে প্রসিদ্ধ। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল শমফুরা এবং তাঁর সহকারীরা মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় শুধু কঠোর তপোশর্চাই করেন না উপরন্তু সম্প্রদায়ের সকল শিশুদের চিরাচরিত শিক্ষার জন্য দায়বদ্ধ থাকেন। এইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা সামাজিক বিধি। বাহ্যিক আচরণ, শৃঙ্খলা এবং সর্বোপরি সমাজের ঐক্যবোধে যথেষ্ট নজর রাখা হয়। ১৯৮৯ সেন্সাস অনুযায়ী এদের লোকসংখ্যা ১৮,২৩১।

(৭) লুসাই

লুসাইরা প্রাথমিকভাবে উত্তর-পূর্ব ত্রিপুরা সংলগ্ন মিজো পাহাড়ের অধিবাসী। আদিম যুগে লুসাইরা, কিরাত নামে পরিচিত ছিল। কিরাত নামটি সমতল বাংলার বাঙালিদের দেওয়া। কাছাড়ের লোকরা এদেরকে 'লুছাই' বলত। লুছাই শব্দ পরবর্তীকালে 'লুসাই'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। উল্লেখ্য, কাছাড়িদের দেওয়া 'লুছাই' নাম একটি বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। 'লু' শব্দের অর্থ মাথা এবং 'ছাই'-এর অর্থ কাটা। যাহারা, মাথা কাটে তারাই লুছাই। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য রয়েছে এমন কী উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও লুসাইরা নরমুণ্ড শিকার করত। এদের মধ্য এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে কোনো সর্দারের মৃত্যু হলে তার আত্মার প্রীতর্থে প্রচুর মদ্য এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ভোজ হত। এই সময় নরমুণ্ড মৃতের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করলে গৌরবজনক মনে করা হত।

নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন লুসাইরা মিজো পাহাড় অঞ্চল থেকে ত্রিপুরায় আসে উর্বর জুম চাষের উপযোগী জমি পাওয়ার কারণে। লুসাইদের মধ্যে ঐতিহ্যগত বিশ্বাস যে ওরা পূর্ব ছিং-লুং থেকে এ রাজ্যে আসে। 'ছিং লুং' শব্দের অর্থ শিলাপর্বত অতিক্রম করে। এতে অনুমান হয় চীনের সিলং যেটি শান্ রাজ্যের পূর্ব দিকে অবস্থিত সেখান থেকেই, ব্রহ্মদেশ হয়ে লুসাইরা ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে।

লুসাইদের ঐতিহ্যগত বৃত্তি জুম চাষ। বর্তমানে অনেকেই জুম চাষের সঙ্গে হাল চাষও করে থাকে। সাধারণত ছোট ছোট পাহাড়ে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ওরা বসবাস করে। গোষ্ঠীগুলি পাঁচটি পরিবার থেকে পঞ্চাশটি পরিবারের সমন্বয়ে হতে পারে। ঘর তৈরী হয় জমির উপর থেকে ৩-৪ ফুট উঁচুতে। ঘরের মেঝে তৈরি হয় কাঠের তক্তা দিয়ে। বর্তমানে অনেকেই পাহাড়ের উঁচু জমি থেকে সমতলে বসবাসে আগ্রহী।

পারিবাহিক জীবনে ওরা সাধারণত একগামিতার সমর্থক আবার কতক কতক

ক্ষেত্রে বহুগামিতার নজিরও দেখা যায়। প্রচলিত প্রথায় বিবাহের পর পুত্র পিতা-মাতার সঙ্গে ততদিনই বসবাস করে যতদিন না অনুজ ভ্রাতার বিবাহ হয়। লুসাইরা পিতৃগোষ্ঠীসম্ভূত অর্থাৎ পিতৃপুরুষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। বিবাহের পরে স্ত্রীকে স্বামীর পরিবারভুক্ত সকলের সঙ্গে বসবাস করতে হয়। লুসাই পরিবারের সদস্যরা সকলেই রক্তের সম্পর্কিত, পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিবারের পুরুষ সদস্য প্রত্যক্ষভাবে পিতার অধীনে, কিংবা পিতৃসম্পর্কের ভাইদের শাসনাধীনে থাকতে হয়। যেহেতু পৈত্রিক সম্পত্তি হস্তান্তর হয় পিতার থেকে পুত্রের কাছে এবং পিতাকেই পুত্রবধূর পণের টাকা চাহিদামত দিতে হয় সে কারণে পুত্র পিতার অবাধ্য হয় না।

লুসাইরা নৃত্যগীত প্রিয়।পাশ্চাত্য পোশাক, রীতিনীতিতে ওরা পুরোপুরি অভ্যস্ত। শিক্ষার দিকে থেকে লুসাইরা কুকি এবং অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে অনেক উন্নত। তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত। খ্রিস্টান মিশনের প্রচারের ফলে অনেকে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বন করেছে। ফলে তাদের মধ্যে যেমন ইংরাজি শিক্ষানুরাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠিক তেমনি সাহেবি পোশাক পরিচ্ছদ পরিধানে তাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৮) কুকি

ত্রিপুরায় লুসাইদের পরে, কুকিরাই প্রভাবশালী উপজাতি সম্প্রদায়। শেক্সপীয়রের মতে 'কুকি' পরিচিতি কুকি সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য নয়। ওরা নিজেদের 'রে-এম' বলে। এদের 'কুকি' আখ্যা দিয়েছে সমতল অঞ্চলের লোকেরা। বাঙালিরা, কাছাড়িরা এদের 'লুছাই' বলত। 'লুছাই' বলার কারণে যারা মাথা কাটে তারাই লুছাই। কুকিগণের নরহিংসাবৃত্তির দরুণ এই আখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এরা 'খচাক' নামেও অভিহিত।

কুকিরা পনেরোটি দফায় বিভক্ত যেমনঃ পাইতু, বেলাঠুট, থাংলুয়া, লাহফাং, বংখই, মিজেল, নামতে, ছাল্যা, ফুন্ কুন্তেই,লেনতেই জংতেই, রাংচন, বল্তে এবং খরেং। প্রথমোক্ত পাঁচ দফার কুকিরা ত্রিপুরায় অধিবাসী। এ রাজ্যের কুকিরা সাধারণত ডার্লং এবং লুসাই এই দুই নামে অভিহিত। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন 'কুকি' অভিধা সাধারণত ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর সম্মিলিত সম্প্রদায় যারা অন্তর্কলহের জেরে লুসাই এবং চিনহিলস থেকে বিতাড়িত হয়ে উত্তর পশ্চিম

দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে কাছায় অঞ্চলে। রাংখাল এবং বেতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের বলা হয় পুরাতন কুকি এবং অন্যদিকে নতুন কুকিরা থাডস জংসেনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে আগমন করে। নৃবিজ্ঞানী স্পিট (১৮৯৩)এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে 'কুকি' অভিধায় আখ্যায়িত হয়েছিল কিছু সংখ্যক উপজাতি শ্রেণির ব্যবসায়ীকে উপলক্ষ করে। সমতল অঞ্চলের লোকেরা তাদের কোনো সময়েই দেখেনি এবং এই কারণে কিছু সংখ্যক আগন্তকদের কাছ থেকেও পরিচয় জানতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং সমতল অঞ্চলের লোকেরা তাদের সুবিধামতো নামের পরিবর্তন সাধন করে। ফলে লুসাইরা পরিবর্তিত হল 'লকাই'-তে। পরবর্তীকালে লকাই থেকে 'কুকাই' এবং পরিশেষে 'কুকাই' থেকে কুকি* মোটের উপর লুসাই এবং কুকিরা ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায় নয়। আসলে এরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত।

১৯৯১সালের সেন্সাস বিবরণী অনুসারে ত্রিপুরার কুকিদের জনসংখ্যা ১, ৬৩৭।এদের প্রধান বাসস্থান কৈলাসহর, ধর্মনগর, উদয়পুর, অমরপুর এবং সদর অঞ্চলে। কুকিগণের প্রধান জীবিকা জুম কৃষি। বর্তমানে হালচাষ দ্বারাও শস্য উৎপাদন করে। জুম ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলারা সমান পরিশ্রম করে। ওরা সাহসী, পরিশ্রমী এবং শিকারপ্রিয়। তির, ধনু,ভল্ল এবং বন্দুক এদের শিকারের অস্ত্র। মাছ এবং মাংস এদের প্রিয় খাদ্য।

কুকিগণ অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির। ব্রিটিশ ভারতে এরা অনেক সময় শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দলবদ্ধভাবে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে নরহত্যা, গৃহদাহ ও লুণ্ঠনাদি দ্বারা নিরীহ অধিবাসীগণকে বিপন্ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত করত। এদের দমন করার জন্য ত্রিপুরেশ্বরকে এমন কী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। অনেক চেষ্টা করে ওদেরকে সংযত করা হয়েছে কিন্তু চারিত্রিক উগ্রতা এখন ও নির্মূল হয় নি।

কুকি সম্প্রদায়ের বিবাহ পদ্ধতি রিয়াংদের মতো। বাল্যবিবাহ এদের সমাজে প্রচলিত নেই। পুরুষ ও স্ত্রীলোক পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হওয়ার পর বিবাহ হয়। পাত্র অপেক্ষা পাত্রীর বয়স অধিক হলেও বিবাহে আপত্তি থাকে না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাত্রের বয়সই অধিক থাকে। এদের সমাজে পণপ্রথা প্রচলিত থাকলেও কোনো পক্ষই অসুবিধার কারণ হয় না। পুরুষদের মধ্যে বিবাহপ্রথা নিষিদ্ধ নয়।

স্ত্রীলোকরা স্বামীর অবর্তমানে পত্যন্তর গ্রহণ করে। পারিবারিক শান্তির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কুকিগণ ঈশ্বরকে 'পাথিয়েন পৃ' বলে। এদের অন্যান্য আরাধ্য দেবতার মধ্যে শিব প্রধান দেবতা। পার্বত্য দেব দেবীকে নিষ্ঠা সহকারে পূজা করে। শিব পূজা বিশেষ আড়ম্বর সহকারে হয়। শিব পূজায় পাড়ার সমস্ত লোক যোগদান করে। এই পূজায় গবয় বলিদান অবশ্য কর্তব্য। জুম কাটা আরম্ভ করার পূর্বে এই পূজায় অনুষ্ঠান হয় এবং পূজার ফলাফল দ্বারা সারা বৎসরের ফলাফল নির্ধারিত হয়। কুকিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু ছিল। বর্তমানে অনেকেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

মৃত্যুর পর কুকি সমাজে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে কুকিগণের রাজা বা প্রধান সর্দারের মৃত্যু হলে তাঁর মৃতদেহ একটি বাক্সে বন্ধ করে নব্বই দিন পর্যন্ত রাখার প্রথা আছে। এই নব্বই দিন দিবারাত্রি বাক্সের চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখা হয় এবং মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রীত্যর্থে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে মদ ও অন্নাদি বাক্সের সম্মুখে কিয়ৎকাল রেখে সকলে মিলে মহাসমারোহে ভক্ষণ করে। নব্বই দিবস পূর্ণ হলে মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত বস্তুও তৈজসাদি সহ বাক্সটি মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করা হয়। এই সময় যত নরমুণ্ড উক্ত গর্তে প্রদান করা যেতে পারে ততই গৌরবজনক মনে করা হয়। তবে সাধারণ লোকের মৃত্যু হলে মৃত্যুর দিবসেই মৃতের আত্মার উদ্দেশে মদ্য ও অন্নাদি প্রদান করে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। এই সকল সমাধিতে নিহত কতিপয় পশুপক্ষীর মস্তক প্রদান করা হয়।

(৯) গারো

নৃতত্ত্ববিদ্‌রা একমত যে গারো সম্প্রদায়ের লোকেরা মূলত গারোপাহাড়ের বাসিন্দা। মজুমদার(১৯৭৬)-এই প্রসঙ্গে বলেন 'গারো' শব্দটির উৎপত্তি ঐ সম্প্রদায়ের গারো নামক প্রথম প্রতিষ্ঠিত নেতার নাম থেকে। অবশ্য গারো সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত বিশ্বাস যে প্রথম ব্যক্তিটি গারো অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে তাঁর নাম ছিল বোনা নিরেপা নিতেপা রংমুথু এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মিসিপা দেবতার আশীর্বাদ ধন্য হয়ে জুম চাষ পত্তন করেছিলেন।

গারো সম্প্রদায়ের লোকরা প্রধানত জুম কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। বর্তমানে অনেকেই জুম প্রণালী পরিত্যাগ করে হলকর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদনে ব্রতী

হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে জুম চাষ অব্যাহত রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ করে অতি প্রাচীনকাল থেকেই গারো বসতি অঞ্চলে জুমচাষ করা হত। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের সমর্থনে নৃবিজ্ঞানী মজুমদার(১৯৭৬) বলেন, উত্তর পূর্ব ভারতের গারো পাহাড়ের বসতি অঞ্চলের চতুর্দিকে সর্বত্র নব্য প্রস্তর যুগের বেশ কিছু যন্ত্রপাতি যা জুম চাষে বা কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয় সেগুলি সাম্প্রতিককালে পাওয়া গেছে। আশ্চর্যজনকভাবে আধুনিককালে গারোরা যে লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এগুলি নব্য প্রস্তরযুগের যন্ত্রপাতির সঙ্গে হুবহু মিল দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধে হয় না বর্তমানকালের গারোরা নব্যপ্রস্তর যুগে জুম চাষ আবাদ করত।

গারোদের শারীরিক গড়ন বেটে বা মাঝারি, মুখমন্ডলে স্বল্পকেশ। গায়ের রং কালো এবং হলদে রং-এর মাঝামাঝি। নাসিকা প্রসারিত এবং চ্যাপ্টা। বর্তমানে ত্রিপুরার যে সব অঞ্চলে এদের বসতি গড়ে উঠেছে সেগুলি হল ঃ সদর, কমলপুর, কৈলাসহর, উদয়পুর এবং অমরপুর অঞ্চলে। ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে ওরা চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যেমন ঃ সোন্তসানরিক, ব্যাপটিষ্ট, ক্যাথলিক এবং হিন্দু। হিন্দু গারোরা হিন্দু দেব দেবীদের উপাসক। ইহা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য আদিবাসীদের মতো ধর্মের উদ্দেশ্যে হচ্ছে শস্য উৎপাদন। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা এবং রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এই কারণে জুম চাষের প্রতিটি স্তরে ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে জুম চাষের প্রস্তুতির সময় 'আগলমার্কা,' পূজার অনুষ্ঠান হয়। আবার ফসল তোলার সম 'মিরামুয়া' ধর্মীয় অনুষ্ঠান-উদ্-যাপন করা হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে জুম চাষ গারোদের জীবনচর্যার ব্যাপারে এক ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি।

(১০) মণিপুরি

ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা যেতে পারে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় থেকেই রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণে অনেক মণিপুরি নিজেদের রাজ্য ত্যাগ করে কাছাড় ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করে। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ ছাড়াও সুদুর অতীতে মণিপুর রাজপরিবারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজধর মাণিক্যের (১৭৮৫-১৮০৪) বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মণিপুরি সম্প্রদায়ের 'মৈতৈ' গোষ্ঠীর সঙ্গেই বিশেষ করে ত্রিপুরার রাজপরিবার ও সাধারণ উপজাতি পরিবারে সম্পর্ক তৈরি হয়। কথিত আছে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের পত্নী ও উপপত্নীর সংখ্যা ছিল মণিপুরি সম্প্রদায়েরই বেশি। সুতরাং রাষ্ট্রবিপ্লব এবং বৈবাহিক সূত্রের কারণেই ত্রিপুরায় মণিপুরিদের আগমন ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পায়। ২০০১ সালের সেন্সাস বিবরণ অনুযায়ী ত্রিপুরায় মণিপুরিদের সংখ্যা ১২,৮৫১।

মণিপুরিগণ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যেমন-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র। ব্রাহ্মণগণ বাঙালি সমাজ থেকে মণিপুরি সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হয়েছেন। অনুরূপভাবে শূদ্রগণও

মণিপুরি সমাজে অনুপ্রবিষ্ট। ব্রাহ্মণদের পদবি ভট্টাচার্য, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। শূদ্রগণ দে, দত্ত, কর, দাস ইত্যাদি পদবি বিশিষ্ট। ক্ষত্রিয়গণ সিংহ উপাধিধারী। মণিপুরিগণ সাধারণত মেঘলী উপাধিতে পরিচিত।

নৃতত্ত্বের বিচারে মণিপুরিগণ মোঙ্গোলো-ড্রাভিডিয়ান। এদের শারীরিক গড়ন বেঁটে। মুখমণ্ডলে স্বল্পকেশ। গায়ের রং কালো এবং হলদে রং-এর মাঝামাঝি। নাসিকা প্রসারিত এবং চ্যাপ্টা আকৃতির।

মণিপুরিগণ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। মদ, মাংস এরা স্পর্শ করে না। দেশ ত্যাগের পর কেউ কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা খুবই নগন্য। শিক্ষা দীক্ষায় মণিপুরিরা বেশ অগ্রসর। ত্রিপুরার ঠাকুর পরিবারের সমকক্ষ। ধর্মীয় জীবনে খুব নিষ্ঠাবন। এদের প্রত্যেকটি গ্রামে অথবা নিদেনপক্ষে দুই তিনটি গ্রামের কেন্দ্র স্থানে একটি মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত হয়। মণ্ডপে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করার জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয়। এই সকল মণ্ডপে স্ত্রী-পুরুষগণ সম্মিলিতভাবে সংকীর্তন করে। রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বৈষ্ণব পর্ব উপলক্ষে প্রতি মণ্ডপে সংকীর্তন এবং রাসলীলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়। কথিত আছে মণিপুরের ভূতপূর্ব অধীশ্বর মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র যে প্রণালীর রাসলীলা স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন সেই প্রণালীর অভিনয় প্রদর্শিত হয়।

মণিপুরি সমাজে ব্রাহ্ম ও গান্ধর্ব এই দ্বিবিধ বিবাহ প্রথা প্রচলিত। ব্রাহ্ম বিবাহে বর ও কন্যার অভিভাবকগণ উভয়ে মিলে সম্বন্ধ নির্বাচন করে থাকেন। অপরদিকে গান্ধর্ব বিবাহ বর ও কনের সম্মতির উপর নির্ভরশীল। এদের সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নেই। তবে বিধবাকে স্ত্রীভাবে গ্রহণ করে সাংসারিক জীবন যাপনে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। স্বামী বর্তমানে পত্যন্তর গ্রহণ সমাজে নিন্দনীয় কার্য হলেও অপ্রচলিত নয়।

মণিপুরিগণ প্রধানত কৃষিজীবী। হলকর্ষণ দ্বারাই কৃষিকার্য করে থাকে। কেহ কেহ স্বর্ণকার এবং কেহ কেহ সূত্রধরের কার্যও করে থাকে। এদের বয়িত বস্ত্রসম্ভারের চাহিদা সর্বত্র। সূক্ষ্ম শিল্পকার্যে এদের পারদর্শিতা সর্বজনবিদিত। কলজাত বস্ত্রের প্রাচুর্যের যুগেও প্রতিযোগিতায় তাঁত ও চরকার তৈরি বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস পায়নি। মণিপুরি রমণীগণ কেবল নৃত্যগীত নিপুণা নহে, সাংসাহিক কার্যের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রবয়ন করা এদের অবশ্য কর্তব্য। পুরুষ অপেক্ষা রমণীরা অধিক পরিশ্রমী এবং

প্রায় সকল কার্যেইপুরুষের সাহায্যকারিনী।

(১১) নোয়াতিয়া

নোয়াতিয়া শব্দের অর্থ নূতন। নানা জাতীয় লোকের সংমিশ্রণে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। তাদের চিহ্নিত করার সুবিধার্থে নোয়াতিয়া বলা হয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রাচীনকাল থেকেই এই মিশ্রজাতির জনগণ ত্রিপুরা জাতির অন্তর্নিবিষ্ট।

নোয়াতিয়াগণ মোট তেরোটি দফায় বিভক্ত। যথা:(১) আনুক,কেওয়া, আছলং, খাকলু, খলিচা, গর্জন,তংবাই,তোতারাম, দেইলদাক, গাইতং, মংবাই, মুড়াসিং এবং ফায়ুং। নৃতত্ত্বের দিক থেকে নোয়াতিয়াগণ মোঙ্গোলো ড্রাভিডিয়ান। এদের শারীরিক গড়ন ত্রিপুরার অন্যান্য আদিবাসীদের মতোই বেটে,মুখমণ্ডলে স্বল্প কেশ, গায়ের রং কালো এবং হলদে রং এর মাঝামাঝি নাসিকা প্রসারিত, এরা পূর্বে জুম কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। তবে বর্তমানে হলকর্ষণ প্রণালী অবলম্বন করে চাষআবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। উল্লেখ্য ত্রিপুরার সর্বশেষ নৃপতি মহারাজ বীরবিক্রম ১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে পর্বতবাসী পুরাণ ত্রিপুরা, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং ও হালাম এই পাঁচ সম্প্রদায়কে সমতলভূমিতে হলকর্ষণে উৎসাহিত করার জন্য কল্যাণপুরে এগারো হাজার দ্রোণ ভূমি সংরক্ষণ করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে পুনর্বার উপরোক্ত পাঁচটি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার মোট ১৯৫০ বর্গমাইল ভূমি সংরক্ষণ করা হল। ফলে আধুনিককালে ওরা যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি লাভে সমর্থ হয়।

নোয়াতিয়াদের বিবাহ পদ্ধতি ত্রিপুরী রিয়াং সমাজের অনুরূপ। এদের মধ্যে পণপ্রথা নেই। কিন্তু ‘জামাই উঠার’ প্রথা আছে।

পুরাতন ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতো নোয়াতিয়া রমণীগণ রৌপ্যনির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করে। কেউ কেউ কাঁচের চুড়ি এবং পুতির মালা ব্যবহার করে থাকে। তবে ধাতব অলঙ্কার অপেক্ষা প্রকৃতিজাত সুগন্ধি পুষ্প এবং সুদৃশ্য পল্লবাদি দ্বারা অলঙ্কৃতা হতে এরা পছন্দ করে।

নোয়াতিয়াগণের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সাধারণত বাঙালিদের অনুরূপ। চতুর্দশ দেবতা, এদের প্রধান আরাধ্য দেবতা। পার্বত্য প্রণালীতে যে সকল দেবতার অর্চনা করা হয়, তাতে ত্রিপুরী ভাষাতেই মন্ত্রোচ্চারিত হয় এবং ওঝাগণই এই সকল পূজার

পুরোহিত। ইহারা সাধারণত শাক্ত মতাবলম্বী হলেও কেউ কেউ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত। এদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ত্রিপুরীদের মতো। মৃত্যুর পর দাহ করার প্রথা আছে। দাহ কার্য শেষ হলে শ্মশান ক্ষেত্র পরিষ্কার করে একটি তুলসী গাছ, একটি প্রদীপ, এবং কিছু অন্ন, ও রান্নাকরা মাংস সেই স্থানে রেখে দেয়। এইভাবে ক্রমাগত সাতদিন খাদ্যবস্তু রেখে দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধকালে এরা সাধ্যানুরূপ গো-দান, অন্নদান ও তৈজযাদি দান করে থাকে এবং পরিবারভুক্ত সকলকেই ভোজপ্রদান করে।

উপরে বর্ণিত ত্রিপুরা জনসম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে ত্রিপুরার অধিবাসী মঙ্গোলয়েড মহাজাতি এবং মঙ্গোলো-ড্রাভিডিয়ান, প্যালে-মঙ্গোলয়েড, টিবেটো মঙ্গোলয়েড জাতির শাখা-প্রশাখার অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য,সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির ৩৭ শতাংশই মঙ্গোলয়েড মহাজাতি। এদের সিংহভাগ লোক চৈনিক। এশীয় মহাদেশের উত্তর, মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল এদের মূল আবাস। পরবর্তীকালে ভৌগোলিক, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং নিজেদের মধ্যে অন্তর্কলহের দরুণ ওরা উত্তর পূর্ব ভারত এবং পূর্ব ভারত এবং পূর্ব ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে। ব্রিটিশ ভারতে এই মঙ্গোলয়েড মহাজাতির শাখা প্রশাখায় লোকদের অনগ্রসর জাতি উপজাতি হিসাবে চিহ্নিতকরণ করা হল, অথচ একই মঙ্গোলয়েড মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত যে সব লোকেরা, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস শুরু করে তারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের অন্যতম বলে প্রতিপন্ন হল। স্বাধীনতার পরেও এদের উপজাতি চিহ্নিতকরণ বহাল রইল।

আধুনিক নৃবিজ্ঞানীরা একমত যে মানুষের জাতিসমূহ একক মানবরূপ-উদ্ভূত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তাগণ মানবজাতির দৈহিক ও মানসিক অসাম্যের ভিত্তিতে ‘অগ্রসর’ ও আদিম জাতির অস্তিত্বের ভ্রান্ত ‘তত্ত্ব’ প্রচার করেন শুধুমাত্র শ্রেণিগত, জাতিগত ও ঔপনিবেশিক বা নয়া ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে। প্রখ্যাত সুইডিস প্রকৃতিবিদ কার্ল ফণ্ লিনি (১৭০৭-১৭৭৮) ছিলেন দেহ বৈশিষ্ট্যভিত্তিক মানুষের জাতিসমূহের বৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিন্যাসের অন্যতম প্রবক্তা। তিনি মূলত শরীর গঠনের আকৃতির বিচারে মানুষের জাতিসমূহের মানসিকতাকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ এশীয় মানবের নিষ্ঠুরতা, বিষণ্ণতা, অনমনীয়তা, লালসা; ‘আফ্রিকান মানবের’ আক্রোশ, ধূর্ততা, আলস্য ও নিস্পৃহতা; ইউরোপীয় মানবের গতিশীলতা, রসবোধ, আবিষ্কার স্পৃহা;সুতরাং কার্ল ফণ্ লিনি-এর মতে ‘শ্বেত’

জাতির অবস্থান অন্য জাতিসমূহের উর্ধতন পর্যায়ে ন্যস্ত। এই নীতি যে ভ্রান্ত তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইউনেস্কো জাতি সমস্যায় জীবতাত্ত্বিক সমস্যাবলী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে (মস্কো, ১২-১৮ আগস্ট, ১৯৬৪)। প্রতিবেদনে বলা হয় বর্তমান বিশ্বের সকল মানুষ 'হোমোসেপিয়ন' নামক একটিমাত্র প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং একই মূল থেকে উদ্ভূত। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈসাদৃশ্যের কারণ হল বংশগত বৈশিষ্ট্য ও বংশগতির বুনিয়াদের উপর পরিবেশগত প্রভাব। এ কথাও সত্য পরিবেশ যেমনই হোক বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সার্বিক ও ভিত্তিগত জৈবিক তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না এবং কোন ক্রমেই জাতি-বিদ্বেষের প্রাস্তরতা বা আদিমতার নির্ণায়ক নয়। মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ সম্মেলনের তিন বছর বাদে জাতি ও জাতিগত কুসংস্কার সম্পর্কে ঘোষণাপত্রটি (ইউনেস্কো, প্যারিস ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭) অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। উপরোক্ত ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে মানুষমাত্রই জন্মসূত্রে স্বাধীনতা, অধিকার ও সমমর্যাদার দাবিদার। এই গণতান্ত্রিক নীতি আজ হুমকির সম্মুখীন। কুসংস্কার দূরীকরণে সমস্ত সামাজিক বিন্যাসের মূল পরিবর্তনগুলির জন্য রাজনৈতিক পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হতে পারে। তাছাড়া এজন্য প্রয়োজন প্রগতির মূল উপকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যান্য উপায়, সরকারি প্রচার ব্যবস্থাও আইন ব্যবস্থার দ্রুত ও সফল প্রয়োগ।

তৃতীয় অধ্যায়

মাণিক্য যুগের সূচনা

ত্রিপুরার রাজবংশ যে খুবই প্রাচীন এবং মধ্যযুগের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মধ্যযুগে এই রাজ্যের ও রাজবংশের ইতিহাস বাংলা পদ্যে রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে রাজা ধর্মমাণিক্যের আদেশে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামক দুজন প্রধান এবং চন্তাই, প্রধান পুজারি দুর্লভেন্দ্র কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়। ধর্মমাণিক্য পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব করেন। এই গ্রন্থের মূল সংস্কার এখন আর পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে ইহা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে যে রূপ ধারণ করে বর্তমানে তাহাই রাজমালা নামে পরিচিত।

মাণিক্য বংশীয় রাজারা ত্রিপুরার এক স্বাধীন সুসংবদ্ধ রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন যার স্থায়িত্বকাল ছিল ১৯৪৯ সালের ১৫ ই অক্টোবর পর্যন্ত।

খ্রিস্টপূর্বাব্দে যদি এই রাজবংশের সূচনা হয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরার ভারতভুক্তির সময় পর্যন্ত সময়টা দাঁড়ায় তিন হাজার তিনশত ছিয়াশি বৎসর। গড়ে ১৮ বছরে এক পুরুষ ধরে এত দীর্ঘ সময় কোনো একটি রাজবংশ নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব করছে এমন উদাহরণ সারা বিশ্বে নাই। কিন্তু রাজ্যের সূচনাকাল থেকে কীভাবে উপজাতি ভিত্তিক গোষ্ঠীতন্ত্র রাজতন্ত্রে উত্তরিত হয়েছিল তা বলা অসম্ভব। রাজমালার সূত্রে জানা যায় যে চন্দ্রবংশীয় যযাতি কর্তৃক স্বীয় পুত্র দ্রুহ্যকে কিরাত দেশে রাজা করে পাঠানো হয়েছিল। এই বংশেই ত্রিপুর নামক রাজার জন্ম হয়। 'ত্রিপুর' থেকে রাজ্যের নাম হয় ত্রিপুরা। রাজা ত্রিপুর দ্বাপরের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজমালার লেখকের মতে সম্ভবত যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। এই কাহিনির যে কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নেই তা বলাই বাহুল্য।

ছেংথুম ফা (মহামাণিক্য) আ ১২২৫-১২৫০

ত্রিপুরের পরবর্তী ৯৩ জন রাজার পর ছেংথুম ফা রাজার নাম পাওয়া যায়।

ইনি গৌড়েশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং এই গৌড়েশ্বর যে মুসলমান নরপতি ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং এই রাজার সময় থেকেই ত্রিপুরার ঐতিহাসিক যুগের সূচনা বলে গণ্য করা যেতে পারে। রাজমালায় উল্লেখিত একটি তাম্রলেখের উপর ভিত্তি করে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন প্রথম মাণিক্য উপাধিধারী রাজা মহামাণিক্য পার্বত্য চট্টগ্রাম শ্রীহট্টের মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূভাগ জয় করে নতুন এক রাজ্যের পত্তন করেন। তাঁর নাম ছিল ছেংথুম ফা। ইতিহাস বিশারদরা মনে করেন এই ঘটনা সম্ভবত পঞ্চদশ প্রথম দিকে ঘটে থাকবে। কারণ ছেংথুম ফা বা মহামাণিক্যের পুত্র ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকাল ত্রিপুরবংশাবলী মতে ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৬২ খ্রিস্টাব্দ রাজমালার সূত্র থেকে জানা যায় যে ছেংথুম ফা গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং যুদ্ধে সাফল্যলাভ করে ত্রিপুরার স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য সাময়িকভাবে তাঁরা হস্তী উপঢৌকনের মাধ্যমে বাংলার সুলতানদের কিছুটা আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন বলে মনে হয়। বিনিময়ে ত্রিপুরা সুলতানদের কাছ থেকে নতুন রাজ্যের স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

রাজমালার কাহিনি থেকে জানা যায় ধর্মমাণিক্য তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রত্নফাকে সাড়ির সুলতানের দরবারে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে বাংলার সুলতানের সৈন্যদের সহায়তায় পিতার রাজ্য শুধু স্বীকার করেন নি, উপরন্তু সুলতানী সৈন্যের সাহায্যে ত্রিপুরার বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন লোককে ঐক্যবদ্ধ এবং সুসংবদ্ধ করেন। রত্নফা সুলতানকে হস্তী এবং বহু মূল্যবান কটি রত্ন উপহার দেন। বিনিময়ে সুলতান তাঁকে মাণিক্য উপাধি দেন। এতে এটাই পরিণত হ রত্নমাণিক্য সাময়িকভাবে সুলতানের কিছুটা আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন।

রাজমালার উপরোক্ত কাহিনি কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কারণ পূর্বোক্ত ধর্মমাণিক্য যে রত্নমাণিক্যের পূর্ববর্তী, মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে তা জানা যায়। রত্নমাণিক্যই যে সর্বপ্রথম মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করেন এই উক্তি যথার্থ সত্য মহামাণিক্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। মহামাণিক্য নামে কোনও লিপি মুদ্রা পাওয়া যায়নি। তবে রাজমালায় এ তথ্য পাওয়া গেছে যে মহামাণিক্য (ছেংথুমফা) কোনো এক গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করেছিলেন এবং গৌড়েশ্বর সম্ভবত সাময়িক বাংলার কোনো সুলতান হবেন। কথিত আছে যে ছেংথুম ফা বাহুবলে দেশের মেঘনানদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন এবং পরে মেহেরকুল আক্রমণ ও না করলে গৌড়ের সুলতানের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ শুরু হয়। জনশ্রুতি এইরূপ ছেংথুম ফা-এর রাজত্বকালে ত্রিপুর রাজ্য-নিবাসী হীরাবন্ত খাঁ নামক জনৈক অধিকারী বঙ্গদেশের তদানীন্তন যবনাধিপতির অধীনে কার্যে নিযুক্ত ছিল। তার ক্ষমতা লক্ষ করে গৌড়েশ্বর তাকে

বিশেষ অনুগ্রহ করতেন। এইজন্য হীরাবন্ত খাঁ গর্বোন্মত্ত হয়ে ছেংথুম ফাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে।

ক্ষুদ্র ভূ-স্বামীর উদ্ধত আচরণে ছেংথুম ফা ক্রোধান্বিত হয়ে হীরাবন্ত খাঁকে বন্দি করে নিয়ে আসার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। হীরাবন্ত খাঁ এই সংবাদ পেয়ে ভীত হয়ে গৌড়াধিপতির শরণাপন্ন হয়। রাজ্যবিস্তার লালসায় গৌড়াধিপতি সুপ্রাচীন হিন্দুরাজ্য জয় করার লক্ষে বিরাট বাহিনী নিয়ে ত্রিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। ছেংথুম ফা ভীত হয়ে গৌড়াধিপতির সহিত সন্ধি স্থাপন করতে উদ্যত হন। এই সংবাদ 'ত্রিপুরা সুন্দরী' রাজমহিষীর কর্ণগোচর হলে তিনি নিজেই জন্মভূমির গৌরব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে কৃত সংকল্প হলেন। রাজমহিষী ত্রিপুরার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দেন এবং সেই রাতে সৈন্যদের তৃপ্তির সঙ্গে পান ভোজন করান এবং তাদের উৎসাহ দ্বিগুণ বর্ধিত করেন। পরদিবস প্রত্যুষে ত্রিপুর রাজমহিষী রণবেশে সুসজ্জিত হয়ে শূল হস্তে মত্তমাতঙ্গোপরি আরোহণ পূর্বক রণভূমিতে প্রবিষ্ট হন এবং চতুর্দশ দেবতা নামে প্রসিদ্ধ ত্রিপুর রাজকুলদেবতার নাম উচ্চারণ পূর্বক বীরোচিত বাক্যের দ্বারা ত্রিপুর সেনাগণকে উৎসাহিত করে সমস্ত দিবস যবনগণের সহিত ঘোর সংগ্রামে নিযুক্ত থাকেন। ত্রিপুরাধিপতি মহামাণিক্যও (ছেংথুম ফা) যুদ্ধক্ষেত্রে গমনপূর্বক মহিষীর সহিত যবন সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন। পরিশেষে রবি অস্তাচলগামী হওয়ার পূর্বেই গৌড়ের সুলতানের যবন সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে তৃণবৎ বিমর্দিত হয়। অবশিষ্ট যবন সেনা নতশিরে গৌড়াভিমুখে প্রত্যাবর্তন করে। অপরদিকে স্বনামধন্য বীরাঙ্গনা ''ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী'' নাম্নি ত্রিপুরাধিপতি মহামাণিক্যের মহিষী যবনগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিধ্বস্ত করে জয়মাল্য ধারণ পূর্বক ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেন। এই সংঘর্ষে রাজার জামাতা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করায় রাজা তাঁকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ত্রিপুরার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক শ্রীকৈলাশ চন্দ্র সিংহের মতে সেই সময় থেকে রাজার জামাতা সেনাপতি পদে নিযুক্ত হবার কথা ত্রিপুরায় প্রচলিত হয়।

ধর্মমাণিক্য (১৪৩১-১৪৬২)

মহামাণিক্যের পুত্র ধর্মমাণিক্য ত্রিপুরার একজন শক্তিশালী এবং নিষ্ঠাবান রাজা ছিলেন। রাজমালায় বর্ণিত ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ধর্মমাণিক্যের রাজ্য শাসনের তারিখই সঠিক জানা যায়। কারণ তাঁর আমলের একটি তাম্রশাসনে

১৩৮০ শক অর্থাৎ ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ আছে। ''ত্রিপুর-বংশাবলী'' অনুসারে ধর্মমাণিক্য ৮৪১ হইতে ৮৭২ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ১৪৩১ থেকে ১৪৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজমালায় এঁর পিতার নাম মহামাণিক্য। তাম্রশাসনে তাহাই আছে। সুতরাং বলা যেতে পারে অন্তত এই সময় থেকে ত্রিপুরার প্রচলিত ঐতিহাসিক বিবরণ মোটামুটি সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

রাজমালার বর্ণনা থেকে জানা যায় মহামাণিক্যের জীবিত কালেই তাঁর পুত্র ধর্মমাণিক্য ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিদর্শন করে বারাণসীতে অবস্থান করছিলেন। মহামাণিক্যের মৃত্যু হলে ত্রিপুরা রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জ্যেষ্ঠের অনুপস্থিতিতে অনুজ চতুষ্টয় সিংহাসন লাভের নিমিত্ত বিবদমান এবং অপরদিকে সেনাপতিরাও সিংহাসন লাভে প্রয়াসী হন। পরিশেষে ত্রিপুরার নেতৃবর্গ বারাণসী থেকে ধর্মমাণিক্যকে ত্রিপুরায় নিয়ে আসেন এবং তাঁদের অনুরোধে ধর্মমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন আরোহণ করেন।

রাজা ধর্মমাণিক্যের পূর্বে বাংলার মুসলমান সুলতানগণ ত্রিপুরা আক্রমণ করে ত্রিপুরার কতকাংশ অধিকার করেছিলেন, ধর্মমাণিক্য তা পুনরুদ্ধার করেন। এই প্রচলিত কাহিনি কত দূর সত্য বলা যায় না। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই প্রসঙ্গে বলেন, শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ(১৩০১-১৩২২)ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর রাজ্যের আয়তন ছিল বিরাট। তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানরা যে রাজ্য শাসন করেছিলেন তার অতিরিক্ত বহু অঞ্চল যেমন সাতগাঁও, ময়মনসিংহ ও সোনারগাঁও, এমন কী সুদূর সিলেট পর্যন্ত অঞ্চল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৯) সোনারগাঁও ও কামরূপের কতক অংশ জয় করেছিলেন। ত্রিপুরার কতক অংশ জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের (১৪১৮-৩৩) রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু শেষোক্ত সুলতানের মৃত্যুর পর থেকে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বের মধ্যবর্তী ২২ বৎসর কাল মধ্যে বাংলার সুলতান খুব প্রভাবশালী ছিলেন না- অভ্যন্তরীণ গোলযোগও ছিল। সুতরাং এই সুযোগে ধর্মমাণিক্য সম্ভবত ত্রিপুরার বিজিতাংশ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কথিত আছে ধর্মমাণিক্যের শাসনকালে আরাকানপতি মে-সো-মোয়ান ব্রহ্মরাজ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়ে ত্রিপুরা রাজের আশ্রয় নেন। পরে ত্রিপুরার সৈন্যদের সাহায্যে মগরাজ নিজ সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

জনশ্রুতি আছে ধর্মমাণিক্য বারাণসী থেকে কান্যকুব্জ দেশিয় কৌতুক নামে এক ব্রাহ্মণকে সপরিবারে নিয়ে আসেন এবং পুরোহিত হিসাবে তাঁকে বরণ করেন। ধর্মমাণিক্য ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেন। এ ধরনের একটি তেরশ আশি শকের (১৪৫৮) তাম্রলেখর বিবরণ রাজমালায় দেওয়া আছে। তেরশ আশি শকের এই তাম্রলেখটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই মূল্যবান। কারণ এই তাম্রলেখ থেকে ধর্মমাণিক্যের সময়কাল এবং তাঁর পিতা যে মহামাণিক্য ছিলেন তা জানা যায়। তাছাড়া ত্রিপুরার মাণিক্য বংশীয় রাজাদের প্রথম দিকের ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের কথাও এই তাম্রলেখ থেকে জানা যায়। রাজমালা গ্রন্থে আছে যে তিনি ধর্মসাগর নামে এক বৃহৎ দিঘি খনন করেছিলেন। এই দিঘি উৎসর্গকালে ধর্মমাণিক্য তেরশ আশি শকাব্দে (১৪৫৮) তাম্রশাসন দ্বারা কৌতুক ও অন্যান্য সাতজন ব্রাহ্মণকে '২৯ দ্রোন' শস্যপূর্ণ ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করেছিলেন।

ধর্মমাণিক্যের অক্ষয় কীর্তি রাজমালা নামক ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস গ্রন্থ রচনার ব্যবস্থা করা ছাড়াও চারটি প্রধান কীর্তি, যেমন-পশ্চিমবর্তী কুমিল্লা পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার, জলাশয় খনন, ভূমিদান এবং ত্রিপুরার ইতিহাস লিখন। ধর্মমাণিক্যের অন্তিমকালের উজ্জ্বল কীর্তি- তিনি ব্রাহ্মণদিগকে ২৯ দ্রোণ উর্বর ভূমিদান করেন। এর ঘটনাকাল, সোমবার, চৈত্র সংক্রান্তি, ১৩৮০ শকাব্দ অর্থাৎ এপ্রিল ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ। তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ এই তাম্র শাসনের কাল গণনা অভ্রান্ত। ইহার ঐতিহাসিক সত্যতা অনস্বীকার্য। ত্রিপুরার ইতিহাসের উপাদান হিসেবে তাম্রশাসনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তাম্রশাসনের প্রতিলিপি নিম্নরূপ ঃ

চন্দ্রবংশোদ্ভব ঃ স্বাপ মহামাণিক্যজ ঃ সুধী ঃ।
শ্রী শ্রী মদ্ধর্ম্মমাণিক্য ভূপশ্চন্দ্র কলোদ্ভবঃ।
শাকে শূন্যাষ্ট বিশ্বাদে বর্ষে সোম দিনে তিথৌ।
ত্রয়োদশ্যাং সিতেপক্ষে মেষে সূর্যস্য সংক্রমে।।
কৌতুকাদি দ্বিজাগ্র্যেষু পূজিতেষু চা চাষ্টসূ।
ভূমিংদদৌ শস্যপূর্ণাং দ্রোণ বিংশ নবাধিকাং।।
জলাশয়ং দ্বিজায়ে মং ধর্মসাগরমাখ্যয়ী।
সভূমি ফল বৃক্ষাদি ভূমিত্তং দত্তবানহং।।
মমবংশ পরিক্ষীনে যঃ কশ্চিদ্ভু পতিভবেৎ।
তস্য দাসস্যদাসোহং ব্রহ্মবৃত্তিং ন লোপয়ৎ।।

মর্ম;-চন্দ্রবংশোদ্ভব মহামাণিক্যের সুধীপুত্র, শশধর সদৃশ শ্রীশ্রীমদ্ধর্ম্মমাণিক্য, ১৩৮০ শকের মেষ সংক্রমণে (চৈত্র মাসের শেষ দিবসে) সোমবার, শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কৌতুকাদি অষ্ট বিপ্রকে শস্য সমন্বিত এবং ফল ও বৃক্ষাদি পূর্ণ উনত্রিশ দ্রোণ ভূমি দান করিলাম। আমার বংশ বিলুপ্ত হইলে যদি এই রাজ্য অন্য কোনো ভূপতির হস্তগত হয় তিনি এই ব্রহ্মবৃত্তি লোপ না করিলে, আমি তাঁহার দাসানুদাস।

প্রথম প্রতাপমাণিক্য (১৪৬২-১৪৯০)

ধর্মমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র এবং ধন্যমাণিক্যের বৈমাত্রেয় অনুজ হলেন প্রতাপমাণিক্য। ধর্মমাণিক্য অকস্মাৎ পরলোক গমন করায় উত্তরাধিকারের সমস্যাটি তিনি মীমাংসা করে যেতে পারেননি। তাই উত্তরাধিকার নিয়ে কলহ দেখা দিল। হঠাৎ ঠান্ডা লড়াইতে ছিলেন প্রতাপের মাতা, ধন্যের মাতা এবং সেনাপতিগণ। ঠান্ডা প্রতাপের চতুরা মাতা অগ্রসর হলেন। ষড়যন্ত্রের মূলে ছিলেন সেনাপতিগণ যাকে উপেক্ষা করে স্বার্থ সিদ্ধির বাসনায় কনিষ্ঠ প্রতাপকে বসানো হল। কিয়ৎকাল সেনাপতিরাই বালক প্রতাপের শিরে অধার্মিকতার অভিযোগ চাপিয়ে রাত্রিকালে গোপনে প্রতাপকে নিহত করলেন। অতপর সেনাপতিদের মধ্যে কাটাকাটি শুরু আতঙ্কিত নগরবাসীদের অনেকেই নগর ত্যাগ করে। রাজকুমার ধন্য স্বীয় জীবন সঙ্কটাপন্ন মনে করে জনৈক পুরোহিতের গৃহে লুকিয়ে রইলেন। অনেক রক্তপাতের প্রধান সেনাপতি উপলব্ধি করলেন যে শান্তি স্থাপনের জন্য ধন্যকে সিংহাসনে বসানো আবশ্যক।

প্রথম প্রতাপমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুটমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হন। ধন্যমাণিক্যে মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় মুকুটমাণিক্য খুবই অল্পকাল রাজত্ব করেন।

মুকুটমাণিক্য (১৪৮৯-১৪৯০)

প্রথম প্রতাপমাণিক্যের অনুজ হলেন মুকুটমাণিক্য ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা হন। ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচারিত তাঁর একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দেও অপর একটি মুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রা ও তাম্রলেখের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় মুকুটমাণিক্য খুবই স্বল্পকালের জন্য রাজত্ব করেন। ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই তাঁর রাজত্বের সমাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় প্রতাপমাণিক্য (১৪৯০)

মুকুটমাণিক্যের পুত্র দ্বিতীয় প্রতাপমাণিক্য ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে

ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ বৎসরেই তিনি তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচার করেন। মুকুটমাণিক্যের মতো তিনিও স্বল্পকাল মাত্র রাজত্ব করেন। সেনানায়করা গোপনে তাঁকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেন। ঐতিহাসিকদের মতে রত্নমাণিক্যের পর থেকে ধন্যমাণিক্যের সিংহাসন আরোহণের (১৪৯০) পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে ত্রিপুরার রাজাদের ধারাবাহিকতা নির্ণয় করা অসম্ভব ছিল কারণ এই অন্তবর্তী সময়ের মুদ্রা বা লিপি পাওয়া যায়নি।

ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫১৫)

ধর্মমাণিক্যের জ্যেষ্টপুত্র এবং প্রতাপের বৈমাত্রেয় অগ্রজ হলেন ধন্যমাণিক্য। তাঁর শাসনকাল ঘটনা বহুল এবং বীরত্ব ব্যঞ্জক। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও খুনি সেনানায়কদের চৈতন্য উদয় হল। তাঁরা রাজকুমারকে খুঁজতে লাগল। অন্বেষণকারী সেনানায়করা ধাত্রীমাতার গৃহে সন্ধান করতে গেল। ধাত্রীমাতার পূর্বের ঘৃণ্য ঘটনা অজানা ছিল না, তাই ধাত্রীমাতার মনে হল ধন্যকেও হত্যা করে রাজ্যলাভের পথ কন্টকমুক্ত করতে সেনারা এসেছে। ধাত্রীমাতা সন্ধান না জানার ভান করল। ধাত্রীমাতার মনোগত ভাব বুঝতে পেরে প্রধান সেনাপতি পবিত্র শালগ্রাম স্পর্শ করে বা শপথ পূর্বক সদিচ্ছা প্রকাশ করল। সেনাপতির কথায় আশ্বস্ত হয়ে ধাত্রীমাতা ইঙ্গিত করল পুরোহিতের বাড়িতে সন্ধান করে দেখতে। সজ্জিত সেনাদল পুরোহিতের বাড়িতে সন্ধান করতে গেলে সেখানে সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। পুরোহিত বাধ্য হলেন সত্যকে স্বীকার করতে। প্রধান সেনাপতি শালগ্রাম স্পর্শ করে রাজকুমারের নিরাপত্তার শপথ দিলেন। রাজকুমার গৃহকোণে সেনাদের হাতে মৃত্যু আসন্ন ভেবে অতীব ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। পুরোহিত নিজেই ঘরের দরজা খুলে দিলেন এবং রাজকুমারকে অভয় দিয়ে সামনে আসতে বললেন। তথাপি ইতস্তত করায়, সৈন্যরা রাজকুমারকে টেনে বের করল। আতঙ্কিত রাজকুমার কাতর কণ্ঠে প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। সেনারা রাজকুমারকে অভিবাদন করে রাজা করবার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। দ্বিধাগ্রস্ত রাজকুমার হিতৈষী পুরোহিত এবং সেনানায়ক সমভিব্যাহারে রাজবাড়িতে গমন করলেন। রাজকুমার স্নান করে নতুন পট্টবস্ত্র পরিধান করেন। রাজপুরোহিত স্বস্তিবাচন পাঠ সমাপ্ত করলে প্রধান সেনাপতি সিংহাসন অভিমুখে রাজকুমারকে নিয়ে গেলে রাজকুমার ধন্য সিংহাসনে উপবেশন করেন। তার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হল। রাজকুমারকে তিলক পরিয়ে দেওয়া হল ও বাদ্যভাণ্ড বেজে উঠল। সেনারা অভিবাদন করল।

রাজকুমার ধন্যমাণিক্য নাম ধারণ করে সিংহাসন আরোহণ করলেন বটে, কিন্তু সিংহাসনে নিষ্কন্টক হলেন না। মহারাজ ধন্যমাণিক্য সৈন্যদের অসঙ্গাত আধিপত্য বিস্তারে ব্যথিত হলেন। মহারাজার একমাত্র পরামর্শদাতা বিচক্ষণ পুরোহিত পরামর্শ দিলেন কৌশলে সেনাপতিদের দমন করতে হবে। পুরোহিতের পরামর্শ অনুসারে রাজা সেনানায়কের আধিপত্য মেনে নিলেন। অপরদিকে মহারাজার নিরাপত্তার জন্য অতি বিশ্বাসভাজন ও সাহসী কতিপয় সৈনিককে শরীররক্ষী নিযুক্ত করে পীড়ার ভান করে মহারাজ কয়েকমাস নির্জনে বসবাস করতে লাগলেন। প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হল সেনাপতিদের উপর। সমস্ত সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ করা হল। কিছুকাল অতিবাহিত হলে সেনাপতিরা মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করল। প্রার্থনা স্বীকৃত হল রাত্রিকালে এক নির্ধারিত সময়ে। প্রতি সেনাপতিকে হত্যা করার জন্য একজন করে বিশ্বস্ত রক্ষী অন্তঃপুরে মোতায়েন করা হল। রাজ দর্শনের পর বিদায়ের অভিবাদন করার কালে সমাগত সব কয়জন সেনাপতি নিমেষে নিহত হল। মুহূর্তে শান্তিপূর্ণ ভাবে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল। মহারাজ ধন্যমাণিক্য নিষ্কন্টক হলেন। অতঃপর নিজেকে আরও নিরাপদ রাখার জন্য তিনি প্রধান সেনাপতির কন্যা কমলাদেবীকে বিবাহ করেন। পূর্বে সেনাপতিদের কেবলমাত্র ত্রিপুরী সম্প্রদায় থেকেই নির্বাচিত করা হত। এই সব সেনানায়কদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য মহারাজ ত্রিপুরী সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায় থেকেও সেনানায়ক নির্বাচন করেন। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রিয়াং সম্প্রদায় থেকে রায়কচাক ও রায়কাছাম নামে দোর্দণ্ডপ্রতাপ দুই ব্যক্তিকে সেনাদলের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করা হল। এছাড়া সেনাবিভাগে পাহাড়ি ও বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের লোক নিযুক্ত করে এক বিরাট বাহিনী গড়া হল। সেনাদলকে উজ্জ্বল ও শক্তিশালী করে রাজ্যের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেনানিবাস নির্মাণ মহারাজ ধন্যমাণিক্য রাজ্য বিস্তারে বিশেষ উদ্যোগী হলেন। রাজধানী রাঙামাটি পশ্চিমে মেহেরকুল, পাটিকারী, উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গা মণ্ডল, বরদাখাত, সাইর, সরাইল, উত্তরে বেজুরা, ভানুগাছ, বিধাজুরি, লঙ্গালা, দক্ষিণে খণ্ডল, আরাকান, পূর্ব দিকে থানাংটি প্রভৃতি জয় করে রাজ্যের সীমা বিশাল বিস্তার করলেন।

ধন্যমাণিক্যের সঙ্গে বাংলার সুলতান হুসেন শাহের বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে তিনটি কারণে ধন্যমাণিক্য আক্রমণাত্মক নীতি করে

বাংলার বেশ কিছু অংশ ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই খালি পুনরুদ্ধার করতে হুসেন শাহ সচেষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয়ত, ধন্যমাণিক্যের নেতৃত্বে শক্তিশালী ত্রিপুরা বাংলা সুলতানের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। তৃতীয়ত, চট্টগ্রামের সরকারকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা, বাংলা এবং আরাকানের মধ্যে ত্রিমুখী সংগ্রাম শুরু করেছিল। ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম জয় করে স্মারক মুদ্রা প্রচলন করেন। ধন্যমাণিক্যের এক সেনাপতি, আরাকানের রামু অঞ্চল জয় করলে ধন্যমাণিক্য আরাকানের রাজধানী 'রসাঙ্গ' বিজেতা উপাধি লাভ করেন। পাঠানদের দৌরাত্ম করতে ধন্যমাণিক্য গোমতীর উজানে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম প্লাবন সৃষ্টি করে ভাটিতে নো চরে অবস্থানরত পাঠান সৈন্যদের গোমতীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

ধন্যমাণিক্য শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলে বেশ কিছু গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। কথিত আছে তিনি হিন্দু পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থ উৎকল পাঁচালী ও প্রেত চতুর্দশী বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। ধন্যমাণিক্যের অক্ষয় কীর্তি ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির এবং মহাদেবের মন্দির নির্মাণ। রত্নপুরে চৌদ্দ দেবতার মন্দির নির্মাণ করেন।

মহিষী কমলাদেবীর নামে কসবা অঞ্চলে কমলাসাগর দিঘি খনন করেন। রাজমালার সূত্রে জানা যায় ধন্যমাণিক্যের বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়েছিল। মুদ্রার সাক্ষ্য অনুসারে ধন্যমাণিক্য অন্তত পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

ধ্বজমাণিক্য (১৫১৫-১৫২১)

ধন্যমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং দেবমাণিক্যের অগ্রজ ছিলেন ধ্বজমাণিক্য। ধ্বজমাণিক্যের সম্ভাব্য রাজত্বকাল ১৫১৫-১৫২১ খ্রিস্টাব্দ। রাজধানী রাঙামাটি থেকে কয়েক ক্রোশ উত্তরে তিনি এক দুর্গ নির্মাণ করান। ত্রিপুরা বংশাবলী ও কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালায় ধ্বজমাণিক্যের নাম থাকলেও, পুরাতন রাজমালায় তাঁর কোনো উল্লেখ নেই। তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

দেবমাণিক্য (১৫২২-১৫২৭)

ধন্যমাণিক্য এর কনিষ্ঠ পুত্র এবং ধ্বজমাণিক্য-এর অনুজ দেবমাণিক্য। দেবমাণিক্যের মুদ্রা পাওয়া গেছে ১৫২০ খ্রিস্টাব্দের। কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে দেবমাণিক্য ধ্বজমাণিক্যের নাবালক পুত্র ইন্দ্রের দাবি অগ্রাহ্য করে ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। ধন্যমাণিক্য ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ মৃত্যুর কিছু পূর্বে চট্টগ্রাম

অধিকার করেছিলেন। কিন্তু এর অল্প কিছুদিন পরেই আরাকান রাজ চট্টগ্রাম ভ্রমণ করেন এবং সেই সময় চট্টগ্রাম আরাকান রাজ-এর অধিকারে ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজমালায় বলা হয়েছে দেবমাণিক্য চট্টগ্রামে থানা বা সেনাশিবির স্থাপন করেছিলেন। এর থেকে অনুমান হয় দেবমাণিক্য আরাকান রাজের কাছ থেকে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম সাক্ষ্য ও পর্তুগিজ বণিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে চট্টগ্রাম দেবমাণিক্যের সমসাময়িক সুলতান নসরৎ শাহের অধীনে ছিল। সুলতান নসরৎ শাহের সঙ্গে দেবমাণিক্যের সংঘর্ষ হয়েছিল তা জানা যায় মুহম্মদ খান রচিত 'মুক্তুল হোসেন' কাব্য থেকে। মুহম্মদ খান-এর মতে তাঁর পুর্বপুরুষ হামজা খান ত্রিপুরার সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন। দেবমাণিক্য ১৪৫০ শক ও ১৪৫২ শকে যে স্মারক মুদ্রা প্রচার করেন তাতে দেবমাণিক্যকে 'সুবর্নগ্রাম বিজয়ী' বলা হয়েছে। এই মুদ্রাগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে দেবমাণিক্য অন্তত সাময়িকভাবে বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের কাছ থেকে সুবর্ণগ্রাম জয় করেছিলেন। নসরৎ শাহ সেই সময়ে মুঘল সম্রাট বাবরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন এবং সেই সুযোগে সম্ভবত দেবমাণিক্য সুবর্ণগ্রাম জয় করেছিলেন। দেবমাণিক্য ভুলুয়া বা নোয়াখালি জয় করে দুরাশার সাগরতীর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন তা তাঁর ১৪৪২ শকের (১৫০২ খ্রিঃ) স্মারক মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয়। ১৪৪২ শকের ভুলুয়া অভিযানের মুদ্রা থেকে অনুমান করা যেতে পারে দেবমাণিক্য ১৫২০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই ত্রিপুরার রাজা হয়েছিলেন।

কথিত আছে দেবমাণিক্য মিথিলা নিবাসী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী লক্ষ্মীনারায়ণের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছিলেন। এই সুযোগে লক্ষ্মীনারায়ণ ক্ষমতালোভী হয়ে দেবমাণিক্যকে হত্যা করেন। দেবমাণিক্যের চিতায় তাঁর প্রধানা মহিষী ও চন্তাইকন্যা আত্মোৎসর্গ করেন। দেবমাণিক্যের নাবালক পুত্র ইন্দ্রের অভিভাবক হিসাবে রাজ্য শাসন করলে সেনানায়করা ক্ষিপ্ত হয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ, দেবমাণিক্যের মহিষী ও পুত্র ইন্দ্রকে হত্যা করে। এই কাহিনি কতটা সত্য বলা কঠিন। কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর রাজমালায় লক্ষ্মীনারায়ণের স্থলে চন্তাই পুরোহিতের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি ইন্দ্রকে ধ্বজমাণিক্যের পুত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইন্দ্রের মাতা দেবমাণিক্যের ধ্বজমাণিক্যের মহিষী ছিলেন। সম্ভবত দেবমাণিক্য ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

ইন্দ্রমাণিক্য (১৫২৭-১৫২৮)

দেবমাণিক্যের পুত্র ইন্দ্র। ইন্দ্রের বৈমাত্রেয় অগ্রজ ছিলেন বিজয়। বিজয়কে লক্ষ্মীপুর গ্রামে গৃহবন্দী করে শিশু বয়সি ইন্দ্রকে সামনে রেখে পশ্চাৎ থেকে প্রশাসন চালাতে থাকেন কুচক্রী লক্ষ্মীনারায়ণ নামক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এবং রাজমাতা। আত্মরক্ষার জন্য মিথিলা থেকে ঐ তান্ত্রিক প্রায় আড়াইশত দেহরক্ষীকে নিয়ে এল এবং দেহরক্ষীদের দ্বারা গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে কুচক্রী লক্ষ্মীনারায়ণ এবং রাজমাতা বিপক্ষকে দমন করতে লাগালেন। অন্যদিকে সেনাবাহিনী ও প্রজাবৃন্দ গোপনে পরামর্শ করে লক্ষ্মীনারায়ণকে ফাঁদে ফেলল। দূত মাধ্যমে মিথ্যা খবর পাঠানো লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট। বলা হল রাজমাতার পেটে তীব্র ব্যথা। তান্ত্রিক লক্ষ্মীনারায়ণ তৎক্ষণাৎ রাজমাতার নিবাসে উপস্থিত হওয়া মাত্র স্থানীয় বিশ্বস্ত কতিপয় সৈনিক তান্ত্রিক লক্ষ্মীনারায়ণকে হত্যা করল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে মৈথিলা সৈনিকদেরও হত্যা করা হল। কতিপয় মৈথিলী সেনা পলায়ন করে বাঁচল। অতঃপর ইন্দ্রমাণিক্যকে ও রাজমাতাকে বধ করা হল। বন্দি বিজয়কে মুক্ত করে সিংহাসনে বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হল।

বিজয়মাণিক্য (১৫২৮-১৫৬৩)

দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ইন্দ্রমাণিক্যের বৈমাত্রেয় অগ্রজ বিজয়মাণিক্য। বিমাতা ও তান্ত্রিকের ষড়যন্ত্রে বিজয় ইতিপূর্বে কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। সৈনিকদের হস্তক্ষেপে ষড়যন্ত্রীরা নিহত হল এবং বিজয় কারামুক্ত হয়ে রাজা হলেন। তাঁর সিংহাসন আরোহণের সময় ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত বিজয়মাণিক্যের সর্বপ্রাচীন ১৪৫৪ শকের মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে বিজয়মাণিক্য ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ বা তার কিছু পূর্বে সম্ভবত ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন। তাঁর পুত্র অনন্তমাণিক্যের মুদ্রা ১৪৮৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ এবং তাঁর সর্বশেষ মুদ্রা ১৪৮৫ শকাব্দ অর্থাৎ(১৫৬৪ খ্রিঃ) পাওয়া গেছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় বিজয়মাণিক্য ত্রিশ বৎসরের অধিক রাজত্ব করেছিলেন।

বিজয়মাণিক্য কেবল দীর্ঘকাল রাজত্বই করেননি, তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ত্রিপুরার স্বাধীনতা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। বিজয়মাণিক্যের বিবাহ হয়েছিল প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের কন্যার সঙ্গে। স্বাভাবিক কারণেই রাজার শ্বশুর এবং একই সঙ্গে রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হওয়ায় দৈত্যনারায়ণ অসীম ক্ষমতার

অধিকারী হন। বিজয়মাণিক্য শ্বশুর দৈত্যনারায়ণের অসীম প্রভাব প্রতিপত্তিতে ক্রমেই অতিষ্ট হয়ে উঠছিলেন। সেনাপতির ঔদ্ধত্য দমনে বিজয়মাণিক্য কৃতসংকল্প হলেন। এদিকে সেনাপতির প্রথম জামাতা হলেন মাধব এবং দ্বিতীয় জামাতা হলেন রাজা বিজয়মাণিক্য স্বয়ং। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে শ্বশুরকে বধ করার পরিকল্পনা করলেন বিজয়মাণিক্য। যিনি প্রধান সেনাপতি তিনিই শ্বশুর। মাধব ও বিজয় হলেন ভায়রা ভাই। শ্বশুর অত্যন্ত স্নেহ ও বিশ্বাস করতেন মাধবকে। বিজয় ও এই মাধবকেই গোপনে নির্দেশ দিলেন প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করতে। পরিকল্পনা মতো মাধব শ্বশুরকে অন্ন-ব্যঞ্জন ও প্রচুর মদ্য পান করতে দিলেন। মাত্রাতিরিক্ত পানাসক্ত শ্বশুর বেঁহুস হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। সেই সুযোগে মাধব ধারালো খড়গ দিয়ে শ্বশুরের মাথা কেটে ফেলে ওই গৃহে অগ্নি সংযোগ করে দিলেন। খবর রটনা হল প্রধান সেনাপতি গৃহদাহে মারা গেছেন। রাজা বিজয় ঘটনাস্থলে এসে খুব কান্নাকাটি করলেন। এদিকে প্রধান সেনাপতির কন্যারা সঠিক তথ্য জেনে ফেললেন। বিজয়মাণিক্যের মহিষী শলা পরামর্শ করে গোপনে মাধবকে হত্যা করালেন এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিলেন। বিজয়মাণিক্য মৃগয়া থেকে ফিরে সমস্ত তথ্য অবগত হয়ে মাধবের খুনীকে বধ করার নির্দেশ দিলেন। প্রধান সেনাপতি শ্বশুরকে রাজ্যের সার্বিক স্বার্থে হত্যা করানো হল।

বিচক্ষণ বিজয়মাণিক্য এইবার রাষ্ট্রীয় কল্যাণকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিলেন। মহারাজের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল সেনাবল বৃদ্ধি করা। তিনি বহু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেন। পদাতিক সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন। পদাতিকদের মধ্যে স্থানীয় ত্রিপুরী, বাঙালি, পাঠান মুসলমান এবং উড়িষ্যার সামন্ত সৈনিক নিযুক্ত করা হল। খড়গধারী সামন্ত সৈনিকগণকে খাড়াইত বা খন্তাইত নামে অভিহিত হত। রাজাকেও রাজবাড়িকে সুরক্ষিত রাখাই ছিল খাড়াইতদের প্রধান কাজ। সেনাবাহিনী সুগঠিত বিজয়মাণিক্য যুদ্ধে বিগ্রহে লিপ্ত হন। অনতিবিলম্বে পার্শ্ববর্তী শ্রীহট্ট রাজ্য আক্রমণ অধিকার করেন। খাসিয়া জয়ন্তীয়া রাজ্যের সঙ্গেও তাঁর যুদ্ধ হয়। খাসিয়া জয়ন্তীয়া রাজ্য পরাজিত হলে হেড়ম্বরাজের মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এক সময়ে বিজয়মাণিক্যের আফগান অশ্বারোহী সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে উজির নারায়ণকে হত্যা করে। বিজয়মাণিক্য কঠোর হস্তে তাদের বন্দি করে চৌদ্দ দেবতার মন্দিরে বলি প্রদান করেন।

এর পরের ঘটনা,বিজয়মাণিক্যের সঙ্গে বাংলার সুলতানের তুমুল সংঘর্ষ

হয়। প্রথম পর্যায়ে বিজয়মাণিক্য পরাজিত হলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে বিজয়ী আফগান সেনাপতি মমারক খান বিজয়মাণিক্যের হাতে বন্দি হলে চন্তাই বা পুরোহিতের সুলতান পরামর্শক্রমে তাকে চৌদ্দ দেবতার মন্দিরে বলি দেওয়া হয়। বাংলার সেই সময় দিল্লির মুঘলদের আক্রমণ আশঙ্কা করে বিজয়মাণিক্যের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন। রাজমালায় বিজয়মাণিক্যের প্রতিপক্ষ বাংলার সুলতান দায়ুদ কররানীকে বলা হয়েছে এবং আফগান সেনাপতি সমারক খানকে দায়ুদ কররানীর (১৫৭৪-১৫৭৬)শ্যালক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মুদ্রানি সাহায্য অনুসারে দায়ুদ কররানী বিজয় মাণিক্যের (১৫৩২-১৫৬৩) সমসাময়িক হতে পারেন না। কররানী বংশীয় সুলতানদের পূর্ববর্তী কোনও সুলতান বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন।

অন্যদিকে মুঘল আফগান সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে বিজয়মাণিক্য সোনার গাঁও অভিযান করেন এবং সোনারগাঁও থেকে প্রচুর সম্পদ লুন্ঠন করেন। বিজয়মাণিক্যের সেনাবাহিনী পদ্মা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল।

রেভারেন্ড জেমস লং এর বিবরণ থেকে জানা যায় বিজয়মাণিক্য ২৬ হাজার পদাতিক, ৫হাজার অশ্বারোহী ও বহু গোলন্দাজ নিয়ে ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, ও লক্ষ্যা নদী দিয়ে সোনারগাঁও বিক্রমপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, বিজয়মাণিক্যের বিজয় অভিযানের কাহিনি সম্পর্কিত তিন প্রকার স্মারক মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথমটি, সুবর্ণগ্রাম জয়ের পর ব্রহ্মপুত্র তীরে ধ্বজ ঘাট স্নানের। দ্বিতীয়টি, ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী লক্ষ্যাস্নানের এবং তৃতীয়টি, পদ্মাবতী স্নানের স্মরণে মুদ্রিত হয়। এই মুদ্রাগুলির সময়কাল থেকে মনে হয় যে বিজয়মাণিক্যের অভিযানগুলি রাজত্বের শেষ দিকে সংগঠিত হয় এবং অভিযানগুলিতে তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন।

বিজয়মাণিক্য তিনটি অভিযান তথা দিগ্বিজয় সমাপ্ত করে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও ধর্মে কর্মে মন দিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুবর্ণগ্রাম অর্থাৎ ঢাকা জনপদের নিকটবর্তী এবং ব্রহ্মপুত্র নদী তীরবর্তী তীর্থক্ষেত্র ধ্বজঘাট থেকে বণিক, কাসারী ইত্যাদি কলা কুশলীদের ত্রিপুরায় বসতির ব্যবস্থা করে ধ্বজনগরে বসতি দান করেন। ধ্বজঘাটের অনুকরণে নাম রাখা হল ধ্বজনগর। ধ্বজনগরের অবস্থান রাঙামাটির উত্তরে। শ্রীহট্টে জিনারপুর গ্রামে খাল কাটান এবং শ্রীহট্টে রাস্তা নির্মাণ করেন। রাঙামাটির উত্তর পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বড়ই আঁকাবাঁকা ছিল। রাজা এর গতিপথ সোজা করে দিলেন এর নাম হল বিজয় নদী।

বিজয়মাণিক্য মুঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে যে "ভাটি সংলগ্ন এক বিস্তীর্ণ ভূভাগে তিপ্রা উপজাতি বাস করে। তাদের রাজার নাম বিজয়মাণিক্য। রাজারা মাণিক্য ও সর্দাররা নারায়ণ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর দুই লক্ষ পদাতিক ও এক সহস্র হস্তী আছে। অবশ্য অশ্বের সংখ্যা নগণ্য। বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে খাসিয়া জয়ন্তিয়া রাজার প্ররোচনায় কিছু হালাম প্রজা বিদ্রোহ করলে বিজয়মাণিক্য শান্তিপূর্ণভাবে এই বিদ্রোহ প্রশমিত করেন এবং হালাম সর্দারকে উপহার প্রদানপূর্বক বশীভূত করেন।

বিজয়মাণিক্যের আমলে যে সব মুদ্রা পাওয়া গেছে সেগুলি নানাভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৪৫৪ থেকে ১৪৮৫ শকাব্দের মধ্যে মুদ্রিত এই মুদ্রাগুলিতে চারজন মহিষীর নাম পাওয়া যায়। চার প্রকার মুদ্রায় তাকে 'কুমদীশদর্শী', 'প্রতিসিন্ধুসীম', 'ত্রিপুর মহেশ' ও 'বিশ্বেশ্বর' বলা হয়েছে।এগুলির লেখনে যথাক্রমে বিজয়া,লক্ষ্মী, সরস্বতী ও বাকদেবীর নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে রাজমালায় শুধুমাত্র লক্ষ্মীর নাম প্রত্যক্ষভাবে এবং দ্বিতীয় এক রানির কথাপরোক্ষভাবে পাওয়া যায়। বিজয়মাণিক্যের লক্ষ্যাস্নানের স্মারক মুদ্রাগুলিতে শিব ও দুর্গার অংশে কল্পিত অনন্যপূর্ব অর্ধনারীশ্বর মূর্তি এবং পদ্মাবতী স্নানের স্মারক মুদ্রার মুখ্য দিকে শিবলিঙ্গ ও গৌণদিকে সিংহাসনে স্থাপিত গরুড়বাহিত বিষ্ণুমূর্তি অংকিত দেখা যায়।এর থেকে তিনি শিব, দুর্গা ও বিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল তা বোঝা যায়।

উত্তরাধিকারের চিন্তা বিজয়মাণিক্যকে বিব্রত অবস্থায় ফেলেছিল। রাজার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ডাঞ্জার ফা এবং কনিষ্ঠ অনন্ত। জ্যেষ্ঠ ডাঞ্জার ফা শারীরিক দিক থেকে দুর্বল থাকায় শাসনের উপযুক্ত নয় বিবেচনা করে তাঁকে উড়িষ্যার রাজা মুকন্দদেবের দরবারে প্রেরণ করা হল এবং কনিষ্ঠ অনন্তকে ত্রিপুরার সিংহাসনে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হল। বিজয়মাণিক্যের বাংলার সুলতানদের অপেক্ষা উড়িষ্যার রাজা মুকন্দদেবের সঙ্গে অধিকতর মিত্রতা তাঁর কুটনীতি জ্ঞানের পরিচয় দেয়। অপরদিকে কনিষ্ঠ পুত্র অনন্তকে পরবর্তী রাজা করার উদ্দেশ্যে সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যার সহিত অনন্তের বিবাহ দিলেন। সেনাপতি গোপীপ্রসাদ বিশ্বস্ততার আশ্বাস দিলেন। বিবাহ অনুষ্ঠানের কিছুদিন পরেই রাজা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে মারা গেলেন। রাঙামাটিতে বৈকুণ্ঠপুরে রাজার স্মৃতিতে মঠ নির্মাণ করা হল।

অনন্তমাণিক্য (১৫৬৪-১৫৬৫)

বিজয়মাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র অনন্তমাণিক্য ১৫৬৪ সালে ত্রিপুরার রাজা হন।

১৪৮৬ শকাব্দ বা ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের অনন্তমাণিক্যের মুদ্রা পাওয়া গেছে। অনন্তমাণিক্য উপযুক্ত রাজা ছিলেন না। তিনি তাঁর শ্বশুর ও সেনাপতি গোপীপ্রসাদ নারায়ণের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন। গোপীপ্রসাদ অনন্তমাণিক্যকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করেন। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে অনন্তমাণিক্যের সর্বশেষ মুদ্রা পাওয়া যায়। তিনি মাত্র দেড় বৎসর রাজত্ব করেন।

উদয়মাণিক্য (১৫৬৬-১৫৭২)

অনন্তমাণিক্যের মৃত্যুর পর গোপীপ্রসাদ অভিষিক্ত হয়ে ত্রিপুরা সিংহাসনে বসেন এবং উদয়মাণিক্য নাম ধারণ করেন। ১৪৮৯ শকে তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। তিনি চন্দ্রপুরে চন্দ্রসাগর নামে এক দিঘি খনন করেন। ত্রিপুরার রাজধানী রাঙ্গামাটি তাঁর নাম অনুসারে উদয়পুর নামে পরিচিত হয়। উদয়মাণিক্য বহু জলাশয় খনন এবং প্রসাদাদি নির্মাণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে বাংলার সুলতান সুলেমান কররানি ত্রিপুরার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। মুদ্রার সাক্ষ্য অনুসারে তিনি পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন।

জয়মাণিক্য (১৫৭৩-১৫৭৬)

উদয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর পুত্র জয়মাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হন। ১৪১৫ শকে (১৫৭৩) তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি সেনাপতি রনাগণ নারায়ণের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন। দেবমাণিক্যের পুত্র ও বিজয়মাণিক্যের এক ভ্রাতা অমরমাণিক্য জয়মাণিক্য ও রনাগণ নারায়ণকে হত্যা করে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইভাবে ত্রিপুরার পুরাতন রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। রাজমালার মতে জয়মাণিক্যের রাজত্বকাল ছিল এক বৎসর। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্যে দেখা যায় জয়মাণিক্য তিন বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

অমরমাণিক্য (১৫৭৭-৮৫)

ধন্যমাণিক্যের পৌত্র, দেবমাণিক্যের পুত্র এবং বিজয়মাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভাই হলেন অমরমাণিক্য। অমরমাণিক্য ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন এবং ওই বৎসই নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। মুদ্রায় তিনি দিগ্বিজয়ী এই পদমর্যাদা ব্যবহার করেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরপের জমিদার তাঁর কর্তৃত্ব অস্বীকার করলে তিনি তাকে দমন করার জন্য রাজপুত্র রাজধরকে প্রেরণ করেন। তরপের জমিদার শ্রীহট্টের শাসক ফতে খানের আশ্রয় নিলে ত্রিপুরার সৈন্যের সঙ্গে ফতে খানের তুমুল যুদ্ধ হয়। রাজধরের হাতে ফতে খান পরাজিত হলে শ্রীহট্ট ত্রিপুরার অধীন

হয়। ফতে খান বার্ষিক কর দানে স্বীকৃত হলে তাঁকে শ্রীহট্ট ফেরত দেওয়া হয়। ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দের মুদ্রায় অমরমাণিক্য নিজেকে 'শ্রীহট্ট বিজয়ী' বলে ঘোষণা করেন। কথিত আছে অমরমাণিক্য বাকলা চন্দ্রদ্বীপে অভিযান করে সেখান থেকে প্রচুর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং বহু লোককে দাসরূপে বন্দি করে আনেন। ভাটির শাসনকর্তা ঈশা খাঁর সঙ্গে তার মিত্রতা ছিল। সম্ভবত মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধের ত্রিপুররাজের সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে ঈশা খাঁ ত্রিপুরার সাহায্য পেয়েছিলেন। রাজমালা সূত্রে জানা যায় ত্রিপুরার রাজা ঈশা খাঁকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দেন। শ্রীহট্টের আফগান শাসক ফতে খানের সঙ্গে সদয় ব্যবহার এবং ঈশা খাঁর সঙ্গে মিত্রতা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে তিনি সম্ভাব্য মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে আফগানদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন।

মহারাজ অমরমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেই ত্রিপুরার ইতিহাস সংরক্ষণে মনোযোগী হলেন। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তিনি 'রাজমালা' নামক ত্রিপুরার ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ডে ১ থেকে ১৪৪ জন নৃপতির কাহিনি খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতকেই সংকলিত হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে ১৪৫ থেকে ১৫৪ পর্যন্ত ১০ জন নৃপতির কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়।

অমরমাণিক্য ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এক বিশাল দিঘি খনন করেন। দিঘির দৈর্ঘ্য ১২২৮ গজ এবং প্রস্থ ছিল ৩০২ গজ। এর অভ্যন্তরে বারো দ্রোণ এক কানি ভূমি পতিত। এই সুবিশাল জলাশয় খননকার্য তৎকালে রাজসূয় যজ্ঞ সদৃশ আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা রূপে খ্যাত। এই দিঘির নামকরণ হয় ' অমর সাগর'। অমর সাগর খননের ইতিহাসের অন্তরালে বহু কান্না, বহু হাহাকার এবং বহু ধ্বংসলীলা বিদ্যমান। উদয়পুর থেকে দক্ষিণবর্তী, পশ্চিমবর্তী ও উত্তরবর্তী জমিদার ও তালুকদারগণ বাধ্য হয়েছিলেন খননকারী পাঠাতে। খননকারীরা নানা নামে অভিহিত হতেন যেমন কোদালী, কুলি, দাঁড়ি, মুছি, মাটিয়াল মাট্যাল ইত্যাদি।

অমরমাণিক্যের রাজত্বের শেষপর্ব নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। অমরমাণিক্য চট্টগ্রাম জয় করে আরাকান রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রথম দিকে অমরমাণিক্য জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত পর্তুগিজদের সহায়তায় আরাকানরাজ অমর মাণিক্যকে পরাজিত করেন। যুদ্ধে অমরমাণিক্যের পুত্র যুঝার সিংহ নিহত হন। কথিত আছে আরাকান রাজ সিকন্দর শাহ(মেংফলুং) অমরমাণিক্যের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে তাদের মধ্যে আত্মকলহের সৃষ্টি করেন। ফলে ত্রিপুরার সেনাদল দুর্বল হয়ে যায়। এই সুযোগে আরাকান রাজ

১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুর অধিকার করেন। আরাকানি বা মগরা উদয়পুরে অবাধ লুণ্ঠন ও হত্যালীলা চালিয়ে আরাকানে প্রস্থান করে। ইতিমধ্যে অমরমাণিক্য আত্মরক্ষার্থে মনু নদীতীরস্থ তেতৈয়া স্থানে পলায়ন করেন। কিন্তু সেখানেও শান্তিতে থাকতে পারেন নি। অমরমাণিক্যের এক শ্যালক ছত্র নাজির কুকিদের সাহায্য নিয়ে বিদ্রোহ করেন। অমরমাণিক্য এই বিদ্রোহ দমন করতে বার বার কুকি আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরিশেষে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। রাজধরমাণিক্যের ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের প্রাথমিক মুদ্রা অনুসারে বলা যেতে পারে অমরমাণিক্য ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে রালফ ফিচ নামক এক ইউরোপীয় পর্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। রালফ ফিচ সাতগাঁও থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ত্রিপুরেশ্বর মগদের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে দেখেছিলেন। রাক্ষিয়াং এবং রামুরাজ্যের মগেরা ত্রিপুরেশ্বরের থেকে অধিক শক্তিশালী হওয়ায় চট্টগ্রাম বা পোটগ্রোণ্ডা বার বার রাক্ষিয়াং রাজার হাতে চলে যাচ্ছিল। অন্যদিকে কৈলাস চন্দ্র সিংহ ও রাজমালায় রালফ্ ফিচকে বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রালফ্ ফিচের ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দের প্রতিবেদন থেকে মনে হয় তিনি অমরমাণিক্যের রাজত্বকালেই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন।

রাজধরমাণিক্য (১৫৮৬-১৫৯৯)

অমরমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজদুর্লভ নারায়ণ পিতার জীবিত কালেই মারা গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র রাজধরমাণিক্য পিতার মৃত্যুর পর ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন এবং সেই বৎসর নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। চতুর্থ পুত্র যুঝার সিংহ মঘ কর্তৃক চট্টগ্রামে নিহত হন। তৃতীয় পুত্র অমরদুর্লভ পিতা মাতার মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। রাজধরমাণিক্য পেলেন রাজ্য আর অমরদুর্লভ পেলেন বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ।

রাজধরমাণিক্যের আমলে আরাকান রাজ আরাকানে প্রস্থান করায় রাজধরমাণিক্য পুনরায় উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজ্যাভিষেকের পূর্বে রাজধর ভুলুয়া, তরপ, শ্রীহট্ট, সরাইল এবং রসাঙ্গের রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিলেন। শ্রীহট্টে জলাশয় খনন, সরাইলে গ্রাম স্থাপন, নিবাস নির্মাণ প্রভৃতি কাজ করেছিলেন। উদয়পুরে প্রত্যাবর্তন করে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। চূর্ণ-বিচূর্ণ প্রশাসনকে আবার নতুন করে সাজালেন। এই সময় ১৫০৮ শকাব্দে তিনি প্রথম রৌপ্য জমিয়ে রাজকোষে লাভের প্রমাণ রেখে যান।

মহারাজ রাজধর ছিলেন দয়ালু করুণাময়। বৈষ্ণব ধার্মিক, ভক্তপ্রবর, দানবীর এবং অহিংসার প্রতিমূর্তি। ষড়রিপু বিবর্জিত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব মহারাজ। তিনি

মহাভারত, ভাগবত গ্রন্থ নিত্য শ্রবণ করতেন। দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর রাজভবনে শ্রীশ্রী হরিনাম কীর্তন হত।

ত্রিপুরার রাজার মানসিক পরিবর্তনের কথা, দেবদ্বিজে ভক্তি বিশ্বারে প্রাবল্য এবং প্রশাসনিক দায়িত্বের প্রতি উদাসীনতার কথা গুপ্তচরের মাধ্যমে শ্রবণ করে বঙ্গদেশ নিযুক্ত মুঘল শাসক ভাবল এই সময়ই ত্রিপুরা আক্রমণের উপযুক্ত সময়। মুঘল শাসক ত্রিপুরার বিরুদ্ধে আক্রমণের কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়াই এক মুঘল বাহিনী প্রেরণ করে। মুগল বাহিনীর গতিরোধ করার জন্য মন্ত্রীবর্গ এবং সেনাপতিবর্গের ব্যবস্থা অনুসারে সেনাপতি চন্দ্রদর্প নারায়ণের নেতৃত্বে ত্রিপুরার সেনাদল কৈলাগড় দুর্গে প্রেরিত হল। কৈলাগড়ে উভয়পক্ষে স্বল্প কাল যুদ্ধের পর মুঘল বাহিনী পশ্চাদ অপসরণ করল। বিজয় গৌরবে ত্রিপুরার সেনাবাহিনী রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করল। উল্লেখ্য সমসাময়িক অন্য কোথাও এ ধরণের ঘটনার কথা জানা যায় না। কৈলাসচন্দ্র সিংহ অবশ্য বলেছেন যে রাজধরমাণিক্যের মন্ত্রী ও সৈন্যদের তৎপরতায় মুঘলরা পরাজিত হয়েছিল। তাঁর এ কথাও সত্য রাজধরমাণিক্যের আমলে মুঘল সেনাপতি মান সিংহ ঈশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করলেন। ত্রিপুরা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। যদিও মান সিংহ আর ত্রিপুরা আক্রমণ করেননি। কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে রাজধরমাণিক্য তিন বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু রাজধরমাণিক্যের ১৫০৮ সালে মুদ্রা এবং ঈশ্বরমাণিক্য যশোধর মাণিক্যের ১৫২২ সালের মুদ্রা থেকে অনুমতি হয় যে রাজধরমাণিক্য বারো বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করেছিলেন।

রাজধরমাণিক্যের মৃত্যুর পর ঈশ্বরমাণিক্য নামে এক রাজা ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। রাজমালা তালিকায় ঈশ্বরমাণিক্যের নাম দেওয়া নেই। কিন্তু ১৫২২ শকের (১৬০০) ঈশ্বর মাণিক্যের মুদ্রা পাওয়া যাওয়ায় ঈশ্বরমাণিক্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে রাজধরমাণিক্যের মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকার নিয়ে রাজপরিবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল এবং রাজধরমাণিক্যের ভ্রাতা অমরদুর্লভ কিছুদিনের জন্য সিংহাসন অধিকার করে নিজ নামে ১৫২২ শকের মুদ্রা প্রচার করেন। তাঁর সম্পর্কে আর কিছু তথ্য পাওয়া যায় নি।

চতুর্থ অধ্যায়

যশোধরমাণিক্য (১৬০০-১৬২৩)

সমতল ত্রিপুরায় মুঘল আধিপত্য বিস্তার

রাজধরমাণিক্যের পুত্র যশোধরমাণিক্য ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫২২ শকের মুদ্রায় বংশীবাদক কৃষ্ণের মূর্তি দেখে মনে হয় যশোধরমাণিক্যও পিতার মতো বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন। রাজমালায় বলা হয়েছে যশোধরমাণিক্য ভুলুয়া আক্রমণ ও জয় করেন।

যশোধরমাণিক্যের রাজত্বকালে বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খান ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। কথিত আছে মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর আরাকান রাজকে পরাস্ত করার জন্য ইব্রাহিম খানকে আদেশ দেন। সম্ভবত আরাকান অভিযানের সুবিধার জন্যেই সামরিক কৌশল হিসাবে ইব্রাহিম প্রথমে ত্রিপুরা জয়ের পরিকল্পনা নেন। রাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ত্রিপুরার রাজা মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরকে কর হিসাবে হস্তী প্রদানে অস্বীকার করার কারণেই মুঘলরা ত্রিপুরা আক্রমণ করে। ইতিহাসবেত্তা নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে এই আক্রমণ ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল। স্যার যদুনাথ সরকার বহরোস্তান-ই-ঘায়েবিতে আক্রমণের তারিখ দেওয়া না থাকলেও বহরোস্তান-ই ঘায়েবিতে দেওয়া পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির সময়কাল থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এই আক্রমণ ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল। রাজমালাতে এই আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে।

উল্লেখ্য, মুঘল সেনাধ্যক্ষ মীর্জান খান এই সময় বাংলাদেশে বেশ কিছু মুঘল অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্মৃতি কথা বহরোস্তান-ই-নায়েবির বিবরণ অনুযায়ী বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ফতে জং ত্রিপুরা আক্রমণের জন্য বিপুল আয়োজন করেন। যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল এইরকম: রাজধানী উদয়পুর আক্রমণের

জন্য মুঘল স্থলবাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত করা হল। একটি বাহিনী মীর্জা ইসফানদিয়ার নেতৃত্বে ও মুসা খানের সহযোগিতা কৈলাগড় বা কসবা পথে, অপর বাহিনী মির্জা নুরুদ্দিনের নেতৃত্বে মেহেরকুল বা কুমিল্লার পথে যাত্রা করল। অপরদিকে নৌ সেনাপতি বাহাদুর খান তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে কুমিল্লা হয়ে গোমতী নদী দিয়ে উভয় বাহিনীর সঙ্গো সংযোগ রক্ষা করে উদয়পুরের দিকে যাত্রা করল। উপরোক্ত কৌশল করে যখন দুই স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী কৈলাগড়ে উপস্থিত হল তখন ত্রিপুরার রাজা তাদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নৈশ আক্রমণের পরিকল্পনা নিলেন। ত্রিপুরেশ্বর এক সহস্র অশ্বারোহী, ষাট হাজার পদাতিক এবং দুইশত হস্তী নিয়ে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে মির্জা ইসফানদিয়ার কৈলাগড় অতিক্রম করে উদয়পুরের সীমানায় এসে পৌঁছলেন। ত্রিপুরার রাজা মধ্যরাতে তাকে আক্রমণ করলেন। তুমুল যুদ্ধ চলল উভয় পক্ষের মধ্যে। যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু হতাহত হল। কিন্তু সম্রাটের সৈন্যরাই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করল। ত্রিপুরার রাজা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করেন। অন্যদিকে এ যুদ্ধে মুঘল সেনাদের একটি বিরাট রকমের জয় হল। উদয়পুর যাত্রাপথেও রাজার সঙ্গো মীর্জা নুরুদ্দিন ও মুসা খানের দ্বিতীয় দলটির যুদ্ধ হল। এখানেও ত্রিপুরার রাজা পরাজিত হয়ে দ্রুত উদয়পুরে যাত্রা করেন।

ত্রিপুরার সৈন্যদের এই পরাজয়ের কারণ হিসাবে স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন যে যদিও ত্রিপুরার সেনাবাহিনী সংখ্যায় বেশি ছিল, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও সংগঠরে কলাকৌশলের দিক থেকে মুঘলদের চাইতে দুর্বল ছিল। মুঘলদের দক্ষ বন্দুকধারী ও গোলন্দাজ বাহিনী সহজেই ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। বহরোস্তান-ই-ঘায়েবির বিবরণে বলা হয়েছে ''রাজা উদয়পুরে পৌছামাত্র মুঘল নৌবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য নদীপথে এক নৌবহর এবং স্থলবাহিনী পাঠানো হল এবং মুঘল নৌবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার জন্য নদীর উপর সেতু নদীর দুইদিকে দুর্গ নির্মাণের আদেশ দেওয়া হল। আদেশ অনুযায়ী সর্দাররা কাজ করলেন। কিন্তু সবই বৃথা হল। ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনী মুঘল সেনা বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করতে পারল না। মুঘল বাহিনী রাজধানী উদয়পুর অধিকার করে রাজার পশ্চাদ্ধাবন করল। রাজা পলায়নের সময় দুর্ভাগ্যবশত নিজ সৈন্য দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। পশ্চাদ্ধাবনকারী মুঘল সৈন্যদের প্রতারিত

করার জন্য রাজা হস্তীগুলি পরিত্যাগ করে গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিলেন। মুঘল সেনারাও পদব্রজে পাহাড়ে প্রবেশ করে। প্রথমে মির্জা নুরুদ্দীন-এর ভৃত্য রাজা দেখতে পেয়ে পরস্পর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হল। দুজনেই যখন আহত এবং ভৃত্যটি যখন রাজাকে বন্দি করার চেষ্টা করছিল সেই সময় মীর্জা ইসফানদিয়ারের সেনা সেখানে বাংলার সুবাদার সুজা ত্রিপুরা আক্রমণ করলে কল্যাণমাণিক্য সে আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে পিটার হেলস নামে এক ইউরোপীয় পর্যটক ভারত ভ্রমণে এসে লিখেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গো বদ প্রতিবেশী মুঘলদের অনবরত যুদ্ধ চলত। ত্রিপুরা পাহাড় পর্বতময় বলে মুঘলদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম ছিল। আজাদ অল হুসাইনির 'নৌবহর-ই-মুরসিদ কুলিখানী' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে সুজার প্রধানমন্ত্রী জানবেগ খান সুজার নির্দেশ অনুযায়ী ত্রিপুরা অভিযান করেন। খানের লোকেরা এক বৎসর ধরে বহু চেষ্টা করেও এই রাজ্যের একটি দুর্গও অধিকার করতে সমর্থ হয়নি। কেবলমাত্র মীর্জাপুরের কয়েকটি জেলা অধিকার করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল এবং এটাই মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা হিসাবে নির্দিষ্ট হল। প্রতিকূল জলবায়ুতে বহু মুঘল সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

কল্যাণমাণিক্যের রাজত্বকালে বানডিন ব্রোকে নামে এক ওলন্দাজ গভর্নর এক প্রতিবেদনে জানান : ''ত্রিপুরা এবং উদয়পুর রাজ্য স্বাধীন, কিন্তু কোন সময় মুঘল সম্রাট কখনও বা আরাকান রাজ ইহা অধিকার করেছেন''। সুজার শাসনকালে ১৫৮০ শকাব্দে (১৬৫৮) সুবে বাংলার যে সংশোধিত রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করা হয়েছিল তাতে উদয়পুর রাজস্ব প্রদানকারী অঞ্চল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ধারণা করা যেতে পারে রাজত্বের শেষ দিকে কল্যাণমাণিক্য সুজার নিকট পরাজিত হয়ে কিছুটা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কল্যাণমাণিক্য যখন ত্রিপুরার রাজা ঐ সময়ে ওই দিল্লির বাদশাহ ছিলেন শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮)শাহজাহান-এর নির্দেশে বাংলার প্রাদেশিক শাসককে ঘন ঘন বদলানো হত। অবশ্য শাহজাদা মোহম্মদ সুজা পর পর দুবার বাংলার সুবেদার পদে নিযুক্ত হলেন।প্রথমবার আট বৎসর(১৬৩৯-১৬৪৬)।তখনই পিতার নির্দেশে ত্রিপুরার বন্য হস্তীর লোভে সুজা ত্রিপুরা আক্রমণ করেছিলেন। কৈলাগড়ে উভয় পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ত্রিপুরা পক্ষের সেনাধ্যক্ষ রাজকুমার গোবিন্দদেব পিতার কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসাতে পুত্রকে ভর্ৎসনা করেন কল্যাণমাণিক্য।

লজ্জিত হয়ে গোবিন্দমাণিক্য দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধে যোগদান করেন এবং মুঘল বাহিনীকে পরাভূত করেন। ত্রিপুরা বাহিনী বিজয় গৌরবে উদয়পুরে প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধাবাসানে কল্যাণমাণিক্য উৎফুল্ল চিত্তে রাজসভা আহ্বান করে গোবিন্দদেবকে যুবরাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এই প্রস্তাবে সকলেই আনন্দিত হন। মহারাজ গোবিন্দদেব যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। ঢাকা থেকে পুনরায় মুঘল বাহিনী ত্রিপুরাকে আক্রমণ করতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি দূরে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই উপনিবেশ উদয়পুর থেকে উত্তর পূর্বে খোয়াই এলাকাতে অবস্থিত। অঞ্চলটি এখন কল্যাণপুর নামে খ্যাত।

মুঘল আক্রমণের পর এবং গোবিন্দদেবকে যুবরাজ করার পর কোনও বড় ধরনের সংকট তাঁর রাজত্বে দেখা দেয় নাই। কল্যাণমাণিক্যই ত্রিপুরার প্রথম রাজা যিনি বাংলা ভাষার তাম্রশাসন প্রচলন করেছিলেন। তিনি কসবা অঞ্চলে একটি বৃহৎ দিঘি খনন করেন যা কল্যাণসাগর নামে পরিচিত। তিনি কসবায় একটি মন্দির নির্মাণ করে কৃষ্ণ প্রস্তরে সিংহবাহিনী মহিষাসুর-মর্দিনী দশভূজা ভগবতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কল্যাণমাণিক্যের মুদ্রায় রানি কলাবতীর নাম পাওয়া যায়।১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে আশি বৎসর বয়সে কল্যাণমাণিক্যের মৃত্যু হয়। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ঘোষিত এক তাম্রশাসনে সর্বপ্রথম ত্রিপুরাব্দ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়।

গোবিন্দমাণিক্য (১৬৬০-১৬৬১)

কল্যাণমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ ঠাকুর। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহণের পর ওই বৎসরেই গোবিন্দমাণিক্য নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। যুবরাজ থাকাকালীন সময়ে গোবিন্দমাণিক্য মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা তখন বাঙলার শাসনকর্তা ছিলেন (১৬৩৯-১৬৬০)। সুজা বহু সংখ্যক হাতি দাবি করলে ত্রিপুরা সেই দাবি পূরণে অক্ষমতা প্রকাশ করে। সেই অজুহাতে সুজা ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। ত্রিপুরা বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন গোবিন্দদেব। যুদ্ধে উভয়পক্ষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির পর রণক্লান্ত উভয়পক্ষ একটি সমঝোতায় এল। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে যশোধরমাণিক্যের সময় মুঘলরা সমতল ত্রিপুরা দখল করেছিল। সেই বংশের উপর ১৬৪১ খিঃ এর যুদ্ধের পরও দখল অব্যাহত রাখতে সমর্থ হল মুঘল শক্তি। অবশ্য পূর্বের দাবির তুলনায়

কিছু কম সংখ্যক হাতি নিয়মিত প্রতি বৎসর তারা দিতে বাধ্য করল ত্রিপুরাকে। উপরন্তু চুক্তি পালনের নিশ্চয়তা স্বরূপ ত্রিপুরার একজন প্রতিভূ মুঘল দরবারে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজকুমার নক্ষত্র রায় ঠাকুর প্রথম প্রতিভূ প্রেরিত হয়েছিলেন।

গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করার সময় থেকেই তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন। উল্লেখ্য, কল্যাণমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের পূর্বেই গোবিন্দমাণিক্যের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু কল্যাণমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের পর নক্ষত্র রায়ের মাতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। নক্ষত্র রায়ের জন্ম কল্যাণমাণিক্যের সিংহাসন আরোহণ করার পর হয়েছিল বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দমাণিক্যের চাইতে সিংহাসনের উপর তাঁর দাবি অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে নক্ষত্র রায় মনে করেছিলেন। সুতরাং তিনি গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্ব অস্বীকার করে ছত্রমাণিক্য নাম নিয়ে ১৬৬০খ্রিস্টাব্দে নিজ নামে মুদ্রা তৈরি করে প্রচলন করেন। কল্যাণমাণিক্যের রাজত্বের শেষ দিকে ঢাকায় মুঘল দরবারে রাজপ্রতিভূ হিসাবে অবস্থান করায় মুঘলদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়।

অপরদিকে গোবিন্দমাণিক্য মন্দিরে বলি প্রথা বন্ধ করায় প্রধান পুরোহিত বা চন্তাই ও আরও অনেকেরই বিরাগ ভাজন হন। ছত্রমাণিক্য এই সুযোগে গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করে ত্রিপুরার রাজা হন। ১৬৬১খ্রিস্টাব্দে ছত্রমাণিক্য পুনরায় নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। কথিত আছে যে গোবিন্দমাণিক্য ভ্রাতৃযুদ্ধে রক্তক্ষয় করতে রাজি ছিলেন না। তিনি বিনা যুদ্ধে ছত্রমাণিক্যকে ত্রিপুরার সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু নক্ষত্র রায় বা ছত্রমাণিক্যের বংশধরদের কাছে যে রাজমালা রক্ষিত আছে তা থেকে জানা যায় যে গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে ছত্রমাণিক্যের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ছত্রমাণিক্য ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে উদয়পুর অধিকার করতে পারেননি। কারণ ওই বৎসর গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁর ভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুর উদয়পুরে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ-এর মতে কুমিল্লার নিকটবর্তী আমতলি গ্রামে গোবিন্দমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদেব ঠাকুরের সঙ্গে ছত্রমাণিক্যের তুমুল সংঘর্ষ হয়। এই সংগ্রামে রামদেব ঠাকুর পরাজিত হন।

ছত্রমাণিক্য ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করার পর স্বাধীনভাবে

যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে রাজ্য পরিচালনা করেন। তিনি গোমতী নদীর তীরে এক প্রাসাদ নির্মাণ করেন। রাজমালার সূত্রে জানা যায় যে ছত্রমাণিক্য 'ছত্রসাগর' নামে এক বৃহৎ দিঘি খনন করিয়েছিলেন। কুমিল্লার নিকটবর্তী 'ছত্রের খিল' ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত 'ছত্রপুর', ইত্যাদি তাঁর রাজত্বকালের সাক্ষ্য বহন করছে। মণিপুরের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ছত্রমাণিক্য ১৬৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মণিপুরের দরবারে একজন কন্যা ও এক হস্তী সহ দূত প্রেরণ করেছিলেন।

টেভার্নিয়ার নামে জনৈক ইউরোপীয় পর্যটক ছত্রমাণিক্যের রাজত্বকালে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্বসীমায় আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকান রাজ্য। টেভার্নিয়ারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে ত্রিপুরায় সে সময় একটি স্বর্ণখনি ও রেশমের কারখানা ছিল। এই স্বর্ণ ও তসর বাণিজ্যের কারণে বিদেশে প্রেরিত হত। তবে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উৎপাদিত স্বর্ণ ও রেশম ততটা বিশুদ্ধ ছিল না।

ছত্রমাণিক্য দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হয়ে গোবিন্দমাণিক্য প্রথমে রিয়াংদের আশ্রয়ে বাস করেন। পরে চট্টগ্রামের পূর্বদিকের এক পার্বত্য প্রদেশে বসবাস করেন। ইতিমধ্যে দিল্লির বাদশাহ ঔরংজেবের কাছে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে বাংলার শাসনকর্তা সুজা সপরিবারে বাংলাদেশ থেকে পলায়ন করে পার্বত্য ত্রিপুরার মধ্য দিয়ে আরাকানে আশ্রয় নেন। জনশ্রুতি এইরূপ ঃ এই সময় সম্ভবত সুজার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের সাক্ষাৎ ঘটে এবং মিত্রতা স্থাপিত হয়। রাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে যে সুজার কাছ থেকে গোবিন্দমাণিক্য বহুমূল্য রত্নখচিত নিমচা তরবারি ও হীরকাঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সুজার নাম স্মরণীয় করার জন্য গোবিন্দমাণিক্য দ্বিতীয়বার সিংহাসনে(১৬৬৭-১৬৭৩) আরোহণ করার পর নিমচা তরবারি ও হীরকাঙ্গুরীয় বিক্রি করে সেই অর্থ দ্বারা কুমিল্লার সুজা মসজিদ নির্মাণ ও মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য কয়েকটি গ্রাম দান করেন যা সুজানগর নামে পরিচিত হয়। সুজানগর নিয়ে আর একটি বিপরীত মত হল কল্যাণমাণিক্যকে পরাজিত করে সুজা নিজেই এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।

গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসনচ্যুত হবার পূর্বেই বাংলার শাসনকর্তা সুজা ঔরংজেবের কাছে পরাজিত হয়ে ত্রিপুরা হয়ে আরাকান পলায়ন করেছিলেন। সুজা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করেছেন শুনে মুঘল সম্রাট ঔরংজেব গোবিন্দমাণিক্যকে

সুজার প্রত্যার্পণ দাবি করে একটি পত্র লিখেছিলেন। আগরতলা মহাকরণে সরকারি মহাফেজখানার ফারসি ভাষায় লিখিত গুরুত্বপূর্ণ পত্রটি সংরক্ষিত আছে। মহারাজ কুমার সমরেন্দ্র কুমার দেববর্মা রচিত 'ত্রিপুরার স্মৃতি' গ্রন্থে যে বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

"অতুলনীয় উচ্চ কুলোদ্ভব সৌভাগ্যবান রাজ্যেশ্বর বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য বাহাদুর আল্লাতালা আপনার রাজ্য সুমঙ্গলে রক্ষা করুন। আমি সুনিশ্চিতরূপে অবগত হয়েছি যে, আমার চির শত্রু, সুজা ভবদীয় রাজ্যে গোপনে অবস্থান করিতেছে। মদীয় পূর্বপুরুষের মহোদয়গণের সঙ্গে আপনার গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষগণের পরস্পর আত্মীয়তা ও প্রণয় থাকা বশত ঃ আমাদের সহিত বিবাদে লিপ্ত আফগানেরা ভবদীয় রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আপনার মহামান্য পূর্বপুরুষগণ অসি প্রহারে যেরূপ সেই দুষ্ট আফগানদিগকে বঙ্গদেশে বিতাড়িত করিতেন, বর্তমানে আমিও তদ্রূপ আশা করি আমার লিখা অনুসারে আপনি উক্ত শত্রু (সুজাকে, বধ করে সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করেন। যদি আপনার অভিমত হয় তবে আমার সেনাপতিকে মুঙ্গেরে অপেক্ষা করাইব। তাহাকে ধৃত করিবার পর আপনার সেনাপতির রক্ষণাবেক্ষণে সাবধানে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন-যেন প্রাচীন বন্ধুতা স্থায়ী রহে। নতুবা ইহা নিশ্চয় জানিবেন-আপনার রাজ্যে উক্ত অপরিণামদর্শীর অবস্থান করার জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্য সংগঠিত হইবে। আমার লিপি অনুসারে কার্য হইবে বলিয়া আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি"।

উপরের চিঠিটির প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা এই পত্রটি প্রাপ্ত হবার পূর্বেই সুজা ত্রিপুরা ত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং ঔরংজেবকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য গোবিন্দমাণিক্য ঔরংজেবের নিকট বশ্যতা স্বীকার পূর্বক বার্ষিক হস্তীকর দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরায় রিয়াং প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল কারণ রাজার কর্মচারীরা দরিদ্র প্রজাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করত। গোবিন্দমাণিক্য শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। অনেক রিয়াং প্রজাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, গোবিন্দমাণিক্যের মহিষী গুণবতী বন্দিশালায় গিয়ে রিয়াং প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন-আমার কোনো সন্তানাদি নেই আমি তোমাদের

সন্তানের ন্যায় লালনপালন করতে চাই। গোবিন্দমাণিক্য নিজেও দয়াবরবশ হয়ে বন্দিদের মুক্তি দেন। রিয়াং প্রজারা আর বিদ্রোহ করেনি।

গোবিন্দমাণিক্য তাম্রশাসন দ্বারা অনেক পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন। তাম্রশাসনগুলো বাংলা ভাষায় লেখার ব্যবস্থা করেন। চন্দ্রনাথে শিব মন্দির, কসবায় মহিষী গুণবতীর নামে বিরাট দিঘি খনন, উদয়পুরে জগন্নাথদেবের মন্দির, এবং গোমতী নদীর জল প্লাবনে শস্যক্ষেত্র যাতে বিনষ্ট না হয় সেজন্যে 'গাঙ আইন, বাঁধ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য করেন। উল্লেখ্য,কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' উপন্যাসে এবং 'বিসর্জন' নাটকে মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের ত্যাগ ও মহত্বের কথা অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের নাম বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দমাণিক্যের মৃত্যু হয়।

রামদেবমাণিক্য (১৬৭৩-১৬৮২)

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেব। বৃদ্ধ এবং অসুস্থ গোবিন্দমাণিক্য সজ্ঞানে ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে রামদেবকে প্রশাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ নামে প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন। রামদেবমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। রামদেবমাণিক্য প্রথমে স্বীয় শ্যালক বলি ভীম নারায়ণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন। পরে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রত্নদেব ঠাকুরকে যুবরাজ করেছিলেন। শ্যালককে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা রাজ পরিবারে এক বেনজির দৃষ্টান্ত।

রামদেবমাণিক্য 'বড় ঠাকুর' নামে নতুন একটি পদ সৃষ্টি করে দ্বিতীয় পুত্র দুর্জয়দেব ঠাকুরকে ওইপদে নিযুক্ত করা নিয়ে পরিবারে অনন্ত কলহের বীজ বপন করেছিলেন। রাজমালার সূত্রে জানা যায় যে রামদেবমাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারিকানাথ ঠাকুর রামদেবমাণিক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নরেন্দ্রমাণিক্য উপাধি গ্রহণ করেন। সরাটল এর জমিদার নাসির মহম্মদের সহায়তায় ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন। পরিশেষে রামদেবমাণিক্য বাংলায় নবাবের সাহায্যে ত্রিপুরার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন।

নরেন্দ্রমাণিক্যকে বন্দি করে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। রামমাণিক্যের তেরোজন পুত্রের মধ্যে চারজন পুত্র জীবিত ছিলেন। এঁরা হলেন যথাক্রমে রত্নদেব, দুর্জয়সিংহ, ঘনশ্যাম, এবং চণ্ডমণি। রামদেবমাণিক্য, জ্যেষ্ঠপুত্র রত্নদেব বা রত্নমাণিক্যকে

সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে, মনোনীত করেন। অপর দিকে বড়ঠাকুর পদ দ্বিতীয় পুত্র দুর্জয় সিংহকে প্রদান করেন। রত্নমাণিক্য বয়সে বালক ছিলেন বলে রামদেবমাণিক্য নিজ শ্যালক বলি ভীম নারায়ণকে রত্নমাণিক্যের অভিভাবক নিযুক্ত করেছিলেন।

রামদেবমাণিক্য মাইজখাড় গ্রামে একটি বড় দিঘি খনন করেছিলেন। দিঘির নাম রাম সাগর। উদয়পুরে মন্দির নির্মাণ করে তিনি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে রামদেবমাণিক্যের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য (১৬৮৫-১৭১২)

পিতা রামদেবমাণিক্যের মৃত্যুর পর ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল খুবই কম। ত্রিপুরা বুরঞ্জী মতে রত্নমাণিক্য সাত বৎসর বয়সে রাজা হন। তাঁর রাজত্বকালে রাজ পরিবার ছিল ষড়যন্ত্রে ও সংঘর্ষে পূর্ণ। তিনি দুইবার রাজত্ব করেছিলেন। প্রথম বার ১৬০১ শকে রাজ্য লাভ করে সেই শকেই সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার ১৬০৭ হতে ১৬৩৪ শকাব্দ পর্যন্ত '১৬৮৫-১৭১২ খ্রিস্টাব্দ' রাজত্ব করেছিলেন। 'চম্পক বিজয়' নামক সমসাময়িক ইতিহাসমূলক কাব্য থেকে জানা যায় যে রত্নমাণিক্য নাবালক হওয়ায় তাঁর মাতুল বলি ভীম নারায়ণ অভিভাবক হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। কিন্তু তিনি রত্নমাণিক্যকে নিরাপদ রাখার জন্য অন্যান্য সিংহাসনের দাবিদারদের অনেককেই হত্যা করেন। এই সময় শায়েস্তা খানের পরিবর্তে বাহাদুর খান বাংলার সুবেদার হয়ে এলে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য বাংলার অন্যান্য রাজা ও জমিদাররা তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। বলি ভীম নারায়ণ দরবারে উপস্থিত না হওয়ায় বাহাদুর খান তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি পূর্বের নিয়মিত বার্ষিক তিনটি হস্তীকর ছাড়াও আরও অর্থ ও হস্তী দাবি করেন। বলি ভীম তা দিতে বিলম্ব করায় তাঁকে বন্দি করে সুবেদার-এর দরবারে আনা হয়। শেষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তিনি নিষ্কৃতি পান। জনশ্রুতি এইরূপ বলিভীম নারায়ণকে হত্যা করা হয়েছিল।

বলিভীম নারায়ণের পর রামদেবমাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্রমাণিক্য দ্বিতীয়বার সিংহাসন দাবি করেন এবং সুবেদারকে অতিরিক্ত হস্তী কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন এবং মুঘলদের সাহায্য নিয়ে ত্রিপুরার রাজা হন। ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে

তিনি নিজ মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি স্নেহবশত রত্নমাণিক্যকে হত্যা না করে নজরবন্দি করে রাখেন। নরেন্দ্রমাণিক্য জনপ্রিয় ছিলেন না। ফলে, জনসমর্থন নিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের ভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুরের পুত্র চম্পক রায় সেনাপতি মীর খানের সহায়তায় চণ্ডিগড়ের যুদ্ধে নরেন্দ্রমাণিক্যকে পরাজিত করে সিংহাসনচ্যুত করেন। চম্পক রায় রত্নমাণিক্যকে ত্রিপুরার সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিজে যুবরাজ নিযুক্ত হন। নরেন্দ্রমাণিক্য দুই বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

চম্পক রায় যোগ্যতার সঙ্গে শাসকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি মুসলমানদের বার্ষিক হস্তীকর প্রদান বন্ধ করে দেন। চম্পক রায়ের একনায়কতন্ত্র সুলভ আচরণ অনেকেরই বিরক্তি এবং ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চম্পক রায়ের বিরোধীরা রত্নমাণিক্যকে চম্পক রায়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনায় রত্নমাণিক্য তাঁকে বন্দি করে হত্যা করেন। চম্পক রায়ের মৃত্যুর পর রত্নমাণিক্য নিজ হস্তে রাজ্য শাসনভার নেন। তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দুর্জয় সিংহকে যুবরাজ এবং ঘনশ্যামকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন। সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমণিকে বাংলার সুবেদারের দরবারে প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেন। কালক্রমে ত্রিপুরার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে। রত্নমাণিক্য মুঘলদের হস্তীকর প্রদান করে নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করলেও কার্যত স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করছিলেন। এই প্রসঙ্গে মেজর স্টুয়ার্ট রচিত বাংলার ইতিহাস বইখানি প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন-'যদিও ইতিপূর্বে মুসলমানদের বাহুবলে ত্রিপুরা লুণ্ঠিত ও বিজিত হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়নি। ত্রিপুরেশ্বর স্বাধীন ছত্রধারণ পূর্বক নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করতেন। কথিত আছে ১৭০৯-৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা নবাবকে যেরূপ উপঢৌকন প্রেরণ করতেন, নবাবও সেরূপ তাঁকে 'খেলাত' প্রদান করতেন। সময়ের বিচারে মুরশিদ কুলি তখন বাংলার দেওয়ান ছিলেন, তখনও নবাব হননি। সেই সময় বাংলার সুবেদার ছিলেন আজিম উস সান। প্রকৃত অর্থে মুরশিদ কুলিই রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং আজিম-উস-সনের সঙ্গে কলহের কারণে ঢাকা থেকে রাজস্ব দপ্তর মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করছিলেন। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির বাদশাহ প্রথম শাহ আলম এক প্রতিনিধির মারফত রত্নমাণিক্যের সঙ্গে এক সন্ধি স্থাপন করেছিলেন ববলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে আসামের রাজা রুদ্রসিংহ ত্রিপুরা

রাজের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে রতন কন্দলি ও অর্জুন দাস বৈরাগী নামক দুই জন রাজদূতকে আনন্দিরাম মেধী নামক এক বাঙালি গায়কের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজদরবারে প্রেরণ করেছিলেন। ওই সময়ে রুদ্রসিংহ মুঘলদের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার রাজা কোনো সাহায্য করবেন কিনা সে সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তিনি তাদের ত্রিপুরায় প্রেরণ করেছিলেন। রত্নমাণিক্য উপরোক্ত রতন কন্দলি ও অর্জুনদাস বৈরাগীকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং বিনিময়ে রত্নমাণিক্য ও ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে রামেশ্বর ভট্টাচার্য ন্যায়ালংকার ও উদয়নারায়ণ বিশ্বাসকে ত্রিপুরার রাজপ্রতিনিধি হিসাবে আসামে পাঠিয়ে ছিলেন। অনুরূপভাবে আসামের রাজা রুদ্রসিংহ আসামের রাজধানী রংপুরে ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে সাড়ম্বরে ত্রিপুরায় প্রতিনিধিদের গ্রহণ করেন। এক বছরের সময়কালের মধ্যেই রুদ্রসিংহ রতন কন্দলি ও অর্জুনদাস বৈরাগীকে দ্বিতীয়বার ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল রাজা রত্নমাণিক্য তাদের গ্রহণ করলে তাঁরা রুদ্রসিংহের একটি গোপন পত্র রাজাকে দেন। তাতে ত্রিপুরার রাজা তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের সঙ্গে পরামর্শ করে মুঘলদের বিরুদ্ধে রুদ্র সিংহকে কতটা সাহায্য করতে পারতেন তা রুদ্রসিংহকে জানাতে অনুরোধ করা হয়। উল্লেখ্য, উদয়পুর থাকাকালে আসামের দূতদ্বয় ও তাদের সহযোগীরা ত্রিপুরায় মদন উৎসব উপভোগ করে আনন্দিত হন। ১৭০৯ থেকে ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তারা তিনবার ত্রিপুরায় দূত হিসাবে আগমন করেছিলেন। তাঁদের রচিত 'ত্রিপুরা দেশের কথালেখ' গ্রন্থ থেকে ত্রিপুরা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। রতন কন্দলি ও অর্জুনদাস বৈরাগীর অবস্থানকালে ত্রিপুরার রাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যকে তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর সিংহাসন চ্যুত করে মহেন্দ্রমাণিক্য উপাধি ধারণ পূর্বক ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন। আসামের এই রাজদূতরা রাজ প্রাসাদের ওই ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ তাদের লেখা 'ত্রিপুরা দেশের কথালেখ' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। সমসাময়িক বিবরণী হিসাবে এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক।

ত্রিপুরা দেশের কথালেখ অনুযায়ী দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর রত্নমাণিক্যের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিলেন। কারণ রত্নমাণিক্য নিজ শ্যালক কবিশেখর নারায়ণকে দেওয়ান নিযুক্ত করেছিলেন এবং নিজ ভগিনীর সঙ্গে

রাজদুর্লভ নারায়ণের বিবাহ দিয়ে তাঁকে অনেক উচ্চ সম্মান দান করে কোতয়াল মুসিক নিযুক্ত করেন। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর সিংহাসন অধিকারের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তিনি মুরাদ বেগ নামক এক মুঘলের সহযোগিতা লাভ করেন। মুরাদ বেগের বিবাহিতা ভগিনীকে রত্নমাণিক্য অসম্মান করেছিলেন বলে মুরাদ বেগ রত্নমাণিক্যের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে মুরাদ বেগ ঢাকায় লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর এই সময় মুঘলদের প্রাপ্য হস্তীকর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অন্য বৎসরের তুলনায় অধিক লোকজন সহ খণ্ডল পরগনায় অবস্থান করতে থাকেন। মুরাদ বেগের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মামুদ সাপী নামক মুঘল কর্মচারী ত্রিপুরা রাজ্যের কাছ থেকে প্রাপ্য হস্তীকর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে ত্রিপুরা অভিযানে যাত্রা করেন। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর মামুদ সাপীর সমর্থন লাভ করেন। রত্নমাণিক্যর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেও রত্নমাণিক্য তাদের কথা বিশ্বাস করেন নি এবং কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও গ্রহণ করেননি। সুতরাং ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর ষড়যন্ত্র সফল করার পূর্ণ সুযোগ পান। ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর মুরাদ বেগের সঙ্গে রত্নমাণিক্যের আপোস মীমাংসার অজুহাতে মুরাদ বেগ ও মামুদ সাপীর সঙ্গে সসৈন্য উদয়পুর আগমন করেন। রত্নমাণিক্য যুবরাজ দুর্জয় সিংহ রাজদুর্লভ নারায়ণকে তাঁদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুরাদ বেগের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেরণ করলে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর তাঁদের বন্দি করে। যুবরাজ দুর্জয় সিংহ মামুদ সাপীকে দশ হাজার টাকা উৎকোচ দিয়ে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি রাজাকে সমস্ত ঘটনা অবগত করলেও রাজার ঘনশ্যামের প্রতি বিশ্বাস অটুট থাকে। এই অবস্থায় ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর সসৈন্যে রত্নমাণিক্যের দরবারে প্রবেশ করেন এবং সিংহাসনে উপবিষ্ট রত্নমাণিক্যকে বলপূর্বক সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং মহেন্দ্রমাণিক্য উপাধি গ্রহণ করেন। এই ঘটনাটি ঘটে সোমবার ১০ মে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে এবং আসামের রাজদূতদ্বয়ের চোখের সামনেই। সিংহাসনচ্যুত রত্নমাণিক্যকে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়। রত্নমাণিক্যের ভগিনীপতি কোতয়াল মুসিব রাজদুর্লভ নারায়ণের প্রতি ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর পূর্ব থেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। সুতরাং রাজদুর্লভ নারায়ণকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। নতুন রাজার অনুমতি নিয়ে তাঁর পত্নী মৃত স্বামীর সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সতীত্ব বরণ করেন। এই সময় মহেন্দ্রমাণিক্যের প্রাসাদ এক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হলে গঙ্গানারায়ণী নামে প্রাসাদের এক ধাত্রী

মহেন্দ্রমাণিক্যকে উপদেশ দেয় যে রত্নমাণিক্যকে জীবিত রাখলে নানা অঘটন ঘটতে পারে সুতরাং তাকে হত্যা করা উচিত। গঙ্গানারায়ণীর পরামর্শমতো রত্নমাণিক্যকে হত্যা করা হল এবং গোমতী নদীর তীরে তাঁর দেহের সৎকার হয়। রত্নমাণিক্যের পত্নীরা রত্নমাণিক্যের মাতার অনুমতি নিয়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় আরোহণ করে সতীত্ব বরণ করেন। শ্রীকৈলাশচন্দ্র সিংহের মতে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের একশত পঁচিশ জন পত্নী ছিলেন এবং সকলেই ছিলেন নিঃসন্তান। মহেন্দ্রমাণিক্য এই হত্যাকাণ্ডের পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য বহু ব্রাহ্মণকে দানধান্য করেন।

মহেন্দ্রমাণিক্য (১৭১২-১৭১৩)

ঘনশ্যাম ঠাকুর রত্নমাণিক্যকে বন্দী করে মহেন্দ্রমাণিক্য নাম ধারণ করে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহেন্দ্রমাণিক্য প্রথমে রত্নমাণিক্যের ভগ্নীপতি দুর্লভনারায়ণকে হত্যা করেন। তখন কিছু বিক্ষুব্ধ লোক মহেন্দ্রমাণিক্যের প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেয়। গঙ্গানারায়ণী নামে একজন পরিচারিকার পরামর্শে মহেন্দ্রমাণিক্য রত্নমাণিক্যকে হত্যা করেন। তিনি চন্দ্রমণিকে বড়ঠাকুর নিযুক্ত করেন। দুর্জয় সিংহ যুবরাজ পদেই বহাল রইলেন।

মহেন্দ্রমাণিক্য আসামের রাজদূতদ্বয়কে ২৪ শে জুলাই ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে রাজদরবারে সাক্ষাৎ করেন। ত্রিপুরার দূত হিসাবে অরিভীম নারায়ণকে উপঢৌকন ও পত্রসম আসামের রাজদূতদ্বয়ের সঙ্গে ১৮ জানুয়ারি, ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে অহোম রাজদরবারে প্রেরণ করেন। মহেন্দ্রমাণিক্য অহোম রাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব যাতে সুদৃঢ় হয় পত্রে ও দূতের মারফত তা উল্লেখ করেন। ত্রিপুরার দূত আসামের রাজদরবার থেকে পত্র ও উপহারসহ ১৭১৪ সালের ৭ই এপ্রিল ত্রিপুরার উদ্দেশে রওনা হন। তিনি মাত্র ১৪ মাস রাজত্ব করেন। অপরিণামদর্শী, লোভী ভ্রাতৃহন্তা মহেন্দ্রমাণিক্য মুঘলের নিকট ত্রিপুরার সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য (১৭১৩-১৭২৮)

মহেন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা যুবরাজ দুর্জয় সিংহ ধর্মমাণিক্য উপাধি ধারণ করে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৭১৪খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন।

অহোম রাজা রুদ্রসিংহ রতন কন্দলি ও অর্জুনদাস বৈরাগীকে তৃতীয়বার রাজদূত হিসাবে ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য তাঁদের ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দের

১৩ মে সাদরে গ্রহণ করেন। ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে দূতদ্বয় ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। ধর্মমাণিক্য তাঁদের রাজা রুদ্রসিংহের জন্য উপহার ও পত্র দেন। অহোম রাজ্যের সঙ্গে ধর্মমাণিক্যের বন্ধুত্ব যাতে অটুট থাকে তার প্রতিশ্রুতি দেন। এবার ত্রিপুরা থেকে কোনও দূত প্রেরিত হয়নি।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালা থেকে জানা যায় যে ধর্মমাণিক্যের সিংহাসন আরোহণের অল্পদিনের মধ্যে বাংলার নবাব ধর্মমাণিক্যকে পরাজিত করে ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রে অধিকার স্থাপন করে সেখানে মুঘল বংশীয় জমিদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ধর্মমাণিক্য যুদ্ধে জয়লাভ করে মুঘল জমিদারকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। এই ঘটনার পর বাংলার নবাব ধর্মমাণিক্যের সঙ্গে যে সন্ধি করেন তাতে স্থির হয় যে ধর্মমাণিক্য কেবল নুরনগর পরগনার জন্যে বার্ষিক পঁচিশ সহস্র মুদ্রা কর হিসাবে নবাবকে দিতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু মুঘল সম্রাট স্বয়ং নুরনগরকে সামরিক জায়গীর হিসাবে গণ্য করে বার্ষিক রাজস্ব পঁচিশ হাজার টাকা রেহাই করে দিয়েছিলেন। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য দিল্লির সম্রাট ঔরংজেবের সঙ্গে হস্তীকর মূলক এক চুক্তি করেছিলেন। তখন থেকে মুঘল সম্রাটের নিকট প্রতি বছর ত্রিপুরা থেকে হাতি পাঠানো হত। ত্রিপুরার রাজা হয়ে ধর্মমাণিক্য ও মুঘল প্রতিনিধির নিকট হাতি পাঠাতে থাকেন। কিন্তু গভীর জঙ্গলে হাতি ধরার ব্যাপারে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেওয়ায় তিনি এক সময়ে মুঘল প্রতিনিধির নিকট হাতি পাঠানো বন্ধ করে দেন। ঢাকার নবাব তখন ক্ষুব্ধ হয়ে ধর্মমাণিক্যের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্যে একদল সৈন্য পাঠালেন। ধর্মমাণিক্যের সৈনাধ্যক্ষ রাণা ভীমনারায়ণ প্রচণ্ড বিক্রমে আট মাস ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুঘল সৈন্যরা শেষ পর্যন্ত অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল।

অন্যদিকে নক্ষত্র রায়ের প্রপৌত্র জগৎরাম ঠাকুর ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করে নেবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তিনি ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত হয়ে পাটপাশা (বলদাখাল)পরগনায় জমিদার আঁকা সিদ্দিকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি আঁকা সিদ্দিকের সাহায্যে ঢাকা নেয়াবতের তৎকালীন সুবিখ্যাত দেওয়ান মীর হাবিবের সঙ্গে মিলিত হন। মীর হাবিব ত্রিপুরা রাজ্য জয়ের অপূর্ব সুযোগ লক্ষ করে স্বীয় প্রভু বাংলার শাসনকর্তা সুজাউদ্দিনের অনুমতি নিয়ে একদল সৈন্য সঙ্গে নিয়ে জগৎরাম ঠাকুরের সঙ্গে ত্রিপুরার উদ্দেশে যাত্রা করেন। অপরদিকে মীর হাবিবের

নেতৃত্বে একদল মুঘল সৈন্য ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করে ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মহারাজ ধর্মমাণিক্য এই সংবাদ ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে পারেননি। জগৎরাম মুঘল সেনাদের পথ দেখিয়ে ত্রিপুরার রাজ্যের অতি নিকটে নিয়ে আসেন। আকস্মিকভাবে ধর্মমাণিক্য এই সংবাদ জেনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। মুঘল সেনাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য তিনি সৈন্য সমাবেশ ঘটালেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ধর্মমাণিক্যের উজির কমলনারায়ণ ঘোষ এই যুদ্ধে নিহত হন। মুঘল সৈন্যরা অতি সহজেই চণ্ডীগড় দুর্গ দখল করে উদয়পুরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।ধর্মমাণিক্য পরাজিত হয়ে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুঘল সেনারা রাজধানী উদয়পুরে প্রবেশ করে সেখানে অবাধ লুণ্ঠন চালায় এবং প্রচুর ধন-দৌলত, হাতি, হাতির দাঁত ইত্যাদি নিয়ে চলে যায়। মীর হাবিব জগৎরাম ঠাকুরকে রাজা উপাধি দিয়ে ত্রিপুরার রাজ বলে প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র জগৎমাণিক্যের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। নবাব সুজাউদ্দিন ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রকে 'চাকলা রোশনাবাদ' নাম দিয়ে বার্ষিক ৯২ হাজার ৯৯৩ টাকা কর ধার্য করে এই অঞ্চল জগৎমাণিক্যকে জমিদারিস্বরূপ প্রদান করেন। ধর্মমাণিক্যের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে জগৎমাণিক্যকে রক্ষা করার জন্য মীর হাবিবের কর্মক্ষমতা দেখে নবাব তাঁকে খান উপাধিতে ভূষিত করেন।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল রাজস্ব আদায় থেকে বহির্ভূত রাখায় পার্বত্য অঞ্চলের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। ধর্মমাণিক্য মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের সহায়তায় নবাব সুজাউদ্দিনের কাছ থেকে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি প্রাপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় চাকলা রোশনাবাদের রাজস্ব ধার্য করা হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা যার মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা সামরিক জায়গির বাবদ এবং কুড়ি হাজার টাকা হস্তীধৃত করার খরচ বাবদ মোট পঁয়তাল্লিশ হাজারটাকা বাদ দেওয়া হয়েছিল। ধর্মমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হলেও চাকলা রোশনাবাদের জন্য বাংলার নবাবের অধীনস্থ জমিদার হিসাবে পরিগণিত হন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট তাঁর হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গাল গ্রন্থে "The Province of Tipperah which from time immemorial had been an independent kingdom became annexed to the Mogul Empire." দ্বিতীয়বার সিংহাসন প্রাপ্তির অল্পকাল পরেই সম্ভবত ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে ধর্মমাণিক্য প্রাণত্যাগ করেন। ধর্মমাণিক্য মুঘল আক্রমণে যখন বিপর্যস্ত সেই সময় মণিপুর রাজ

পামহেইবা ত্রিপুরার উত্তর সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ ও অধিকার করেন। এই সাফল্যের জন্য পামহেইবা কে 'তাখেলঙাম্বা' অর্থাৎ 'ত্রিপুরা বিজয়ী' আখ্যায় ভূষিত করা হয় এবং এই উপলক্ষে মণিপুরে 'তাখেল ঙাম্বা' অর্থাৎ 'ত্রিপুরা বিজয়ী' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করা হয়। প্রজাদের সুবিধার জন্য তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ছাড়াও বেশ কিছু নিষ্কর জমি ব্রাহ্মণদের দান করেন। মেহেরকুল,ছত্রগ্রাম, কসবা ও ধর্মপুরে কয়েকটি দিঘি খনন করেন। তিনি মহাভারতের বাংলা পদ্যানুবাদ করিয়েছিলেন এবং প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

মুকুন্দমাণিক্য (১৭২৯-১৭৩৮)

দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা চন্দ্রমণি মুকুন্দমাণিক্য উপাধি ধারণ পূর্বক ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মুকুন্দমাণিক্যের ১১৩৯ ত্রিপুরাব্দ বা ১৭২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দের একটি সনদের উল্লেখ করেন। এই সনদের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে মুকুন্দমাণিক্য ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে অন্তত ১৭২৯খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা হন।

মুকুন্দমাণিক্য তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুরকে মুর্শিদাবাদের দরবারে প্রতিভূ হিসাবে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সময় থেকে চাকলা রোশনাবাদের বার্ষিক রাজস্ব ৭৮,৩০৫ টাকা ধার্য হয়। সামরিক জায়গির ও হস্তীধৃত করার খরচ মোট ৪৫,০০০টাকা বাবদ দিয়ে অবশিষ্ট ৩৩,৩০৫ টাকা নিয়মিত বার্ষিক রাজস্ব দিতে হত। গোবিন্দমাণিক্যের ভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র সুবা রুদ্রমণি ঠাকুর গোপনে পার্বত্য সর্দারদের সহায়তায় একটি সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করে উদয়পুরে ফৌজদার ও তার অনুচরদের হত্যার পরিকল্পনা করেন। এ সম্পর্কে তিনি মুকুন্দমাণিক্যকে অবহিত করলে মুকুন্দমাণিক্য মুর্শিদাবাদে জ্যেষ্ঠপুত্র পাঁচকড়ির নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ফৌজদারকে এই পরিকল্পনা কথা জানিয়ে দেন। তা সত্ত্বেও ফৌজদার মুকুন্দমাণিক্যও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন সন্দেহ করে তাকে সপরিবারে বন্দি করেন। অপমান ও হতাশায় মুকুন্দমাণিক্য বিষপানে আত্মহত্যা করেন। মুকুন্দমাণিক্য সম্ভবত দশ বৎসর (১৭২৯-১৭৩৮) রাজত্ব করেন। তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, প্রভৃতি বর্ণের ব্যক্তিদের বহু নিষ্কর জমি দান করেছিলেন।

জয়মাণিক্য (১৭৬৯-১৭৪২) ইন্দ্রমাণিক্য (১৭৪৪)

মহারাজ মুকুন্দমাণিক্যের কারাগারে অপমৃত্যু হলে রুদ্রমণি সুবা নামে একজন

উপজাতি সর্দার 'জয়মাণিক্য' নাম ধারণ করে ত্রিপুরার সিংহাসন আরোহণ করেন। রুদ্রমণির সাহসিকতার জন্য জনসাধারণ মুকুন্দমাণিক্যের পুত্রের পরিবর্তে রুদ্রমণিকেই তাদের রাজা নির্বাচিত করেন। রুদ্রমণি জয়মাণিক্য উপাধি নিয়ে ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা হন এবং ওই বৎসরেই তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। এদিকে মুকুন্দমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র পাঁচকড়ি সেই সময় মুর্শিদাবাদে ত্রিপুরার রাজার প্রতিভূ হিসাবে অবস্থান করছিলেন। তিনি বাংলার নবাবের সাহায্য লাভ করে ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন এবং ইন্দ্রমাণিক্য উপাধি গ্রহণ করেন। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। জয়মাণিক্য উদয়পুর থেকে বিতাড়িত হয়ে মতাই পাহাড়ে তার প্রশাসন কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি স্থানীয় জমিদারদের সহযোগিতায় ঘন ঘন উদয়পুর আক্রমণ করে ইন্দ্রমাণিক্যকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিলেন। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের এক পুত্র গঙ্গাধর ঢাকায় নায়েব নাজিমের নিকট থেকে সনদ নিয়ে ত্রিপুরার রাজা হবার চেষ্টা করেন। উদয়মাণিক্য নাম নিয়ে অল্পকালের জন্য রাজাও হন। মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে ইন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যু হলে জয়মাণিক্য পুনরায় ত্রিপুরার রাজা হন। ইতিমধ্যে তিনি উদয়মাণিক্যকে কুমিল্লা থেকে বিতাড়িত করে সমগ্র ত্রিপুরা পুনরুদ্ধার করেন। জয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা হরিমণি ঠাকুর বাংলার নবাবের সনদ লাভ করে বিজয়মাণিক্য উপাধি নেন এবং ত্রিপুরার রাজা হন। ইন্দ্রমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ কৃষ্ণমণি জয়মাণিক্যও বিজয়মাণিক্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। নবাবকে নিয়মিত রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে বিজয়মাণিক্যকে বন্দি করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। সম্ভবত তিনি পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে দক্ষিণশিক্ নিবাসী একজন মুসলমান প্রজা ক্রমশ প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর নাম সমসের গাজি।

সমসের গাজির নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮)

জগৎমাণিক্য যখন মীর হাবিবের সাহায্যে চাকলা রোশনাবাদে কর্তৃত্ব পান, তখন দক্ষিণশিক নিবাসী এক দরিদ্র মুসলমান চাষ-আবাদ করার সময়ে এক মহামূল্যবান বস্তু পেয়ে সেটি জগৎমাণিক্যের হাতে তুলে দিলে জগৎমাণিক্য খুশি হয়ে সেই প্রজাকে দক্ষিণশিকের জমিদারিস্বত্ত্ব প্রদান করেন। প্রজার নাম ইমনসদা গাজি। মহামাণিক্যের কৃপায় ইমন্‌সদা গাজির ভাগ্যের পরিবর্তন হল। তিনি রাতারাতি জমিদার হয়ে গেলেন।

সদা গাজির পুত্র নাছির মোহম্মদ পিতার মৃত্যুর পর দক্ষিণশিকের জমিদার

হলেন। তিনি তাঁর শিশুপুত্রদের সঙ্গে এক দরিদ্র মুসলমান বালককেও পড়াশুনা করার সুযোগ করে দেন। এর নাম সমসের গাজি। সমসের গাজির জীবনী লেখক সেখ মনোহরের লেখা 'গাজীনামা' থেকে জানা যায় যে সামসেরের পিতা পীর মহম্মদ একজন ফকির ছিলেন। আবার রামগঙ্গা বিশারদ রচিত কৃষ্ণমালা গ্রন্থে সমসেরকে রজক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাল্যজীবনে তিনি দক্ষিণশিকের জমিদার নাছির মহম্মদের গৃহে প্রতিপালিত হন।পরবর্তী সময়ে তিনি জমিদারের একজন তহশিলদার নিযুক্ত হন। তহশিলদার নিযুক্ত থাকাকালে তিনি জমিদারের অত্যাচার এবং কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন হন এবং এর প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হন। তিনি তাঁর সমবয়স্ক কৃষক যুবকগণকে নিয়ে দল গঠন করতে আরম্ভ করেন। দলগঠনের পর সমসের জমিদার নাছির মহম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। একদিন তিনি সদলবলে জমিদারের নিকট উপস্থিত হয়ে জমিদার কন্যাকে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দেবার দাবি জানালেন। এতে জমিদারের আভিজাত্যে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। তিনি একজন ক্রীতদাসের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকার করেন এবং ক্রীতদাসের এই প্রকার ঔদ্ধত্যে ক্ষিপ্ত হয়ে সমসেরকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করলে, সমসের বিপদ বুঝে সদলবলে পলায়ন করেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হলে সমসের তাঁর কৃষক বাহিনী নিয়ে অতর্কিতে জমিদারের প্রাসাদ আক্রমণ করেন। জমিদার ও তাঁর পুত্রগণ বিদ্রোহীগণকে বাধা দিতে গিয়ে নিহত হন। সমশের জমিদার কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণশিক পরগনার জমিদারি অধিকার করেন। ত্রিপুরার রাজা ইন্দ্রমাণিক্য সমসের গাজীর বিদ্রোহের খবর পেয়ে একজন উজিরের নেতৃত্বে একদল সৈন্য সমসেরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু সমসের তাঁর বিদ্রোহী বাহিনীর সহায়তায় ত্রিপুরার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। ত্রিপুরার উজির তাঁকে দক্ষিণ শিকের জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে মুক্তিলাভ করেন। এরপর নগরের প্রতিনিধি হাজি হোসেনের সহায়তায় এবং নবাবকে বার্ষিক অধিক রাজস্ব আদায় করে দেওয়ার বিনিময়ে তিনি সমগ্র চাকলা রোশনাবাদের শাসক হন। অন্যদিকে নানা অরাজকতার মধ্যে ত্রিপুরার রাজা বিজয়মাণিক্য ঢাকায় পরলোক গমন করলে ইন্দ্রমাণিক্যের ভ্রাতা কৃষ্ণমাণিক্য ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর অধিকার করতে সচেষ্ট হন। সমসের

তাঁর কৃষকবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেন এবং স্বল্প প্রচেষ্টায় উদয়পুর দখল করে ফেলেন।

বিতাড়িত হয়ে কৃষ্ণমাণিক্য পুরাতন আগরতলায় এসে বসবাস শুরু করেন।পার্বত্য ত্রিপুরার প্রজারা প্রথমদিকে সমসেরকে রাজা হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করায় সমসের দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের এক পৌত্র লক্ষ্মণমাণিক্যকে নামে মাত্র উদয়পুরের সিংহাসনে স্থাপন করে নিজেই রাজ্য চালাতে থাকেন এবং কয়েক বছর পর ত্রিপুরার সিংহাসনও নিজে অধিকার করেন। কিন্তু রাজা উপাধি গ্রহণ করেননি। সনদগুলিতে তিনি নিজেকে শ্রীযুত মহম্মদ সমসের চৌধুরী হিসাবে উল্লেখ করেন।

সমসের স্বল্পকালের মধ্যেই সুদক্ষ প্রশাসক হিসাবে প্রমাণ করলেন। রাজ্যের প্রতি পরগনায় তিনি একজন করে সুদক্ষ শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ত্রিপুরাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানে কিল্লা বা দুর্গ নির্মাণ করেন। শাসনকার্যে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় থেকেই নিযুক্ত হত। ধর্মপুর নিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ ছিলেন তাঁর দেওয়ান এবং খণ্ডল নিবাসী হরিহর ছিলেন তাঁর নায়েব দেওয়ান। এঁদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল। সমসেরের প্রধান অনুচর আবদুল রজ্জাক ছিলেন রোশনাবাদের শাসনকর্তা।

সমসের এর নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল দেশব্যাপী এক ভয়ঙ্কর অরাজকতার সময়। অরাজকতার সুযোগ নিয়ে চোরাকারবারি প্রভৃতি সমাজের শত্রুরা প্রবল হয়ে উঠে। চোরাকারবারিরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম চড়াতে থাকে। সমসের স্বাধীনতা ঘোষণা করেই এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সমসেরের এই ব্যবস্থা 'রাজমালা' বা 'ত্রিপুরার ইতিহাস' রচয়িতা কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখেছেন সমসের তাঁহার অধিকার মধ্যে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের আশ্চর্য নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশে ৮২সিক্কা ওজনের সের ধার্য হইয়াছিল। তিনি সেই সেরের পরিমাণে কোন দ্রব্য কত মূল্যে বিক্রয় হইবে তাহার একটি তালিকা প্রত্যেক বাজারে টাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন।

চাউল/১ সের-৫	কার্পাস-১ সের-৫
লঙ্কা/১ সের-৫	তৈল-/-১-৯০
গুড়/১ সের-১০	ঘৃত-১-১০

লবণ/১ সের-১০ ডাল-১ - ১০
লবণ/১ সের-১০ ডাল-১ - ১০

দরিদ্র প্রজাদের বিনামূল্যে জমি বন্টন ও নিষ্কর জমিদানের ফলে এবং বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। উপরন্তু অধিক পরিমামে রাজস্ব দিয়ে বাংলার নবাবকেও সন্তুষ্ট রাখতে হত। সমসের অর্থ সংগ্রহের জন্য এক সহজ উপায় অবলম্বন করেন। তিনি নিজ রাজ্যের বাইরে ধনী ও কৃপণ জমিদারদের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করে অর্থ সংগ্রহ করতেন। সেই অর্থের একাংশ তিনি দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন এবং অপর অংশ বাংলার নবাবকে রাজস্ব দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতেন। সমসেরের জীবনচরিত প্রণেতা শেখ মনোহর লিখেছেন-সমসের একজন কৃপণ জমিদারের গৃহে ডাকাতি করে এক লক্ষ টাকা এনেছিলেন। কারণ ওই জমিদার কোনও দান খয়রাত করতেন না।

সমসের ডাকাতির কথা চারিদিকে প্রচারিত হতে থাকে এবং জমিদার ও ধনী ব্যক্তিরা ভীত হয়ে নবাবের কাছে সমসেরের বিরুদ্ধে বার বার অভিযোগ পেশ করতে থাকেন। ত্রিপুরার যুবরাজ কৃষ্ণমাণিক্য এই বিদ্রোহ ধ্বংস করার জন্য তৎকালীন বাংলার নবাব মীরকাশেমের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সমসেরের নেতৃত্বে ব্যাপক প্রজা-বিদ্রোহের সংবাদ ইতিপূর্বে নবাবের নিকটও পৌঁছেছিল। নবাব কৃষ্ণমাণিক্যই ত্রিপুরার রাজা বলে স্বীকার করেন এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ বণিকগণের সাহায্য পুষ্ট এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। নবাবের সুশিক্ষিত ও কামান বন্দুকে সুসজ্জিত বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধে সমসেরের বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সমসের নবাবের হস্তে বন্দি হন। সমসেরকে মুর্শিদাবাদের কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। কিছুদিন পর, ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে নবাবের হুকুমে তোপের মুখে বন্ধ করে সমসের গাজীকে হত্যা করা হয়।

এইভাবে প্রায় দুই বৎসর কাল ত্রিপুরার সামন্তরাজ ও ইংরেজী বণিকগণের ত্রাস সৃষ্টি করে এবং বাংলার কৃষকবিদ্রোহের ইতিহাসে এক নতুন পথ নির্দেশ করে সমসের গাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত রোশনাবাদের এই কৃষক বিদ্রোহের অবসান ঘটে। কৃষ্ণমাণিক্য এই বিদ্রোহের অবসানের পর ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর শাসনকালেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তির চার বৎসর পর ত্রিপুরার এই সমতল ক্ষেত্র ব্রিটিশ বণিকরাজের সম্পূর্ণ কুক্ষিগত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্রিপুরায় ইংরেজশক্তির আবির্ভাব

কৃষ্ণমাণিক্য (১৭৬০-১৭৮৩)

মুকুন্দমাণিক্যের পুত্র কৃষ্ণমণি ঠাকুর কৃষ্ণমাণিক্য নাম ধারণ করে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। সমসের গাজীর শাসনকালে উদয়পুর অধিকারে ব্যর্থ হয়ে কৃষ্ণমাণিক্য পুরাতন আগরতলায় এসে বসবাস করছিলেন। সমসেরের পতনের পর উদয়পুর কৃষ্ণমাণিক্যের অধিকারে এলেও পুরাতন আগরতলাকেই অধিক নিরাপদ মনে করে এখানেই তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সম্পন্ন হওয়ার এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সমতল ত্রিপুরায় প্রথম ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হল (১৭৬২, ফেব্রুয়ারি) সমগ্র বাংলা তখন ইংরেজদের অধিকারে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকার লাভের প্রথম বৎসরেই ভূমি রাজস্ব পূর্বাপেক্ষা ছেষট্টি হাজার ছয়শত পঁচানব্বই টাকা বৃদ্ধি করা হল। পূর্বে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ ও সিরাজদ্দৌলার শাসনকালে চাকলা রোশনাবাদ-এর রাজস্ব ছিল তেত্রিশ হাজার তিনশত পাঁচ টাকা। ইংরেজ শাসনগণ সেই রাজস্ব বৃদ্ধি করে এক লক্ষ টাকা ধার্য করে। ১৭৬৫ সালের বন্দোবস্ত বর্ধিত রাজস্ব আরও বর্ধিত করে এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকায় ধার্য করা হয়।

চাকলা রোশনাবাদের রাজস্বের বিষয় নিয়ে চট্টগ্রামের ফৌজদার রেজা খানের সঙ্গে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের পূর্ব থেকেই বিরোধ ছিল। ত্রিপুরার মহারাজকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি বাংলার নবাবের কাছে সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। যদিও ওই সময় বাংলার নবাব ইংরেজদের কাছে ক্রীড়নক মাত্র। বাংলার নবাব যথারীতি বিষয়টি ইংরাজ গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল গ্রাস করতে উদ্যত হয়। এই

অবস্থায় ত্রিপুরার বিষয়টি ছিল একটি মস্ত সুযোগ। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ভ্যান্সিটার্ট বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য চট্টগ্রাম কাউন্সিলে পাঠিয়ে দিলেন। চট্টগ্রামের ইংরেজ প্রতিনিধি মিঃ ভার্লেস্ট তখন লেফটেন্যান্ট ম্যাথুজকে অনুমতি দিলেন ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করে নিতে। লেফটেন্যান্ট ম্যাথুজ কৃষ্ণমাণিক্যের সেনাধ্যক্ষ বক্সীকে পূর্বেই উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করেন। যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বেই বিশ্বাসঘাতক সেনাধ্যক্ষ ত্রিপুরার সেনাদের দুর্গ পরিত্যাগ করে পালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। হতাশ হয়ে কৃষ্ণমাণিক্য রাজা ও রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের ইংরেজ বিরোধী কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কলকাতার কর্তৃপক্ষকে জানান যে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ইংরেজদের বাধাদানের জন্য রাজা আগরতলায় সৈন্য সমাবেশ করেছেন। এর মোকাবেলার জন্য মিঃ লিক্ সৈন্য সাহায্যের আবেদন জানান। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মিঃ লিক্‌কে সেনা দিয়ে সাহায্য করলেও এই বলে নির্দেশ দেন যে, রাজা কর্তৃক আক্রান্ত না হলে মিঃ লিক্ এই সৈন্য রাজার বিরুদ্ধে ব্যবহার না করেন। শেষ পর্যন্ত ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দশ বৎসরের জন্য চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি সরাসরি ব্যবস্থাপনায় বা খাসে নিয়ে আসেন। সরকারের প্রাপ্য রাজকর পরিশোধ করে শাসন সংক্রান্ত ব্যয় ও রাজপরিবারের ভরণ পোষণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃত্তি প্রদান করা রেসিডেন্টের কর্তব্য ছিল। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি ত্রিপুরার রাজাকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরাজ আগমনের ফলে ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলের জনজীবনে এক ব্যাপক বিপর্যয় ঘটেছিল। কৃষির অবনতি ছাড়াও এখানকার প্রাচীন ও সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্পের সর্বনাশ সাধিত হয়েছিল। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীগণ কাদবা ও চরপাতা নামক স্থানে দুটি বাণিজ্যাগার স্থাপন করে। ত্রিপুরার পর্বতজাত কার্পাস নির্মিত বাপ্তা বস্ত্রের বাণিজ্যই উল্লিখিত কুঠি স্থাপনের অভিপ্রায় ছিল। অন্যূন ১২লক্ষ টাকার বাপ্তা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতি বৎসর বিদেশে প্রেরণ করত। এই বাপ্তা বস্ত্রের দালালি দ্বারা লৌহগাড়ার সাহা পরিবার অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিলাতি শিল্পপণ্য ত্রিপুরার বাপ্তা বাণিজ্যের শিরে কুঠারাঘাত করে। বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার মতো ত্রিপুরাতেও ইংরেজরা নীল চাষের প্রবর্তন করেছিল। কৈলাস সিংহের মতে নীলকরের অত্যাচার কালে ত্রিপুরাবাসীগণ যেরূপ একতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিল,

বাংলার অন্য কোনও জেলার লোক তা দেখাতে পারেনি।

রানি জাহ্নবী দেবী (১৭৮৩-১৭৮৫)

কৃষ্ণমাণিক্য তাঁর মৃত্যুর অকে আগেই ছোট ভাই হরিমণি ঠাকুরকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য জীবদ্দশাতেই হরিমণি ঠাকুর মৃত্যুমুখে পতিত হন। কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে রেসিডেন্ট স্যার র‍্যালফ্ লিক্ আগরতলায় ছুটে আসেন। ত্রিপুরা রাজের রাজা কে হবেন-এই বিষয় নিয়ে স্যার র‍্যালফ্ লিক্ মহারানি জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করেন। জাহ্নবী দেবী লিক্ সাহেবকে জানান যে, রাজধর ঠাকুরকেই ত্রিপুরার ভাবী রাজারূপে তাঁরা নির্বাচন করে রেখেছিলেন। এই ব্যাপার নিয়ে স্যার র‍্যালফ্ লিক্ ইংরেজ গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসকে চিঠি লেখেন। ঐতিহাসিক চিঠিখানা এইরূপ ঃ

The Hon'ble Warren Hastings, Governor General
Fort William
Honourable Sir,

I judge it my duty to inform you that I have this day received informatio of the death of the Raja of Tipperah, who died on the 11th instant.He has not left any children, but a nephew and other relations, the succession is claimed by the former as nearest in blood to the deceased, I have no doubt as it was to my knowledge, the earnest desire of the Raja and Rani that the nephew should succeed. I shall, in consequence of this intelligence immediately proceed to Tipperah and shall not acknowledge any Raja there until I have authority for it.

I am
Sd/-R. Leeke
Resident

মহারানি জাহ্নবী দেবী কুমার রাজধর ঠাকুরকেই ত্রিপুরার রাজা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই ইচ্ছার কথা রেসিডেন্ট র‍্যালফ্ লিক্‌কে তিনি খুলে বলেন। রানি জাহ্নবী দেবী পর্দার অন্তরাল থেকে রেসিডেন্ট লিক্ সাহেবের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্য পরিচালার ব্যাপারে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। রানি লিক্ সাহেবকে একথাও জানালেন যে, রাজধরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব থেকে মুক্তি চান। র‍্যালফ্ লিক্ জাহ্নবী দেবীকে তাঁর ইচ্ছার কথা গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসকে জানাতে বললেন। মিঃ লিকের পরামর্শ অনুযায়ী মহারাণি জাহ্নবী দেবী গভর্নর জেনারেলের নিকট রাজধরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য

আবেদন জানান। কিন্তু গভর্নর জেনারেলের নিকট থেকে অনুমোদন আসতে বিলম্ব হচ্ছিল। এদিকে সমসের গাজী কর্তৃক অনুমোদিত রাজা লক্ষণমাণিক্য শক্তি প্রয়োগে পুনরায় রাজ সিংহাসন দখল করে নিতে সচেষ্ট হলেন। মহারানি জাহ্নবী দেবী কৌশলে তাঁকে বোঝালেন যে, রাজধর সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি লক্ষ্ণণমাণিক্যের পুত্র কুমার দুর্গামণিকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। এরকম একটা সঙ্কটময় মুহূর্তে মহারানি জাহ্নবী দেবী স্বয়ং ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে তুলে দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন।

রানি জাহ্নবী দেবীর শাসনকালের শেষ দিকে ত্রিপুরায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং এই দুর্ভিক্ষ প্রায় দুই বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। রানি জাহ্নবী কুমিল্লায় রানির দিঘি ও রাধানগরে রাধামাধব দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য (১৭৮৫-১৭৯৭)

১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে রাজধরমাণিক্য সিংহাসনে আরোহন করেন। লক্ষ্ণণমাণিক্যের পুত্র দুর্গামণি ঠাকুরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হল। রাজধরমাণিক্য রাজবংশের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজবংশের এটাই প্রথম আত্মীয়তার সম্পর্ক।

ত্রিপুরার ইতিহাসের ইংরাজ-পর্বে র‍্যালফ লিক্ ত্রিপুরার প্রথম রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত হন। রেসিডেন্ট লিক্ ছিলেন অত্যন্ত চতুর ও বিবেকহীন। প্রধানত তাঁরই প্ররোচনায় কৃষ্ণমাণিক্যের পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য বার বার ইংরাজদের হাতে নিগৃহিত হয়ে অপরিসীম দুর্গতি ভোগ করেছিলেন। ত্রিপুরার ইংরাজ প্রভুত্বের বিস্তারের সূচনা ও কলঙ্কিত ইতিহাসের পূর্ণ ও প্রামাণ্য বিবরণ আজও জানা যায়নি। মেকেঞ্জির বিবরণ থেকে জানা যায় যে রাজধরমাণিক্য একদল ডাকাতকে আশ্রয়দানের অপরাধে ১৭৮৩ শে খ্রিস্টাব্দে কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামে বন্দি অবস্থায় ছিলেন। ১৮৩৮ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার জে.জে হার্ভের কাছে প্রেরিত ডেপুটি গভর্নরের একটি আদেশে রাজধরমাণিক্যের গ্রেপ্তারের বৎসর ১৭৮৪ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজধরমাণিক্য অবশ্য নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

রাজধরমাণিক্যের প্রতি ইংরাজদের আক্রোশমূলক মনোভাবের প্রকৃত কারণ অন্যত্র। ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলের প্রতি ইংরাজদের লোভ বরাবরই ছিল। সমগ্র প্রদেশে তৎকালীন অরাজক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনজীবনে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা সহজেই অনুমেয়। এই পরিস্থিতিতে কৃষকরা দলে দলে নিজেদের বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে পাহাড়ের জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই সময়কার সরকারি নথিপত্রে রায়তদের এই ব্যাপক বাস্তুত্যাগের উল্লেখ রয়েছে। এই অবস্থায়

রাজস্বের হার বৃদ্ধি এবং বকেয়া রাজস্বের জন্য ইংরাজদের ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি স্বভাবতই ত্রিপুরাধিপতির বিরক্তির কারণ হয়েছিল। ইংরাজদের অভিযোগ ছিল কোম্পানির দাবি পূরণে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য স্বয়ং ইচ্ছুক হলেও কুমার রাজধরমাণিক্যের প্ররোচনায় তিনি ইংরাজ কালেক্টরের পরোয়ানা বার বার অগ্রাহ্য করার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন।

রাজধরমাণিক্যের রাজত্বকালে বিজয়মাণিক্যের পুত্র রামচন্দ্র ঠাকুর চট্টগ্রামের রিয়াং প্রজাদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করে এবং তাদের সাহায্য নিয়ে ত্রিপুরার সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন। রাজধরমাণিক্য তিন বৎসর পর এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।

প্রকৃতপক্ষে রাজধর একজন স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রাজা ছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত কৃষ্ণমাণিক্যের সঙ্গে রেসিডেন্ট লিকের বিরোধের সময় রাজধর সর্বদাই কৃষ্ণমাণিক্যের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং ইংরেজদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য কৃষ্ণমাণিক্যের সামরিক প্রস্তুতির জন্য রাজধরমাণিক্যই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। রাজধর সত্যই ডাকাতদের আশ্রয় দিয়ে থাকলে কি ধরনের ডাকাতদের আশ্রয় দিয়েছিলেন? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইংরেজ রাজত্বের সূচনায় বাংলাদেশে যে অরাজকতা চলছিল এবং চোর ডাকাতের উপদ্রব বেড়েছিল তার মধ্যে কিন্তু কিছু স্বদেশি স্বেচ্ছাসেবক ইংরেজ বিদ্বেষীরাও ছিল। এ ধরনের স্বদেশি ডাকাতদের আশ্রয় দিয়ে তিনি নিজ ইংরেজ বিরোধী মনোভাবকে চরিতার্থ করতে দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজধরমাণিক্য নিঃসন্দেহে অসীম বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। একথা বলাই বাহুল্য যে প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ত্রিপুরার পক্ষে কোনো দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সংগঠিত করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। তথাপি ইংরাজদের নথিপত্রের বিবরণ অনুযায়ী রাজধরমাণিক্যের ব্যক্তিত্বে তাঁর স্বাধীনচেতা চরিত্রটি কিন্তু সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

দুর্গামাণিক্য (১৮০৯-১৮১৩)

রাজধরমাণিক্যের মৃত্যুর পর ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ দুর্গামণির অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হবার কথা ছিল। কিন্তু রাজধরমাণিক্যের শেষ জীবনে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজকুমার রামগঙ্গা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন এবং রাজধরমাণিক্যের মৃত্যুর সাথে সাথেই তিনি ত্রিপুরার সিংহাসন জোর করে অধিকার করেন। ফলে ত্রিপুরা

রাজ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। রাজপরিবারের লোকেরা এবং মহারাজার কর্মচারীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে কেউ যুবরাজ দুর্গামণির পক্ষে, আবার কেউ বা রাজকুমার রামগঙ্গার পক্ষ ধারণ করেন। এমন কি ত্রিপুরার তদানীন্তন জেলা জজ মিঃ ইলিয়ট রামগঙ্গামাণিক্যের পক্ষে এবং জেলার কালেক্টর দুর্গামণির পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। যুবরাজ দুর্গামণি কুকিদের সাহায্য নিয়ে রামগঙ্গামাণিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন ও তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করতে থাকেন। এই অবস্থায় গভর্নর জেনারেল ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে ১২ আগস্ট এক পত্রে যুবরাজ দুর্গামণিকে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না থেকে দেওয়ানি আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেন। পত্রে গভর্নর জেনারেল জানান যে দুর্গামণি ঠাকুর আদালতে জমিদারির উপর নিজ দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে ত্রিপুরা রাজ্যের উপরও তার দাবি সরকার মেনে নেবেন। যুবরাজ দুর্গামণি তখন রামগঙ্গামাণিক্যের বিরুদ্ধে আদালতে এক মোকদ্দমা করেন। রামগঙ্গামাণিক্যও আদালতে নিজের অধিকার প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হন। ওই মোকদ্দমায় জগন্নাথ ঠাকুরের বংশধর রামচন্দ্র ঠাকুরও নিজ দাবি উত্থাপন করেছিলেন। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থিতাবস্তা বজায় রাখার জন্য রামগঙ্গামাণিক্যই পূর্বের মতো ত্রিপুরা রাজ্য ও জমিদারির শাসনকার্য চালাতে থাকেন। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে একবার কুকিদের আক্রমণে তিনি এতই ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন যে সময়মত ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য না এলে সপরিবারে নিহত হতেন। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ১৮ জুলাই ঢাকা প্রভিন্সিয়াল কোর্টে এই মামলার রায় প্রকাশ হয়। তাতে বলা হয় যে, যেহেতু রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজই রাজা হবার অধিকারী, সেই হেতু যুবরাজ দুর্গামণিই আইনত ত্রিপুরার রাজা ও জমিদারির অধিকারী। এই রায়ের বিরুদ্ধে রামগঙ্গামাণিক্যের আপীল খারিজ হয়ে যায়। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের আদালতের রায় অনুসারে দুর্গামণি চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি প্রাপ্ত হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই মহারাজ দুর্গামাণিক্য নাম নিয়ে ত্রিপুরার রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হন। দুর্গামাণিক্যের সময় থেকেই ইংরেজ সরকার সিংহাসন প্রাপ্তির অনুমোদন হিসাবে ত্রিপুরার রাজাদের কাছ থেকে নজরানা আদায় করতে শুরু করে। দুর্গামাণিক্য বারাণসীতে এক মন্দির নির্মাণ করে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। মহারাজ দুর্গামাণিক্য প্রায় চার বছর রাজত্ব করার পর তীর্থদর্শনে বেরিয়ে পড়ার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেন। রাজ্য ত্যাগ করার পূর্বে রামগঙ্গামাণিক্যকে খবর দিয়ে রাজধানী পুরাতন আগরতলায় আনিয়েছিলেন। উভয়ের মধ্যে আর মনোমালিন্য রইল না। কথিত

আছে রামগঙ্গামাণিক্যকে তিনি বলেছিলেন, আমি তীর্থযাত্রায় বের হচ্ছি। এ রাজ্যে আর ফিরে আসব কি না সন্দেহ। তুমিই আমার পরিবর্তে ত্রিপুরা রাজ্য দেখাশুনা করবে। কিন্তু কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে মহারাজ দুর্গামাণিক্য তীর্থযাত্রায় রওয়ানা হবার পূর্বেই শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের হস্তে রাজ্য ও জমিদারির শাসনভার অর্পণ করে যান।

মহারাজ দুর্গামাণিক্য তীর্থ দর্শন সম্পূর্ণ করে পাটনায় চলে আসেন এবং পাটনাতেই মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ৬ এপ্রিল দেহরক্ষা করেন।

রামগঙ্গামাণিক্য (১৮১৩-১৮২৬)

মহারাজ দুর্গামাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন নিয়ে ত্রিপুরায় আবার গোল শুরু হয়। জজ পেটন সাহেব ত্রিপুরা রাজ্য ও জমিদারির দাবিদারগণকে তাঁদের দাবি পেশ করার জন্য ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ৬ মে তারিখে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। ঘোষণাপত্র অনুযায়ী রামগঙ্গা তাঁর দাবির সপক্ষে জানান, “যেহেতু বর্তমান দরখাস্তকারী হচ্ছেন রাজা রাজধরমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তাঁর পিতা তাঁকে বড়ঠাকুর পদে উন্নীত করেছিলেন এবং যেহেতু রাজা দুর্গামাণিক্যের জীবদ্দশায় কাউকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে যান নি, সুতরাং বর্তমান দরখাস্তকারীই ত্রিপুরার রাজা এবং জমিদারির প্রশাসক হবার যোগ্য অধিকারী”।

উপরোক্ত দাবি পেশ করার পর জজ পেটন আইনগতসিদ্ধ যুবরাজের অভাবে বড়ঠাকুর পদাধিকারী রামগঙ্গামাণিক্যকেই ত্রিপুরার রাজা বলে ঘোষণা করেন। শাস্ত্র অনুসারে তাঁর অভিষেকাদি হতে কিছু বিলম্ব হয়ে যায়। শম্ভুচন্দ্রকে যুবরাজ করার জন্য মহারাজ দুর্গামাণিক্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্গামাণিক্যের জীবদ্দশায় তিনি আর তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে যেতে পারেননি। ফলে শম্ভুচন্দ্রের ত্রিপুরা সিংহাসনে দাবি অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে ইংরেজ সরকার রামগঙ্গামাণিক্যকে খিলাত প্রদান করেন। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে মহাসমারোহে রামগঙ্গামাণিক্যের অভিষেক সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে ইংরেজ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। রামগঙ্গামাণিক্য তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং নিজপুত্র কৃষ্ণকিশোরকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন। আদালতের বিচারে অকৃতকার্য হয়ে শম্ভু ঠাকুর অন্য উপায়ে ত্রিপুরার সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করেন। শম্ভু ঠাকুরের প্ররোচনায় একদল কুকি সহ হালাম উপজাতিরা রামগঙ্গামাণিক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এদের

সাহায্য নিয়ে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর আগরতলা আক্রমণ করেন। রামগঙ্গামাণিক্য এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেও শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে রামগঙ্গামাণিক্যের সংঘর্ষ অনবরত চলতে থাকে।

শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর শুধুমাত্র ত্রিপুরা রাজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে ক্ষান্ত হননি। ইংরাজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও চট্টগ্রামের উপজাতি সম্প্রদায়কে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম চাষি উপজাতি প্রজারা ইংরাজ কর্তপক্ষকে কোনও প্রকার খাজনা দিতে বিরত থাকে। ইংরাজরা চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে এবং ত্রিপুরায় শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এবং গ্রেপ্তারের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর পার্বত্য অঞ্চলে এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ শম্ভুচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পর শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর পুনরায় রামগঙ্গামাণিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে সুবা ধনঞ্জয়ের হাতে শম্ভু চন্দ্র ঠাকুর পরাজিত হন।

রামগঙ্গামাণিক্য রাজা হয়ে উজির দুর্গামণি ও রামহরি বিশ্বাসের উপর রাজ্য ও জমিদারির শাসনভার অর্পণ করেন। উপরন্তু উজির দুর্গামণিকে অনেকগুলি তালুক দান করেন। রামহরি বিশ্বাস বিষগাঁওয়ে অবস্থানকালে সেখানে কালীমন্দির নির্মাণ করে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর নিত্য পূজার্চনার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়েছিল। রামহরির প্রতি অতিরিক্ত স্নেহপ্রীতি দেখে জনৈক ইংরেজ রাজকর্মচারী উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট এক প্রতিবেদনে লিখেছিলেন,-"ত্রিপুরার রাজা দু-একজন বাঙালি আমলার হাতের ক্রীড়নক মাত্র"। মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য একজন ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অভ্যন্তরে গোপীনাথ মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। গোপীনাথের সেবার জন্য উড়িষ্যার দেবোত্তর সম্পত্তি ক্রয় করে তা পাণ্ডাদের অধিকারে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। বৃন্দাবন ধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপনের জন্য গৌরীচন্দ্র চৌধুরী নামে ধার্মিক ব্যক্তিকে মন্দির নির্মাণের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন। গৌরীচন্দ্র বৃন্দাবনে কুঞ্জ নির্মাণ করে শুভদিনে সেখানে রাহবিহারীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আজও সেই কুঞ্জ 'ত্রিপুরা মহারাজার কুঞ্জ' নামে পরিচিত। মোগরা গ্রামের সন্নিকটে একটি বিশাল দিঘি খনন করেছিলেন। দিঘির নাম গঙ্গাসাগর। তিনি স্বীয় গুরু ও গুরুপত্নীর নামানুসারে ভুবনমোহন ও কিশোরী দেবীর মূর্তি নির্মাণ করে আগরতলায় স্থাপন

করেছিলেন।

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর ধর্মপরায়ণ রাজা রামগঙ্গামাণিক্য পরলোক গমন করেন।

কাশীচন্দ্র মাণিক্য (১৮২৬-১৮২৯)

মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্যের মৃত্যুর পর তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীচন্দ্র ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে আরোহণের চার মাস পর ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাকে খেলাত প্রদান করে। এদিকে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর পার্বত্য ত্রিপুরা অধিকারের জন্য এক উপায় অবলম্বন করেন। পঁচিশ হাজার টাকা রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে পার্বত্য ত্রিপুরা বন্দোবস্ত নেওয়ার জন্য তিনি গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদন করেন। গভর্নর জেনারেল এই আবেদন অগ্রাহ্য করেন। মহারাজ কাশীচন্দ্রমাণিক্য উপলব্ধি করলেন শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের শত্রুতা রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। এই কারণে মহারাজ কাশীচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে ডেকে তাঁর সঙ্গে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করেন। তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য মাসিক পাঁচশত টাকা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর কুমিল্লায় শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন শুরু করেন।

অপরদিকে নিয়মিত রাজস্ব আদায় ও দক্ষ জমিদারি পরিচালনার উদ্দেশ্যে কাশীচন্দ্রমাণিক্য এফ. কোরজোন নামে এক সাহেবকে চাকলা রোশনাবাদের ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করেন। এই প্রথম ত্রিপুরা সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিজ্ঞ সাহেব কর্মচারি নিয়োগ শুরু হয়।

কাশীচন্দ্রমাণিক্যের আমলেই ত্রিপুরা শ্রীহট্ট কাছাড় জেলার সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়। সীমান্ত পুনর্গঠনের নামে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যের কয়েকশ বর্গমাইল সমতল ও চাষের জমি দখল করে নেয়।

কাশীচন্দ্রমাণিক্যের আমলেই মণিপুরের রাজা ইংরেজ সরকারের কাছে এক আবেদনে জানান যে ত্রিপুরার রাজা মণিপুরের সীমানার অন্তর্গত থাঙ্গুম অঞ্চল দখল করে নিতে উদ্যত, যে অঞ্চলটিতে মণিপুর রাজ্যের একটি থানা ছিল। এই ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য ইংরেজ সরকার শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনার অঞ্চলটি মণিপুর রাজ্যের অধিকারে ছিল বলে শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনার অঞ্চলটি মণিপুর রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত রাখার প্রস্তাব দেন। ইংরেজদের পক্ষ থেকে অঞ্চলটি দখল না

করার জন্য কাশীচন্দ্রমাণিক্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

শেষ জীবনে কাশীচন্দ্রমাণিক্যের সঙ্গে যুবরাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের মত বিরোধ হলে কাশীচন্দ্র উদয়পুরে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য(১৮৩০-১৮৪৯)

মহারাজ কাশীচন্দ্রমাণিক্যের পর ইংরেজ গভর্নমেন্টের খিলাত লাভ করে যুবরাজ কৃষ্ণকিশোর ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ত্রিপুরা জেলার জজ মি.টমসন আগরতলায় মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যকে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক প্রদত্ত সনদ ও খিলাত প্রদান করেন। অভিষেকের সময় কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ইংরেজ গভর্নমেন্টকে নজরানা হিসাবে সমর্পন করেন। সেই সময় তিনি তাঁর আড়াই বৎসর বয়স্ক পুত্র ঈশানচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যর রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা পুরাতন হাবেলি বা আগরতলা থেকে নতুন হাবেলি অর্থাৎ বর্তমান আগরতলার রাজধানী স্থাপন (১৮৩০)। শুরু হল পুরাতন আগরতলা থেকে রাজধানী, ব্রিটিশ ভারতের রেললাইনের কাছাকাছি ব্যাবসা-বাণিজ্য, যাতায়াত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণের জন্য এরই নিকটবর্তী বর্তমান আগরতলায় সরিয়ে আনার পরিকল্পনা।

মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য একজন অমিতব্যয়ী নরপতি ছিলেন। অর্থের জন্য তিনি উজির দুর্গামণিকে বারবার চাপ দিতেন ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে ও চাকলা রোশনাবাদ এলাকার তিনি বাঁশ, তুলা ইত্যাদির উপর শুল্ক আদায়ের চেষ্টা করলে স্থানীয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। চট্টগ্রামের কমিশনার মিঃ হার্ভে পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বলে দাবি করেন এবং ত্রিপুরা রাজ্য খাস দখল করার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠান। রাজা এবং কলিকাতাস্থ এজেন্ট বিগনেল সাহেব এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে ডিসেম্বর বাংলার ডেপুটি গভর্নর হার্ভেকে এ চিঠিতে জানান যে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল রাজার স্বাধীন এলাকা। এটি অধিকার করে নেবার প্রস্তাব একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। রাজা তাঁর পার্বত্য এলাকায় যে কোনো শুল্ক ইচ্ছামতো আদায়ের অধিকারী।

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজপরিবারের রামকানু ঠাকুর তিন চার শত কুকি,

চাকমা, মগ ও ত্রিপুরীদের দ্বারা গঠিত একটি দল নিয়ে ত্রিপুরা জেলার খণ্ডলের এক ভূমধ্যধিকারী মেরকি চৌধুরীর বাড়ি আক্রমণ করে ভস্মীভূত করে। এই আক্রমণে পনেরো জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকলে কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য রামকানু ঠাকুরকে বন্দি করে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের পুত্র ভগবানচন্দ্র ঠাকুর ত্রিপুরা জেলায় ছাগলনাইয়া থানার একটি গ্রাম কুকিদের সাহায্যে লুন্ঠন ও ভস্মীভূত করেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যকে এই ঘটনার জন্য দোষারোপ করেন। ত্রিপুরার সীমান্তে উপযুক্ত রক্ষী না রাখার ফলেই ভগবান চন্দ্র ঠাকুরের নেতৃত্বে কুকিরা ত্রিপুরারাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করে ব্রিটিশ এলাকায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। কুকিদের দৌরাত্ম্য ক্রমশ বেড়েই চলছিল।১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ১৬ এপ্রিল লালচোকলার নেতৃত্বে কিছু কুকি সম্প্রদায়ের লোক বোচাবাড়ি নামে এক মণিপুরি অধ্যুষিত অঞ্চলে লুঠতরাজ ও ব্যাপক নরহত্যা শুরু করলে ইংরেজ সরকার কুকিদের দমন করার জন্য কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের সাহায্য চান। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার করতে অক্ষম হওয়ায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ক্যাপ্টেন ব্লেকউডের অধীনে শ্রীহট্ট থেকে একদল সৈন্যকে কুকিদের দমন করতে প্রেরণ করেন। লালচোকলার গ্রাম অবরোধ করার পর ৪ ঠা ডিসেম্বর লালচোকলা ক্যাপ্টেন ব্লেকউডের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কৈলাসসিংহের মতে ত্রিপুরা রাজার জনৈক সেনাপতি কেলি ফিরিঙ্গি লালচোকলাকে গ্রেপ্তার করে ব্লেকউডের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। লালচোকলা তার অপরাধ স্বীকার করার পর তাকে দ্বীপান্তরিত করা হয়।

কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য ফার্সি ভাষা জানতেন। শাস্ত্রবিদ্যা ও মল্লযুদ্ধেও সুনিপুণ ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর রাজত্বকালে দুর্গামণি উজির রাজমালার ষষ্ঠ খণ্ড সংকলন করেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে আকস্মিক বজ্রাঘাতে কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের মৃত্যু হয়।

ঈশানচন্দ্রমাণিক্য (১৮৫০-১৮৬১)

পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য ত্রিপুরার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের রাজ্যাভিষেককালে ইংরেজ সরকার ১২৫টি স্বর্ণমুদ্রা নজরানা হিসাবে দাবি করেন। শেষ পর্যন্ত ১১১টি স্বর্ণমুদ্রা ইংরেজ সরকারকে নজরানা হিসাবে দেওয়া হয়। ভারতে ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ত্রিপুরার রাজারা

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাজ্যাভিষেক কালে নজর স্বরূপ কয়েকটি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা ইংরেজ সরকারের দাবিতে পরিণত হয়। সুযোগ বুঝে ইংরেজ সরকার নজরানার পরিমাণ বাড়াতেই থাকে। অভিষেককালে ঈশানচন্দ্রমাণিক্য তাঁর পরবর্তী ভ্রাতা উপেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুরকে যুবরাজ ও জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুরকে বড়ঠাকুর নিযুক্ত করেন।

সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকেই ঈশানচন্দ্রমাণিক্য কঠিন আর্থিক সংকটে পড়েন। পিতৃঋণ এগারো লক্ষ টাকা। বলরাম হাজারিকে উপযুক্ত ভেবে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করে রাজ্য ও জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ফল বিপরীত হল। বলরাম ও তাঁর ভ্রাতা শ্রীদামের দুর্ব্যবহারে ত্রিপুরার উপজাতি প্রজাগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কীর্তি ও পরীক্ষিৎ নামে দুজন ত্রিপুরী উপজাতিদের সংঘবদ্ধ করে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। একদিন গভীর রাতে তারা বলরামের বাড়ি আক্রমণ করে, বলরাম কোনোক্রমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। শ্রীদাম কীর্তির হস্তে নিহত হন। মহারাজ ঈশানচন্দ্র শেষ পর্যন্ত, বলরামের শত্রুদের বন্দি করে কারাগারে আবদ্ধ করেন। সুযোগ বুঝে যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র একদিন কীর্তিকে হত্যা করেন। বলরামের প্রতি যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রের কিছুটা দুর্বলতা ছিল। এই সুযোগে বলরাম রামমাণিক্য, বর্মন, কাপ্তুল সর্দার খাঁ, ছোবল খাঁ প্রমুখ কয়েকজন সৈনিকের সঙ্গে পরামর্শ করে মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যকে হত্যা করার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য বিশ্বস্ত অনুচর মারফত তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন। তিনি চক্রান্তকারীদের সমস্ত চক্রান্ত বন্ধ করার জন্য গোপনে বিশেষ উদ্যোগ নিতে লাগলেন। সুযোগ বুঝে ঈশানচন্দ্রমাণিক্য কাপ্তুল সর্দার খাঁকে বন্দি করে তাকে ত্রিপুরা থেকে নির্বাসিত করেন। তারপর বলরাম ও রামমাণিক্যকে বন্দি করে তাঁদেরকেও নির্বাসনে পাঠান। তারপর ব্রজমোহন ঠাকুরকে বলরামের স্থলাভিষিক্ত করেন।

ব্রজমোহন ঠাকুরও ঋণশোধে ব্যর্থ হন। ইংরেজ সরকারকে রাজস্ব দেবার কোনও উপায় নেই দেখে চাকলা রোশনাবাদ বিক্রয় করে দেবার প্রস্তাব উঠল। এই অবস্থায় কলকাতা থেকে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে চাকলা রোশনাবাদের ম্যানেজার করে আনা হল। তিনি সব ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করবেন। রাজা

তাকে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করতে উদ্যত হলে রাজগুরু প্রভু বিপিনচন্দ্র গোস্বামী আপত্তি জানান। এই অবস্থায় প্রভুভক্ত ঈশানচন্দ্রমাণিক্য গুরু বিপিনচন্দ্র গোস্বামীর হাতেই ত্রিপুরা রাজ্য ও জমিদারির ভার অর্পণ করেন। গুরু বিপিনচন্দ্র গোস্বামী বিশেষ বুদ্ধি বলে ও সুকৌশলে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। তিনি ত্রিপুরার রাজাদের দেওয়া বহু নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অনেকটা মজবুত করেন। ঋণের পরিমাণও ধীরে ধীরে কমতে লাগল। কিন্তু গুরুর অপ্রতিহত ক্ষমতায় রাজপরিবারের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়।

ঈশানচন্দ্রমাণিক্য আর এক সমস্যার সম্মুখীন হলেন। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ শুরু হলে একদল বিদ্রোহী ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে রাজার সাহায্য প্রার্থী হয়। রাজা তাদের সাহায্য না করে কয়েকজন সিপাহিকে বন্দি করে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। তা সত্ত্বেও কিছু ইংরেজ কর্মচারী, রাজা বিদ্রোহী সিপাহিদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এই অভিযোগ করে শাস্তিস্বরূপ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে স্বাধীন ত্রিপুরার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার দাবি জানান। পরিশেষে বিচারক ম্যাটকাফের মধ্যস্থতায় এই প্রচেষ্টা কার্যকর হয়নি। রাজা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান। এই সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার তাঁর স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল পুস্তকে লিখলেনঃ রাজার অধীনে যে ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী ছিল তাদের পক্ষে বিদ্রোহী সিপাহিদের প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। তবে তিনি নির্দেশ পাঠালেন ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে সকল বিদ্রোহী পাওয়া যাবে তাদের সকলকেই যেন বন্দি করে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পণ করা হয়।

Webstar-এর Eastern District Gazeteers এর Tipperah Vol-এ বলা হয়েছে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ত্রিপুরাকে প্রভাবিত করেনি। অবশ্য ১৮৫৭ সালে নভেম্বর মাসে একটি গুজব রটে যে বিদ্রোহীদের তিনটি কোম্পানির সেনাবাহিনী পার্বত্য ত্রিপুরার দিকে এগিয়ে আসছে। এই গুজবের ফলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বিদ্রোহীরা কুমিল্লায় যাওয়ার পথে রাজার পুলিশ এবং সেনাদলের বাধা পেয়ে ওরা উত্তর অভিমুখে সমতলের দিকে চলে যায়।

ত্রিপুরার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক, কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর, রাজমালা গ্রন্থে লিখলেনঃ ১৮৫৭খ্রিস্টাব্দে 'সিপাহি বিদ্রোহের' সময়ে চট্টগ্রামের বিরোধী সৈন্যগণ সাহায্য লাভের আশায় ত্রিপুরাধিপতির নিকট আসছে। এই সংবাদ

শ্রবণ করে ঈশানচন্দ্র বিদ্রোহী সিপাহীদের ত্রিপুরা থেকে বার করে দিতে আদেশ করেন। বিদ্রোহীরা সেই আদেশ অবহেলাপূর্বক আগরতলার নিকটবর্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহারাজ এই সংবাদ অবগত হয়ে সিপাহিদের বন্দি করে কুমিল্লার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করেন। তথায় তাদের ফাঁসি হয়েছিল।

মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের ১২৬৭ ত্রিপুরাব্দ, ২৫ শে অগ্রহায়ণের ৩২০ নং চিঠি পাঠে জানা যায় যে, ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর বিভাগে, বিদ্রোহী সৈন্যগণের অনুসন্ধান ও গতিরোধের জন্য ত্রিপুরা সৈন্য প্রেরিত হয়েছিল। তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত সময়ে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করার জন্য মহারাজের পক্ষ থেকে গোলকচন্দ্র সিংহ মহাশয় পলিটিক্যাল অফিসার স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় সিপাহি বিদ্রোহকালে মহারাজা ঈশানচন্দ্র ব্রিটিশের সম্পূর্ণ সহায়ক ছিলেন, কেননা তাঁর নির্দেশ ছিল ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে সকল বিদ্রোহী পাওয়া যাবে তাদের সকলকেই যেন বন্দি করে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করা হয়। উল্লেখ্য, উপরোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী যখন দেখা গেল, কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী সেনা রাজনির্দেশ অবহেলা করে আগরতলার নিকটবর্তী স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন, তখন তাদের সকলকেই বন্দি করে কুমিল্লায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও সন্দেহ কিন্তু থেকে যায়, সম্ভবত বিদ্রোহী সিপাহিদের প্রতি ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের একটু দুর্বলতা ছিল। কারণ কোম্পানি সরকারের কাছে অতীতে এবং ঈশানচন্দ্রের আমলেও ত্রিপুরার রাজারা অযথা হয়রানি, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত ঃ বিদ্রোহী সিপাহিদের গতিবিধি বন্ধ করতে ঈশানচন্দ্র বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন বলে কোনও রিপোর্ট নেই। তৃতীয়ত, সংসদীয় নথিপত্রে উল্লেখ আছে যে ত্রিপুরার সরকারি কর্মচারীরে মহারাজ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের এই বিদ্রোহ দমনে সাধ্যমত সাহায্য দেবেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি কী পরিমাণ সাহায্য করেছিলেন তার কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। চতুর্থত, বিদ্রোহীগণকে দক্ষিণ সীমান্তে বাধা না দিয়ে আগরতলা বা উদয়পুরের কাছাকাছি আসবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কেন? পঞ্চমত, ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার কুকিরা বিদ্রোহ করলে ত্রিপুরেশ্বর তাদের দমন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে ব্রিটিশ সরকারের আদেশ লঙ্ঘন করেছিলেন। তবে একথা অনস্বীকার্য ব্রিটিশকে সাহায্য করে ত্রিপুরার রাজদরবারের নীতিবিরুদ্ধ কাজ করা ঈশানচন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল কিনা তাও যথেষ্ট সন্দেহজনক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ত্রিপুরায় বিদ্রোহ

তিপ্রা বিদ্রোহ (১৮৫০)

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে তিপ্রা বিদ্রোহ(১৮৫০)মূলত সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১ফেব্রুয়ারি মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঈশানচন্দ্রমাণিক্য সিংহাসনে বসেই তাঁর প্রিয় অনুচর বলরাম হাজারি নামক এক ব্যক্তিকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করে তাঁর উপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করেন। বলরামের প্রধান সহকারী হয় তাঁর ভ্রাতা শ্রীদাম হাজারিকা। এই দুই ভ্রাতা একত্রে ত্রিপুরাবাসীগণকে শোষণ ও শাসনে জর্জরিত করে তোলেন। ত্রিপুরার যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন এদের পৃষ্ঠপোষক। ক্রমে ক্রমে তাঁদের অত্যাচার জনসাধারণের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ বার বার এর প্রতিকার প্রার্থনা করেও কোনও ফল না হওয়ায় জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে এর প্রতিকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। বিদ্রোহের পথকে তারা অত্যাচার নিবারণের একমাত্র পথ বলে গ্রহণ করে। তাদের নেতৃপদে আবির্ভূত হন পরীক্ষিৎ ও কীর্তি নামে দুজন ত্রিপুর সর্দার। পরীক্ষিৎ ও কীর্তি বহু কুকি ও ত্রিপুর যুবককে সংগ্রহ করে একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে এক রাত্রে তারা বলরাম হাজারিকার বাসভবন আক্রমণ করে। বলরাম হাজারিকার রক্ষীরা বাধা দিতে গিয়ে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। এই বিদ্রোহ 'তিপ্রা বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। শেষ পর্যন্ত রাজার সেনাদলের তৎপরতায় এই বিদ্রোহ দমন করা হল। বিদ্রোহীদের অনেককেই বন্দি করা হল এবং বিদ্রোহীদের অন্যতম নায়ক কীর্তিকে যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রের প্রেরিত গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা নিহত করা হল।

এই বিদ্রোহ দমনের পর কোনও এক কারণে বলরাম হাজারিকা রাজা

ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের প্রতি অসন্তুষ্ঠ হন এবং গোপনে একদল সৈন্য দ্বারা বিদ্রোহ সংঘটিত করে যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভাগ্যচক্রে এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। রাজা ঈশানচ ন্দ্রমাণিক্য বলরাম হাজারিকাকে পদচ্যুত করেন এবং অনুচর সহ তাঁকে রাজ্য থেকেও নির্বাসিত করেন।

১৮৫৭- খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ ও ত্রিপুরা

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মহাবিদ্রোহ শুরু হলে ৮ই নভেম্বর চট্টগ্রামে ৩৪ নং পদাতিক বাহিনীর সৈন্যরা বিদ্রোহ করে এবং সরকারি কোশাগার থেকে ২,৭৮ ২৬৭৫ টাকা লুন্ঠন করে সরকারি পিলখানা থেকে ৩টি হস্তী নিয়ে ত্রিপুরা অভিমুখে যাত্রা করে। ওই সময় ত্রিপুরার সামরিক শক্তি খুবই দুর্বল ছিল এবং রাজার আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাছাড়া রাজপরিবারের মধ্যে তখন নানারকম ষড়যন্ত্র চলছিল। এই অবস্থায় বিদ্রোহী সিপাহিদের সাহায্য ও আশ্রয় দিয়ে ইংরাজদের সঙ্গে প্রকাশ্য শত্রুতা করার মতো শক্তি ও সাহস ত্রিপুরার রাজার ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের পিতা রাজা কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের আমল থেকেই ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক ভালো ছিল না। বহু সময় এমন অবস্থা হয়েছে যে ইংরাজের নিকট রাজারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছেন। রাজকোষ অর্থশূন্য, কুমিল্লার 'শুকল' উপাধিধারী দেশওয়ালি এবং বহুবিধ স্বার্থান্বেষী উত্তমর্ণগণের নিকট ত্রিপুরাপতিগণ প্রায় বিক্রীত, রাজপরিবারে রাজ্যলোভ এবং রাজানুগ্রহের দলাদলিতে ও পরস্পর বিদ্রোহে সকলেই নিপীড়িত। প্রজাগণেরও এই অবস্থায় দুর্গতির সীমা ছিল না। সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী রক্ষা করার মতো অর্থও রাজার ছিল না এবং ব্যবস্থাও ছিল না। এমতাবস্থায় চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সৈন্যগণ সাহায্য লাভের আশায় ত্রিপুরাপতির নিকট আসছে, এই সংবাদ শুনে রাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্য বিদ্রোহী সিপাহীদের ত্রিপুরা থেকে বের করে দিতে আদেশ করেন। সিপাহিরা ত্রিপুরার রাজার আদেশ শুনে ত্রিপুরা পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ রাজ্য কাছাড়াভিমুখে রওনা হয়। কয়েকজন বিদ্রোহী রাজার আদেশ উপেক্ষা করে আগরতলায় নিকটবর্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য এই সংবাদ পেয়ে সিপাহিদের বন্দি করে কুমিল্লার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পণ করেন। তথায় সিপাহিদের ফাঁসি হয়।

মহারাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের ১২৬৭ ত্রিপুরাব্দের ২৫ শে অগ্রহায়ণের ৩২০ নং চিঠিতে জানা যায় যে ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর বিভাগে বিদ্রোহী

সৈন্যগণের অনুসন্ধান ও গতিরোধের জন্য ত্রিপুরা সৈন্য প্রেরিত হয়েছিল। বিদ্রোহীগণের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত সময়ে সমস্ত অবস্থা উত্থাপন করার জন্য মহারাজের পক্ষে গোলকচন্দ্র সিংহ ''পলিটিক্যল অফিসার" স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন।

গভর্নমেন্ট সন্দেহবশত ত্রিপুরেশ্বরকে বিদ্রোহীগণের সাহায্যকারী বলে মনে করে ত্রিপুরা রাজ্য দখল ও ত্রিপুরা পতিকে কারারুদ্ধ করার জন্য অনুমতি প্রচার করেন। পরিশেষে জজ মেটকাফ সাহেব গভর্নমেন্টের অমূলক সন্দেহ ও ভ্রম প্রদর্শন করে ত্রিপুরা রাজকে রক্ষা করেন। এ সম্পর্কে শশীভূষণ চৌধুরী বলেন, 'তদানীন্তন ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ দুর্গতিপূর্ণ অবস্থায় মহারাজার সিপাহিদিগকে বাধা দেবার উপযুক্ত ক্ষমতা ছিল না। অথবা বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ত্রিপুরা অতিক্রম করিয়া শ্রীহট্ট ইত্যাদি অঞ্চলে যাইবার উদ্দেশ্য বুঝিয়া পরোক্ষভাবে রাজ্য অতিক্রম করিতে সাহায্য করা হইয়াছিল। এই কাজে হয় বিদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নদের রাজপরিবারের কতক সহযোগিতা ছিল।

বিদ্রোহী সিপাহিদের প্রতি রাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের গোপন সহানুভূতি বা সমর্থন ছিল কিনা তা না জানা গেলেও ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের প্রজারা যে বিদ্রোহী সিপাহিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তা সিপাহিদের পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে নির্বিঘ্নে কিছুদিন বসবারে মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়। সিপাহিদের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত এবং ত্রিপুরার উপজাতীয় প্রজারা রাজার সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে সিপাহিদের বন্দি করা খুব কঠিন কাজ হত না। একথা সত্য ত্রিপুরার রাজা বিদ্রোহী সিপাহিদের বহিস্কারের আদেশ দিয়েছিলেন তাদের বন্দি করার ইচ্ছা রাজার ছিল না।

বিদ্রোহকালে মহারাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্য সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশের সহায়ক ছিলেন কিনা সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। তিনি তাঁর রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহী সৈনিকদের গতিবিধি বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন এমন কোনও রিপোর্ট নেই। Parliamentary Papers - এ উল্লেখ আছে যে ত্রিপুরার মহারাজ সরকারি কর্মচারীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের এই বিদ্রোহ দমনে সাধ্যমতো সাহায্য করবেন। কিন্তু তিনি কি পরিমাণ সাহায্য করেছিলেন তার কোনও বিবরণ নেই। কিন্তু সমসাময়িক ত্রিপুরার প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ-এর

বিবরণে ত্রিপুরেশ্বরকে বিদ্রোহীগণের সাহায্যকারী ও রাজাকে কারারুদ্ধ করবার জন্য গভর্নমেন্টের অনুমতি দানের কথার উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোম্পানি সরকারের হাতে বিদ্রোহীদিগকে ত্রিপুরা রাজ্যের সাহায্য ও সহায়তা সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গোপন সংবাদ না থাকলে একজন স্বাধীন দেশীয় নরপতি সম্পর্কে ইংরেজ সরকার এইরূপ মনোভাব পোষণ করতেন না। তবে একথা অনস্বীকার্য ব্রিটিশ শক্তিকে সাহায্য করে ত্রিপুরার রাজদরবারে -নীতি বিরুদ্ধ কাজ করা ঈশানচন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

১৮৫৭খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী একশত বৎসরের শোষণ শাসনেরই চরম পরিণতি। ইংরেজ শাসক এই একশত বৎসরে সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রাস করে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন চূর্ণ করে ক্রমবর্ধমান পুরাতন ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের সর্বগ্রাসী শোষণের পথ প্রস্তুত করে। এই সর্বাত্মক ধ্বংসের মধ্যেই ইংরেজ শাসনের কবল হতে মুক্তিলাভ ও ভারতের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারত জুড়ে শুরু হওয়া মহাবিদ্রোহের ঝড় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

ত্রিপুরার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর রাজমালা গ্রন্থে লিখেছেন "১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহিদের বিদ্রোহিদের সময়ে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সেনাগণ সাহায্য লাভের আশায় ত্রিপুরাপতির নিকট আসিতেছে এ সংবাদ শ্রবণ করে ঈশানচন্দ্রমাণিক্য তাহাদিগকে ত্রিপুরা হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ করেন। তাছাড়া সেই আদেশ শ্রবণে বিদ্রোহীরা ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক ব্রিটিশ রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক ব্রিটিশ রাজ্য কাছাড়িমুখে প্রস্থান করে। কয়েকজন বিদ্রোহী সেই আদেশ অবহেলা পূর্বক আগরতলার নিকটবর্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহারাজ এই সংবাদ অবগত হইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া কুমিল্লাস্থ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। তথায় তাদের ফাঁসি হইয়াছিল। মহারাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের ১২৬৭ ত্রিপুরাব্দের অংশে অগ্রহায়ণের ৩২০ নং চিঠি পাঠে জ্ঞাত হওয়ায় যে ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর ভাগে বিদ্রোহী সৈন্যগণের অনুসন্ধান ও গতিরোধের জন্য ত্রিপুরা সৈন্য প্রেরিত হয়েছিল। তাহাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণকে উপযুক্ত সময়ে অবস্থা জ্ঞাপন করার জন্য মহারাজের পক্ষে গোলকচন্দ্র সিংহ মহাশয় পলিটিক্যাল অফিসার' স্বরূপ প্রেরিত

হইয়াছিলেন। গভর্নমেন্ট সন্দেহ দ্বারা পরিচালিত ত্রিপুরেশ্বরকে বিদ্রোহীগণের সাহায্যকারী বলিয়া ত্রিপুরা রাজ্য দখলে ত্রিপুরাপতিকে কারারুদ্ধ করিবার জন্যে অনুমতি প্রচার করেন। জজ মেটকাফ সাহেব গভর্নমেন্টের অমূলক সন্দেহ ও ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ত্রিপুরা রাজ্য রক্ষা করেন"।

ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর 'রাজমালা' গ্রন্থে ত্রিপুরেশ্বরকে বিদ্রোহীদের সাহায্যকারী ও রাজাকে কারারুদ্ধ করার জন্য গভর্নমেন্টের অনুমতি প্রচারের কথা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্পর্কে ডক্টর শশীভূষণ চৌধুরী বলেন, "জজ মেটকাফ ইংরেজ আদালতে কোনও উপস্থাপিত মামলা উপলক্ষে হয়তো এই সন্দেহমূলক বলে মত প্রকাশ করেন।

সিপাহি বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ শাসন তাসের ঘরের মতো শূন্যে ভেসে যাচ্ছিল তখন সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করার জন্য চট্টগ্রাম ইংরাজ সরকারের হাতে তিনশত সৈন্য ছিল। সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে কারাগারের দরজা ভেঙে বন্দিদের মুক্ত করে রাজগির ধনাগার লুণ্ঠন করে মোট (২৭৮২৬৭৫) টাকা সাতাশ লক্ষ বিরাশি হাজার ছয়শত পঁচাত্তর টাকা পায়। তারপর সরকারি পিলখানা থেকে তিনটি হাতি নিয়ে ত্রিপুরা অভিমুখে রওয়ানা হয়। এই সংবাদ পেয়ে কুমিললার জনগণ এবং ইংরেজ সরকারি কর্তৃপক্ষরা ভয়ে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। সৌভাগ্যবশত সিপাহিরা কুমিল্লা পরিত্যাগ করে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার পথ অবলম্বন করেছিল। তারা মহারাজের আদেশ শুনে ত্রিপুরারাজ্য ছেড়ে কাছাড় অভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে লাতু নামক স্থানে শ্রীহট্টের ইংরাজ পদাতিক দলের সঙ্গে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীদের গুলিতে প্রথমেই মেজর বিঙ্-এর মৃত্যু হয়। মেজর সাহেবের মৃত্যুর পর সুবেদার অযোধ্যা সিংহ জয়লাভ করেন। মণিপুরের রাজকুমার চাইহুম(নরেন্দ্রজিৎ) এই সময়ে কাছাড়ে ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন। তখন মণিপুরের রাজাসন তাদের প্রধান লক্ষ্য হল। মহারাজ চন্দ্রকীর্তি এই সংবাদ শ্রবণমাত্র চারশত সৈন্য তাদের বিরুদ্ধে পাঠালেন। ঘোর সংগ্রামে বিদ্রোহীগণ পরাজিত হল। আহত অবশিষ্ট অল্প সংখ্যক বিদ্রোহী কুকিদের আশ্রয় গ্রহণ করে।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট যে ইংরেজের দেশীয় সিপাহিগণ চট্টগ্রামে বিদ্রোহ করে ও ধনাগার লুণ্ঠন করে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করেছিল। ওদের লক্ষ্য ছিল কুমিল্লায় সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহ সঞ্চার করা। তারপর ক্রমে শ্রীহট্ট, মণিপুর এবং আসামের উত্তর অঞ্চল অভিযান করা। সিপাহিদের ভবিষ্যতের লক্ষ্য অনুযায়ী

ত্রিপুরা রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে অনুপ্রবেশ ও অতিক্রম স্বভাবতই সহজসাধ্য ছিল। চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহিদের ত্রিপুরাতে আস্তানা গাড়ার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। অপর দিকে ত্রিপুরার রাজা বিদ্রোহী সিপাহিদিগের সহায়তায় অন্যকোনও গোপন পরিকল্পনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করবেন এইরূপ চিন্তাভাবনাও অমূলক। মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের পূর্ব থেকেই ত্রিপুরার অবস্থা ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। তখন এমন অবস্থাও গিয়েছে যে ইংরেজের নিকটও রাজারা সন্দিগ্ধ, লাঞ্ছিতও অপমানিত এবং রাজকোষ অর্থশূন্য। প্রজাগণের দুর্গতির সীমা ছিল না। ত্রিপুরা রাজ্যের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী রক্ষা করার মতো অর্থও ছিল না।

প্রশ্ন হতেই পারে অগ্রগামী বিদ্রোহীগণকে রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে বাধা না দিয়ে আগরতলা বা উদয়পুরের কাছাকাছি আসার সুযোগ দেওয়া হল কেন? এই বিষয়ে ডঃ শশীভূষণ চৌধুরীর মতামত যথেষ্ট মূল্যবান মনে হয়। তিনি বলেন ঃ প্রথমত, তদানীন্তন ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ দুর্গতিপূর্ণ অবস্থায় মহারাজার পক্ষে সিপাহিদিগকে বাধা দিবার উপযুক্ত ক্ষমতা ছিল না। দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল ত্রিপুরা অতিক্রম করে শ্রীহট্ট ইত্যাদি অঞ্চলের দিকে প্রবেশ করা। তৃতীয়ত, ইংরেজের দিক থেকে বিদ্রোহীদের গতিরোধ করায়, শক্ত নির্দেশের বলে ইংরেজ দেখানো কিছু ব্যবস্থা হয়েছিল। দু-চারজন বিদ্রোহী ধরাও পড়েছিল, কিন্তু এই ধরা পড়া সম্পর্কে রাজ্য রাজ্যবাসী ইংরেজের চরকে সাহায্য করেছিল এইরূপ জানা যায়নি। চতুর্থত, ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তার লিপ্সা এবং ডালহৌসির Doctrine এর তোপের মুখে ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের মতো দুর্বল রাজার পক্ষে বিদ্রোহীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা কতটুকু সম্ভব ছিল তা বিবেচনার বিষয়। পঞ্চমত, অধস্তন ইংরেজ কর্মচারীদের নিজেদের সাফাই দেওয়ার প্রয়োজনও হয়েছিল কিনা এবং সেই স্বার্থের প্রয়োজনে দেশীয় স্বাধীন রাজ্য ত্রিপুরার বিরুদ্ধে রিপোর্ট রচিত হয়েছিল কিনা তাহাও দেখবার বিষয়। তদানীন্তন রাজমন্ত্রী হয়তো রাজার রাজ্য ও গদি রক্ষার জন্য ইংরেজ নির্দেশিত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকতে পারেন। পরিশেষে বলা যেতে পারে বিদ্রোহী সিপাহিরা ত্রিপুরা অতিক্রম করে তাদের লক্ষ্য ও গন্তব্যের পথে যেতে ত্রিপুরার জনসাধারণ থেকে সমর্থন কিছুটা পেয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোনো কোনো পার্বত্য জাতি ও সর্দার বিদ্রোহীগণকে সাময়িক আশ্রয় দিয়ে তাদের অভিযান অগ্রগামী করার সুবিধা করে দিয়েছিল। রাজ্যের মধ্যবর্তী অমরপুর অঞ্চলে কোনো প্রতাপশীল সর্দার কর্তৃক বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করবার

অজুহাতে ইংরাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত হবার সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল।

কোনও কোনও মহলে সন্দেহ আছে বিদ্রোহকালে মহারাজা ঈশানচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশের সহায়ক ছিলেন কিনা। তিনি তাঁর রাজ্য মধ্যে বিরোহী সিপাহিদের গতিবিধি বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন বলে কোনও রিপোর্ট নেই।

Parliamentary Paper - এ উল্লেখ আছে যে ত্রিপুরা রাজ ইংরেজ সরকারি কর্মচারীদিগকে আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি তাদের এই বিদ্রোহ দমনে সাধ্য মতো সাহায্য করবেন। কিন্তু তিনি কি পরিমাণ সাহায্য করেছিলেন তার কোনও বিবরণ নেই। মোটের উপর ব্রিটিশকে সাহায্য করে ত্রিপুরার রাজদরবারের নীতিবিরুদ্ধ কাজ করা ঈশানচন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল কিনা তা সন্দেহজনক।

কুকি-অভ্যুত্থান (১৮৬০-৬১)

ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বের শেষ দিকে ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। এই সময় পার্বত্য প্রজাদের করের বোঝা বৃদ্ধি পায়। শুধু ঘর চুক্তি কর নয়, বাঁশ, তিল ও কার্পাসের উপরও শুল্ক বৃদ্ধি পেল। অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় কুকি এবং রিয়াংদের করের হার ছিল বেশি। এজন্য বার বার আবেদন নিবেদন করেও তারা কোনো প্রতিকার পায়নি।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের কুকি অভ্যুত্থানের মূল কারণ নির্ধারণ করে কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর রাজমালা-য় লিখলেন "ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশের রিয়াং সম্প্রদায় কুকিদের মতো ভীষণ না হইলেও নিতান্ত নিরীহ নহে। রিয়াংগণ খণ্ডলের বাঙালি মহাজনদের নিকট হইতে সর্বদা টাকা ধার করিত। পার্বত্য প্রদেশে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন, দুই-তিন বৎসর শস্য জন্মে নাই। সুদে আসলে অনেক টাকা দাঁড়াইল। মহাজনেরা রিয়াংদের টাকার জন্য তাগাদা দিত। তাহারা ইহা অসহ্য বোধে দুপ্‌থাং(ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন কুকি সম্প্রদায়ের একটি) ও অন্যান্য কুকিদের সহিত মিলিত হইয়া এই কার্য সম্পাদন করে। ইহাতে কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর, রাজকুমার নীলকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি রাজবংশীয় কয়েকজন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিখ্যাত কুকি সর্দার রতন পুইয়া ইহাদের সহিত যোগদান করেন"।

এই সকল পার্বত্য উপজাতিদের দারিদ্র্য ও মহাজনি শোষণ সম্বন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের বর্ণনা নিম্নরূপঃ "অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির জন্যে তাহাদিগকে স্বল্পমূল্যে ফসল বিক্রয় করিতে এবং অত্যধিক মূল্যে বীজ ক্রয় করিতে হয়। এই অবিবেচনার কার্যহেতু তাহারা চরম আর্থিক দুর্দশায় পতিত এবং কার্যত সমগ্র উপজাতি সম্প্রদায় মহাজনের ঋণের জালে আবদ্ধ হয়। দুঃসময়ে তাহারা

কোনও মহাজনের নিকট হইতে কয়েকটি টাকা ঋণ লয়। তাহারা নিরক্ষর বলিয়া ঋণপত্রে বিপুল পরিমাণ সুদ লিখিত হয়, আর কদাচিৎ তাহারা সেই ঋণের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে। কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে মহাজনের ঋণের গ্রাস হইতে রক্ষণ করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেও রক্তশোষক মহাজনদিগকে বাধা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কার্য"। এই কুকি-আক্রমণ সম্বন্ধে সরকারি বিবরণে লিখিত আছে যে "মনে হয় রাজার প্রজাবর্গের একাংশ নিরবচ্ছিন্ন শোষণে ক্ষিপ্ত হইয়া রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল"। পুঞ্জীভূত আক্রোশের বিস্ফোরণ ঘটল, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে। ত্রিপুরা রাজ্যের খণ্ডল পরগনার অন্তর্গত ছাগলনাইয়া থানার অধীন মুনসিরখিল নামক গ্রামের বাজারে ত্রিপুরা রাজ্যের জনৈক সেনাপতি তাঁর সৈন্যদের নিয়ে এক পূজার আয়োজনের প্রাক্কালে সংবাদ পৌছল চার-পাঁচশত কুকি ও বহু রিয়াং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি আক্রমণ করেছে। এই সংবাদে সেনাপতি ও তাঁর সৈন্যদল অবিলম্বে পলায়ন করে। কুকিরা বিনা বাধায় পনেরোখানি গ্রামের সকল মহাজন ও ধনী ব্যক্তির গৃহ লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে একশত পঁচাশিজন গ্রামবাসীকে হত্যা করে, অনেককে বন্দি করে নিয়ে গেল। রাজমালার বর্ণনায় আছে "কুকিরা গ্রামগুলি থেকে কেবলমাত্র স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ নিয়ে চলে গিয়েছিল। ত্রিপুরা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট একদল সশস্ত্র পুলিশ পাঠানোর পর আগ্নেয়াস্ত্রহীন কুকিগণ গভীর জঙ্গলে পলায়ন করেন।"

আবার এক বছর বাদেই ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে একদল কুকি ও রিয়াং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করে। উদয়পুরে একটি সেনানিবাস ছিল। সেখানে একজন হাবিলদারের অধীনে মাত্র পঁচিশ জন সৈন্য। উদয়পুর আক্রমণের সংবাদ পাওয়া মাত্র হাবিলদার সহ সৈন্যরা অস্ত্রাগার ফেলে পালিয়ে যায়। কুকিরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং একটি প্রকাণ্ড বাজার ভস্মীভূত করে। কতিপয় ব্যক্তি কুকিদের বাধা দিতে গিয়ে নিহত হয়।

কুকিদের পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্যস্থল পার্বত্য চট্টগ্রামে চাক্মা-রানি কালিন্দীর অধিকৃত স্থান। সেখানে কয়েকটি গ্রাম ভস্মীভূত করার পর একদল সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কুকিরা গভীর পার্বত্য প্রদেশে পলায়ন করে। এই যুদ্ধে ইংরেজ সরকার ২৩০ জন সিপাহি এবং ৩৪৫০ জন সশস্ত্র কুলি সহ অভিযান করেন। ইংরেজ বহিনী ১৫ শত মন ধান নষ্ট করে প্রতিশোধ নেয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংরেজ সরকারের নির্দেশে লেফ্‌টেন্যান্ট গ্রাহাম আগরতলা আসেন এবং ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে কুকিরা যাতে ব্রিটিশ ভারতে প্রবেশ না করতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চলে পাহারার উপর মিঃ গ্রাহাম গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রাহাম

সাহেব ঈশানচন্দ্রমাণিক্যকে সঙ্গে নিয়ে কুমিল্লায় আসেন এবং চট্টগ্রামের কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। সেখানে আলোচনার পর ঈশানচন্দ্রমাণিক্য নিম্নলিখিত বিষয়ে কমিশনারের সঙ্গে একমত হন ঃ

১। ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চলে পাঁচটি চৌকি স্থাপন করা হবে এবং প্রতিটি চৌকিতে ২০ জন করে রক্ষী থাকবে।

২। ফেণীর নিকটবর্তী অঞ্চলে ১৫০ জন রক্ষী রাখা হবে যাতে প্রয়োজনের সময়ে তারা অন্য চৌকিতেও যেতে পারে।

৩। ত্রিপুরার সৈন্যদের আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার জন্য ইংরেজ সরকার ৬ জন ইনস্ট্রাক্টর পাঠাবেন, তাদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি ত্রিপুরার রাজাকে বহন করতে হবে।

৪। ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে আবার নতুন করে জরিপ করতে হবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও কুকিদের শান্ত রাখার উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সুপারিনটেন্ডেন্ট ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কুকি সর্দার রতন পুঁইয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি করেন তাতে স্থির হয় যে সীমান্ত প্রদেশে শান্তিরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রতিবছর রতন পুঁইয়াকে ৪০০টাকা পুরস্কারস্বরূপ দেবেন। রতন পুঁইয়ার মাধ্যমে হাওলাং এবং সাইলো কুকি সর্দারদের সঙ্গেও চুক্তি করা হল এবং এদের প্রত্যেককে শান্তিরক্ষার পুরস্কার স্বরূপ ৮০০ টাকা করে দেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়।

এই সব ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ব্রিটিশ এলাকা কিছুটা নিরাপদ হলেও ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি।

মোটের উপর ১৮৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দের কুকি আক্রমণকে নিছক আক্রমণ বলা সমীচীন হবে না। এই আক্রমণের সঙ্গে জড়িত ছিল মহাজনি ঋণগ্রস্ত ত্রিপুরার রিয়াং প্রজা এবং করভাবে জর্জরিত ত্রিপুরা রাজ্যের আরো কিছু সংখ্যক প্রজা যারা কুকিদের ত্রিপুরা আক্রমণের আহ্বান জানিয়েছিল। এমন কি রাজপরিবারের কিছু বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন যার ফলে কুকি আক্রমণ প্রজা বিদ্রোহে রূপান্তরিত হল।

স্বাধীনতা আন্দোলনে ত্রিপুরা

ব্রিটিশ ভারতের সবুজ মানচিত্রে হলুদ রঙের ত্রিপুরা রাজ্য 'পার্বত্য ত্রিপুরা' নামেই অভিহিত ছিল। সমতল বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের নাড়ির যোগ।

রাজনীতির উত্তপ্ত বেলভূমি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন আন্দোলনের আঁচ এখানে এসে পড়েছে। যদিও ভারতের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশ লাভ করে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং সুসংঘটিত জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশও ঘটে এই যুগে। কিন্তু ত্রিপুরায় রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ ঘটে আরও কিছু পরে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। এর দুটি কারণ। প্রথমত, ভারতের ব্রিটিশ শাসকের মতো কোনও বিদেশি শক্তি ত্রিপুরায় রাজত্ব করেনি। ত্রিপুরার রাজারা ছিলেন স্থানীয় অধিবাসী। সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত থাকলেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থার সঙ্গে ত্রিপুরার প্রত্যক্ষ কোনও যোগাযোগ ছিল না। তাই ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন প্রথম দিকে এখানে প্রসার লাভ করেনি। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারায় ভারতে এবং বিশেষ করে তৎকালীন সমতল বাংলায় নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। ফলে ভারতে জাতীয় চেতনা এবং জাতীয় আন্দোলন জোরদার হয় কিন্তু তার প্রভাব ত্রিপুরায় ঊনবিংশ শতকে বিস্তার লাভ করতে পারে নি। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা প্রবেশ করলেও তা রাজপরিবারের মধ্যেই সীমিত ছিল। দেরিতে হলেও সেসময় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগল ত্রিপুরার বুকে। ত্রিপুরার রাজারা এবং রাজপরিবারের লোকেরা ছিলেন বঙ্গসংস্কৃতি ও বঙ্গভাষার পৃষ্ঠপোষক। বঙ্গসংস্কৃতিও বঙ্গভাষার মাধ্যমে বাংলার নবজাগরণের সঙ্গে ত্রিপুরাও যুক্ত হল। বাংলার বিপ্লবী কর্মীদের অনেকে গোপনে আশ্রয় নিতেন কারণ পার্বত্য ত্রিপুরা ব্রিটিশ ভারতের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল না। তাঁদের বিপ্লবী কার্যকলাপের দ্বারা ত্রিপুরাবাসী স্বভাবতই প্রভাবিত হতে পারেন। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির সংবাদে এমন কি রাজপরিবারের অনেকেই আগরতলাবাসীদের সঙ্গে শোকাচ্ছন্ন হলে মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্যও এই শোকের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। স্বদেশী যুগের প্রখ্যাত দেশভক্ত মুকুন্দ দাস প্রৌঢ় বয়সে আগরতলায় এসেছিলেন। অভিনয়ের ফাঁকে বক্তৃতা করেও দেশাত্মবোধক গান গেয়ে তিনি তরুণদের জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করতেন।

অনেক সময় বিপ্লবীদের প্রতি ত্রিপুরা সরকারের গোপন নৈতিক সমর্থনও থাকত। কারণ তখনও ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। বিপ্লবীদের কার্যকলাপ কেবলমাত্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কুমিল্লার পুলিশ পিস্তল চুরির সন্দেহে দুজন বিপ্লবীকে

আটক করার জন্য সোনামুড়া অঞ্চলে প্রবেশ করলে মহারাজা তার আগেই ওই দুজনকে নিজ লোকজনের সহায়তায় পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নিরাপদে আগরতলায় নিয়ে আসেন। বিপ্লবীদের প্রতি মহারাজার যে গোপন সহানুভূতি ছিল সে সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার অবহিত ছিল এবং এ নিয়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ করত।

উল্লেখ্য সমগ্র বঙ্গাদেশ যখন ১৯০৮ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতি তরুণদের মধ্যে ব্যাপক কর্মসূচি রূপায়ণে তৎপর ওই সময়ে অনুশীলন সমিতির সভ্যদের শিক্ষাদানের জন্য পার্বত্য ত্রিপুরার বিলোনীয়া ও উদয়পুরে দুটি কেন্দ্র ছিল। বাইরের থেকে দেখতে চাষবাসের খামার বাড়ি। দিনের বেলায় লোকেরা মাঠে কৃষকের কাজ করত। রাতে নিকটবর্তী পাহাড়ে এদের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের এবং গুলি চালনার শিক্ষা দেওয়া হত। তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হত এবং সামরিক শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হত।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরার (মাণিক্য শাসনাধীন)এটাই সম্ভবত প্রথম পদক্ষেপ। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্রিপুরায় গণজাগরণের সূচনা হয়। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার পরই ১৯২২-এ চট্টগ্রামে বাংলার প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবীরা একত্র হয়ে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের নতুন কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' সমিতির কাজ আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয়। সূর্য সেন ওরফে মাস্টারদা ওই সময়ে আর একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেন। ১৯২৩ সাল, যে প্রতিষ্ঠানটি আত্মপ্রকাশ করল তার নাম 'ছাত্র সংঘ'। প্রকাশ্যে তাদের উদ্দেশ্য ব্যায়াম করা, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ইত্যাদি অনুশীলন। মুখ্য উদ্দেশ্য-সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হওয়া। সরকারের বাজেয়াপত করা বইপত্র-'ক্ষুদিরাম', 'কানাইলাল', 'ফাঁসির সত্যেন' ইত্যাদি পুস্তক পাঠ। 'ছাত্র সংঘ' ভেঙে 'ভ্রাতৃ সংঘ' সৃষ্টি হল। ছাত্রসংঘ অনুশীলন দলের সমর্থক, ভ্রাতৃ সংঘ যুগান্তরের নেতৃত্বে প্রধানত শচীন্দ্রলাল সিংহ, প্রভাত রায় প্রমুখ।

যুগান্তর দলের কার্যকলাপের আর একটি বিবরণে দেখা যাচ্ছে 'যুগান্তর' দলের একটি শাখা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কল্যাণ সংঘ হেম ঘোষ এবং ললিত বর্মরে অধীনে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯২৮ সাল থেকে কাজ করতে থাকে। এই সংঘেরই সভ্য রাজেন্দ্র দে আগরতলা থেকে 'ত্রিপুরার কথা' নামে একটি প্রগতিশীল সাপ্তাহিক পত্রিকা

প্রকাশ করেন। যুগান্তর দলের আর একজন প্রধান কর্মী ছিলেন মণি বিশ্বাস। কুমিল্লার অনুশীলন সমিতিরও একটি গুপ্তশাখা ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আগরতলা কৃষ্ণনগরের রাজাবাবুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন প্রভাত রায়, সুশীল দেববর্মা ও কান্তি দেববর্মা অনুশীলন 'সমিতির আর একটি ছোট কেন্দ্র ছিল আগরতলা মোটরস্ট্যান্ড এর কাছে নরসিং আখড়ায়। অনন্ত দে এর নেতৃত্বে এই কেন্দ্রের কাজ চলত। কর্মসূচীর অন্তর্গত রাজনৈতিক ডাকাতিও একটি হয়েছিল ওই সময়ে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির কাছে একটি পান দোকান থেকে কিছু টাকা ও গহনা লুঠ হয়েছিল ওই ডাকাতির অভিযোগে ঢাকা জেলার কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, থানার শচীন্দ্র দত্ত এবং দেবীদুয়ার থানার পবিত্র পাল নামক তিনজনকে খেলার মাঠে একটি বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ব্রিটিশ সরকার এঁদের তিনজনকে বিচারের জন্য কুমিল্লা শহরে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই যেহেতু তাঁরা অপরাধ করেছেন বলে মহারাজা তাঁদের ব্রিটিশ আদালতে নিতে দেননি। উল্লেখযোগ্য যে, ওই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্য রাজনৈতিক বিপ্লবী ও কর্মীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে এতটাই গুরুত্বলাভ করেছিল, যে ক্ষুদ্র ত্রিপুরার উদার বনভূমি সসাগরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঝড়ের কেন্দ্ররূপে চিহ্নিত হয়েছিল।

'বন্দেমাতরম' বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে যে সমস্ত দেশপ্রেমিক অজস্র ত্যাগ স্বীকার ও কৃচ্ছতা বরণ করেছেন এবং জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য স্বেচ্ছায় স্বাধীনতার বেদীমূলে ফাঁসিকাষ্ঠে বা সম্মুখ সমরে আত্মাহুতি দিয়েছেন সেই শহিদনামায় ত্রিপুরারও গৌরবময় ভূমিকায় যারা ছিলেন তাঁদের আত্মাহুতির কথা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

১. শ্রী অসিতরঞ্জন ভট্টাচার্য ঃ জন্মস্থান-লেসিয়ারা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পিতা-বরেণ্য দেশকর্মী ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী? আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হন এই বিপ্লবী বিচারাধীন থাকাকালেই প্রেসিডেন্সি জেলে মৃত্যুবরণ। (৬ই আগস্ট, ১৯০৯)।

২. শ্রী অশোক নন্দী ঃ জন্মস্থান-কালীকচ্ছ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পিতা-বরেণ্য দেশকর্মী ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হন এই বিপ্লবী বিচারাধীন থাকাকালেই প্রেসিডেন্ট জেলে মৃত্যুবরণ। (৬ই আগস্ট,১৯০৯)।

৩. শ্রী গোপালচন্দ্র সেন ঃ জন্মস্থান-ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ১৯৩৭ সালে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে বিপ্লবী হিসাবে যোগদান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রহ্মদেশে নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। এমনই এক উত্তপ্ত মুহূর্তে কলকাতার বড়বাজারে শিবঠাকুর লেনের বিপ্লবী গুপ্ত আড্ডায় সশস্ত্র পুলিশের হানা ও চারতলা থেকে নির্মমভাবে তাঁকে ভূতলে নিক্ষেপ করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই বিপ্লবীর জীবনাবসান। (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)

৪. শ্রী গণেশচন্দ্র চক্রবর্তী (অপর নাম বীরেন্দ্রচন্দ্র) ঃ জন্মস্থান-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিদাকুট গ্রামে। পিতা ঃ শ্রী চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। ত্রিশের দশকের গোড়ায় বাখরগঞ্জ (বরিশাল) জেলে জেলে আটক অবস্থায় গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নির্যাতিত বিপ্লবীর মৃত্যু হয়।

৫. শ্রী গোপাল দেব ঃ জন্মস্থান-শ্রীঘর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স হত্যার ব্যাপারে অভিযুক্ত হয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তর। আন্দামানের নিভৃত কারাজীবনের পর ভারতের মূল ভূখণ্ডের একটি জেলে স্থানান্তরিত হন এবং ঐ আটক দশাতেই বিপ্লবীর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

৬. শ্রী তারিণী মজুমদারঃ জন্মস্থান-কাশীনগর, কুমিল্লা। ঢাকা শহরে কলকাতা বাজারে গোপন আশ্রয়স্থলে থাকাকালীন সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ সমরে বিপ্লবীর মৃত্যুবরণ (১৫ জুন, ১৯১৮)।

৭. শ্রী ত্রিপুরা সেনগুপ্ত ঃ শ্রী ত্রিপুরা সেনগুপ্ত। ঃ জন্মস্থান-কুমিল্লা। পিতা-শ্রী নিবারণচন্দ্র সেনগুপ্ত। ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের অন্যতম সেনানী,জালালবাদ পাহাড়ে সশস্ত্র ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষকালে বিপ্লবীর প্রাণদান। (২২ শে এপ্রিল, ১৯৩০)।

৮. শ্রী নিরদবরণ ভট্টাচার্যঃ জন্মস্থান -মেড্ডা,ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পিতা-শ্রী দীনবন্ধু ভট্টাচার্য। ১৯৩১ সালে বিদেশি সরকার নিয়োজিত পুলিশের কোপদৃষ্টিতে পড়েন এবং নানা জেল ঘুরে শেষটায় নিক্ষিপ্ত হন বারাণসী জেলে। পুলিশ চরম লাঞ্ছনা ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সেই জেলেই বিপ্লবীর আত্মাহুতি।

৯. শ্রীমতী প্রফুল্ল নলিনী ব্রহ্ম ঃ জন্মস্থান-কুমিল্লা। পৈতৃক নিবাস-কুমিল্লার কাকসার। পিতা-শ্রীরজনী ব্রহ্ম। কুমিল্লা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স হত্যা মামলা(১৪ই ডিসেম্বর,১৯৩১) পরই গ্রেপ্তার হয়ে প্রথমে কাকাসার গ্রামে ও পরে কুমিল্লা শহরে অন্তরিন। এই দুর্গত অবস্থায় অ্যাপেন্ডিসাইটিসে আক্রান্ত হন এবং

সাম্রাজ্য বাদী সরকার উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা না করায় বিপ্লবী নায়িকার(কুমিল্লার ছাত্রীসংঘের সভানেত্রী) অকালেই জীবন-দীপ নির্বাণ। ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭।

১০. শ্রী বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ঃ জন্মস্থান-লেসিয়ারা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সশস্ত্র চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের সময় এই সেনানী জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। সংগ্রামে চালনাকালে গুলিতে বিপ্লবীর প্রাণদান। ২২ শে এপ্রিল ১৯৩০।

১১. শ্রী বিনয়ভূষণ দত্ত ঃ জন্মস্থান-সুলতানপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পিতা-শ্রী বিপিন বিহারী দত্ত। কুমিল্লার কুখ্যাত জেলা শাসক স্টিভেন্স হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৩২ সালে গ্রেপ্তার হন। কারান্তরালে তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও নিপীড়ন চলে, ফলে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে তাঁর। অর্ধমৃত অবস্থায় জেল থেকে মুক্তি দিলেও চিকিৎসায় আর কোনো ফল হয় না। ১৯৪৪ সালের ১ লা এপ্রিল থেকে নিরুদ্দেশ হন। একটি বিপ্লবী জীবনের অবসান হল।

১২. শ্রী বিপিনবিহারী দে (দত্ত)ঃ জন্মস্থান-ঘাসিগ্রাম, কুমিল্লা। পিতা-শ্রী রামমাণিক্য দে (দত্ত)। ১৯১৬ সালে কুমিল্লায় ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হলে বিহারে বিপ্লবীর আত্মগোপন। কিন্তু শেষ রক্ষা পায়নি। পুলিশ ধাওয়া করলে একরূপ অবরুদ্ধ অবস্থায় দুর্ঘটনাপতিত হয়ে ১৯১৬ সালে মৃত্যু হয়।

১৩. শ্রী মোহিনীমোহন রায় ঃ জন্মস্থান-ধর্মনগর, (ত্রিপুরা রাজ্য), পিতা-শ্রী অশ্বিনী কুমার রায়। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত থানা এলাকায় ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি যখন চলছে, সেই উত্তপ্ত দিনে সুদূর ত্রিপুরা থেকে হাজির হন এই কিশোর বিপ্লবী যখন চলছে, সেই উত্তপ্ত দিনে সুদূর ত্রিপুরা থেকে হাজির হন এই কিশোর বিপ্লবী (বয়স ১৬) এবং পুলিশি নির্যাতনে বিপর্যস্ত ওই অঞ্চলের অখ্যাত বাদু গ্রামে গোপনে ক্যাম্প করেন। পুলিশ ঘুরে ঘুরে হানা দেয় ঐ ক্যাম্পেও। টেনে নামায় ক্যাম্পে উড্ডীয়মান জাতীয় পতাকা। অসীম বিক্রমে কিশোর বিপ্লবী পতাকাটি পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের বক্ষে ধারণ করে। চলল পুলিশের নির্বিচার লাঠি চালনা ও অত্যাচার। সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত, তবু বিপ্লবীর কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি আর করমুষ্ঠিতে জাতীয় পতাকা। সংজ্ঞা বিলুপ্ত অবস্থায় বন্দি করে তাকে বারাসাত সাব জেলে আটক রাখা হয় এবং সেই অবস্থায় বীর কিশোরের জীবনদীপের অবসান হয়। ১৯ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১।

১৪. শ্রীযশোদারঞ্জন পাল ঃ জন্মস্থান-ইব্রাহিমপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। চট্টগ্রামে এক রাজনৈতিক ডাকাতি সম্পর্কে ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে গ্রেপ্তার হন। বিস্ফোরক রাখা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে হাইকোর্টে আপিল এবং বিচারে কারামুক্তির পরিবর্তে, সামান্য দণ্ড হ্রাস। জেলে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের নির্যাতন-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং মুমূর্ষ অবস্থায় জেল থেকে সাময়িক মুক্তিলাভের পরই

বিপ্লবীর জীবনাবসান ঘটে।

১৫. শ্রী নৃপেন্দ্রকুমার দাস ঃ জন্মস্থান-পুর্বধইর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ১৯৩১ সালে বিদেশি সরকারের আশ্রয়পুষ্ট পুলিশের রোষদৃষ্টি পড়ে এই কিশোর বিপ্লবীর উপর এবং পুলিশি অত্যাচার নিপীড়নে অতিষ্ট হয়ে শেষ অবধি কুমিল্লার জেলে মৃত্যু।

১৬. শ্রী ললিতচন্দ্র চৌধুরী ঃ জন্মস্থান-বাগবাড়ি, চাঁদপুর। পিতা-শশীভূষণ চৌধুরী। মুন্সিগঞ্জ বোমার মামলায় ১৯১১ সালের ১০ এপ্রিল ১০ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। দণ্ডাদেশ ভোগ করার কালেই পঞ্জাবের মন্টগোমারি জেলে বিপ্লবীর প্রাণত্যাগ। সেপ্টেম্বর,১৯১৭।

১৭. শ্রী শৈলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ জন্মস্থান-কুমিল্লা। পিতা-শ্রী বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। রাজপুতনায় দেওলি বন্দিনিবাসে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নিতান্ত অবহেলিত অবস্থায় বিপ্লবীর মৃত্যুবরণ ১৭ অক্টোবর, ১৯৩৩।

১৮. শ্রী সুরেন্দু কুমার দত্ত। জন্মস্থান-হানারচর, চাঁদপুর। পিতা-শ্রী কালীকিশোর দত্ত। ১৯৩৪ সালের ৮ই আগস্ট পুলিশ বিপ্লবীকে বন্দি করে তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখে। বন্দি অবস্থায় অসুস্থ হলে নিজগৃহে অন্তরিনে পাঠানো হয়। ওই অবস্থায় রোগে জর্জরিত হয়ে আইনের শত বন্ধনের মধ্যে বিপ্লবীর জীবনাবসান ঘটে। (১৭ই মার্চ, ১৯৩৬)

১৯. শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায় ঃ জন্মস্থান-গোকর্ণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। মালয়ে অবস্থানকালে নেতাজী আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগদান। ব্রহ্মদেশের কালোয়াতে এক সশস্ত্র সংঘর্ষকালে বিপ্লবী সেনানীর মৃত্যুবরণ।

২০. শ্রী সত্যেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন ঃ জন্মস্থান-বিটঘর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পিতা-শ্রী দীনেশচন্দ্র বর্ধন। ১৯৪১ সালে মালয় দেশে ভারতীয় স্বাধীনতা লিগে যোগদান এবং পর বৎসর সাবমেরিনে ভারতের কাথিওয়ার উপকূলে অবতরণ। ব্রিটিশ সৈন্যের হাতে ধৃত হয়ে মাদ্রাজ দুর্গে বন্দি। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মাদ্রাজ জেলেই ফাঁসিকণ্ঠে বিপ্লবী সৈনিকের আত্মবলিদান। ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩।

সূত্র ঃশাশ্বত ত্রিপুর হিতসাধিনী সভার শতবার্ষিকী স্মারক সংকলন (১৮৭২-১৯৭২)

সপ্তম অধ্যায়

আধুনিক যুগ

বীরচন্দ্রমাণিক্য (১৮৬২-১৮৯৬খিঃ)

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য আধুনিক ত্রিপুরার জনক। রাজ্যের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার শুরু তাঁর আমল থেকেই। বীরচন্দ্র কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের পুত্র এবং ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভাই। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের এক রোবকারি দ্বারা বীরচন্দ্র রাজক্ষমতা লাভ করেন। কথিত আছে ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যুর চারদিন পর ১৮৬২ সালের ৪ আগস্ট তারিখে তৎকালীন কুমিল্লার জেলাজজ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রোবকারিটি পেশ করা হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক দলিলটি নিম্নরূপ ঃ

রোবকারি কাছারি এলাকে রাজগীপর্বত ত্রিপুরা, হুজুর শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর। ইতি, সন ১২৭২ ত্রিপুরা। তারিখ ১৬ই শ্রাবণ।

এ পক্ষ বাতব্যাধি পীড়াতে শারীরিক কাতর হওয়া প্রযুক্ত, রাজত্ব ও জমিদারি শাসন বিষয়ীকার্য সুচারুমতে নির্বাহ হইতেছে না এবং যে প্রকার ব্যামোহ ইচ্ছাধীন কোন সময়ে প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাও নিশ্চয় নাই। এমতেই এ পক্ষের খান্দানের চিররীতিমতে ঐ কার্য নির্বাহ তদর্থক যুবরাজ ও বড়ঠাকুর ও কর্তা নিযুক্ত করা প্রয়োজন, সেমতে হুকুম হইল যে-

যুবরাজ পদে এ পক্ষের ভ্রাতা শ্রীল শ্রীমান বীরচন্দ্র ঠাকুর ও বড় ঠাকুরীপদে প্রথম পুত্র শ্রীল শ্রীমান ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুর ও কর্তা পদে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীল শ্রীমান নবদ্বীপচন্দ্র ঠাকুরকে নিযুক্ত করা যায় ও এ বিষয়ের এত্তেলা স্বরূপ এই রোবকারির এক এক কিত্তা জেলা চট্টগ্রাম ও জেলা ঢাকা প্রদেশের শ্রীল শ্রীযুক্ত দায়ের সায়ের কমিশনার সাহেব বাহাদুরান ও জেলা ত্রিপুরা ও জেলা শ্রীহট্টের শ্রীল শ্রীযুক্ত

জজসাহেব ও শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব ও শ্রীযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরাণ হুজুরে প্রেরণ হয়। ইতি

মোকাবেলা	শ্রীশ্রীমহীমং
শ্রীগুরুদাস বর্ধন	বিশ্বনাথ গুপ্ত
পেস্কার	মোহরের

বীরচন্দ্রমাণিক্যের দুই ভাই চক্রধ্বজ এবং নীলকৃষ্ণ এই রোবকারি অসত্য বলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট নিজেদের দাবি পেশ করেন। ত্রিপুরার (কুমিল্লার) তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই ব্যাপারে একটি রিপোর্ট চট্টগ্রামের কমিশনারের নিকট পাঠান। চট্টগ্রামের কমিশনার ভারতের গভর্নর জেনারেলকে জানিয়েছিলেন যে, ত্রিপুরার মহারাজা ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যু হয়েছে; ত্রিপুরার সিংহাসন নিয়ে এখন অনেকে দাবিদার উপস্থিত হয়েছেন। এর মধ্যে ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের ভ্রাতা বীরচন্দ্র ও নবদ্বীপচন্দ্র যথাক্রমে 'যুবরাজ' ও 'বড়ঠাকুর' হয়েছেন। কাজেই আপাতত বীরচন্দ্রমাণিক্যকে দখলদারি রাজা হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে অন্যান্য দাবিদারগণকে দেওয়ানি আদালতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের দাবি পেশ নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর বীরচন্দ্রকে 'ডিফ্যাক্টো'বা কার্যত রাজা বলে স্বীকার করেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ই মার্চ প্রিভি কাউন্সিল বীরচন্দ্রের সপক্ষে রায় দিলে ইংরেজ সরকারের অনুমতি লাভ করে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৯ ই মার্চ মহাসমারোহে বীরচন্দ্রমাণিক্যের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তিনি ১২৫ টি স্বর্ণমুদ্রা ব্রিটিশ সরকারকে নজর প্রদান করেছিলেন। ১৮৭৭খ্রিস্টাব্দের ২৮ নভেম্বর ব্রিটিশ সরকার বীরচন্দ্রমাণিক্যকে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের এক সিদ্ধান্ত অনুসারে 'স্বাধীন ত্রিপুরা' কথাটি বাদ দিয়ে পার্বত্য ত্রিপুরা ব্যবহার করা শুরু হয়। কিন্তু ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ফরেন সেক্রেটারি এচিসন সাহেব ভারতীয় রাজন্যবর্গের সনদাদি সংগ্রহ করে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে লেখা হয়েছিল স্বাধীন ত্রিপুরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অনুগ্রহ প্রদত্ত রাজ্য নয়। অপর দিকে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ই মার্চ প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতি লিখেছেন-যদি ত্রিপুরার রাজাও চাকলা রোশনাবাদের জমিদারি ব্রিটিশ ভারতের আইন ও বিচার আদালতের অধীন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি পার্বত্য ত্রিপুরা নামে একটি বড় রাজ্যের স্বাধীন রাজা।

বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের পর অনেকের ধারণা ছিল মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের একমাত্র পুত্র নবদ্বীপচন্দ্রকে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। কিন্তু তা না করে তিনি নবদ্বীপ চন্দ্রকে প্রায় এক বছর তিনমাস রাজভবনে অবরুদ্ধ করে রাখেন। নবদ্বীপচন্দ্রের বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। নবদ্বীপচন্দ্রকে তাঁর পিতা ঈশানচন্দ্রমাণিক্য 'নবদ্বীপ নগর' নামে একটি জায়গির প্রদান করেছিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য সেই তালুকটি বাজেয়াপ্ত করে নেন এবং এমন কি ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের পত্নী চন্দ্রেশ্বরী দেবীর 'খোয়াইস' নামক তালুকটিও বাজেয়াপ্ত করে নেন।

ত্রিপুরার শাসনব্যবস্থা সুপরিচালনার জন্য তিনি ডবলিউ এফ্ ক্যাম্পবেলকে নিযুক্ত করেন। ইতিপূর্বে ক্যাম্পবেল চাকলা রোশনাবাদের ম্যানেজার ছিলেন। রামমাণিক্য বর্মনকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করা হয়। কাশীচন্দ্র দাসকে নিযুক্ত করা হয় পেশাকার পদে। চাকলা রোশনাবাদের দেওয়ান হন কুমিল্লা জজ আদালতের উকিল মুন্সী ঈশানচন্দ্র গুপ্ত। এদিকে নবদ্বীপচন্দ্র নানা যন্ত্রণা ভোগ করে তাঁর মাকে নিয়ে স্থায়িভাবে কুমিল্লায় বসবাস করতে থাকেন।

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের স্বার্থ দেখার জন্য ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এ.ডব্লিউ. বি. পাওয়ারকে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। এই ব্যাপারে লেফটেন্যান্ট গভর্নর ত্রিপুরার মহারাজাকে জানিয়েছিলেন যে পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োগ করা হলেও এতে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থের কোনো হানি হবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাধীনতায় তাঁরা হস্তক্ষেপ করবেন না। এ.ডবলিউ.পাওয়ার ত্রিপুরা রাজ্যে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট হয়ে আসার পর তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী বীরচন্দ্রমাণিক্য ত্রিপুরার কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হন। প্রাচীনকাল থেকেই ত্রিপুরায় দেওয়ানি ও ফৌজদারি -সংক্রান্ত বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি মহারাজ নিজে করতেন। বীরচন্দ্রমাণিক্য আদালতের সংস্কার সাধন করে 'খাস আপিল আদালত' নামে একটি বিচারালয় স্থাপন করেন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। এটাই ছিল চূড়ান্ত আপিল আদালত। এই আদালতে দুজন বিচারপতি থাকতেন। এটা অনেকটা ব্রিটেনের প্রিভি কাউন্সিলের ধাঁচে গঠিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ প্রশাসনের অনুকরণে রাজ্যে আবগারি বিভাগ এবং স্ট্যাম্প বিভাগ সৃষ্টি করা হয় এবং দলিল রেজিস্ট্রির নিয়ম প্রবর্তন করা হয়।

বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরা আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। আইন, প্রশাসন, শিক্ষা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি সকল দিক থেকেই ত্রিপুরাকে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রশাসনের সুবিধার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। উত্তর বিভাগ, মধ্য বিভাগ ও দক্ষিণ বিভাগ। বিভাগগুলির প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল যথাক্রমে কৈলাসহর, আগরতলা ও উদয়পুর (পরে সোনামুড়া)।

সেনাবাহিনীকে আধুনিকভাবে সুশিক্ষিত করা হয়। মহারাজা বীরচন্দ্রের আমলে সৈন্যদলে সিপাহির সংখ্যা ছিল ২৫০। রাজার অনুগত চারজন ব্যক্তি ঐ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত হন। প্রথম দুজন ক্যাপ্টেন পদবির এবং অপর দুজন-এর পদবি সুবেদার। রাজার অনুমতিতে তাঁরা প্রয়োজনে লোক নিয়োগ করতে পারতেন। বৎসরে এগারো মাসের মাহিনা দেওয়া হত। কাজ করার পর অন্য সময়ে সিপাহিরা নিজেদের খেত-খামারে কাজ করতে পারত। সময় সময় এসকর্ট ইত্যাদির প্রয়োজনে হাজির থাকলেই চলত। ১৮৭৪-৭৫ সালে সৈন্যদল পুনর্গঠিত হয়েছিল। ওই সময়ে ছয়টি কোম্পানিতে ৪০ জন অফিসার, ৪ জন বিউগলার এবং ২৩০ জন সিপাহি ছিল। বিভিন্ন পদের বেতনের হার ছিল যথাক্রমে মেজর ৫০ টাকা, ক্যাপ্টেন ১৫টাকা, জমাদার ৮-১৫টাকা। হাবিলদার ৮-১০ টাকা, আমলাদার ৬-৮ টাকা, বিউগলার ৫-৮টাকা, সাধারণ সিপাহি ৪-৬ টাকা। সৈন্যদলে বাঙালি হিন্দু ১৫ জন, মুসলমান ৯৬ জন, গুর্খা ৬৬ জন, দেশোয়ালি ৮১ জন, অসমিয়া ১০ জন এবং ত্রিপুরী ও মণিপুরি ৮ জন। মোট সৈন্যসংখ্যার অর্ধেকের বেশি ছিল ২ নং কোম্পানিতে। গুর্খা সিপাহিরা সবাই ওই কোম্পানিভুক্ত ছিল। মিলিটারি আউট পোস্ট ছিল ৮ টি। সেগুলিতে ছিল ৪ জন কমিশনড্ অফিসার, ১১ জন নন্-কমিশনড্ অফিসার এবং ১১ জন সিপাহি। কৈলাসচন্দ্র সিংহ এক প্রতিবেদনে বলেন, এক শতাব্দীর মধ্যে ত্রিপুরার সৈন্য সংখ্যা ৪ হাজার থেকে ২৯,৪০০ জন পরিণত হয়েছিল। ত্রিপুরার রাজারা যখন যুদ্ধে যেতেন তখন হাজার হাজার সৈন্য নেওয়া হত। প্রত্যেক সমর্থ প্রজা যুদ্ধে যোগ দিত। 'ফুরই' নামে একটা চিহ্ন ছিল তাতে কোনো পশুর রক্ত লাগিয়ে দেওয়া হত অথবা চিহ্নটির দিক খানিকটা 'বিনন্দিয়া' গ্রামের সর্দারের কাছে পৌঁছিয়ে দিত। 'ফুরই' নামে চিহ্ন দেখা মাত্র প্রজারা বুঝত রাজার নিকট থেকে জরুরি ডাক এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই 'ফুরই'টিকে অন্য গ্রামে পৌঁছিয়ে দিত। এইভাবে সারা রাজ্যের প্রজারা নিজ নিজ

অস্ত্র শস্ত্র হাতে নিজে রাজধানীর দিকে যাত্রা করত। সব প্রজারা একত্রিত হলে রাজ-সরকার ভোজের ব্যবস্থা করত। এই ভোজকে বলা হত 'হসম্ ভোজন' বা সৈন্যদের ভোজন। ভোজনের দ্বারা পরিতৃপ্ত হলে তাদের সকলকে নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করা হত। পাহাড়িয়া সৈন্যদের এই ভোজন-পর্ব পরিচালনা করতেন 'মুবা' বা প্রধান সেনাপতি।

মহারাজা বীরচন্দ্রের আমলেই ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে আগরতলার প্রথম মিউনিসিপ্যালিটির সৃষ্টি। এর জন্য তিন বর্গ মাইল এলাকা নির্ধারন করা হয় এবং পলিটিক্যাল এজেন্টকে চেয়ারম্যান্ করা হয়। ১৮৭৪ সালে মিউনিসিপ্যাল আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। কর হিসেবে ৮৫২ টাকা ধার্য করা হলেও সে বছর মাত্র ৩২৪ টাকা আদায় হয়েছিল। যদিও মোট ব্যয় হয়েছিল ৯৯২ টাকা। মিউনিসিপ্যালিটির সৃষ্টির দু'বছর বাদে ১৮৭৩ সালে মে মাসে আগরতলা শহরে প্রথম হাসপাতাল স্থাপিত হয়। ওই বছরেই হাসপাতালে রোগির সংখ্যা ছিল ৩০৩৪ এবং পরের বছর সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩২২। আরোগ্য লাভ করে ৩২৯৩ জন। ১২ জন রোগির মৃত্যু ঘটে। ইনডোর রোগির সংখ্যা ১৩ জন। দশজন আরোগ্য লাভ করে। কৈলাসহর সাব-ডিভিসনে একটি ডাক্তারখানা ছিল। রাজ্য সরকার প্রদত্ত মাসিক সাহায্য ও জনসাধারণ প্রদত্ত বার্ষিক চাঁদার সাহায্যে ঐ ডাক্তারখানার খরচ চালানো হত। ২০টাকা বেতনের একজন দেশিয় ডাক্তার সেখানে কাজ করত। এক বছর বাদেই ওই ডাক্তারখানায় ৩০০ জন রোগির চিকিৎসা হয়। রাজ্যের মেডিকেল অফিসার ছিলেন ডাঃ স্টরক সাহেব। এক প্রতিবেদনে তিনি বলেন, "বৎসরের বেশির ভাগ সময়ে ত্রিপুরা অস্বাস্থ্যকর ছিল। শহর এবং গ্রামগুলিতে কলেরার প্রাদুর্ভাবে বহুলোক আতঙ্কে বাড়িঘর ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিল।" ওই সালেই রাজ্যের প্রথম টিকাদানের ব্যবস্থা চালু হয়। আদর্শ স্থাপনের জন্য মহারাজ স্বয়ং টিকা নিয়েছিলেন এবং তাঁর পরিবারের সবাইকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রায় একই সময়ে ১৮৭৫ সালে আগরতলায় প্রথম পোস্টঅফিস স্থাপিত হয়। চালু হয় ১৮৭৫ সালের পয়লা অক্টোবর। স্থির হয়েছিল ব্যয় বহন করবেন রাজ্য সরকার আর পরিচালনা করবেন ভারতীয় পোস্টাল কর্তৃপক্ষ।

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় কুমিল্লা থেকে ১৮৭৯ সালে 'ত্রিপুরা বার্তাবহ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকার প্রকাশ হয়। পাক্ষিক পত্রিকাটিতে

ত্রিপুরার সমাজ, ধর্ম এবং রাজনীতির উপর আলোচনা থাকত। পত্রিকাটিতে সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হতো। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮ থেকে ১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। প্রায় দশ বৎসর পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার পর বন্ধ হয়ে যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম হাইস্কুল "আগরতলা সরকারি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর। এই স্কুলটিই পরবর্তীকালে (১৯০৪খ্রি.) উমাকান্ত একাডেমি নামে পরিচিত হয়। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যই প্রথম রাজ্যবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব সরকারিভাবে গ্রহণ করেন। বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহার শুরু হয়। ত্রিপুরার বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহার শুরু হয়। ত্রিপুরার এই বরেণ্য মহারাজা নিজেও উচ্চমানের কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন যেমন-'প্রেম মরীচিকা,' 'অকাল কুসুম,' 'উচ্ছাস', 'ঝুলন', 'হোরী,' 'সোহাগ' প্রভৃতি। মহারাজা প্রচারবিমুখ ছিলেন বলে তিনি কখনও বিদগ্ধ মন্ডলীর কাছে তা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেননি, বরং অপরের সাহিত্য সাধনার শ্রদ্ধাশীল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য, 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থের একখানা বাংলা সংস্করণ প্রকাশের জন্য তৎকালীন সময়ে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন এবং নিজ অর্থব্যয়ে 'শ্রীশ্রী হরিভক্তি বিলাস' গ্রন্থটি ছাপাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের 'গোবিন্দ ভাষ্য' পুস্তকটির মুদ্রণের কারণে তিনি তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিলেন। বাংলা ভাষার গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মহামূল্য গ্রন্থ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থখানি মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের অর্থানুকুল্যে প্রকাশনা সম্ভব হয়েছিল।

বীরচন্দ্রমাণিক্য বুঝতে পেরেছিলেন যে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। জনগণের রাজনৈতিক অবস্থার কোনও উন্নতি হবে না যতক্ষণ না জনগণের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কার্যকরী হচ্ছে। সেই কারণেই তিনি সামাজিক আবার ধর্মনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। সামাজিক সংস্কার আবার ধর্মনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর সামাজিক চিন্তাধারা সমূহের শিকড় ধর্মনৈতিক চিন্তাধারার গভীরে প্রোথিত ছিল বলেই তিনি 'জুলাই প্রথা', 'তিতুন প্রথা,' 'ক্রীতদাস প্রথা' নিষিদ্ধ করেন (১৮৭৮)। সাহেব এবং উমাকান্তবাবুর আগ্রহে সতীদাহ প্রথা নিবারণমূলক আদেশজারির সপক্ষে সচেষ্ট হয়ে অনতিবিলম্বে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হল (১৮৮৯)। সমাজ সংস্কারক

হিসাবে তিনি জাতিভেদ প্রথা তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল ব্যক্তিদের বাধাদানের ফলে বীরচন্দ্রের এই শুভ প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে অসুস্থ বীরচন্দ্র স্বাস্থ্য উদ্ধারের কারণে দ্বিতীয়বার কার্শিয়াং গেলেন। সঙ্গে ছিলেন উদীয়মান কবি রবীন্দ্রনাথ। অসুস্থ শরীর নিয়েও মহারাজ তরুণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্য, চারুকলা থেকে ধর্ম, দর্শন নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। রোগের প্রকোপ কিন্তু কমল না। কলকাতায় আনা হল মহারাজ বীরচন্দ্রকে। সেখানেই তিনি পরলোক গমন করেন (১৮৯৩)।

রাধাকিশোরমাণিক্য (১৮৯৬-১৯০৯)

বীরচন্দ্রমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাকিশোরমাণিক্য ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে ত্রিপুরার শাসনভার গ্রহণ করেন। রাজ সিংহাসন আরোহণের পূর্বেই ত্রিপুরার শাসন পরিচালনার ব্যাপারে রাধাকিশোরমাণিক্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। বীরচন্দ্রমাণিক্যের মহিষী ভানুমতী দেবীর মৃত্যুর পর বীরচন্দ্রমাণিক্য কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবনধামে গিয়েছিলেন। ওই সময়ে রাজ্য ও জমিদারি পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয়েছিল। যুবরাজ রাধাকিশোর ছিলেন সেই মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি। সেই সময় মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের অনুপস্থিতিতে রাধাকিশোরমাণিক্য দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য ও শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

রাধাকিশোরমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হলেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি রাধাকিশোরমাণিক্য পুত্র বীরেন্দ্রকিশোরকে 'যুবরাজ' পদে নিয়োগ করতেই বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ ইংরেজ সরকারের কাছে অভিযোগ এবং শেষ পর্যন্ত মামলা আদালত পর্যন্ত গড়াল। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার একটি সনদের মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে রক্তের সম্পর্ক আছে এমন কোন ব্যক্তিকে ত্রিপুরার মহারাজারা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করতে পারবেন। তবে সেই নির্বাচনে ইংরেজ সরকারের অনুমোদন লাভের প্রয়োজন আছে। ইংরেজ সরকার বীরেন্দ্রকিশোরকেই যুবরাজ পদে মেনে নেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে সমরেন্দ্র দেববর্মণ ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করলে রাধাকিশোরমাণিক্যের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারেন আশঙ্কা করে

রাধাকিশোরমাণিক্য ১৩১৪ ত্রিপুরাব্দের ১১ আষাঢ় তারিখে এক আদেশ-বলে সমরেন্দ্রচন্দ্রকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেন।

রাধাকিশোরমাণিক্যের বিশেষ স্মরণীয় কীর্তি হল ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় 'ত্রিপুরা স্টেট গেজেট' প্রকাশনার ব্যাবস্থা করা। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যান্য মূল্যবান কীর্তির মধ্যে রয়েছে 'শিলালিপি সংগ্রহ' এবং 'বৃহৎ নারদীয় পুরাণ' গ্রন্থ দু'টি বাংলায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা। উপরন্তু ওই সময়ে রাজানুগ্রহে 'পঞ্চপন্ডিত' 'বঙ্গভাষা' 'অরুণ' ইত্যাদি সাময়িক পত্র-পত্রিকা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রকাশিত হত। রাধাকিশোর রাজা হবার বহু পূর্বেই তরুণ বয়সে তাঁর সম্পাদনায় 'বার্ষিকী' নামে একটি সাময়িক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। 'বার্ষিকী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে নববর্ষের বর্ণনার একটি উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হল ঃ

"যেমন ঘটিকা-যন্ত্রের দোলক এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে দোলায়িত হয় সেইরূপ নববর্ষ ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার সময় অতীতকালের চিন্তায় মন ধাবিত হয়। আমরা কি করিব-এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কি করিয়াছি-এই প্রশ্ন উত্থিত হয়। 'আমরা' এই শব্দটি যেরূপ আত্মীয়ব্যঞ্জক তাহাতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিরূপ কীর্তিকলাপ রাখিয়া গিয়াছেন,তাহাদের চরিত্রে কি কি অনুকরণযোগ্য গুণ আছে-এই সকল বর্ণনা করিয়াই এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া হয়...."

বাংলা ভাষায় বীরচন্দ্রমাণিক্য এবং রাধাকিশোরমাণিক্যের উৎকর্ষের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'মাতৃভাষাকে (অর্থাৎ বাংলা ভাষা) এমন সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা যে তাদের রাজোচিত সৌজন্যেরই অঙ্গ"।....মহারাজা বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোরের যে সমস্ত চিঠি আমার কাছে আছে সেগুলি অমূল্য সম্পদ বিশেষ। এমন চমৎকার চিঠি আজকালকার দিনে লেখাও অসম্ভব"।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাংলা, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশে চরমপন্থীদের কার্যকলাপের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অক্টোবরের ১৬ তারিখ বঙ্গভঙ্গ আইন বলবৎ হয়। সেই দিন কলিকাতার এক বিরাট বিক্ষোভের পর এক বিশাল শোভাযাত্রা গঙ্গাতীরে পৌঁছয় এবং বন্দেমাতরম এ জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে মাতৃভূমিকে পুনরায় সংযুক্ত করার দৃঢ় শপথ নেওয়া হয়। এই আনুষ্ঠানিক প্রতিজ্ঞার নিদর্শন হিসাবে মণিবন্ধে রাখি বাঁধা হয়।

এই রাখিবন্ধন ছিল জাতির ঐক্যের প্রতীক। রাখিবন্ধন উৎসবের পরে নভেম্বরের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ চতুর্থবার ত্রিপুরায় আসেন। ডিসেম্বরে প্রিন্স অব ওয়েলস কলকাতায় আসেন। তাঁর অনুষ্ঠান কলকাতাবাসীরা বর্জন করে। আমন্ত্রিত রাধাকিশোর সৌজন্যের খাতিরে কলকাতা যান এবং অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে ত্রিপুরার মহারাজাদের একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠলেও মহারাজকুমার মহেন্দ্র দেববর্মার 'বঙ্গভঙ্গ' সম্পর্কীয় একটি কবিতা 'অরুণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে সহজেই অনুমান করা যায় লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ঢেউ ত্রিপুরা রাজ্যেও পৌঁছেছিল এবং স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে রাধাকিশোরমাণিক্যের একটা নৈতিক সমর্থন ছিল। কবিতার উদ্ধৃতির ছিল এইরূপ ঃ

জানেন সবে মর্ত্যলোকে বঙ্গ বিভাগ লয়ে।
মনের ক্ষোভে মর্ত্যলোকে বঙ্গ বিভাগ লয়ে।
মনের ক্ষোভে বঙ্গবাসী উঠছে অধীর হয়ে।
সভা করে সবে মিলে এই করেছে স্থির।
বিদেশী বসনে কভু ঢাকবোনা শরীর।
জানি আমি ভারতের সুসন্তান যারা,
এ প্রতিজ্ঞা রক্ষিবারে সক্ষম তাহারা'।

স্বাদেশিকতার শিকড় ত্রিপুরা রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় কতটা গভীরে প্রবেশ করেছিল। তার একটি দৃষ্টান্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা (১৯২২) তাঁর 'ত্রিপুর দরবার রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন ঃ''অল্পদিন হইল, একজন বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দেশীয় রাজ্যশাসনের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিলেন-তখন স্পষ্টতই দেখিতে পাইলাম, তিনি মনে করিতেছেন, ব্রিটিশ রাজ্যের সুব্যবস্থা সমস্তই যেন তাহাদেরই সুব্যবস্থাঃ-তিনি যে ভারবাহী মাত্র-তিনি যে যন্ত্রী নহেন, যন্ত্রের একটা সামান্য অঙ্গমাত্র, একথা যদি তাঁহার মনে থাকিত, তবে দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার প্রতি এমন স্পর্দ্ধার সহিত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ব্রিটিশ রাজ্যে আমরা যাহা পাইতেছি, তাহা যে আমাদের নহে এই সত্যটি ঠিকমত বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে। এই কারণেই

আমরা রাজার নিকট হইতে ক্রমাগতই নূতন নূতন অধিকার প্রার্থনা করিতেছি এবং ভুলিয়া যাইতেছি-অধিকার পাওয়া, এবং অধিকারী সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে, তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ, তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি উৎসুক না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের আদেশ বলে রাধাকিশোরমাণিক্য যখন তাঁর স্থাপিত কলেজটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন তখন তাঁর মানসিক পীড়ার কথা অনুমান করে কলকাতার পার্ক স্ট্রীটে অবস্থিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে 'ভারত সঙ্গীত সমাজ'-এর পক্ষ থেকে মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যকে সংবর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। গানটি ছিল এইরূপ ঃ

'রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা
ত্রিপুর পুর-লক্ষ্মী বহে তব বরণডালা।
ক্ষীণ-জন-ভয়-তারণ তব বাণী,
দীনজন দুঃখহরণ নিপুণ তব পাণি
অরুণ তব মুখচন্দ্র করুণ রস ঢালা।
গুণী রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে
গুণ-অরুণ-কিরণে তব সব ভুবন আলা'।

রাধাকিশোরমাণিক্যের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। এই কারণে বাংলার কবি ও সাহিত্যকদের প্রতি একটা দুর্বলতাও ছিল। তিনি প্রয়োজন বোধে তাঁদের পুরস্কৃত করতেন। উল্লেখ্য, কলকাতার 'সঞ্জীবনী' নামে একটি পত্রিকার কথায় তিনি যখন জানলেন কবি হেমচন্দ্র অন্ধ এবং বিপন্ন হয়ে পড়েছেন তখন তিনি অবিলম্বে নিজ তহবিল থেকে মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তিদানের এক প্রস্তাব কবিগুরুর কাছে পাঠালেন এবং বৃত্তিদাতার নাম গোপন রাখার জন্য

কবিগুরুকে অনুরোধ করেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মণকে এক পত্রে লিখলেন ঃ 'হেমবাবুর সাহায্যার্থে মহারাজ যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতে এখানে চতুর্দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছে। মহারাজের বদান্যতার কথা গোপন রাখা আমার সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে হেমবাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাবোধ করিতেছেন। মাঝখান হইতে মহারাজের কল্যাণে যশের কিয়দংশ আমার কপালেও পড়িয়াছে। মহারাজ যখন কর্নেল মহিম ঠাকুরের কাছে জানতে পারলেন বৃত্তির বন্দোবস্তের কারণে অন্ধ কবিবর কতকটা আরামে শেষজীবনে অতিবাহিত করেছিলেন তখন তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন:'আমি বাংলার ক্ষুদ্র রাজা হইলেও আমি বর্তমানে তাঁহাকে যদি কবি মাইকেল মধুসূদনের মত দাতব্য চিকিৎসালয়ে পড়িয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গান করিতে হয়, তবে দেশের পরম দুর্ভাগ্য। তোমরা আমার পারিষদেরা নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে, আর আমাকে যে কতদূরে যাইতে হইবে তাহা জানি না। তোমাদের চক্ষুকর্ণ যেন এইরূপ ব্যাপারে বন্ধ না থাকে, মুখ যেন সদা-সর্বদা খোলা থাকে।'

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের প্রজাহিতৈষণা, সদাশয়তা, গুণগ্রাহিতা, দানশীলতা, স্বদেশ প্রেম ছাড়াও তাঁর মেধা ও বুদ্ধিমত্তা ছিল অসাধারণ। কথিত আছে একবার কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বন্ধুদের তাঁর গবেষণার ফলাফল দেখাবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। মহারাজ রাধাকিশোরের সঙ্গো তখনও বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের পরিচয় হয়নি। বিনা আমন্ত্রণেই রাধাকিশোরমাণিক্য সেই কলেজের বিজ্ঞানাগারে উপস্থিত হয়ে সবাইকে বিস্ময়ে তাক লাগিয়ে দেন। কবিগুরু আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গো মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের পরিচয় করিতে দেন। জগদীশচন্দ্রের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল তিনি কৌতূহলভরে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রদর্শনী শেষ হলে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র রাধাকিশোরমাণিক্যকে সবিনয়ে প্রশ্ন করেন। 'আপনি এই সব কঠিন পরীক্ষা সমূহ বুঝতে পেরেছেন কি? জবাবে মহারাজ বললেন, 'আপনি যদি আমাকে একবার আপনার যন্ত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ দেন তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে, পরীক্ষাগুলো সম্পর্কে আমার ধারণা পরিস্কার হয়েছে কি না'। বিজ্ঞানাচার্য মহারাজ রাধাকিশোরকে যন্ত্রগুলোর সামনে নিয়ে গেলে তিনি অতি সহজেই যন্ত্রের সাহায্যে 'শক্' এবং 'রেসপণ্ড' তত্ত্বটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়ে দেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠেন, 'মহারাজ আপনি চমৎকার

বুঝতে পেরেছেন। লর্ড এলগিনকে আমি বুঝাতে পারিনি। আমার এম,এ ক্লাশের ছাত্ররাও সহজে বুঝতে পারে না। আনি আমাকে অবাক করে ছেড়েছেন, মহারাজ'।

রাজর্ষি রাধাকিশোরমাণিক্যের দানশীলতার আর একটি ঘটনা। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রকে যখন তাঁর ব্যক্তিগত বিজ্ঞান সাধনায় কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করতে কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেন না তখন জগদীশচন্দ্র মুষড়ে পড়লেন। বিজ্ঞানের নতুন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে শুনে বন্ধুবর কবি রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত নিলেন দশ হাজার টাকা কবি নিজে আত্মায় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের নিকট থেকে সংগ্রহ করবেন এবং আরও দশ হাজার টাকার জন্য ত্রিপুরা রাজ দরবারে ভিক্ষা করতে উপস্থিত হবেন। ভাগ্যচক্রে মহারাজ রাধাকিশোর তখন কলকাতায়। কবিকে ভিক্ষুকবেশে আসতে দেখে দানশীল রাধকিশোর দুঃখ করে বলে উঠেন:

'এ বেশ আপনার সাজে না কবি। বাঁশি বাজানোই আপনার কাজ; আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করবো। প্রজাবৃন্দের প্রদত্ত অর্থই আমাদের রাজভোগ যোগায়। আমাদের অপেক্ষা বড় ভিক্ষুক জগতে, আর কে আছেন? এই ভিক্ষার ঝুলি আমাকেই পূর্ণ করতে হবে'। ওই সময়ে যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের বিবাহ। মহারাজ বললেন, ''বর্তমানে, আমার ভাবী বধুমাতার দু-এক পদ অলঙ্কার নাই বা হইল, তৎপরিবর্তে জগদীশবাবু সাগর পার হইতে যে অলঙ্কারে ভারতমাতাকে ভূষিত করিবেন, তাহার তুলনা কোথায়?''

সকলের শুভকামনাকে সম্বল করে জগদীশচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন কিন্তু নানা কারণে আবিষ্কারের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে বিলম্ব হতে লাগল। এদিকে ছুটি ফুরিয়ে গেলে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হবে এইরূপ অবস্থায় রাধাকিশোরের অভয় বার্তা এবং বিশ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য লাভে, পশ্চিম জগতের বৈজ্ঞানিক সমাজের জয়মাল্য নিয়ে বিজ্ঞানচার্য দেশে ফিরলেন।

উল্লেখ্য নীরব-দাতা ত্রিপুরেশ্বরের বিশেষ অনুরোধে এ গোপন তথ্যটি জগদীশচন্দ্র, মহারাজ রাধাকিশোর এবং কর্নেল মহিম ঠাকুর-এই ত্রয়ী ছাড়া অন্য কেউ জানতো না। কলকাতায় 'বসুবিজ্ঞান মন্দির'-এর উদ্বোধন কালে (১২ মার্চ, ১৯১৮) হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাবার এই সুযোগ বিজ্ঞানাচার্য গ্রহণ করলেন। আবেগভরে তিনি বললেন, ''স্বর্গীয় মহারাজার বিশেষ অনুরোধ ছিল যে এই ব্যাপরে তাঁর নাম অজ্ঞাত থাকে। আজ ইহজগতে তিনি আর নেই। এখন এই কথা বলার

আর বাধা রইল না যে যখন সহৃদয়তার হাত সম্প্রসারিত করা একান্ত জরুরি ছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।"

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বেনারস থেকে সারনাথ যাওয়ার পথে পথদুর্ঘটনায় রাজর্ষি রাধাকিশোরমাণিক্যের মৃত্যু হয়।

বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য (১৯০৯-১৯২৩)

পঁচিশ বৎসর বয়সে বীরেন্দ্রকিশোর ত্রিপুরার রাজসিংহাসন লাভ করেন। ২৫ নভেম্বর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মহাসমারোহে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয় এবং ত্রিপুরাধিপতির পুত্র বীরবিক্রম যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হন। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে পূর্ববাংলার ছোটলাট ল্যান্সলট সাহেব এবং মণিপুরের রাজা উপস্থিত ছিলেন।

বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য একজন অসাধারণ চিত্রশিল্পী, বাদ্যশিল্পী এবং ব্যক্তিগত জীবনে খুব সৌখিন হলেও প্রশাসন এবং রাজ্যের উন্নয়নে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর অঙ্কিত বিখ্যাত তৈলচিত্র 'সন্ন্যাসী', 'ঝুলন', 'বংশীবদন' ইত্যাদি এককালে দেশ-বিদেশের শিল্পীদের অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করেছিল। তৈলচিত্রগুলি এক সময়ে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের শোভাবর্ধন করত। সঙ্গীত রচনাতেও বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

রাজ্যভার গ্রহণ করে সর্বাগ্রে তিনি অমাত্যসভা পুনর্গঠন করেন। অমাত্যসভার সদস্যসংখ্যা ছিল পাঁচজন। তিনি সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে আটজন করেন। সদস্যরা হলেন ঃ রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুর, অন্নদাচরণ গুপ্ত, ঠাকুর রাধামোহন, ঠাকুর সারদাচরণ, কর্নেল মহিম ঠাকুর, অনঙ্গমোহন সাহা, দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর। বীরেন্দ্রকিশোর ছিলেন অমাত্য-সভার সভাপতি। কিছুদিন পর অমাত্যসভা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি স্টেট কাউন্সিল গঠন করেন। স্টেট কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বেশি বলে জরুরি কাজের জন্য সিলেক্ট কমিটি গঠন করা হল। রাজপরিবারের লোকদের অধিক সংখ্যায় শাসনকার্যে নিযুক্ত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হল। উল্লেখ্য মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমল থেকেই মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্রের বিরোধিতা ছিল। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্রকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করে রাজপরিবারে অভ্যন্তরীণ বিরোধের অবসান ঘটান।

কৃষির উন্নতির কারণে আগরতলায় একটি আধুনিক কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা

হল। আদর্শ কৃষি খামারের কার্যকারক যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে জাপানে পাঠানো হল রেশম গুটি চাষের প্রশিক্ষণ নিতে। রেশম শিল্পের প্রসারের জন্য রেশম-বয়ন স্কুল খোলা হল। ত্রিপুরা রাজ্যের মাটি চা-শিল্প গড়ে ওঠার উপযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হল ডঃ এ.সি.ভট্টাচার্যের উপর। ডঃ ভট্টাচার্য ত্রিপুরার মাটি পরীক্ষা করে প্রতিবেদনে জানান ত্রিপুরায় চা-শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর ডঃ ভট্টাচার্যের প্রতিবেদনের বাস্তব রূপ দিতে ১১ বছরে মোট ৪০টি চা বাগান গড়ে তুললেন। চা বাগান গড়ে ওঠার ফলে সরকারি আয় প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। ত্রিপুরার ভূগর্ভে খনিজ পদার্থের গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর বিশিষ্ট ভূ-তাত্ত্বিক অশোক বসুকে নিযুক্ত করেন।

মালঞ্চাবাসে অবস্থানের স্মৃতি প্রসঙ্গে উত্তরকালে শান্তিনিকেতনে কবি বলেছিলেন ঃ "পৃথিবীতে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র অনেক দেখিয়াছি কিন্তু ওই ত্রিপুরায় কুঞ্জবনের শৈলশ্বেত ভবন আমার স্মৃতি হইতে মলিন হইতে পারিতেছে না"।

বিশ্বযুদ্ধ জনিত কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল অস্বাভাবিক হারে। ব্রিটিশ এলাকাতে দাম বাড়ায় খাদ্যদ্রব্যের বহির্গমন অব্যাহত ছিল। পূর্বে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত লুসাই পাহাড়কে পুনরায় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিতে আবেদন করা হল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিনের দাবিকে নাকচ করে দেয়। শুধুমাত্র 'হিল ত্রিপুরা' শব্দের পরিবর্তে 'ত্রিপুরা' শব্দ ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গেল(১৯২০খ্রিঃ)। মহারাজ অসুস্থতাবোধ করায় কলকাতায় বিশ্রামের উদ্দেশ্যে গেলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিশ্রাম হল না। 'চ্যাম্বার অব প্রিন্সেস' অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে দিল্লীতে গেলেন (১৯২১খ্রিঃ)। মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। মাত্র ৪০ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য (১৯২৩-১৯৪৭)

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের মৃত্যুর সময় পুত্র যুবরাজ বীরবিক্রমের বয়স ছিল মাত্র পনেরো। অপ্রাপ্ত বয়সের কারণে রাজ্য শাসনভার একটি শাসন পরিষদের উপর ন্যস্ত হল। রাজ্যভার অধিগ্রহণ বিষয়ে প্রচারিত রোবকারীটি ছিল এইরূপ ঃ

"রোবকারী দরবার শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরবিক্রমকিশোর দেববর্মা যুবরাজ গোস্বামী

বাহাদুর এলাকাকে স্বাধীন ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩৩৩ ত্রিং তারিখ ৩২ শে শ্রাবণ।

যেহেতু গত ২৮ শে শ্রাবণ অপরাহ্ন এক ঘটিকার সময় পিতৃদেব মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন, আমি খান্দানের রীতি এবং এই রাজবংশের চিরপ্রসিদ্ধ কুলাচার মতে পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতে রাগগি ত্রিপুরা এবং জমিদারি চাকলা রোশনাবাদ এবং অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তির মালিক দখলদার হইয়াছি। এইক্ষণ হইতে রাজগি ও জমিদারি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পূর্ণ রূপে আমার পক্ষে পরিচালিত হইবে।

দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্যন্ত স্বর্গীয় মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের নিয়োজিত রাজত্ব ও জমিদারি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকারক ও কার্যপ্রণালী বহালও বলবৎ রাখা যায়। নিয়োজিত কার্যকারকগণ প্রচলিত আইন, নিয়ম ও প্রথানুসারে আমার পক্ষে সর্বাধিক কার্য সম্পাদন করিবেন।"

১৯২৮ সালের ২৯ জানুয়ারি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে মহাসমারোহে বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য বাহাদুরের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হওয়ার পর, তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর আমলের মুখ্য ঘটনার মধ্যে ছিল ত্রিপুরায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাব ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রসার, সংস্কার, শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, বিশ্ব পরিক্রমা এবং রিয়াং বিদ্রোহ। তিনিই রাজ্যের প্রথম রাজপুত্র যিনি রাজপরিবারের গন্ডির বাইরে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর গৃহ শিক্ষক ছিলেন পুলী সাহেব। রাজ্যলাভের পর দুই বৎসর অতিবাহিত হতে না হতে তিনি বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন (২০ জানুয়ারি,১৯৩০)। ভ্রমণ সঙ্গীদের মধ্যে গৃহ শিক্ষক পুলী সাহেবও ছিলেন। যাত্রার সময় বোম্বাই নগরে রাজাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন তথাকার গভর্নর এবং বারিয়ার রাজা। প্রথম বারের দীর্ঘ ৮ মাস ইউরোপ ভ্রমণে পোপ, ইতালির রাজা, মুসোলিনী, মোকোর যুবরাজ, বেলজিয়ামের রাজা, ব্রিটেনের রাজা ও রানি, ওয়েলস নরপতি, কনটের ডিউক, অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা হয়। মহারাজা দ্বিতীয় বার, পাঁচ মাসের ইউরোপ ভ্রমণ করেন (১৯৩৬ খ্রিঃ)। এবারের ভ্রমণ সাথীদের মধ্যে রানি কাঞ্চনপ্রভাদেবীও ছিলেন। দ্বিতীয়বারে ইউরোপ ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বীরচন্দ্রমাণিক্যের অসুস্থ বোন বসন্তপ্রভাকে দেখে আসা। এই

যাত্রাতেও তিনি ব্রিটেনের রাজা ও রানি, জার্মান রাষ্ট্রপ্রধান এডলফ্ হিটলার প্রমুখ রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে তাঁর সৌজন্যমূলক কথাবার্তা হয়।

দ্বিতীয় বার ইউরোপ ভ্রমণের পর মহারাজ যখন ত্রিপুরায় ফিরে এলেন তখন সমগ্র ভারতে জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে স্থানীয় ও আঞ্চলিক প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং এসব ঘটনার মধ্যেই ভারতে জাতিসত্তার উন্মেষ ক্রমশ প্রতিফলিত হচ্ছিল। ত্রিশের দশকের শেষ নাগাদ ৬০০টি দেশীয় রাজ্যের সবগুলিতেই কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের শুরুতে যে ৬০টি দেশীয় রাজ্যের তালিকার প্রজামণ্ডল 'প্রজাপরিষদ' নামের রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে ত্রিপুরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রিপুরার প্রথম কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্তের মতে ১৯৩৭ সালে কয়েকজন কমিউনিস্ট সমর্থকের উদ্যোগে 'জনমঙ্গল সমিতি' গঠিত হয়। অবশ্য ত্রিপুর সেনের মতে ১৯৩৮ সালে এই সমিতি গঠিত হয়।

ত্রিপুরার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ, ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামণ্ডল, ত্রিপুরা জনমঙ্গল সমিতি প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠনগুলি সোচ্চার হয়। উল্লেখ্য, জনমঙ্গল সমিতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার প্রাক্কালে ধর্মনগরে এক সম্মেলন থেকে কয়েকটি গণতান্ত্রিক দাবি, যেমন-অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, বেকারদের জন্য কাজ, শিল্পকেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি উত্থাপন করে। মহারাজ প্রজাদের আশ্বস্ত করার জন্য সাংবিধানিক সংস্কার সাধনের ঘোষণা করেন। ১৯৩৯ সালের ২৭ জানুয়ারি বড়লাট এক পত্রে বীরবিক্রমের মতামত জানতে চাইলেন প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ত্রিপুরা যোগদান করবে কিনা, ভবিষ্যদ্ দ্রষ্টা বীরবিক্রমমাণিক্য এর ইতিবাচক উত্তর দেন। প্রতিশ্রুতিত শাসন সংস্কার বিষয়ক ঘোষণা জারি হল (১৪ এপ্রিল, ১৯৩৯)। কিছুদিন পরেই, দীর্ঘ আট মাসের জন্য মহারাজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে বিশ্ব পরিক্রমায় রওয়ানা হলেন। এবারের ভ্রমণসূচীতে ছিল ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জাভা, মালয়, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশ। উল্লেখ্য এই ভ্রমণসূচীতেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ হয়। কালিফোর্নিয়াতে বেতার ভাষণ দেন, জাতিসংঘের অধিবেশন দর্শন করেন। মহারাজার সম্মানে সানফ্রান্সিসকোতে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। অস্ট্রেলিয়ার মার্কিন সামোয়া নামক উপনিবেশ

এর সরকারও ভোজ দেন। অস্ট্রেলিয়ার সরকারও সিডনিতে ভোজসভার সম্বর্ধনা জানান। পরিশেষে বালি দেশের রাজা ও মহারাজ বীরবিক্রমকে সৌজন্য সহকারে অভ্যর্থনা জানান। মহরাজ সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আগরতলায় প্রত্যাবর্তন করলেন ১৯৪০ সালের ২৫ জানুয়ারি। উল্লেখ্য, ১৯৩৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর যখন মহারাজ প্রশান্ত মহাসাগরের পথে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন তার পরবর্তী দিনেই অর্থাৎ ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হল। মহারাজার জাহাজ ঘুরে গেল আমেরিকার দিকে। যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেই ১৩ অক্টোবর তিনি আমেরিকা ত্যাগ করলেন। কলকাতায় ফিরলেন ২৪ ডিসেম্বর।

বিশ্ব পরিক্রমার পর মহারাজ বীরবিক্রম আধুনিক জগৎ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে প্রশাসন ব্যবস্থা সংস্কারে মন দিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর বিদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গৃহশিক্ষক ও ছিলেন ইংরেজ। বিদেশে শিক্ষাগ্রহণ করার সুবাদে ব্রিটেনের উপযোগিতাবাদীদের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বীরবিক্রমের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে প্রথমেই তিনি মন্ত্রণাসভা, ব্যবস্থাপক সভা ও মন্ত্রিপরিষদ এই তিনটি ভাগে শাসনব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করেন। এমনকি গ্রামের জনসাধারণকে শাসন ক্ষমতার শরিক করার জন্য 'গ্রাম মণ্ডল' গঠন করেছিলেন। দূরদর্শী বীরবিক্রম বুঝতে পেরেছিলেন স্বচ্ছ প্রশাসনিক নেতৃত্বের ওপর প্রশাসনিক সাফল্য নির্ভর করে। প্রশাসনিক নেতৃত্বের সংকট এবং ব্যর্থতা, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ডেকে আনে। প্রশাসনিক সাফল্যের উদ্দেশ্যে তিনিই প্রথম রাজ্যে সিভিল সার্ভিস ক্যাডার গড়ে তোলেন। প্রশাসনে গতিশীলতা এবং রাজকার্য পরিচালনা ও উন্নতির জন্য প্রতি বছর প্রধান কর্মচারীদের সম্মেলন হত। প্রথম সম্মেলনের ঐতিহাসিক 'মেমো'-এর উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

প্রধান কর্মচারী-সম্মেলন

মেমো নং ৩২

B.B.K Manikya

16.6.39 T.E

মেমো নং: ৩২

রাজ্যের কার্য-পরিচালনা ও উন্নতিকল্পে প্রতি বৎসর একবার প্রধান প্রধান সমুদয় কর্মচারির রাজধানীতে একত্রিত হইয়া আলোচনা করা আবশ্যক মনে হওয়ায় প্রথম সম্মেলনের দিন আগামী পূজাবকাশের পরে হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত। অন্যান্য সনের সম্মেলনের তারিখ পরে জানানো হইবে।

এই সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত চিফ সেক্রেটারি করিবে।

ইতি, সন ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ১৮ই আশ্বিন।

বয়সে নবীন হলেও মহারাজ বীরবিক্রম ছিলেন প্রজ্ঞাবান। তিনি বুঝেছিলেন প্রশাসনিক সাফল্য কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভর করে। যেমন পদোন্নতির সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকলে সরকারি কৃত্যকে দক্ষতার ধারা অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থায় দক্ষতার সঙ্গে কাজ করলে পুরস্কৃত হবার সম্ভাবনা নিশ্চিত থাকে। তৃতীয়ত চাকরিতে ভবিষ্যতে পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকলে যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীরা সেই চাকরির প্রতি আকৃষ্ট হয়। চতুর্থত, পদোন্নতি প্রথা চালু থাকলে কর্তৃপক্ষের অভিজ্ঞ এবং যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা উচ্চস্তরের পদগুলি পূরণ করা সম্ভব। এই শর্তগুলি মাথায় রেখেই যেসব রাজকর্মচারী কর্মকুশলতা ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রদর্শন করেছেন, মহারাজ তাঁদের উৎসাহদান ও স্বীকৃতিস্বরূপ 'কর্মবীর' 'কর্মদক্ষ' 'কর্মনিষ্ঠ' ইত্যাদি উপাধি প্রদান ও পদক দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজকীয় দরবারে এইসব উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে রাজ্যের রাজকর্মচারীদের মধ্যে ভালো কাজ প্রদর্শনের প্রবণতা দেখা যায়। উপরন্তু যেসব মননশীল গুণীজন রাজ্যের হিতসাধনে সদানিযুক্ত মহারাজ তাদেরও উৎসাহিত করারজন্য 'মহামান্যবর,'মান্যবর' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজ্যের গেজেটেড ও অন্যান্য সাধারণ কর্মচারীদের রাজকার্যে কুশলতার জন্য প্রতিবছর আর্থিক পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করা হয়। এছাড়া ত্রিপুরী সিভিল সার্ভিসের কিংবা অন্যান্য গেজেটেড অফিসারদের মধ্যে যাঁরা বছরে সর্বোৎকৃষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন, তাঁদের মধ্য থেকে দুইজনকে এবং আমলা শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্য থেকে কর্তব্য, নিষ্ঠা ও কার্যদক্ষতার জন্য তিনজনকে বিজয়া দশমী দরবারে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষাবিভাগের কুশলতার দিকেও মহারাজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে উৎসাহ বর্ধনের নিমিত্ত পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই তথ্যের সপক্ষে মহারাজার নিম্নোক্ত 'মেমো'-টি উদ্ধৃত করা হল :

B.B.K Manikya

মেমো নং: ১২২

স্বস্তি

বিষম সমরবিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য বাহাদুর, কে.সি.এস.আই. নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবর্গেষু, প্রচরত্ন, পরমস্য বিরাজতে।

রাজধানী হস্তিনাপুরী

যেহেতু বিগত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এ রাজ্যের মফস্‌স্থ হাইস্কুলসমূহ

মধ্যে কৈলাসহর রাধাকিশোর ইনস্টিটিউশন সর্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করিয়াছে এবং তজ্জন্য উক্ত স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুত প্রহ্লাদচন্দ্র বর্মন রায়-এর কৃতিত্ব এ পক্ষের সন্তোষের বিষয় হইয়াছে, অতএব উক্ত কৃতিত্বের জন্য এবং উৎসাহ বর্ধনার্থ তাহাকে মং ১২০ টাকার পারিতোষিক (খিলাত) প্রদান করা যায়।

ইতি ২৮ শে আশ্বিন, ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দ।

উল্লেখ্য, একই সময়ে মহকুমাশাসক শশাঙ্ক রায় এবং হিসাব রক্ষক প্রফুল্ল ভট্টাচার্য কর্মদক্ষতার জন্য পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

মহারাজ বীরবিক্রম সাহিত্য,শিল্প, সংগীত ও সংগীত শাস্ত্রে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। সঙ্গীত এবং নাটক রচনায় ছিলেন যথেষ্ট সিদ্ধহস্ত। মহারাজার সঙ্গীত সহচর ছিলেন সঙ্গীতাচার্য ও সুদক্ষ চিত্রশিল্পী ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মণ। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'চাঁদ কুমুদিনী, শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বিলাপ' কলিকাতায় অভিনীত হয়ে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। তাঁর সঙ্গীতচর্চার উল্লেখযোগ্য দিক হল মহারাজ বীরবিক্রমের আমল থেকেই প্রাসাদকেন্দ্রিক চর্চার বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে এসেছিল। মহারাজ রচিত একটি হোরী সংগীতের নমুনা সংযোজন করা হলঃ

হোরী খেলনক আমারি,
করতি কানাইয়া সাথ তুঁহারি।
নিকট কপট তু লম্পট কানাহাই
পরনারী সঙ্গ তু ফাগ মগই।
সব কাম ছোড়ত শ্যাম নাম গাঁওয়ত,
আরজ করতি বাত রাখিও হামারি।

কবিগুরুর স্নেহের পাত্র মননশীল সংগীত রসিক মহারাজ শান্তিনিকেতন থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করেন (২২শে পৌষ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)।আম্রকুঞ্জে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ এবং আশ্রমবাসীগণ মহারাজকে সংবর্ধনা দেন। ত্রিপুরাধিপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'আজকের এই অস্তোন্মুখ সূর্যের মতোই আমার হৃদয় জীবনে পশ্চিম দিগন্ত থেকে তোমার প্রতি তার আশীর্বাদ বিকীর্ণ করছে। তোমার সঙ্গে আজ আমার এই মিলন আর একদিনকার শুভ সম্মিলনের আলোকেই উদ্দীপ্ত হয়ে দেখা দিলে। সেকথা আজ তোমাকে জানিয়ে দেবার উপলক্ষ ঘটল বলে আমি আনন্দিত, তখন তোমার জন্ম হয়নি। আমি তখন বালক। একদা তোমার স্বর্গত প্রপিতামহ বীরচন্দ্রমাণিক্য

তাঁর মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, কেবল আমাকে এই কথা জানাবার জন্য যে, তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিতে চান। দেশের কাছ থেকে এই আমি প্রথম সমাদর পেয়েছিলুম। প্রত্যাশ করি নি এবং এই বহুমানের যোগ্যতা লাভ করার দিন তখন অনেক সুদূরে ছিল। .....রাধাকিশোরমাণিক্যর কাছ থেকে যে অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সমাদর পেয়েছেলিম তা দুর্লভ।....আজ তোমার আগমনে সেদিনকার সুখস্মৃতির সমীরণ তুমি বহন করে এনেছ। আজ তুমি বর্তমান দিনকে সেই অতীতের অর্ঘ্য এনে দিয়েছ। এই উপলক্ষে তুমি আমার স্নিগ্ধ হৃদয়ের সেই দান গ্রহণ করো যা তোমার পিতা-পিতামহদের অর্পণ করেছিলুম, আর গ্রহণ করো আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ"।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর মহারাজার সম্মানে শান্তিনিকেতনে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়। ওই সময়ে বিশ্বভারতীর পরিবর্ধিত সংগীত ভবনের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য কুড়ি হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন।

বীরচন্দ্রমাণিক্যের সাহিত্য প্রীতিও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় কবিগুরুর সপ্ততিতম জন্ম-জন্মজয়ন্তী উৎসবে। উল্লেখ্য, মহারাজার শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করে বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ভাষাবিদ্ এবং সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা-যেমন, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, আচার্য নন্দলাল বসু, অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পার্মি ব্রাউন প্রমুখ বিদগ্ধমণ্ডলী মহারাজ বীরবিক্রমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন উপরোক্ত জন্মজয়ন্তী উৎসবের সূচনা হয়েছিল। টাউন হল প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র-শিল্প-প্রদর্শনী ও মেলার উদ্বোধন করার পর মহারাজ সুধীমণ্ডলীর উদ্দেশে ভাষণে (১৯৩১,২৫ ডিসেম্বর) বলেন :

'আপনাকে আমাকে এই মহাযজ্ঞের হোতৃপদে বরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। জগৎ পূজ্য বিশ্বকবির সংবর্ধনার কোন অঙ্গের নেতৃত্ব করিতে আমার ন্যায় ব্যক্তির সঙ্কোচ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তথাপি কবির সহিত রাজ-পরিবারের যে চিরপ্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান আছে তাহাই আজ আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে। পূর্ণ গৌরবমণ্ডিত রবির ভাস্বর দীপ্তির ঐশ্বর্যের প্রতি আজ আমার লক্ষ্য নাই। আমি আপনাদের আহবানে আমার পিতামহ-প্রপিতামহের স্নেহপরায়ণ বন্ধু আমাদের বিশ্বজয়ী অন্তরঙ্গের জয়ন্তী-উৎসবে যোগদান করিতে পারিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। দরিদ্র সুদামা ব্রাহ্মণের সাহসে আজ আমি বলীয়ান।

বিধাতার বিধানে ত্রিপুরা-রাজ-পরিবার চিরকালই কলা-সৌন্দর্যবাসী। তাই শুভক্ষণে উদীয়মান রবির তরুণ সৌন্দর্যের ছটায় আমার প্রপিতামহ পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বীরচন্দ্রমাণিক্য আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তদবধি কবিবরের সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ। পিতৃদেব বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যও সে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

শিল্পপ্রিয় ত্রিপুরা রাজবংশের উপর কবির প্রভাব সামান্য নহে। পক্ষান্তরে গিরি-নির্ঝরিণী শোভিতা, বনপুষ্পভূষিতা, শ্যামলা পার্বতী ত্রিপুরার স্বভাব-সৌন্দর্য, গোবিন্দমাণিক্য, প্রমুখ আমার পূর্বপুরুষগণের কীর্তিকলাপ, ত্রিপুরার সাহিত্য চর্চা, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্র ও বয়ন শিল্প মহাকবিকেও আকৃষ্ট করিয়াছে। ইহাতে ত্রিপুরাবাসী মাত্রেই গৌরবান্বিত।

আপনারা ক্ষমা করিবেন, আমি স্বার্থপরের ন্যায় মহাকবির সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধেরই উল্লেখ করিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি-ভারতের কবি-বিশ্বকবি-আমি তাঁহাকে ত্রিপুরার কবি বলিয়া অর্ঘ প্রদান করিতেছি।

তথাপি একথা কোনোমতেই ভুলিলে চলিবে না যে, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র কেবলমাত্র সাহিত্য জগতেই আবদ্ধ নহে। বিশ্বমানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উদাত্ত সুরে বাজিয়া উঠিতেছে; কিন্তু সেখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তাহাদের চরিতার্থতার জন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম; সামান্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনও তাঁহার নিকট উপেক্ষার বস্তু নহে; শান্তিতে শ্রীতে মন্ডিত হইয়া যাতে উহা অখন্ড বিশ্বজীবনের মধ্যে আপন প্রতিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট না হয়-উপদেশের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা, নিজের জীবনব্যাপী কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সর্বদাই তিনি এই আদর্শকে আপামর সাধারণ সকলের সমক্ষেই তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেইজন্যেই শিল্পকলাকে কোনদিনই তিনি কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞের উপভোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই; নিজের দেশের শিল্পকলাকে সমগ্রভাবে, যথার্থভাবে দেখিবার শিক্ষা আমরা তাঁহারই নিকট পাইয়াছি। তাঁহারই নিকট দীক্ষা পাইয়া শিল্প-সৌন্দর্যের দিব্য নিকেতনের সমস্ত দ্বার আমাদিগের সম্মুখে উদঘাটিত হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়েও ত্রিপুরাবাসীর সৌভাগ্যের সীমা নেই। কেননা দেশীয় শিল্পকলা সম্বন্ধীয় তাঁহার প্রধান প্রবন্ধ 'দেশীয় রাজ্য' প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে আগরতলার ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত হয়। আজ একদিকে যেমন গীতাঞ্জলির করুণ সুরের ঝঙ্কার আমাদিগের বৈষ্ণব্ পরিবারের প্রাণে অহরহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধে মহতী উপদেশবাণী রাজ্য-পরিচালনাকে সৌন্দর্যে এবং

কল্যাণের কান্তিতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার বিষয়ে দিব্য ইঙ্গিতের নির্দেশে আমাদিগকে ধন্য করিতেছে। আমি আর অধিকক্ষণ আপনাদের সময় লইতে চাই না। আসুন, আজ মহাকবির সপ্ততিতম জন্মোৎসবে আমরা সমবেতভাবে শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি যে তিনি তাঁহার বরপুত্রকে সুদীর্ঘ জীবন প্রদান করিয়া তাঁহার মুখে স্বীয় অভয় বাণী বিশ্বময় প্রচার করিতে থাকুন। কবিবরের আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমি এক্ষণে এই শিল্প প্রদর্শণীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি'।

ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের সমাপ্তি কাটলেও ভারতে, ধর্ম, জাত-পাত নিয়ে রাজনীতির আধিক্যের কমতি ছিল না। মহারাজ বীরবিক্রম ছিলেন সঙ্কীর্ণ রাজনীতির উর্ধ্বে। তাঁর সমদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত কাল পরে কুমিল্লার আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংবর্ধনার উত্তরে মহারাজার ভাষণ (১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দ ৮ ভাদ্র)-এর মধ্য দিয়ে। তিনি সেদিন বলেন : 'আমি আজ সরলভাবে আপনাদিগকে বলিতেছি, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি আবহাওয়া আমার রাজ্যে সৃষ্টি করা-ইহাই আমার সর্বোচ্চ এবং একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। যাহাদিগকে ভাগ্য আমার নিজের ভাগ্যের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত-হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, আমি তাহাদিগকে এই বুঝাইয়া দিতে চাই যে, বিভিন্ন জাতিতে অথবা বর্ণে বর্ণে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্যের স্থান নেই। প্রতি সম্প্রদায় একই আদর্শ, লক্ষ্য এবং পরিণতির সুনিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত। আমি চাই, হৃদয়ের অন্তঃস্থলের অনুভূতি দ্বারা প্রত্যেকে এইটুকু উপলব্ধি করুক যে, ধর্ম কেবলমাত্র পন্থা বিশেষ -যাহার অনুসরণেই একমাত্র সার্বজনিক গন্তব্যগৃহে আমরা বিশ্বপিতার পদপ্রান্তে উপনীত হইতে পারি।

প্রসঙ্গক্রমে মানবদরদী মহারাজাবীরবিক্রমের আমলে আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। ঘটনাটি ১৯৪১ সালের রায়পুরার কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যার ফলে ঢাকা জেলার রায়পুরা ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলে হাজার হাজার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগী ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় পেতে আখাউড়া রেলস্টেশনে জমায়েত হল। পিতৃপুরুষের ভিটায় শান্তিতে বাস করার অধিকার তাদের নেই সাম্প্রদায়িক নিপীড়নে। অসংখ্য অসহায় শরণার্থীর এই আকস্মিক জমায়েতের গুরুতর পরিস্থিতি সম্বন্ধে কুমিল্লার জেলা কর্তৃপক্ষও রাজনৈতিক কারণে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন। অতঃপর স্টেশন কর্তৃপক্ষ উপায়হীন হয়ে ত্রিপুরেশ্বরের

শরণাপনন হলেন। ওই সময়ে আগরতলার রাজপ্রাসাদে তখন সবেমাত্র স্বর্গীয়া মহারানী-রাজমাতার শ্রাদ্ধবাসরের অনুষ্ঠান চলছিল। মহারাজ সপারিষদ সেখানে উপস্থিত। ঠিক এমন একটি মুহূর্তে আখাউড়া স্টেশন-মাস্টার টেউলর সাহেব স্বয়ং রাজদরবারে জরুরি পরিস্থিতির ব্যখ্যা করলেন। মহারাজা মুহূর্তেই বিলম্ব না করে রাজমন্ত্রী ও সচিববর্গের ভবনগুলির দুয়ার খুলে দিয়ে শরণার্থীদের অবিলম্বে ত্রিপুরায় নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। ইউনাইটেড প্রেসের কর্ণধার এক প্রতিবেদনে জানালেন ''All roads lead to Tripura now and all eyes are directed towards its wonderful ruller with reverence and love. Tripura has done a miracle and has extorted the admiration of the whole country. May the flag of Tripura fly aloft for all time to come....''

নিঃসন্দেহে সেদিনের ঘটনা ত্রিপুরার উত্তরকালের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেই অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা কবিগুরু তাঁর অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী দিবস ভাষণ দান কালে উল্লেখ করে বলেন, 'আমার আনন্দের একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে যখন বুঝলেম বর্তমান মহারাজা অত্যাচার পীড়িত বহুসংখ্যক দুর্গতিগ্রস্ত লোককে আসামান্য বদান্যতার দ্বারা আশ্রয় দান করেছেন, তার বিবরণ পড়ে আমার মন গর্বে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারলুম তাঁর বংশগত রাজউপাধি, আজ বাংলাদেশের সর্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হোল। ....' উল্লেখ্য, পঞ্চাশের মন্বন্তরে (১৩৫০) মহারাজ তখনও রাজ্যান্তর হতে সমাগত হাজার হাজার ক্ষুধার্ত নরনারীকে আশ্রয় দান করে এবং ক্ষুধার অন্ন দিয়ে অক্ষয় পুন্য অর্জন করেছিলেন।

বিশ্বকবির মহাপ্রয়াণের সময় মহারাজ ছিলেন দক্ষিণ ভারতে। বিশ্বযুদ্ধের কারণে তড়িঘড়ি তিনি ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন। রাজবাড়ির মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদিগকে পান্না, বারিয়া,প্রভৃতি রাজ্যের রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। ইংরেজ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় 'ওয়ার' কমিটি গঠন করলেন, যুদ্ধ তহবিলও গঠন করা হল। ২২ মে বোধজং বাহাদুরের নেতৃত্বের ত্রিপুরা বাহিনী বর্মা যুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রেখে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে। মিত্রপক্ষের কাছে জার্মানি আত্মসমর্পণ করল ৪ মে, ১৯৪৫। পাঁচ মাসের ব্যবধানে ৬ এবং ৯ আগস্টে জাপানে অ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হল। ১৪ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে। ব্রহ্মদেশ রণক্ষেত্রে ত্রিপুরা বাহিনীর

বিশেষ কৃতিত্বের স্মারক হিসাবে বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ Knight Grand Cross of the order of the British Empire এই সম্মানে ভূষিত করে। এদিকে বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থের অভাবে যুদ্ধ ফেরত 'ত্রিপুরা রাইফেলস', বাহিনী ভেঙে দেওয়া হল। বেকার হয়ে গেল বহু সেনা। রাজ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। অবশ্য বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় মহারাজ বীরবিক্রমের আমলে রিয়াং সর্দারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল(১৯৪৩)। রাজনৈতিক অস্থিরতা চলতে থাকলেও,ভারতের স্বাধীনতা লাভ প্রায় নিশ্চিত হয়ে ওঠে। দূরদর্শী মহারাজা ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সম্মতি দেন, স্বাধীনতা লাভের প্রাক মুহূর্তে (২৭ মে, ১৯৪৭) তাঁর মহাপ্রয়ান ঘটে। যুবরাজ কিরীটবিক্রম রাজ্যের অধিকারী হলেও প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ার দরুণ মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর সভাপতিত্বে গঠিত কাউন্সিল অব রিজেন্সি ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করে। ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতভুক্ত হয়। রাজন্য ত্রিপুরার অবসান ঘটে। ২৬ নভেম্বর স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান গৃহীত হল।

রিয়াং বিদ্রোহ (১৯৪২-১৯৪৩)

ভারতের কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাসে উপজাতীয় আদিবাসীদের সংগ্রাম এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। জমিদার-শ্রেণী ও ইজারাদারগণের শোষণ-উৎপীড়নের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে রিয়াং উপজাতিরা সংগ্রাম শুরু করেছিল। ওরা শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে লাভ করেছিল কেবল অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়ন আর অবহেলা। ত্রিপুরায় তিপ্রা বিদ্রোহ (১৮৫০), জমাতিয়া বিদ্রোহ (১৮৬৩), কুকি বিদ্রোহ (১৮৪৪-৯০), এবং রিয়াং বিদ্রোহ(১৯৪৩) মূলত জমিদার-মহাজন-ইজারাদার বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করে।

রাজন্য ত্রিপুরার সর্বশেষ নৃপতি মহারাজা বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যের আমলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে রিয়াং সর্দারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহ হয়। রাজ-পরিষদরা প্রকৃত তথ্য না জানিয়ে এই ঘটনাকে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আখ্যা দিয়ে রাজাকে প্রভাবিত করেন। রাজসৈন্যরা বহু বিদ্রোহীকে হত্যা করে। ৫০টি গ্রাম জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়। তিন হাজার রিয়াং উপজাতি বন্দি হয়। কথিত আছে রতনমণিকে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয়।

বিদ্রোহের নায়ক রতণমণির বাসস্থান ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড়

মহকুমার রামচীরা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম নীলকমল নোয়াতিয়া। রতনমণি, লোকমান সাধু নামে পরিচিত ছিলেন। রিয়াংদের পূর্ব নিবাস সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় ঃ

"কহিল চন্তাই নৃপতি বিদ্যমনে।
শুনহ রিয়াং পাড়া আছিল যেখানে।।
গোমতী নদীর যথাতে উৎপত্তি।
ডমরু নামেতে তীর্থ জান তার খ্যাতি
তাহার পূর্ব্বেতে টিলা মায়োনি নাম ধরে।
রিয়াং বসতি ছিল সেই নদীর তীরে।
তাতিগ্রামে জান কর্ণফুলী তরঙ্গিনী।
সে নদীর সঙ্গে মিলিয়াছে মায়োনী।। " উৎস ঃ কৃষ্ণমালা।

পূর্বে ত্রিপুরার উদয়পুর, সোনামুড়াও বিলোনীয়া বিভাগে রিয়াংগণের বসতি ছিল। অল্পকাল মধ্যে তারা রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, তৎকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং রিয়াংদের বসতিহেতু সেই অঞ্চল 'রিয়াং দেশ' নামে প্রখ্যাত ছিল।

রতনমণি সাধুর বেশভূষা ছিল অতি সাধারণ। সন্ন্যাসীর মত তাঁর জীবনযাত্রা। গলায় রুদ্রাক্ষ মালা ছিল। তাঁর শিষ্যগণ একটি করে রুদ্রাক্ষ ধারণ করত। তাঁর শিষ্যগণের কাছ থেকে জানা যায় তিনি হরিনামের মন্ত্র দিতেন 'ওঁ প্রাণঃ রাম' উচ্চারণ করে। গল্পচ্ছলে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং প্রেমের অবতার চৈতন্যের বিষয়েও উপদেশ দিতেন। বারো বছরের উপর তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অনেকের ধারণা রিয়াং বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সাত থেকে দশ বছর আগে রতনমণি ত্রিপুরায় আসেন। ত্রিপুরায় তাঁর প্রথম শিষ্য খুশীকৃষ্ণ নোয়াতিয়া। জনশ্রুতি এইরূপ যে খুশীকৃষ্ণ,গেলাকৃষ্ণ, চৈত্রসেন এবং অন্য একজন শিষ্য সহ তিনি অমবপুরের একছড়ি মৌজায় 'তাওযাম'-এ প্রথম আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে অমরপুরের ডুম্বুরে প্রেমতল আশ্রম, সামখুমছড়া ও উদয়পরের দক্ষিণ মহারানী প্রভৃতি স্থানে তাঁর একাধিক আশ্রম নির্মিত হয়। ৩০ রতনমণি রামায়ণ, মহাভারত, গীতার বাণী প্রচারে ব্রতী হন। চট্টগ্রাম থাকাকালীন সময়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, অস্ত্রাগার

লুণ্ঠন এবং স্বদেশী যোদ্ধাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং মহত্ত্বের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হন। রতনমনির আধ্যাত্মিক চেতনা এবং স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে রিয়াংরা তাঁর শিষ্য হতে লাগল।

রতনমণির ভক্ত শিষ্যগণ একতারা বাজিয়ে এখনও সন্ধ্যাকালে প্রার্থনা সভায়, গান করেন সমবেত কণ্ঠে ঃ

ওঁ ছে ব্রহ্মা	ওঁ ছে বিষ্ণু
ওঁ ছে মহেশ্বর	ওঁ ছে নর ঈশ্বর
ওঁ ছে স্বর্গ	ওঁ ছে মর্ত আদি

এরপরের কর্মসূচিতে গুরুবন্দনা এইরূপ ঃ

জগনি গুরু সে সব (সেই জগতের গুরু)
মানিয়া মুনু ছে (মানুষ আইন মানে না)
রতন গুরু যে অ (সেই রতন গুরু)
মানে খা আমানুং নঅ(তুমি আমাদের মা, বাবা)
বিজয় আমানুং নঅ(জয় বিজয় তোমাদের কাছে)
বিজয় কালী মা (তুমিই মা কালী)
দেবানি ফাইমি সে অব (দেবতা হতে তিনি আসেন)
দেব বাই আদি সে অব (দেব তিনি আদিও তিনি)
রতন সাম না অব (রতন এই বলেন)
আদিনি সামি সে অব (আদির কথা বলেন)
বংশ সে ঈশ্বর (বংশই ঈশ্বর)
বংশ ন অ উধার খেনাই (বংশের উদ্ধার করেন)

ইহা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে সাধু নিজ সম্প্রদায়ের গরিব আদিবাসী রিয়াংদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এবং নতুন ধর্মে ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

বিদ্রোহের সূচনা ঃ প্রতি বছর মকর বা পৌষ সংক্রান্তির সময়ে অমরপুরের তীর্থমুখে পুণ্যস্নান করার জন্য বিভিন্ন জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা সমবেত হন। এই সময়ে কেউ কেউ মৃত আত্মীয়-স্বজনের পুণ্য অস্থি গোমতী নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে তাঁদের আত্মার সদ্গতির জন্য ধর্মীয় ক্রিয়াদি সম্পাদন করেন।

এই সব ক্রিয়া কর্মে বাঙালি ব্রাহ্মণরা উপজাতিদের মন্ত্র পড়াতেন এবং নিরীহ উপজাতিদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। অনেক সময় মন্ত্র পড়াবার নামে অত্যাচারও চলত। এই সব ক্রিয়া-কলাপে রতনমণি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। রিয়াং সম্প্রদায়ের চৌধুরীদের সহায়তায় ব্রাহ্মণদের তাড়িয়ে নিজেরাই মন্ত্র পড়াতে লাগলেন। সংগৃহীত অর্থ রতনমণির অনুচর এবং চৌধুরীরা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেওয়ার প্রথা চালু হল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অর্থের বন্টন ব্যবস্থা নিয়ে রতনমণির শিষ্যদের সঙ্গে চৌধুরীদের বিবাদ শুরু হয়। এ ঘটনার সংবাদ অবগত হয়ে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর-এর আদেশে রতনমণিকে গ্রেপ্তার করে রাজধানী আগরতলায় বন্দি করে রাখা হয়। কিন্তু রতনমণি বন্দি অবস্থায় পালাতে সক্ষম হন। শিষ্যদের চোখে রতনমণি তখন শুধু আধ্যাত্মিক গুরুই নন প্রকৃত অর্থে স্বদেশী নায়ক হয়ে ওঠেন। ঘটনাচক্রে এই সময়ে রিয়াং সম্প্রদায়ের নিপীড়িত জনগণ দলে দলে তার শিষ্য হতে লাগল। উল্লেখ্য বিলোনীয়া মহকুমার বগাফা অঞ্চলের খগেন্দ্র রিয়াং নামে জনৈক চতুর আদিবাসী রিয়াং সম্প্রদায়ের 'রায়'হতে উদ্যোগী হলেন। রিয়াং সমাজে 'রায়' উপাধি রিয়াংদের কাছে রাজাস্বরূপ। রিয়াংজাতির সর্বপ্রধান নেতা। কিন্তু রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ একটি প্রথা আছে যে একজন 'রায়'-এর জীবদ্দশায় অন্য কেউ রায় হতে পারেন না। খগেন্দ্র রিয়াং প্রচলিত প্রথাকে উপেক্ষা করে মহারাজ বীরবিক্রমের কাছে অন্যায়ভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টায় তদবির শুরু করেন। মহারাজ খগেন্দ্র রিয়াং-এর তদবিরে প্রভাবিত হয়ে দেবী সিং রিয়াং নামে বর্তমান রিয়াং সমাজের 'রায়' উপাধিধারীকে ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করে খগেন্দ্র রিয়াংকে নতুন 'রায়' হিসাবে মনোনীত করেন। দেবী সিং রিয়াং রাজদরবারে অভিযোগ জানিয়েছিলেন কিন্তু এতে ফল পয়নি। এই ঘটনায় রিয়াংগণ হতাশায় দলে দলে রতনমণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন এই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তৎপরতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। ত্রিপুরায় বালক সেনা, ত্রিপুরা রাজ্য রক্ষী বাহিনী, খাস সেনাবল গঠিত হয় (১৯৪০)। ১৯৪৩ সালে বৃহৎ বঙ্গের কয়েক লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের কবলে, ত্রিপুরাতেও সেই পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে এই আশঙ্কায় মহারাজ বিশাল শষ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে চাইলেন। এদিকে রাজ্য ধানের ফলন তেমন ভাল হয় নি, অথচ সৈন্যদের জন্য ধান-চালের সংগ্রহ অভিযান চলতে থাকে। মহারাজার অজান্তে রাজকর্মচারীরা জোর করে দরিদ্র প্রজাদের নিকট থেকে নামমাত্র মূল্যে চাল সংগ্রহ

করতে থাকে। রিয়াং সম্প্রদায়ের স্বার্থান্ধ চৌধুরীরা রাজার কর্মচারীদের উৎকোচ দিয়ে ধান চাল সংগ্রহ করে গোলায় মজুত করতে লাগল। ফলে দক্ষিণ ত্রিপুরার অমরপুর, উদয়পুর, বিলোনীয়া এবং সাব্রুম মহকুমার পার্বত্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রতনমণির শিষ্যরাও প্রাণ রক্ষার্থে 'ধর্মগোলা' তৈরি করে নিজেদের মধ্যে ধান চাল বন্টনের ব্যবস্থা করে। রাজকর্মচারীরা অমূলকভাবে এই ব্যাপারটি সন্দেহের চোখে দেখে।

বিশ্বযুদ্ধের সময়, মহারাজ ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্য থেকে বিশেষ করে রিয়াং সম্প্রদায় থেকে সৈন্য সংগ্রহে সচেষ্ট হন। এর কারণও আছে। রিয়াংদের রাজভক্তি ছিল অসাধারণ। প্রাচীনকালে রিয়াং সম্প্রদায়ের ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে বীরত্বেও যুদ্ধকৌশলে বিশেষ সুনাম ছিল। কথিত আছে মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে (পঞ্চদশ শতাব্দী) রিয়াং সম্প্রদায়ের কাচাগ্ ও রায় কছম্ সেনাপতিদ্বয়ের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে বঙ্গেশ্বর হোসেন শাহ ত্রিপুরা আক্রমণ করতে গিয়ে বার বার পরাজিত ও বিড়ম্বিত হয়েছেন। উপরোক্ত দুই সেনাপতি হোসেন শাহের একটি পতাকা ও একটি তোপ কেড়ে নিয়েছিলেন।৩২ মহারাজ ধন্যমাণিক্যের পরেও ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে রিয়াংদের প্রাধান্য ছিল। স্বাভাবিক কারণেই মহারাজ বীর বিক্রম যুদ্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত রিয়াং সম্প্রদায়ের থেকেও সৈন্য সংগ্রহে আগ্রহী হয়েছিলেন। কিন্তু রিয়াং যুবকগণ, সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। অনিচ্ছা প্রকাশ করার মূল কারণ তাঁদের সামাজিক অভিযোগে মহারাজা গুরুত্ব দেননি। রিয়াং চৌধুরীরা রাজাকে বোঝালেন রতনমণির নেতৃত্বে তাঁর শিষ্যরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। রাজা অনুসন্ধান না করে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন। রাজার সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে রতনমণির শিষ্যদের সংঘর্ষ হল। উভয় পক্ষে বহুলোকের মৃত্যু হয় রাজার সশস্ত্র বাহিনীপরিশেষে রিয়াংদের অকথ্য অত্যাচার শুরু করে। তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হাজার হাজার রিয়াং প্রজাকে বন্দি করে রাজধানীতে আনা হয়। মহারাজ বন্দি রিয়াং প্রজাদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে মুক্তি দেন। পলায়মান রতনমণিকে ব্রিটিশ সৈন্যরা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বন্দি করে আগরতলায় পাঠিয়ে দেয়। রতনমণি বন্দি অবস্থায় বিচারের পূর্বেই অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রতনমণির মৃত্যুর পর স্বতস্ফূর্ত রিয়াং বিদ্রোহের মূল্যায়ন করে তৎকালীন

স্বাধীনতা পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবেদনটি জানার পর জওহরলাল নেহেরু মহারাজ বীরবিক্রমকে একটি ঐতিহাসিক পত্র দিয়েছিলেন। পত্রটি এইরূপ ঃ

৩৬ নং ওয়েলিংটন স্ট্রিট
কলিকাতা
ডিসেম্বর ৯, ১৯৪৫

হিজ হাইনেস মহারাজা মাণিক্যবাহাদুর,
ত্রিপুরা স্টেট
ত্রিপুরা (বেঙ্গাল)

প্রিয় মহারাজা সাহেব,

আমি জ্ঞাত হয়েছি যে, ত্রিপুরারাজ্য গণপরিষদ এবং ত্রিপুরারাজ্য কংগ্রেসের অনেক সদস্য বিনা বিচারে দীর্ঘকাল ধরে কারাগারে আছেন। যুদ্ধের শুরুতে স্পষ্টই তাদের বহুসংখ্যক বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা বাংলা সরকারের না ত্রিপুরা রাজ্যের বন্দি, আমি জানি না। আরও সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে যে, এই বন্দিদের প্রতি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তাদের কয়েকজন মারাত্মক অসুখে ভুগছেন। আমি আরও জানতে পেরেছি যে ১৯৪০-এর আরম্ভ থেকেই সমস্ত সভা এবং মিছিল এবং অন্যান্য বিক্ষোভ প্রদর্শন রাজ্যটিতে নিষিদ্ধ এবং কোনও প্রকারের নাগরিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই। আমি আশ্চর্য হই যে আজকের ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের ঘটনাবলীতে এমন অবস্থার অস্তিত্ব থাকতে পারে। আমার তথ্যগুলি যদি ভুল হয় আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে শুধরিয়ে দিলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। যদি সেগুলি ভুল না হয়, আমি বিশ্বাস করি আপনি অনুগ্রহপূর্বক প্রজা শাসনের এই কলঙ্ক অবলোকন করবেন। আমি খুশী হবো যদি একটি উত্তর আনন্দভবন, এলাহাবাদ, আমার বাড়ির ঠিকানায় আমার নিকট প্রেরিত হয়।

ভবদীয়
স্বা ঃ জওহরলাল নেহেরু

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর চিঠি প্রাপ্তির পর মহারাজ বীরবিক্রম রিয়াং বিদ্রোহের প্রকৃত তথ্য জানার জন্য চারজনের একটি কমিটি গঠন করেছিলেন (১৯৪৫)। কমিটির উপর দায়িত্ব দেওয়া হল রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তিজনক অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার কারণ ও প্রতিকার এবং তাদের নৈতিক সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থার সামগ্রিক উন্নতিসাধনের উপায় নির্ধারণের প্রতিবেদন পেশ করার জন্য। কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঃ

১. রতনমণি খগেন রায় ও চৌধুরীদের বিরুদ্ধে অবিচারের অভিযোগ মহারাজের গোচরে আনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মিসিপ হরচন্দ্র ঠাকুর 'রায়' এর পক্ষে থাকায় প্রতিকার পাননি।

২. রিয়াংগণ লুসাই চিফ রাংবুংহার কাছে লিখিত অভিযোগ করে, এই ঘটনায় মহারাজ তাদের উপর ক্রুদ্ধ হন।

৩. রায় এবং চৌধুরীরা দরিদ্র রিয়াংদের কাছ থেকে জরিমানা বা অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় করত। রিয়াংদের অনেক সামাজিক বিধান তারা নিজেরা লঙ্ঘন করত, কিন্তু অন্যদের সেই কারণেই বিচার ও জরিমানা করত।

৪. দেবী সিং রায়-এর পরিবর্তে খগেন্দ্র চৌধুরীকে মহারাজ কক রায়কাঞ্চন মনোনীত করেন। কিন্তু রায়ের জীবিত থাকাকালে 'রায়' পরিবর্তনের বিধান ছিল না।

৫. চৌধুরী অনেক গরিব রিয়াংদের দিয়ে জমিতে বা অন্য ক্রিয়া কর্মে 'বেগার' খাটাত।

৬. জনশ্রুতি ছিল জাপানিদের সঙ্গে রতনমণির দলের যোগাযোগ আছে এবং জাপানের কাছ থেকে ওরা সাহায্য পাচ্ছে।

৭. রাজার বিরুদ্ধে রিয়াংরা আন্দোলন করেনি। রায় ও কিছু সংখ্যক চৌধুরীর বিরুদ্ধেই তাদের আন্দোলন ছিল।

কাঁঠালিয়াছড়ার রতনমণির শিষ্য রিয়াং প্রধানদের বক্তব্য ছিল। ৩৪

১. রায় কাঞ্চন ও চৌধুরীদের জরিমানা ও জুলুম ঃ ২০,০০০ টাকা করে। শ্রীচিন্তামণি বলেন মোট ২০,৪২৫ টাকা দশ আনা ছয় পাই জরিমানা করে।

২. খগেন রায় কর্তৃক বাসী পূজার (গঙ্গা পূজার) চাঁদা দু'টাকা থেকে বাড়িয়ে চার টাকা করা হয়।

৩. রাজদ্রোহী বলা এবং জাপানির চর বলা এবং রাজ্য রক্ষা বাহিনী দিয়ে সাজা দেওয়া ও কয়েদ খাটান।

৪. রতনমণির শিষ্য হলে জরিমানা করা।

৫. মহারাজ কর্তৃক রায় ও চৌধুরীদের অন্যায় ও জুলুমের প্রতিকার না করা।

সুতরাং মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যের দ্বারা গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী বলা যেতে পারে রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহ (১৯৪৩) বাস্তবিক পক্ষে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল না। রাজার নিযুক্ত খগেন্দ্র রিয়াং (রায়)ও চৌধুরীদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সকল প্রকার শোষণ -উৎপীড়ন থেকে মুক্তি-এটাই ছিল রিয়াং বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন কোন কোন ইংরেজ কর্মচারী আদিবাসীদের স্বাধীনতা প্রিয়তা, সারল্যে এতটাই মুগ্ধ ছিলেন যে তাঁরা স্বজাতীয় ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদনে জানিয়েছিলেন যে আদিবাসীদের মানুষ হিসাবে গ্রহণ করে সভ্য সমাজের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা উচিত। এই সকল ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতিভূ ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের কমিশনার ক্যাপ্টেন লিউইন। তাঁর আবেদনে তিনি বলেন ঃ" এই পাহাড়-পর্বতগুলিকে আমরা যেন কেবল আমাদের নিজ স্বার্থেই শাসন না করি, আমরা যেন কেবল এই পাহাড়-অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থেই, তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নিমিত্তেই তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করি। সভ্যতাই সভ্যতা সৃষ্টি করে, সভ্যতা সভ্যতারই ফল, এর কারণ নয়। শাসনকার্যে যোগ্যতাসম্পন্ন কোন কর্মচারীকে এই পাহাড়-অঞ্চলের মানুষগুলির শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ করতে হবে। এই সকল অঞ্চলে এরূপ শাসক চাই যিনি সরকারি শাসনচক্রের একটি অংশ মাত্র হবেন না, সমশ্রেণীভুক্ত এই জীবদের (অর্থাৎ পার্বত্য-অধিবাসীদের) ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে তাঁকে যথেষ্ট সহনশীল হতে হবে; যে সহানুভূতির স্পর্শে বিশ্বের সকল মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব, তাঁহাকে সেই সহানুভূতি অনায়াসে ও দ্রুততার সঙ্গে তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। সেই শাসককে নূতন নূতন চিন্তাধারার উদ্ভাবন এবং সেই চিন্তাধারার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে ও তা সফলভাবে প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু তাঁদের

জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কারে যাতে আঘাত না লাগে, সেজন্য সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। এই প্রকার কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় থাকলে তারা নিজেরাই নিজেদের সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে তাদের নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা চালিত হয়ে কালক্রমে তারা ইংরেজ জাতি অপেক্ষা কোনও অংশে হীন ও নিম্নস্তরের মানুষ হবে না। তারা গড়ে উঠবে ভগবানর সৃষ্ট জীবকূলে একটি মহৎ আদর্শরূপে"।

রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ ও আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের বিশেষ কমিটির প্রতিবেদনকে গুরুত্ব দিয়ে স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সময় রতনমণির অন্যতম অনুগামী তছলমফা ওরফে রাজাপ্রসাদ চৌধুরী ত্রিপুরার পূর্ণমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন এবং রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা দেওয়া হয়।

রাজ্যে খনিজ তেলের অনুসন্ধান করার জন্য বীরবিক্রমকিশোর 'বর্মা অয়েল কোম্পানী'কে অনুমতি দিয়েছিলেন। রাজ্যের প্রশাসনকে উন্নত করার লক্ষ্যে রাজ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হল। একই সঙ্গে উন্নতমানের বিচার ব্যবস্থার জন্য ইংরেজ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত জজদের মধ্য থেকে বিচারক নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। পরিশেষে প্রশাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যকে দশটি বিভাগে বিভক্ত করা হল। উদয়পুরের নাম পরিবর্তন করে 'রাধাকিশোরপুর' রাখা হল (১৯১২)। রাজ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর বিভিন্ন মহকুমায় ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শুধু সংখ্যার দিক থেকে নয় শিক্ষার মান উন্নত করার লক্ষ্যে সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণকে আমেরিকার শিক্ষাপদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ নিতে পাঠানো হল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরাতে সর্বপ্রথম ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় একমাত্র কেন্দ্র আগরতলায় চালু করতে (১৯১২) শর্তাধীন অনুমতি দিল।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের যেমন একটা নৈতিক সমর্থনের পরিচয় পাওয়া যায় ঠিক তেমনি বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের ক্ষেত্রে সে ধারা গুপ্তভাবে অব্যাহত যে ছিল তার প্রমাণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া ও উদয়পুরে অনুশীলন সমিতির ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল,এ তথ্য মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের অজানা ছিল মনে হয় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে কোনও দেশীয় রাজ্যের শাসকের

পক্ষে বিরোধিতা সম্ভব ছিল না। রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ বাইরে সহযোগিতার প্রমাণ দিলেও ভেতরে যে স্বাধীনতা আন্দোলনে নৈতিক সমর্থন ছিল তার প্রমাণের অভাব নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কৌশলগত কারণে বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য ইংরেজ সরকারের যুদ্ধ-তহবিলে প্রচুর অর্থ দান করেন। উল্লেখ্য, রিয়াং বিদ্রোহ স্তিমিত হওয়ার পর মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের জন্য সচেষ্ট হলেন।প্রথমেই কৃষির উন্নতির বিশেষ ব্যবস্থা নেন। পার্বত্য প্রজাদের জুম চাষের পরিবর্তে আধুনিক হাল চাষে উৎসাহিত করেন এবং জমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। মৌখিকভাবে জমি ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হল। উপজাতিদের জন্য জমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। পরিবহন এবং রাস্তাঘাট নির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গ্রাম উন্নয়নে গ্রাম মণ্ডলীর উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।ট্রেজারিতে ব্যাংক স্থাপন এবং আর্থিক লেনদেনের সুবিধার জন্য ত্রিপুরা স্টেট ব্যাংক স্থাপিত হয়। প্রশাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যকে দশটি বিভাগে বিভক্ত করেন। উদয়পুরের নাম পরিবর্তন করে রাধাকিশোরপুর রাখা হল (১৯১২)। পাশ্চাত্য শিক্ষাও ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়ে এবং দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রাজ্যের উন্নতির জন্য দীর্ঘ উনিশ বছরের এক উল্লেখযোগ্য। পরিতাপের বিষয় মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্যের জীবিতকালে এই পরিকল্পনার রূপদান করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর পরিকল্পনার অংশ হিসাবে আগরতলায় মহারাজ বীরবিক্রম কলেজ (১৮৪৭) স্থাপন এবং ১৯৮৭ সালের ২ রা নভেম্বর ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়।

অষ্টম অধ্যায়

রাজন্য যুগে শাসন পদ্ধতি

রাজন্য যুগে ত্রিপুরায় সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাজাই ছিলেন সর্বময় কর্তা এবং রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। রাজারা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেও রাজা একদল উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাহায্যেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল প্রথম দিকে রাজার নিজ গোষ্ঠীর অভিজাতবর্গ ও রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিরাই প্রশাসনের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন। উল্লেখ্য, নারায়ণ উপাধিযুক্ত এইসব ব্যক্তিরা একদিকে যেমন ছিলেন সেনাপতি আবার অন্যদিকে ছিলেন রাজার পরামর্শদাতা। সেনাবাহিনী ওদের হাতে থাকায় ওরা খুবই ক্ষমতাশীল ছিলেন। এমন কি রাজারাও অনেক সময় নিজেদের অসহায় বোধ করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহারাজ অনন্তমাণিক্যের দুর্দশা উল্লেখ করা যেতে পারে। অনন্তমাণিক্য ছিলেন পরাক্রমশালী রাজা বিজয়মাণিক্য-এর পুত্র। অন্যদিকে প্রতাপশালী সেনাপতি গোপীপ্রসাদের জামাতা। জামাতাকে রাজ্যাভিষেক করানোর পর গোপীপ্রসাদ কার্যত রাজ্যের সর্বাধিকারী হলেন। রাজা হওয়ার উৎকট বাসনার ফলে সুযোগ বুঝে অনন্তমাণিক্য-কে হত্যা করে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে সম্ভবত রত্নমাণিক্যই ত্রিপুরার প্রথম রাজা যিনি প্রতিবেশী মুসলিম শাসনের অনুকরণে কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করেছিলেন। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তিনি চারটি উচ্চপদের সৃষ্টি করেন। যেমন-(১) উজির বা প্রধানমন্ত্রী, (২) সুবা বা সেনাপতি, (৩) নাজির বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনীর প্রধান এবং (৪) দেওয়ান বা অর্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। উপরোক্ত চারটি উচ্চপদ ছাড়াও পরবর্তী সময়ে আরও কতকগুলি প্রায় সমতুল্য শ্রেণীর উচ্চপদ সৃষ্টি করা হল, যেমন কারাকুল, কোতোয়াল মুসিব, নেমুজির প্রভৃতি। প্রশাসনে তিনি নিজের বিশ্বাস-ভাজন লোক নিযুক্ত করতেন। অবিভক্ত বঙ্গদেশের (প্রাচীন নাম (গৌড়) সুলতানের দরবারে রত্নফা থাকাকালীন সময়ে সেখানে গ্রামে গঞ্জে

নানারকম-কলা কুশলীকে কাজ করতে দেখেছিলেন। ত্রিপুরার এমন কলা-কুশলীর অভাব উপলব্ধি করে তিনি গৌড়ের সুলতানের কাছে অনুরোধ জানালেন। সুলতান রত্নফার অনুরোধ রক্ষা করে বঙ্গদেশের নানা গ্রাম থেকে দশ হাজার 'নবশাক' পাঠালেন। নবশাক হল কর্মকার, কুম্ভকার, গোপ, তেলী, তাঁতি, নাপিত,বারুই, মালাকার ও মোদক। ঢাকার নিকটবর্তী স্বর্ণগ্রাম (সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁও)থেকে কতিপয় শ্রীকর্ণ অর্থাৎ লিপিব্যবসায়ী করণিক-কে আনা হল। প্রতিরক্ষার কাজে বঙ্গদেশ থেকে চার হাজার সেনা পাঠানো হল। রাজা রত্নমাণিক্য পরবর্তী সময়ে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবস্থা উন্নত হওয়ার পর গৌড়েশ্বরের অনুমতিক্রমে বঙ্গদেশ থেকে দশ হাজার বাঙালিকে ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। রত্নমাণিক্য বাংলাদেশীয় হিন্দুদের সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রথম খুবই অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে হিন্দুসংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার-এর মতে "রত্নমাণিক্যের সময়ে থেকেই ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং বাংলার হিন্দুসংস্কৃতি ও সভ্যতা ত্রিপুরায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এরূপ অনুমান করা যেতে পারে"। রত্নমাণিক্য ১৪৬৭খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। উল্লেখ্য, মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের পূর্বকাল পর্যন্ত রত্নমাণিক্যের প্রবর্তিত শাসন পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রশাসনে বাংলা এবং ফার্সি ভাষা ব্যবহৃত হত।

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের শাসনকালে প্রশাসন যন্ত্রের আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তিনি প্রশাসনিক করণীয় কাজের একটি রূপরেখা তৈরি করতেন। যোগ্যস্থানে যোগ্যব্যক্তি নিয়োগ করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সামগ্রিকভাবে কর্মীদের প্রশাসন পরিচালনা করা এর অন্তর্গত। তিনি মন্ত্রীপদের সৃষ্টি করে তাঁকেই প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে বসাতেন। অবস্থার কারণে সময় সময় দেওয়ানকেও মন্ত্রী পর্যায়ভুক্ত করতেন। প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজের জন্য তিনি কয়েকটি বিভাগ গঠন করেন এবং প্রত্যেকটি বিভাগের পরিচালনা করতেন একজন করে প্রধান আধিকারিক। রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি অমাত্য সভা নির্ধারিত ছিল। রাজার একজন নিজস্ব সচিব রাখা হত। বীরচন্দ্রমাণিক্যের পর মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য রাজ্যের প্রশাসন এবং জমিদারি সংক্রান্ত কার্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহক সভা গঠন করেন। আইন প্রণয়ন ইত্যাদি কাজের জন্য ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন করেন। পরবর্তী মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের সময় অমাত্য-সভা নতুনভাবে পুনর্গঠন

করে নামকরণ করা হল 'স্টেট কাউন্সিল' হিসাবে। দক্ষ প্রশাসক যাতে প্রশাসনে নিযুক্ত হতে পারে সেজন্য তিনি 'স্টেট সিভিল সার্ভিস' গঠন করেন। পরিশেষে মহারাজা বীরবিক্রমমাণিক্যের সময় 'মন্ত্রণা সভা' 'ব্যবস্থাপক সভা' ও মন্ত্রী পরিষদ নামে তিনটি পরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রী পরিষদের উপর রাজ্য শাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। 'মন্ত্রণা সভা' বা 'রাজসভার' কাজ ছিল মহারাজাকে সর্ব বিষয়ে পরামর্শ বা মন্ত্রণা দেওয়া।

প্রশাসন পরিচালনায় দক্ষ অফিসার নিয়োগ করার জন্য বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বপ্রথম 'সিভিল সার্ভিস ক্যাডার' গড়ে তোলেন। রাজ্যের ভূগর্ভে নিহিত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য তিনি প্রাথমিক সার্ভের কাজ শুরু করেছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। সুখের বিষয় তাঁর সেই স্বপ্ন বর্তমানে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রশাসনে গতিশীলতা আনার জন্য এবং রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধানের জন্য মহারাজ প্রতি বছর আগরতলায় রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মচারীদের নিয়ে এক সম্মেলনে বসতেন। প্রথম সম্মেলনের মেমোটি ছিল নিম্নরূপ :

রাজধানীতে প্রধান কর্মচারী-সম্মেলন মেমো নং ৩২

B.B.K Manikya
16.6.39 T.E

স্বস্তি,

বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর কে.সি.এস.আই.নরপতেরাদেশোহং কারকবর্গেষু, প্রচরত্ন, পরমস্য বিরাজতে।

রাজধানী হস্তিনাপুরী

যেহেতু বিগত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এ রাজ্যের মফস্সলস্থ হাইস্কুল সমূহ মধ্যে কৈলাসহর রাধাকিশোর ইনস্টিটিউশন সর্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করিয়াছে এবং তজ্জন্য উক্ত স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুত প্রহ্লাদচন্দ্র বর্মন রায়-এর কৃতিত্ব এ পক্ষের সন্তোষের বিষয় হইয়াছে; অতএব উক্ত কৃতিত্বের জন্য এবং উৎসাহ বর্ধনার্থ তাঁহাকে মং ১২০ টাকার পারিতোষিক(খিলাত) প্রদান করা যায়। ইতি ২৮ শে আশ্বিন, ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দ।

মহারাজা বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন সংস্কারের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহ ঘুরে এসে তিনি প্রশাসনে আধুনিক চিন্তাধারার রূপায়ণ করতে চেয়েছিলেন। বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, জনসাধারণের মধ্যে স্বাবলম্বন,সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি শাসনকার্যে অধিকতর মাত্রায় জনসাধারণের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য ১৩৪৯ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ তারিখে ত্রিপুরার শাসন-সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন। এর মধ্যে ছিল 'রাজসভা' বা 'প্রিভি কাউন্সিল' গঠন। ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিয়ে রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল গঠনের কথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনকার্যে গতি আনার জন্য বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেছিলেন। এতে একজন প্রধানমন্ত্রী ও অনধিক চারজন মন্ত্রী ছিলেন।

বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য আইন বিষয়ে উপযুক্ত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং বাজেট আলোচনা ও তৎসম্পর্কে অভিমত প্রদানে অধিকারী একক ব্যবস্থাপক সভা গঠন করেছিলেন। সভাপতি ব্যতীত এর সদস্যসংখ্যা ছিল ৫৪জন। এর মধ্যে ২৯ জন ছিল রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত। বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য বিশ্বাস করতেন যে জন-প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়েই জনগণের অভাব অভিযোগ যথার্থভাবে দূর করা সম্ভব।

বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য তৃণমূল থেকেই শাসন ব্যাপারে অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সেজন্য তিনি 'গ্রামমণ্ডলী' গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। কতিপয় গ্রামের সমবায়ে গ্রামমণ্ডলী গঠন করা হয়েছিল। এই গ্রামমণ্ডলীর মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন পরিচালনা করা, নির্দেশিত ট্যাক্স বা কর আদায় করা এবং ছোটখাটো মামলার বিচার করার দায়িত্ব ছিল। এই গ্রামমণ্ডলী গঠনের পরিকল্পনা বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যের দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা দূর করার ব্যাপারেও মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি এক আদেশ বলে রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের নাম রেজিস্ট্রেশনের উপর গুরুত্ব দেন এবং কী উপায়ে বেকার সমস্যার সমাধানে করা যায় সেই বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদকে মহারাজার বিবেচনার

জন্য প্রস্তাব দিতে বলেন।১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য ইংরেজ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় 'ওয়ার কমিটি' গঠন করেন। তাছাড়া তিনি একটি যুদ্ধ তহবিলও গঠন করেছিলেন। ত্রিপুরার লোকেরা যাতে সেনাদলে যোগদান করে সেইজন্য তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন। 'প্রথম ত্রিপুরা রাইফেল' বাহিনী আরাকান এবং বর্মাযুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল।

উত্তরাধিকার আইন

রাজার উত্তরাধিকারী ছিলেন যুবরাজ। ক্ষমতা ও পদমর্যাদায় রাজার পরেই ছিল তাঁর স্থান। রাজস্ব, হস্তী ও সেনাদল ছিল তাঁর অধীনে। প্রয়োজন হলে তিনি যুদ্ধে যেতেন। যুবরাজ পদটি মহারাজ কল্যাণমাণিক্য সৃষ্টি করেন। কল্যাণমাণিক্য নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দমাণিক্যকে হিন্দু শাস্ত্রমতে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং সেই সময় থেকে ত্রিপুরার রাজবংশে যুবরাজ নিযুক্তির প্রথা প্রচলিত হয়। কল্যাণ মাণিক্য অন্যান্য রাজকুমারদের ঠাকুর উপাধি দেন। পরবর্তীকালে রাজকুমার কর্তারা এই নামে অভিহিত হন। গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রাম মাণিক্য 'বড় ঠাকুরে'র পদ সৃষ্টি করেন। যুবরাজের পরেই ছিল বড় ঠাকুর-এর স্থান। হস্তী সংগ্রহ করা ছিল তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। ওই সময় বাংলার নবাবকে কর হিসাবে হস্তী দিতে হত। এইজন্য হস্তী সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু এই পদটি সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে নানা জটিলতা ও বিবাদের সৃষ্টি হয়। কারণ বড় ঠাকুর যুবরাজের উত্তরাধিকারী হতেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার এক সনদের মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে সিংহাসনের উপর দেববর্মা পরিবারের বংশানুক্রমিক দাবি থাকবে। রাজা নিজ বংশ থেকে কোন পুরুষকে সিংহাসনের জন্য যুবরাজ মনোনীত করতে পারবেন। রাজার কোন মনোনীত প্রার্থী না থাকলে তাঁর নিকটতম পুরুষ আত্মীয় সিংহাসনের অধিকারী হতেন। তবে প্রত্যেক প্রার্থীর রাজ্যপ্রাপ্তি ভারত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল।

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা

ত্রিপুরার রাজধানী প্রথমদিকে রাঙ্গামাটি বা উদয়পুর ছিল। কথিত আছে ত্রিপুর রাজবংশের ১৮৪ জন রাজা রাজত্ব করেছেন। এই রাজবংশের বয়স সূচনা

থেকে ত্রিপুরার ভারতভুক্তির সময়ে পর্যন্ত দাঁড়ায় তিন হাজার তিনশত ছিয়াশি বৎসর। গড়ে ১৮ বছরে এক পুরুষ ধরলে এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোন একটি রাজবংশ নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব করেছে এমন উদাহরণ বিশ্বে নেই। এর মধ্যে ৫৯০খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১১৭০ বছর উপরোক্ত রাজবংশ উদয়পুরেই রাজত্ব করেছেন। পরবর্তীকালে ১১৭০ বছর পর মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য(১৭৪০-১৭৮৩)-এর আমলে রাজধানী উদয়পুর থেকে আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়। ইতিহাসবেত্তাদের মতে রাজমালায় বর্ণিত প্রথম ১৪৪জন ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে শেষ দুই একজন ব্যতীত আর সকলের কাহিনি নিছক কল্পনাপ্রসূত। অবশ্য কোন কোন সময় অস্থায়ীভাবে অমরপুর,পুরাতন আগরতলা প্রভৃতি স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল।

প্রশাসন ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে মুসলিম অনুকরণে রাজ্যকে কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত করা হয়েছিল এবং প্রতিটি পরগনায় চৌধুরী উপাধিযুক্ত শাসক নিযুক্ত করা হত। পরবর্তী এলাকাগুলি এবং বিশেষ করে সদ্য বিজিত অঞ্চলগুলি লস্করের অধীন ছিল। এইরূপ অঞ্চলে থানা বা সেনাশিবির স্থাপন করা হত এবং থানার দায়িত্বে থাকতেন থানাদাররা। ত্রিপুরার আধুনিক জগতের পথিকৃৎ মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য ত্রিপুরাকে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। বিভাগগুলির প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল যথাক্রমে কৈলাসহর, আগরতলা ও উদয়পুর এবং পরে সোনামুড়া। পরবর্তীসময় মহকুমা আকারের আরও কয়েকটি বিভাগ সৃষ্টি হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন আধিকারিকরা শাসক হিসাবে নিযুক্ত হন। জমিদারি চাকলা রোশনাবাদের জন্য একজন দেওয়ান নিযুক্ত থাকতেন।

ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় উপজাতি সর্দারগণ নিজ নিজ গ্রামগুলির তত্ত্বাবধান করত। যার যার এলাকায় সর্দাররাই ছিল সর্বেসর্বা। ওই সব এলাকায় উপজাতি রীতিনীতি অনুযায়ী গ্রামগুলি শাসিত হত। গ্রামের সর্দাররা চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত হতেন। কখনো কখনো প্রধান সর্দাররা রাজা উপাধি পর্যন্ত পেতেন। তাঁরা ত্রিপুরার রাজার প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ বনজ সম্পদ নজর বা উপহার দিতেন। যুদ্ধের সময় ও প্রয়োজনে তাঁরা রাজাকে সৈন্য ও লোক দিয়ে সাহায্য করতেন। মিসিপ নামে একশ্রেণীর কর্মচারী উপজাতিদের প্রতিনিধি হিসাবে রাজদরবারে অবস্থান করতেন। প্রয়োজনে উপজাতি প্রজাদের সম্পর্কে তাঁরা রাজাকে খোঁজখবর দিতেন।

রাজা সরকারি নানাবিধ কার্য সম্পাদন করার জন্য রাজ্যের প্রাচীন অধিবাসী পুরাতন ত্রিপুরীগণ 'বারহদা' বা হুদ্দায় (উপাধি) বিভক্ত ছিল। যেমন: বাছাল, শিউক, কোয়াতিয়া, দৈত্যসিং, হুজুরিয়া, শিলটিয়া, আপাইয়া, ছত্রতুইয়া বা ছত্রধরৈয়া, দেওরাই বা গালিম, সুবে নারায়ণ, সেনা এবং জুলাই।

উপরোক্ত বাছালদের সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি আছে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমান রাজবংশ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পূর্বে বাছালগণ রাজ্যের অধিপতি ছিল। এইরূপ জনশ্রুতি ভিত্তিহীন কেননা ঐতিহাসিক সত্য হল হালামগণের কবল থেকে ত্রিপুরা রাজ্য চন্দ্রবংশীয় বর্তমান রাজবংশে হস্তগত হয়েছে। রাজার সঙ্গে পার্বত্য দলপতিদের সাক্ষাতের একটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল 'হসম ভোজন' প্রথা। শারদীয় পূজাকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দলপতিরা 'হসম ভোজন'-এর জন্য রাজা কর্তৃক নিমন্ত্রিত হতেন। ভোজনের মাধ্যমে এই সময় রাজা ও দলপতিদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করার সুযোগ হত।

হালামগণের রাজভক্তির অনেক নিদর্শন আছে। ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যাভিষেকের উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকার থেকে নানাবিধ দ্রব্য ওরা উপহার পেয়ে থাকত। সেই সকল উপহার বস্তু ওরা কখনও পুরুষানুক্রমে সযত্নে রক্ষা এবং দেবতা জ্ঞানে পুজো করে। এ প্রসঙ্গে কথিত আছে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে, জয়ন্তীয়া রাজ্য যে রাজার শাসনাধীন ছিল সেই রাজার নামও ছিল বিজয়-মাণিক্য। ত্রিপুরাধিপতি শ্রীহট্ট জয় করার পর, জয়ন্তীয়ার রাজা ভীত হয়ে, নানা উপঢৌকন সহ ত্রিপুরার মহারাজার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। প্রীতি উপহার স্বরূপ ত্রিপুরেশ্বর হস্তী প্রদান করেন। জয়ন্তীয়ার রাজা নিজ রাজ্যে প্রচার করেন বিজয়মাণিক্য ভীত হয়ে হস্তী উপঢৌকন দিয়েছেন। এই অসত্য ব্যবহারে ত্রিপুরেশ্বর জয়ন্তীয়া রাজ্য আক্রমণ করেন। হেড়ম্বের রাজা নির্ভয় নারায়ণ মধ্যবর্তী হয়ে উভয়ের বিবাদের মীমাংসা করে দেন। কিন্তু জয়ন্তীয়া রাজ বিপদ মুক্ত হয়ে ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে প্রয়াসী হলেন। ওই সময়ে ত্রিপুরেশ্বরের হালাম প্রজারা জয়ন্তীয়া রাজ্যের সীমান্তে বসবাস করত। মহারাজ বিজয়মাণিক্য অনতিবিলম্বে রাজানুরক্ত হালামদের রাজ্যের রাজধানীতে এনে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করেন। সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ ও চিরস্মরণীয় করার অভিপ্রায়ে ধাতু নির্মিত একটি হস্তী ও একটি ব্যাঘ্র মূর্তি উপহার প্রদান করেন। উক্ত মূর্তিদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে নিম্নলিখিত বাক্যবলি উৎকীর্ণ ছিল ঃ

"পূর্ব্বাপৌর্য ক্রমাদ্ভবন্ত আত্মীয়া
ইদানীং যদি বৈপরিত্যমাচরন্তি
তদোপরিধর্ম: শস্যনাশো ভবিষ্যতি
পশ্চাদ্গজ শার্দ্দলৌ।।"

অর্থাৎ তোমাদের সহিত পূর্বাপর যে আত্মীয়তা চলে আসছে, ইদানীং যদি তার বিপরীত আচরণ কর,তবে তোমাদের ধর্ম ও শস্য নষ্ট হবে এবং পশ্চাৎগজ ও শার্দুল দ্বারা তোমরা বিনষ্ট হবে। উল্লেখ্য, জুমক্ষেত্র লব্ধ শস্য হালামদের একমাত্র সম্বল এবং বন্য হস্তী ও ব্যাঘ্র থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। রাজশাসনে ধর্ম ও শস্য নষ্ট এবং গজ-শার্দুল কর্তৃক নিহত হবার ভীতিসঙ্কুল আদেশ থাকায় হালামগণ সেই আদেশকে দেবাজ্ঞা জ্ঞানে, বংশপরম্পরায় বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা এখনও পালন করে আসছে এবং মূর্তিদ্বয়কে দেবতাজ্ঞানে প্রতিদিন পুজো করে থাকে। এই কার্যের দ্বারা যেমন মহারাজ বিজয়মাণিক্যের রাজনীতিক কৌশলের পরিচয় পাওয়া, তেমনি হালামদের রাজভক্তি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়।

রাজস্ব ব্যবস্থা

রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ছিল রাজস্ব থেকে আয়। সাধারণত সমতল অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ভূমিকর, পার্বত্য অঞ্চলের ঘরচুক্তি কর, বনকর, বাঁশ, বেত, কার্পাস, তুলা প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত শুল্ক এবং হস্তী, নজর, জরিমানা থেকে রাজার অর্থ সংগ্রহ করা হত। সমতল অঞ্চলে যারা হলকর্ষণের দ্বারা চাষ আবাদ করত তাদের কাছ থেকে নিয়মিত ভূমি কর আদায় করা হত। ভূমি রাজস্ব থেকে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ত্রিপুরার সরকারি কর্তৃপক্ষ প্রতিপক্ষ রাজ্যগুলি থেকে কৃষকদের ত্রিপুরায় বসতি করে হল কর্ষণের দ্বারা চাষ আবাদে উৎসাহিত করা হত। অধিকাংশ চাষযোগ্য জমি রাজা জমিদার বা তালুকদারদের মধ্যে নির্দিষ্ট খাজনা আদায়ের শর্তে বিলি করে দিতেন। নিয়ম ছিল আদায়কৃত খাজনার এক দশমাংশ নিজেদের মধ্যে নির্দিষ্ট রেখে জমিদার এবং তালুকদাররা বাকি অংশ রাজ সরকারে জমা দেবেন। কিছু নিষ্কর জমি এবং অন্যান্য কিছু সুযোগ সুবিধাও তারা ভোগ করতেন। মুদ্রার মাধ্যমে খাজনা জমা দিলেও প্রজারা জমিদারদের উৎপন্ন ফসলের একাংশ মুদ্রার পরিবর্তে জমা দিতে পারত। জমির উর্বরতা অনুযায়ী খাজনার হারের পরিমাণ নির্দিষ্ট হত। প্রজাদের বার্ষিক জমার অতিরিক্ত হিসাবে ভেট, বেগার, পাঁচা পঞ্চক, বীরসিংহ নামক নানা ধরনের স্থানীয় কর দিতে হত। জঙ্গলাকীর্ণ জমি বিশেষ সুবিধাজনক শর্তে বন্দোবস্ত দেওয়া হত। এইরূপ জমির জন্য প্রথম কয়েক বৎসর

কোনও খাজনা দিতে হত না। জমিদারি ও তালুকদারি ছাড়াও কিছু রায়তি স্বত্বও প্রচলিত ছিল। এই স্বত্ত্ব অনুযায়ী জমির অধিকারীরা বংশানুক্রমিকভাবে জমি ভোগ দখল করতে পারত তবে সরকারের অনুমতি ছাড়া জমি হস্তান্তর করা যেত না। কয়েকটি পরগনার রাজস্ব থেকে আয় রানি ও রাজ পরিবারের ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মাণিক্য রাজারা নানা ধরনের লাখেরাজ বা নিস্কর জমি দান করতেন। নিস্কর জমিগুলি ছিল নিম্নরূপ: (১) ব্রহ্মোত্তর (ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের দান), (২) ফকিরান(মুসলমান ফকিরদের দান),(৩)আয়মা(ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মাচরণের জন্য দান),(৪) ইনাম (সেবার জন্য পুরস্কার), (৫)খানে বাড়ি(বসতি স্থাপনের জন্য দান),(৬) নানকর(ভরণপোষণের জন্য কর্মচারীদের দান), (৭) চারাগি খয়রাত(মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য),(৮) বৈদ্যাঙ্ক (বৈদ্য বা চিকিৎসকদের জন্য) এবং (৯) দেবোত্তর (মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য)।

পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি প্রজাদের নানাবিধ অরণ্য জন্তু, গজদন্ত, পশুচর্ম ও শৃঙ্গ, ধাতুনির্মিত বস্তু ও নিজহস্তে বোনা নানা ধরনের বস্তু বার্ষিক নজর হিসাবে প্রদান করতে হত এবং সেগুলি রাজকর রূপে গৃহীত হত। এছাড়াও জুমের জমিতে উৎপন্ন তিল, কার্পাসের নির্দিষ্ট অংশ রাজা গ্রহণ করতেন। পরবর্তীকালে পার্বত্য অঞ্চলের প্রজাদের কাছ থেকে ঘরচুক্তি কর আদায় করা হত। পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি প্রজারা হলকর্ষণের দ্বারা জমি চাষে অভ্যস্ত ছিল না। তারা জুম চাষে অভ্যস্ত থাকায় তাদের কাছ থেকে জমির পরিমাণের পরিবর্তে পরিবার পিছু কর আদায় করা হত। এই পদ্ধতিকে বলা হত ঘরচুক্তি কর। পূজার সময়ে উপজাতি সর্দাররা রাজদরবারে সমবেত হতেন এবং নিজেদের এলাকার পরিবারের সংখ্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘরচুক্তি কর দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতেন। উপজাতি হিসাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঘরচুক্তি করের পরিমাণ বিভিন্ন রকম হত। যেমন ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে হান্টার-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা যায় তিপ্রা ও জমাতিয়াদের ঘরচুক্তি করের হার পরিবার পিছু যেখানে ছিল সাড়ে তিন টাকা সেখানে রিয়াং ও নোয়াতিয়াদের ক্ষেত্রে পরিবার পিছু ঘরচুক্তি করের পরিমাণ ছিল দশ টাকা। হালাম সম্প্রদায় যেহেতু রাজপ্রাসাদ ও সরকারের অন্যান্য কাজে সাহায্য করত সেই কারণে তাদের ঘরচুক্তি করের হার ছিল সর্বাপেক্ষা কম। আবার যে সব সম্প্রদায় রাজপরিবার অথবা রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকত তাদের ঘরচুক্তি কর থেকে রেহাই

দেওয়া হত এবং তাদের পরিচয় ছিল 'হুদা' বা 'হদার' লোক।পার্বত্য অঞ্চলের বনজ সম্পদ, তিল, কার্পাস প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য শুল্ক দিতে হত। পার্বত্য এলাকায় সরকারি কার্য উপলক্ষ্যে ভ্রমণরত রাজকর্মচারীদের মালপত্র বহন ও পথ প্রদর্শনের কাজ করতে বাধ্য ছিল পার্বত্য প্রজারা। পূর্বে এর জন্য কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হত না। এই প্রথা 'তৈথং প্রথা' নামে পরিচিত ছিল। অনুরূপ 'লাহার প্রথা' অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলের প্রজারা কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধের জন্য বিনা পারিশ্রমিক জঙ্গাল পরিস্কার করে রাস্তা তৈরি করতে বাধ্য ছিল।

ত্রিপুরা রাজ্যের এলাকা বহির্ভূত সমতল অঞ্চল থেকে অনেকে রাজ্যের সীমান্তে প্রবেশ করে অস্থায়ীভাবে বসতি ও চাষ আবাদ করে ফসল উৎপন্ন হওয়ার পর তা সংগ্রহ করে চলে যেত। এইরূপ অস্থায়ী প্রজাদের জিরাতিয়া প্রজা বলা হত। এরজন্য তারা ত্রিপুরার রাজাকে কর দিতে বাধ্য থাকত। পশুর জন্য নিয়মিত ঘাস ও অন্যান্য আহার্য যারা সংগ্রহ করত তাদের 'ঘাশুরি' নামে বিশেষ করে দিতে হত। এমন কি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যও প্রজারা কর দিতে বাধ্য থাকত। কথিত আছে রামগঙ্গামানিক্য (১৮০৪-১৮০৮ রাজত্বকাল)-এর বিবাহে এবং দুর্গামাণিক্য (১৮০৯-১৮১২খ্রিঃ)-এর রাজ্যাভিষেকে প্রজাদের এক আনা করে বিশেষ কর দিতে হয়েছিল।

ভূমিরাজস্ব ও জরিপ ব্যবস্থা

ত্রিপুরার ভূমিরাজস্ব ও জরিপ ব্যবস্থা প্রতিবেশী বঙ্গাদেশের ভূমিরাজস্ব ও জরিপ ব্যবস্থার অনুরূপ। কথিত আছে শেরশাহ(১৫৩৯-১৫৪৫খ্রিঃ) বঙ্গাদেশে জরিপ প্রথা, আমিন ও কানুনগো নিয়োগ প্রথা, পাট্টা ও কবুলিয়াত ইত্যাদি প্রথা চালু করেছিলেন। পরে টোডরমল মোঘল বাদশা আকবরের নির্দেশে বঙ্গাদেশের ভূমি রাজস্ব ও জরিপ ব্যবস্থা নতুনভাবে প্রবর্তন করেন। পরবর্তী সময়ে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধরত বাদশা ঔরঙ্গাজেব-এর নির্দেশে বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খান (১৭০০-১৭২৭খ্রিঃ)বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাতে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। যুদ্ধরত ঔরঙ্গাজেবের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। সেই বিপুল অর্থের যোগান দিল বঙ্গাবাসী ও ত্রিপুরাবাসী।

প্রশাসন ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য মুসলিম শাসনের অনুকরণে রাজ্যকে কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত করা হয়েছিল এবং প্রতিটি পরগনায় চৌধুরী

উপাধিযুক্ত শাসক নিযুক্ত করা হত। দূরবর্তী এলাকা এবং সদ্যবিজিত অঞ্চল লস্করের অধীন ছিল। সদ্যবিজিত এলাকায় থানা বা সেনাশিবির স্থাপন করা হত। থানার দায়িত্বে থাকতেন থানাদাররা। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য ত্রিপুরাকে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। বিভাগগুলির প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল যথাক্রমে কৈলাসহর, আগরতলা ও উদয়পুর পরে (সোনামুড়া)। পরে মহকুমা আরও কয়েকটি বিভাগ সৃষ্টি হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট-এর ক্ষমতাসম্পন্ন আধিকারিকরা শাসক হিসাবে নিযুক্ত হন। জমিদারি চাকলা রোশনাবাদের জন্য একজন দেওয়ান নিযুক্ত থাকতেন।

উল্লেখ্য, সমতল ত্রিপুরা চাকলা রোশনাবাদ নামে চিহ্নিত হয়েছিল। চাকলা রোশনাবাদের অন্তর্গত ছিল যথাক্রমে নোয়াখালি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং দক্ষিণ শ্রীহট্ট। এই অঞ্চলের অধিকাংশ প্রজা ছিল হিন্দু। তারা ত্রিপুরার রাজাকে বাঙালি কর দিত। বিদেশি আক্রমণের ফলে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং দিল্লিতে চালান দেওয়া হত।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভূমিরাজস্ব বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার শেষে চিরস্থায়ী বন্দোবত প্রবর্তন করে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিসের শাসনকালে(১৭৮৬-১৭৯৩খ্রিঃ)ত্রিপুরাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হল, অনধিকৃত, অনাবাদি, অনুন্নত জঙ্গালাকীর্ণ ও পতিত জমিতে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ত্রিপুরাতে প্রবর্তনের ফলে তালুকদারগণ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভূমিতে স্থায়ী অধিকার লাভ করে প্রজাপত্তনে আগ্রহী হয়। কৃষক শ্রেণীর প্রজারা অনাবাদি ও পতিত ভূমি চাষাবাদ করে উৎপাদন বাড়াল। যত বেশি চাষ আবাদ বৃদ্ধি হয় তাতে তত বেশি রাজস্ব পায় তালুকদারগণ। অথচ রাজাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক রাজস্ব দিলেই চলে। তালুকদারদের উৎসাহে সমতলবাসী কৃষকরা জঙ্গালাকীর্ণ ত্রিপুরাতে কর্মদ্যোগ সৃষ্টি করার ফলে কৃষক, তালুকদার এবং রাজা উপকৃত হয়েছিলেন।

ত্রিপুরায় জরিপ ও বন্দোবস্ত বিষয়ে প্রথম লিখিত আইন চালু হয় ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে যার শিরোনাম ছিল, 'রাজস্ব সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।' ১৮৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'রাজা ভূমধ্যকারী সম্বন্ধীয় বিষয়ক আইন' প্রচলিত হয়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'জরিপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী,' ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে 'সরকারি প্রাপ্য আদায় সম্বন্ধীয় আইন এবং ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে 'পার্বত্য প্রজাগণের ঘরচুক্তি কর সম্বন্ধীয় আইন' চালু

হয়।

"বিচার ব্যবস্থা"

রাজন্য যুগে ত্রিপুরার মাণিক্য বংশীয় রাজাদের রাজত্বের প্রথম দিকে রাজ্যে বিচার বিষয়ক লিখিত কোন আইন ছিল না। স্থায়ী আদালত বা কারাগারের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিচার না হওয়া পর্যন্ত অপরাধীদের রাখার জন্য 'আলং' নামে এক অস্থায়ী বন্দিশালার ব্যবস্থা ছিল। সাধারণত সাম্য ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী বিচারকরা অপরাধীদের বিচার করতেন। প্রধান বিচারপতি ছিলেন রাজা। তাঁর কাছেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সকল বিচার্য বিষয়গুলি উত্থাপন করা হত। অপরাধীদের শাস্তি ছিল কঠোর। বিচারে দোষী প্রমাণিত হলে প্রকাশ্যে শিরচ্ছেদ বা হাতির তলায় ফেলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হত। পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিদের নিজস্ব রীতি অনুযায়ী সর্দাররা বিচার করলেও তাদের ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিষয়ক বিচার কার্য পরিচালনার জন্য একটি পাহাড়ী আদালতের অস্তিত্ব ছিল। অধিকাংশ সাধারণ বিচারকার্য স্থানীয় সর্দাররাই করতেন বলে পাহাড়ি আদালতে খুব কম সংখ্যক বিচারের নিষ্পত্তি হত। অথচ আর্থিক উন্নয়নের জন্য পূর্বশর্ত হল আইনগত পরিকাঠামোর সংস্থান। আইনগত পরিকাঠামোর সংস্থান সর্বপ্রথম মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে আইন প্রণয়ন ও তাদের বিধিবদ্ধভাবে প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার আধুনিক বিচার ব্যবস্থার পত্তন ঘটে। এই বিষয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে লিখিত আইনের প্রণয়নের প্রমাণ আছে। উপরোক্ত সাল থেকে আইন প্রণয়ন, প্রবর্তন, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের ধারা অব্যাহত। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই সব মোকদ্দমার বিচারের জন্য খাস আপিল আদালত নামে একটি বিচারালয় স্থাপিত হয়। এই আদালতের জন্য দুজন বিচারক নিযুক্ত হন। খাস আপিল আদালতের প্রধান বিচারপতি বা চিফ্ জাস্টিস হিসাবে যুবরাজকে নিযুক্ত করা হয়। প্রজাদের একই বিচার ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য পূর্ব প্রচলিত পাহাড়ি আদালত রদ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকালে কিছুসংখ্যক জমাতিয়া উপজাতি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এর ন্যায়সঙ্গত কারণও ছিল। গবেষকদের মতে রাজকর্মচারীদের নির্বিচারে অত্যাচারের ফলেই এই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। জমাতিয়া সম্প্রদায়ের বহু লোক ত্রিপুরার মহারাজার

সৈনিকের বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। বিদ্রোহ দমন করার জন্য বীরচন্দ্রমাণিক্য প্রথমে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারা বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হয়। এরপর বীরচন্দ্রমাণিক্য সেনাবাহিনীতে কিছু সংখ্যক দুর্ধর্ষ কুকি সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে সেনাবাহিনী আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। কুকি সৈন্যরা বিদ্রোহী জমাতিয়া প্রজাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার চালিয়ে তাদের দমন করে। জমাতিয়া প্রজাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করার জন্য জমাতিয়াদের ছিন্নমুণ্ড এনে বিজয় কেতন স্বরূপ বংশদণ্ডের উপর বেঁধে রাখা হয়েছিল। এই বীভৎস ঘটনা সম্পর্কে তদানীন্তন ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সি. মেঞ্জাল তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন।"The heads of the Jamatyas were cut off and are now hanging up in terroeum at Agartolla" এই ঘটনার পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের স্বার্থ দেখার জন্য ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই এ ডব্লিউ বি পাওয়ারকে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট আসার পর তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী বীরচন্দ্রমাণিক্য কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হন। বিশেষ করে বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আদালতের সংস্কার সাধন করে 'খাস আপিল আদালত' নামে একটি বিচারালয় স্থাপন করেন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। আপিল আদালতটি অনেকটা ব্রিটেনের প্রিভি কাউন্সিলের ধাঁচে গঠিত হয়েছিল।

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য ব্রিটিশ প্রশাসনের অনুকরণে ত্রিপুরা রাজ্যে আবগারি বিভাগ এবং স্ট্যাম্প বিভাগ সৃষ্টি করেন এবং দলিল রেজিস্ট্রি নিয়ম প্রবর্তন করেন। দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আইনের সংশোধন করেন এবং 'তামাদি' আইন চালু করেন। এ প্রসঙ্গে জনৈক নীলমণি দাসের নাম স্মরণীয়। তিনি ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। ত্রিপুরায় বিচার ব্যবস্থায় উন্নতিকল্পে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি ত্রিপুরার উকিলদের জন্য প্রথম পরীক্ষা-ব্যবস্থা চালু করেন। রাজন্য যুগের শাসন ব্যবস্থায় একটি জনমত বিরোধী প্রথার অস্তিত্ব ছিল। রাজন্য যুগের শাসন ব্যবস্থায় একটি জনমত বিরোধী প্রথার অস্তিত্ব ছিল। প্রথার নাম 'তিতুন প্রথা'। এই প্রথা অনুসারে সরকারি কর্মচারীরা যখন ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে সরকারি কাজে যেতেন তখন তাঁদের মালপত্র বিনা পারিশ্রমিকে পার্বত্য অঞ্চলের প্রজাদের বহন করতে হত। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য এই প্রথা বন্ধ করে দেন।

পুলিশ বিভাগ

রাজন্য শাসন ব্যবস্থায় রাজ্যের শান্তি রক্ষাদি কাজে নিযুক্ত সরকারি বিভাগের কর্মচারী আরক্ষী বা পুলিশ নামে অভিহিত হতেন। মাণিক্য রাজগণের

আমলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নাজিরের অধীনে একদল সশস্ত্র সৈন্য থাকত। রাজধানীর শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ছিল কোতয়াল মুসিবের উপর। প্রকৃতপক্ষে কোতয়াল মুসিব নিযুক্ত হবার পর থেকে নাজিরের গুরুত্ব এবং মর্যাদা কিছুটা হ্রাস পায়। বিনন্দীয়া নামে রাজার এক প্রকার সৈন্য বা পেয়াদা থাকত। তারা প্রাসাদরক্ষীর কাজ করত এবং পুলিস বা পেয়াদার কাজও করত। রাজার আদেশ প্রচার এবং পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে যে কোন অভিযুক্ত প্রজাকে তারা বন্দি করে নিয়ে আসতে পারত। বন্দি বা অপরাধীদের যে বন্দি শিবিরে রাখা হত তার প্রধান ছিলেন আলং হাজারি। তিনি বিনন্দীয়াদের প্রধান ছিলেন। তাঁদের কর্মকুশলতার গুণে নাজির উপাধিও প্রাপ্ত হতেন। বীরচন্দ্রমাণিক্য এবং রাধাকিশোরমাণিক্যের সময় পুলিশ বিভাগকে পুনর্গঠন করে আধুনিকীকরণ করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে থানা সৃষ্টি করে থানায় দারোগার অধীনে একদল পুলিশ কর্মী রাখার ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য ১৮৭১ সালে বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে প্রায় তিন শত কুকি সম্প্রদায়ের লোক ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং হত্যা ও লুঠতরাজ চালায়। এর পর তারা কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলায় প্রবেশ করে কিছু সাহেবকে হত্যা, লুঠতরাজ ও কিছু লোককে বন্দি করে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। ব্রিটিশদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে কুকিদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অভিযান চালান। বীরচন্দ্রমাণিক্য এই অভিযানে রাজ্যের পুলিশ দল প্রেরণ করে নানাভাবে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেন।

সামরিক বিভাগ

ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ ও নিরাপত্তা রক্ষার কারণে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল। সেনাবাহিনী ত্রিপুরা উপজাতির সম্ভ্রান্তবংশীয় নারায়ণ উপাধি-ধারী সেনাপতিদের অধীনে রাখা হত। এইরূপ স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছাড়াও যুদ্ধের সময় উপজাতির দলপতিরা তাদের দলবল নিয়ে রাজাকে সাহায্য করার প্রথা ছিল। সম্ভবত রত্নমাণিক্যই ত্রিপুরার প্রথম মহারাজা যিনি বাংলার সুলতানি শাসন পদ্ধতি অনুসারে ত্রিপুরার শাসন সংস্কার করেন এবং সামরিক বাহিনী পুনর্গঠন করেন। প্রচলিত বিধি অনুসারে প্রধান সেনাপতি সুবা উপাধি প্রাপ্ত হতেন। প্রত্যেক সুবার অধীনে হাজারি, জমাদার, দফাদার প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত সেনানায়করা সৈন্য পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন। রত্নমাণিক্যের মৃত্যুর পর নারায়ণ উপাধিধারী

সেনাপতিরা বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে ধন্যমাণিক্য এইসব নারায়ণদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি নিজেকে রাজধানীর পাশে এক পুরোহিতের বাড়িতে লুকিয়ে রাখলেন। রাজ্যে রটনা হল মহারাজ অসুস্থ। মহারানিও অন্তঃপুরে থাকেন, কোথাও যান না। একমাত্র পুরোহিত ছাড়া রাজপুরীর ভেতরে কেউ যেতে পারেন না। প্রধান সেনাপতি অন্যান্য সেনানায়কদের মুখপাত্র হয়ে মহারানির সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। মহারানির অনুমতি পেয়ে প্রধান সেনাপতি অন্তঃপুরে এলেন। তাঁকে জানানো হল মহারাজ পাণ্ডু রোগে ভুগছেন। একদিন স্বচক্ষে দেখতে চাইলেন। পুরোহিত সাক্ষাতের যেদিন স্থির করে দিলেন সেদিন রাজার অন্ধকার কক্ষে কয়েকজন সৈন্যকে লুকিয়ে রাখা হল। অন্ধকার কক্ষে প্রধান সেনাপতিসহ অন্যান্য সেনানায়করা মহারাজকে যখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন তখন লুকানো সৈন্যরা তাদের সবাইকে বধ করে ফেলল। মহারাজ ধন্যমাণিক্য নারায়ণ উপাধিধারী সেনাপতিদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। ধন্যমাণিক্য এরপর ত্রিপুরী উপজাতির সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিরা ছাড়াও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায় থেকেও সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এদের মধ্যে রিয়াং উপজাতির রায়কচাগ ও রায়কছম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে বিজয়মাণিক্য (১৫২৮-১৫৬৩খ্রিঃ) রাজ্যের নিরাপত্তার কারণে নজর দিলেন সেনাবল বৃদ্ধিতে। তিনি বহু নৌকা নির্মাণ করেন, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেন এবং পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত করেন। পদাতিকদের মধ্যে ত্রিপুরী ও বাঙালি ছিল। এছাড়া কিছু সংখ্যক পাঠান, মুসলমান এবং উড়িষ্যার সামন্ত সৈনিক নিযুক্ত করেন। রাজ্যের নিরাপত্তা ও বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য তিনি পদাতিক বাহিনী ছাড়াও গোলন্দাজ, অশ্বারোহী, হস্তী ও রণতরী নিয়ে এক বিশাল সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। রেভারেন্ড জেমস লঙ-এর বিবরণ অনুযায়ী বিজয়মাণিক্যের গোলন্দাজ বাহিনী ছাড়াও ছাব্বিশ হাজার পদাতিক,পাঁচ হাজার রণতরী নিয়ে তিনি পূর্ব বাংলায় অভিযান করেছিলেন। তিনি খড়াইত বা খড়গধারী নামে এক বিশেষ শ্রেণীর সৈন্যদল গঠন করেন। এই খড়াইত সৈন্য বিশেষ সাহসী ও বলশালী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হত। কথিত আছে, যে ব্যক্তি সাত বার ধন্য সাগর প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হত তাকেই খড়াইত বিভাগে নিযুক্ত করা হত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে বিজয়মাণিক্যের অশ্বারোহী সৈন্য বেশি না থাকলেও পদাতিক

সৈন্য সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ এবং রণহস্তী ছিল এক হাজার, বাহারি-ই-গায়েবি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে যশোধরমাণিক্য ষাট হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্বারোহী এবং দুইশত রণহস্তী নিয়ে মুঘলদের প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়াও এক বিশাল নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনী রাজধানী উদয়পুর রক্ষায় নিযুক্ত ছিল।

ত্রিপুরার পদাতিক বাহিনী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। একদল ছিল ঢালী। এরা ঢাল ও তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতো। আর এক দল তিরন্দাজ যারা তির ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করতো। গোলন্দাজ বাহিনীতে ছিল কামান ও বন্দুক। অমরমাণিক্য গোলন্দাজ বাহিনীতে কিছু পর্তুগিজ সৈন্য নিযুক্ত করেছিলেন। যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে ত্রিপরার রাজারা বিভিন্ন অঞ্চলে গড় বা দুর্গ নির্মাণ করতেন। কৈলাগড়, চণ্ডীগড়, বিশালগড়, কলমিগড়, জামির খান গড় প্রভৃতি নামগুলি আজও এর সাক্ষ্য বহন করছে।

সামরিক কৌশল হিসাবে সদ্যবিজিত স্থানে থানা বা সেনা নিবাস স্থাপন করা হত। আচম্বিতে নৈশ আক্রমণ ও নদীর বাঁধ ভেঙে দিয়ে শত্রুদের গতিরোধ করা হত। যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছাড়াও উজির, নাজিররাও প্রয়োজনে সৈন্য পরিচালনা করতেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিশেষ প্রয়োজনে রাজার বিশেষ দূত 'ফুরাই' বা রাজচিহ্ন যুক্ত দণ্ডসহ গমন করে রাজার আজ্ঞা পৌঁছে দিত।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণমাণিক্য ইংরাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করার পর ত্রিপুরায় সর্বপ্রথম একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। পার্বত্য ত্রিপুরায় রাজাদের তথাকথিত স্বাধীনতা বজায় থাকলেও প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী রাজারা নিরাপত্তার জন্য ইংরাজদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আত্মরক্ষার জন্য দুশ্চিন্তা না থাকায় ব্রিটিশ আমলে ত্রিপুরার রাজারা আর সামরিক সম্ভার বৃদ্ধির দিক মনযোগ দেননি। অবশ্য বিশাল সামরিক বাহিনী পোষণের মত আর্থিক সামর্থ্যও তাঁদের ছিল না। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ে রাজ্যে মাত্র এক হাজার বন্দুকধারী হিন্দু সৈন্য ছিল এবং সর্দারের অধীন তিন হাজার কুকি সৈন্য ছিল। বীরচন্দ্রমাণিক্য আধুনিক ত্রিপুরার পথিকৃত হলেও ১৮৭২ সালে তার সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র আড়াই শত।

"স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন"

ত্রিপুরায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা চালু হয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের

আমলে ১৮৭১খ্রিস্টাব্দে। চেয়ারম্যান ছিলেন ত্রিপুরার ব্রিটিশ-ভারতের পলিটিক্যাল এজেন্ট মিঃ বলটন। স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার এলাকা সীমিত ছিল রাজবাড়ির সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে। তখন কোনও আইন বা নিয়মবিধি ছিল না। পরবর্তী সময়ে সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটা নিয়ম বিধি তৈরি হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে নিয়মকানুন কিছু সংশোধন করা হয়। মিউনিসিপ্যালিটি -এর চেয়ারম্যান ছিলেন রাজা বা রাজমন্ত্রীর মনোনীত। সকল কর্মীরা ছিল রাজ-কর্মচারী বা রাজ পরিবার সংশ্লিষ্ট। সদর-কালেক্টর পদাধিকার বলে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়ায় চিকিৎসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। ডাঃ মণিময় মজুমদার দীর্ঘ সময় চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব পালন করেন।

পরবর্তীকালে মহারাজ বীরবিক্রম পূর্বের কথা এবং নিয়মকানুন পরিবর্তন করে প্রজাবর্গকে মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্মে সংশ্লিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা ও আয় বৃদ্ধির কথা চিন্তা করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গাল মিউনিসিপ্যালিটি আইনের অনুকরণে ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যালিটি আইন তৈরি হয়। এই আইন পরবর্তীকালে ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের মিউনিসিপ্যাল আইন নামে পরিচিতি লাভ করে। উক্ত আইনে আগরতলাকে ৬ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয় এবং কমিশনারের সংখ্যা করা হয় ১২। প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন কমিশনার নির্বাচিত হবেন। বাকি ৬ জন হবেন রাজমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত। কমিশনাররা চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন। আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনে হোল্ডিং প্রতি বার্ষিক ছয় টাকা ধার্য করা হয়। সন্দেহ নেই, গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা থাকলেও আগরতলা পুরসভা রাজ-সরকারের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। রাজ-সরকার বা রাজ-মন্ত্রী মনোনীত কমিশনাররাই চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্যরা ছিলেন যথাক্রমে মহারাজকুমার আদিত্যকুমার দেববর্মণ, সদর কালেক্টর নরেশকুমার ভট্টাচার্য, কুমার রমেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ, উকিল আরমান আলী মুনশি। এই আইনের সর্বশেষ চেয়ারম্যান ছিলেন উকিল আরমান আলী মুনশি এবং ভাইস-চেয়ারম্যান ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবম অধ্যায়

ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলন
(১৯৪৫-১৯৪৯খ্রিঃ)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পূর্বকাল পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজনৈতিক আন্দোলনের কোন পরিকাঠামো না থাকলেও ১৯৩৫ সালের কংগ্রেস রাজনীতির অনুসারী রাজনৈতিক দল হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ-এর আবির্ভাব ঘটে। তিন বৎসরের ব্যবধানে উদারনৈতিক সংস্কারবাদীদের উদ্যোগে ১৯৩৮ সালে 'ত্রিপুরা জনমঙ্গল সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সময়ে যে ক'জন কমিউনিস্ট মতাদর্শী ছিলেন তারা 'জনমঙ্গল সমিতি'-কে তাদের রাজনৈতিক প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, উপরোক্ত সময়ে ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ বা ত্রিপুরা জনমঙ্গল সমিতি উভয় প্রতিষ্ঠানের তেমন কোন ও গণভিত্তি গড়ে উঠেনি। উভয় দলের মূল রাজনৈতিক দাবি ছিল রাজানুগত্যে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সারা ভারতবর্ষে ব্যাপক আন্দোলনের ঝড় বইলেও ত্রিপুরায় তার কোনও ছোঁয়া লাগে নি। অন্য দিকে প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী মতাদর্শের প্রভাব ছিল অপরিসীম। প্রজাসাধারণ জাতি, উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজভক্তি ছিল তুঙ্গে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রভাবে সামন্তশাসিত ত্রিপুরাতেও নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্রমশ আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৪৫ সালে স্বনামে ত্রিপুরায় কংগ্রেস রাজনৈতিক দলরূপে আবির্ভূত হয় এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তার শাখা স্থাপিত হয়। সমসাময়িক যুগে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবং স্বল্পকাল পরে ফরোয়ার্ড ব্লক দল সমান্তরালভাবে কাজকর্ম শুরু করে। যদিও শক্তি সামর্থ্যের দিক থেকে কমিউনিস্টরা ছিল খুবই দুর্বল। উপরন্তু বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন

আক্রান্ত হওয়ার পর 'জনযুদ্ধের' লাইন নেওয়ার অপরাধে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে যে রাজনৈতিক আক্রমণ শুরু হয়েছিল তার রেশ তখনও মুছে যায় নি। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল ছাড়াও ত্রিপুরার রাজনীতিতে জন্ম নেয় ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামণ্ডল। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রজামণ্ডল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে প্রজামণ্ডলের কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের সক্রিয় অবদান ছিল। প্রজামণ্ডলের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতেও সক্ষম হয়েছিল। তার প্রমাণ দেখা যায় উপজাতি ককবরক ভাষাভাষী শিক্ষিত যুব সমাজের দ্বারা ১৯৪৫ সালে 'জনশিক্ষা সমিতি'র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। তখন কমিউনিস্ট পার্টি সর্বশ্রেণীর গণতান্ত্রিক জনগণকে দায়িত্বশীল শাসনের দাবিতে এক মঞ্চে মিলিতকরণ এবং শ্রমজীবী কৃষক অংশের জনগণকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা এই নীতি গ্রহণ করেছিল। জনশিক্ষা সমিতির দুই প্রধান নেতা দশরথ দেব এবং অঘোর দেববর্মা উভয়ের অভিন্ন মত ছিল। জনশিক্ষা সমিতি গঠনের ব্যাপারে ১৯৪৫ সালে যে ক'জন সদস্যকে নিয়ে পার্টি ইউনিট গঠিত হয়েছিল বীরেন দত্ত ছিলেন তাদের পরিচালক এবং নেতা। যদিও নীতিগত প্রশ্নে যা কিছু সিদ্ধান্ত পার্টি ইউনিট নিত তার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বীরেন দত্তের যে বিশেষ ভূমিকা ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ত্রিপুরার তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে সেদিনের পার্টির নেতৃত্ব উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিল। নেতৃবর্গ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে উপজাতিদের মধ্যে যদি সংগঠন গড়ে তুলতে হয়, তাহলে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক স্লোগানের দ্বারা তা সম্ভব হবে না। প্রয়োজন হবে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে উপজাতিদের এবং বিশেষ করে তাদের শিক্ষিত যুব অংশের মন জয় করা। এ সম্পর্কে কমরেড বীরেন দত্ত তাঁর আমার স্মৃতিতে ত্রিপুরার কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখছেন ঃ "সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সংগ্রাম ছাড়া শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র সামন্ততন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোচনার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের উপজাতি জনগণকে সংগঠিত করা প্রায় অসম্ভব ছিল।"

১৯৪৫ সালে মহারাজা বীরবিক্রমের জীবিতকালেই 'জনশিক্ষা সমিতি' গঠিত হয় ১১ জন যুবকদের নিয়ে। যুবকদের মধ্যে ছিলেন সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা

এবং দশরথ দেববর্মা প্রমুখ। ত্রিপুরার জনগণের নিরক্ষরতা এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার সঙ্কল্প ঘোষণা করে এই জনশিক্ষা সমিতির কর্মীবৃন্দ কাজে নেমে পড়েন। খোয়াই, সদর এবং কমলপুর বিভাগ সমূহের উপজাতি গ্রামগুলিতে গিয়ে জনশিক্ষা সমিতির কর্মীরা জনশিক্ষা সমিতির নীতি ও উদ্দেশ্য ব্যাখা করেন। কমলপুর ও খোয়াই বিভাগের সংগঠন গড়া এবং বেসরকারি স্কুল গড়ে তোলার মূল দায়িত্ব প্রধানত দশরথ দেববর্মার উপর ন্যস্ত হয়। সদর উত্তরের একাংশ যেমন সোনাই নদীর (সুমলী) উত্তর পাড় থেকে সিমনা অঞ্চল পর্যন্ত সংগঠন গড়ার কাজ প্রধানত দশরথ দেববর্মাকেই দেখতে হয়েছিল। এছাড়া গ্রামে গ্রামে বৈঠক করে বেসরকারিভাবে অনেকগুলি প্রাইমারি স্কুল গড়ে তোলা হয়। ক্রমে ক্রমে জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যে সদর বিভাগ, খোয়াই বিভাগ এবং কমলপুর বিভাগে অনেকগুলি বেসরকারি স্কুল গড়ে উঠে। অপর দিকে সদর দক্ষিণে এবং সদর উত্তরে বাকি অংশের দায়িত্ব পড়েছিল যথাক্রমে হেমন্ত দেববর্মা, সুধন্বা দেববর্মা এবং ললিতমোহন দেববর্মা-এর উপর। গোড়া থেকেই এই জনশিক্ষা সমিতির কাজ-কর্মের সঙ্গে বীরেন দত্ত জড়িত ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি অফিসার ব্রাউন সাহেব ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষাদপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে। এই নিযুক্তির ফলে জনশিক্ষা সমিতির কাজকর্মের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। জনশিক্ষা সমিতি যে সমস্ত প্রাইমারি স্কুল গড়ে তুলেছিল ব্রাউন সাহেব তাঁর আমলে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে তার প্রায় তিন শতাধিক বিদ্যালয়কে সরকারি বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। শিক্ষা অনুরাগী ব্রাউন সাহেবের সমর্থন পেয়ে অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বীকৃতি লাভের ফলে ত্রিপুরা-উপজাতি জনগণের মধ্যে জনশিক্ষা সমিতির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

মহারাজ বীরবিক্রম অবশ্য বুঝতে পারেন যে জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন নিছক শিক্ষাবিস্তার মূলক নয়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। এই আন্দোলনের পশ্চাতে কমিউনিস্টদের সমর্থন মহারাজকে বেশ বিচলিত করে দেয়। তিনি অনতিবিলম্বে আগরতলায় সকল উপজাতি দফার সর্দার এবং ভলান্টিয়ারদের জন্য এক বিশাল ভোজসভার আয়োজন করেন। নামে ভোজসভা হলেও আসলে রাজন্য পক্ষের বশংপদদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্দেশ্যেই মহারাজ

এই সম্মেলন ডেকেছিলেন। তাতে কয়েক হাজার উপজাতি সর্দার ও ভলান্টিয়ার আমন্ত্রিত হন। এই সর্দার ও ভলান্টিয়াররা ছিলেন ত্রিপুরার উপজাতি এলাকার মণ্ডলগুলি পরিচালনার জন্য মহারাজা বীরবিক্রমের দ্বারাই মনোনীত। এই সম্মেলনের সময় দশরথ দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন না। উল্লেখ্য আমন্ত্রিত সর্দারদের দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল ব্রজলাল, কিশোর দেববর্মন, দুর্জয়কিশোর দেববর্মন (মহারাজ কুমার), ঠাকুর জিতেন্দ্রমোহন দেববর্মণ, ললিতমোহন দেববর্মনদের উপর।

জনশিক্ষা সমিতির নেতৃবর্গের বুঝতে অসুবিধে হয়নি এই জনসমাবেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জনশিক্ষা সমিতির মোকাবিলা করার জন্য উপজাতি সর্দারদের নিয়ে একটি পাল্টা সংগঠন গড়া। সর্দারদের প্রভাব খাটিয়ে জনশিক্ষা সমিতিকে জনবিচ্ছিন্ন করা। অন্যদিকে জনশিক্ষা সমিতির সদস্যরা মহারাজা বীরবিক্রম যাতে আমন্ত্রিত সকল সম্প্রদায়ের মাতব্বরদের বিভ্রান্ত না করতে পারেন এবং জনশিক্ষা সমিতির বিরোধী করে না তুলতে পারেন সেজন্য আমন্ত্রিতদের শিবিরে গিয়ে প্রচার আন্দোলন চালাতে থাকেন। এই প্রচারে মুখ্য ভূমিকা নেন সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা এবং অমরেন্দ্র দেববর্মা (বংশী ঠাকুর) প্রমুখ। এই প্রচারে সাহায্য করেন বীরেন দত্ত, বীরচন্দ্র দেববর্মা এবং প্রভাত রায় প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। তাছাড়া জনশিক্ষা সমিতির বহু কর্মী শিবিরে শিবিরে গিয়ে মহারাজা বীরবিক্রমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপজাতি সর্দারদের অবহিত করেন। জনশিক্ষা সমিতির নেতাদের উপর আক্রমণ আসতে পারে এই আশঙ্কাও জনগণের কাছে প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানের পূর্বদিন মহারাজা বীরবিক্রম তাঁর বশংবদ উপজাতি ব্যক্তিদের নিয়ে একটি উপজাতি সংগঠন গড়ার প্রস্তুতি চালান। তখন জনশিক্ষা সমিতির কর্মীদের এবং প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর ও বীরেন দত্তর রণকৌশল ছিল মহারাজার এই প্রচেষ্টাকে সরাসরি বাধা না দেওয়া। কেননা, মহারাজার সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে যাওয়া জনশিক্ষা সমিতির পক্ষে সহজ নয়। জনশিক্ষা সমিতির জনপ্রিয়তা বেড়েছে সত্য, কিন্তু রাজার প্রতি উপজাতিদের আনুগত্য যে অটুট এও তেমনি সত্য! জনশিক্ষা সমিতির প্রচেষ্টা ছিল জনশিক্ষা সমিতি এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে যেমন প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর, বীরচন্দ্র দেববর্মা, সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা এবং দশরথ দেববর্মাকে মহারাজার গঠিত উপজাতি সংগঠনের সদস্যভুক্ত করা। সংগঠনের ভিতরে গিয়ে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালাবার উদ্দেশ্যে তাঁদের সেই

সংগঠনে পাঠানো। মহারাজা বীরবিক্রম চেয়েছিলেন তাঁদের বাদ দিয়ে শুধু রাজার বশংবদদের নিয়ে এই সংগঠন গড়া।

জনশিক্ষা সমিতির প্রচার ও কার্যকলাপ মহারাজার কর্ণগোচর হতেই সে রাতের মধ্যে সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা এবং বংশী ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করা হয়। দশরথ দেববর্মা তখন আগরতলায় ছিলেন না। মহারাজা ভেবেছিলেন জনশিক্ষা সমিতির এই প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তার এবং উপযুক্ত শাস্তি দিলে উপজাতি সর্দার এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত উপজাতিরা ভয় পেয়ে মহারাজার প্রস্তাব মেনে নেবেন। অন্যদিকে জনশিক্ষা সমিতির সংস্রবও ছেড়ে দেবেন। কিন্তু ফল হল উল্টো, বংশী ঠাকুর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে প্রচুর জেলখাটা ব্যক্তি। বংশীঠাকুরের নাম উপজাতিদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়। জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সুধন্বা দেববর্মা এবং হেমন্ত দেববর্মাও অনুরূপ জনপ্রিয়। তাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি শিবিরে বিক্ষোভ এবং গুঞ্জন শুরু হয়। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হল রাতের মধ্যে বংশী ঠাকুর, হেমন্ত দেববর্মা এবং সুধন্বা দেববর্মাকে মুক্তি না দিলে তাঁরা কেউ মিছিলে যোগদান করবেন না। এমন কি মহারাজার আয়োজিত ভোজসভাতেও কেউ যোগ দেবেন না। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনশিক্ষা সমিতির কর্মীদের এবং প্রভাত রায় ও বীরেন দত্তের ভূমিকা ছিল। আমন্ত্রিত সহস্রাধিক সর্দার এবং ভলান্টিয়ারদের বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখে মহারাজা ভোর রাতেই এই উপরোক্ত তিনজনকে মুক্তি দেন। মুক্তি দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজা উপজাতি সর্দারদের কাছে 'ত্রিপুর সংঘ' গঠনের জন্য প্রস্তাব পাঠান। প্রস্তাবে প্রভাত রায়, বীরচন্দ্র দেববর্মা, বংশী ঠাকুর, সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা এবং দশরথ দেববর্মার নাম ছিল না। অতঃপর জনশিক্ষার সমিতির নেতারা উপরোক্ত ব্যক্তিদের ত্রিপুর সংঘের সদস্যভুক্ত করে কমিটিতে রাখার জন্য উপস্থিত কিছু সংখ্যক সর্দারদের সই নিয়ে মহারাজার কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করেন। মহারাজা দশরথ দেববর্মা ছাড়া অন্য সকলকে ত্রিপুর সংঘের সদস্যভুক্ত করেন। ফলে মহারাজার অনুগতদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে 'ত্রিপুর সংঘ' গঠিত হল। সর্দাররা মহারাজা আয়োজিত মিছিল এবং ভোজসেবায়ও যোগদান করল।

'ত্রিপুর সংঘে'র সভাপতি করা হল অ্যাডভোকেট ললিতমোহন দেববর্মাকে। মহারাজা 'ত্রিপুর সংঘে'র হাতে উপজাতিদের বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়ার সুপারিশ

করার ক্ষমতা অর্পণ করেন। ত্রিপুর সংঘ গঠনের বৎসরাধিক কালের মধ্যেই মহারাজা বীরবিক্রমের মৃত্যু ঘটে। পরবর্তী সময়ে 'ত্রিপুর সংঘ' বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরই মধ্যবর্তী সময়ে আমন্ত্রিত হয়ে দশরথ দেববর্মা ত্রিপুর সংঘের বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠক হল সদর উত্তরের রাজঘাট গ্রামের লক্ষ্মীকান্ত দেববর্মার ঘরে। উপস্থিত ছিলেন বীরেন দত্ত, হেমন্ত দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা এবং দশরথ দেববর্মা। সেই বৈঠকে দশরথ দেববর্মাকে সভাপতি, অঘোর দেববর্মাকে সাধারণ সম্পাদক এবং হেমন্ত দেববর্মাকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে এক সংগঠন তৈরি হয়। সংগঠনের নাম দেওয়া হয় ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ। উল্লেখ্য বগলা দেববর্মা এবং সুধন্বা দেববর্মাকেও উক্ত পরিষদের সদস্যভুক্ত করা হয়। মুক্তি পরিষদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'ইশ্‌তেহার'-এর খসড়া লেখার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় বীরেন দত্তের উপর।

১৯৪৬ সালের প্রথমদিকে ত্রিপুরায় প্রজামণ্ডল গঠিত হয়েছিল। আগেকার জনমঙ্গল সমিতি এবং জনশিক্ষা সমিতির নেতৃবর্গ এবং কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের একত্রিত করেই প্রজামণ্ডল একটা সাধারণ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করতে শুরু করেছিল। ওই সময় সারা ভারত প্রজামণ্ডলের অধিবেশন গোয়ালিয়রে(১৯৪৬)বসে। জওহরলাল নেহেরু ও সীতারামাইয়া উপস্থিত হয়েছিলেন। ওই অধিবেশনে প্রজামণ্ডলের তরফ থেকে বীরেন দত্ত, বীরচন্দ্র দেববর্মা ও সুধন্বা দেববর্মা নির্বাচিত হয়ে গোয়ালিয়র গেলেন। গোয়ালিয়র প্রজাপরিষদের তরফ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ও সুখময় সেনগুপ্ত। বিতর্ক দেখা দিল অধিবেশনে কারা প্রতিনিধিত্ব করবে। স্থির হল উভয়পক্ষই অধিবেশনে থাকবে। কিন্তু কারোরই ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না। ত্রিপুর সংঘের দলভুক্ত হওয়ায় সুধন্বা দেববর্মার প্রতিনিধিত্ব করা নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুধন্বা দেববর্মার অধিকার স্বীকৃত হল।

কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৪৬ সালে মহারাজা বীরবিক্রম পরলোক গমন করেন। ত্রিপুর সংঘর ও বিলুপ্তি ঘটে। সারা ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল। দেশীয় রাজ্যগুলি দোলায়মান। ভারতে যোগ দেবে না কি পাকিস্তানে। ত্রিপুরার মহারাজা অবশ্য দেশীয় রাজ্যগুলির সর্বাগ্রে ভারতে যোগ দেওয়ার সম্মতি জানিয়ে দেন।

গোলাঘাটি বিদ্রোহ

১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরার ভারত ডোমিনিয়নে যোগ দেওয়ার

পূর্বে ১৯৪৮ সালের ৯ অক্টোবর ছিল ত্রিপুরায় ইতিহাসের একটি কলঙ্কময় দিবস। পুলিশ গুলি চালিয়েছিল দিনের বেলায়। প্রাণ হারান সাত জন। আহতের সংখ্যা আট। ঘটনার পর থেকেই এলাকার পুরুষেরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। ঘরে মেয়েরা ভীত ও সন্ত্রস্ত। প্রায় এক সপ্তাহের ঘটনা। এর মধ্যে গুলির শব্দ আর শোনা যায় নি। পুলিশ দিনের বেলায় পুরুষদের খোঁজ খবর নিতে আসতো। গ্রামের অনেকের নামেই গ্রেফতারি পরোয়ানা। রাতে পুলিশ সম্ভবত ভয়ে গ্রামে আসতো না। এই কারণে দিনের বেলা থেকে রাতই ছিল বেশি নিরাপদ। আচমকা প্রভাতী নৈঃশব্দে গুলি ছোঁড়ার শব্দ। ভয়ে বিহ্বল মানুষের মনে আতঙ্ক। কেউ ঘরের বাইরে আসেনি বিকেলের আগে। দু-একজন বৃদ্ধ পূর্ব দিকের টিলার দিকে ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে রইল। ওই দিকেই গুলির শব্দ শোনা গিয়েছিল। অনুসন্ধানকারীরা টিলার দিকেই রওয়ানা হল, কেননা টিলায় জুম চাষের প্রস্তুতি চলছে। দেখা গেল টং ঘরের দরজা খোলা। ঘর রক্তে ভেসে যাচ্ছে জুম চাষি রাজেন্দ্রের নিথর দেহ।গোলাঘাটির ঘটনায় রাজেন্দ্র দেববর্মা নবম শহিদ। ত্রিপুরার জনদরদী কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্তের প্রতিবেদনটি ছিল, এইরূপ:"১৯৪৮ সালের ৯ অক্টোবর ছিল ত্রিপুরা কমিউনিস্ট পার্টির একটি অগ্নি পরীক্ষার দিন। সামান্য সংখ্যক পার্টি সদস্য নিয়ে গোলাঘাটি হত্যালীলার মোকাবিলা করতে হয়েছিল পার্টিকে। বুভুক্ষু জনসাধারণ ধান বোঝাই নৌকার পাশে হাজির হয়েছিল। ধান ছিল বিশালগড়ের মহাজন হরি সাহার। হরি সাহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষ অজ্ঞ ছিল। বিশালগড় থানার ওসি মিহির চৌধুরীর নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশ হাজির ছিল ধানের নৌকা উদ্ধার করতে। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ ছিল থানা অফিসারের উপর। তাকে কার্যকর করার জন্যই জনসাধারণকে কোনরূপ সতর্ক না করেই পুলিশ ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালায়। লাটিয়াছড়ার কুঞ্জ দেববর্মা, বড়জলার সতীশ দেববর্মা সহ সাতজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। গ্রেফতারি পরোয়ানা ও আক্রমণের আশঙ্কা করে কর্মীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সমর্থকদের নির্মূল করার এই অভিযান দিল্লি থেকেই পরিকল্পিত হয়েছিল।"

ত্রিপুরার পাকিস্তান-ভুক্তির ষড়যন্ত্র

ত্রিপুরার মুসলিমলীগ পন্থী আঞ্জুমান ইসলামিয়া জন্মলগ্ন (১৯৪৫) থেকেই ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কিন্তু মহারাজা বীরবিক্রম

১৯৪৭-এর এপ্রিলের শেষ ভাগে ত্রিপুরার ভারত ইউনিয়নে যোগদানের ঘোষণা করায় তাদের গুঞ্জন শুরু হয় মহারাজের অধিকার নিয়ে। আঞ্জুমান ইসলামিয়ার দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যায় কুমিল্লা, ঢাকা ও কলকাতায়। এদিকে রাজ অন্ত:পুরের মহারাজকুমার দুর্জয় কর্তার সঙ্গে আঞ্জুমান ইসলামিয়ার নেতৃবৃন্দের আগাগোড়াই মেলামেশা ও যোগসাজশ ছিল। এই অবস্থায় হঠাৎ ঘোষিত হয় মহারাজ বীরবিক্রমের মৃত্যু। এই রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক যুগ-সন্ধিক্ষণে মহারাজের অকাল আকস্মিক মৃত্যু ত্রিপুরার ভাগ্যকে এক চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিল। মহারাজ কিরীটবিক্রম নাবালক। মাতা মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী 'রিজেন্ট' হিসেবে রাজ্যের ও জমিদারির শাসন ক্ষমতা হাতে নিলেন। সঙ্কটজনক অবস্থায় তিনি ভারত সরকারের সাহায্য চাইলেন। ভারতে তখনও ব্রিটিশ শাসন। যদিও ভারতের ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট সত্যব্রত মুখার্জী আই.সি.এসকে ত্রিপুরার প্রধানমন্ত্রী এবং রিজেন্টের দেওয়ান হিসেবে আগরতলায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

অপর দিকে ত্রিপুরার সীমান্তস্থিত কুমিল্লার মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের উদ্যোগে ও আগরতলার কতিপয় ব্যক্তির সহযোগিতায় পাকিস্তান ত্রিপুরা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। স্বল্পকালের মধ্যেই দেওয়ান সত্যব্রত মুখার্জি পাকপন্থীদের খপ্পরে পড়েন। দুর্জয় কর্তা এবং আঞ্জুমানীদের সঙ্গে চলে দহরম-মহরম। জনগণ তা আঁচ করে বিক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে উঠেন। ওই সময়ে রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে এবং রমেন্দ্রকিশোর দেববর্মার (ননী কর্তা) নেতৃত্বে জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে পাকপন্থীদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেন তুমুল আন্দোলন। বিরাট প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয় আগরতলায় উমাকান্ত ময়দানে ১২ জুলাই, ১৯৪৭ সালে, সভাপতি ননী কর্তা। অবিলম্বে ত্রিপুরার প্রধানমন্ত্রী সত্যব্রত মুখার্জীর অপসারণের দাবি উঠল। ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামণ্ডল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ বাহিনীও গড়ে তোলে। আগরতলার চারজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রভাত রায়, জয়সিংহ দেববর্মা, কালু চন্দ ও প্রফুল্ল রায় শিলংয়ে মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। ইতিমধ্যে ভারতের গোয়েন্দা দপ্তর মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানের ত্রিপুরা আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হয়েছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে ৪ ঠা নভেম্বর স্বরাষ্ট্র ও উপ-প্রধানমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলকে ত্রিপুরা সম্পর্কে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। আসাম সরকারকে একই সঙ্গে এই

অবস্থা অবহিত করেন এবং পাকিস্তানের সরকারকে টেলিগ্রাম মারফত সতর্ক করে দেন। পাকিস্তানের ত্রিপুরা আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য ভারত সরকার আসাম থেকে উপযুক্ত সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। ফলে পাকিস্তানের ত্রিপুরা আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরার ভারত ডোমিনিয়নে যোগ দেওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ৯ অক্টোবর, ১৯৪৮ সালে ত্রিপুরার রাজন্য যুগের অবসান এবং গণতান্ত্রিক উত্তরণের পর্ব শুরু হয়ে গেল। গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ অবশ্য সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন চালু হওয়ার ফলে। জেল ফেরত অনুশীলন ও যুগান্তর দলের নেতারা দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভক্ত হয়ে 'ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি' 'ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ' নামে দুটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মঞ্চ গড়ে তুলেন (১৯৩৮)। আন্দোলনের দুটি মুখ্য দাবি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে রাজার অধীনে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা এবং প্রজাকল্যাণমূলক ব্যবস্থা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালের ২৬ জানুয়ারি ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের নেতারা আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস দল গঠন করে কংগ্রেসের নামেই আন্দোলন শুরু করেন। অপরদিকে অনুশীলন দলের বীরেন দত্তের উদ্যোগে কমিউনিস্ট সংগঠন জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হয় (১৯৩৮)। সমিতির অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সভ্যদের মধ্যে ছিলেন বংশীঠাকুর, প্রভাত রায়, সুকুমার ভৌমিক, কীর্তি সিংহ প্রমুখ। এই সংগঠন রাজ্যে রাজার অধীনে দায়িত্বশীল শাসনের দাবিতে প্রচার আন্দোলন শুরু করে এবং সকলেই রাজবন্দি হয়ে কারারুদ্ধ হন। এই সময়ে কুমিল্লা জেল কমিটির অধীনে একটি গোপন কমিউনিস্ট সেল গঠন করা হয়। এই সেলের সম্পাদক ছিলেন দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত। বীরেন দত্তের পরামর্শে সারা ভারত কৃষক সম্মেলনে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়। প্রতিনিধি দলের সভ্যরা ছিলেন যথাক্রমে নলিনী সেনগুপ্ত, ঊষারঞ্জন দেববর্মা, নিমাই দেববর্মা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় সব রকম রাজনৈতিক সভা-সমিতিও প্রচার নিষিদ্ধ হয়ে গেল। গোপনে 'ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি', 'জনশিক্ষা সমিতি' এবং অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে 'ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামণ্ডল' নামে একটি যুক্ত মঞ্চ তৈরি করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলতে থাকে। এই যুক্ত সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন যোগেশচন্দ্র দেববর্মা এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত

হলেন বীরচন্দ্র দেববর্মা। উল্লেখ্য নেহরুর নেতৃত্বে সারা ভারত গণপরিষদের পক্ষে তড়িৎ দাশগুপ্ত ও সুখময় সেনগুপ্ত যৌথভাবে রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে দেশীয় রাজ্য প্রজামণ্ডল নাম নিয়ে যোগদান করেন। বীরেন দত্ত 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা' নামে পত্রিকা প্রকাশ করে গোয়ালিয়র অধিবেশনের একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালে এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় সি.পি.আই. দলের দ্বিতীয় পার্টি সম্মেলনের পি.সি. যোশীর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার পর তাঁকে সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে বি.টি. রনদিভেকে সাধারণ সম্পাদক করা হয় এবং নতুন করে পলিটব্যুরো গঠন করা হয়। পার্টির কর্মসূচিতে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা আপসমূলক স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না এই আশঙ্কায় কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই নির্দেশ জারি করেন, যেখানেই সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হবে সেখানেই কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করতে হবে। জঙ্গি আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। সারা দেশে হাজার হাজার কমিউনিস্ট নেতাও কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। ত্রিপুরার প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর, বীরচন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ায় আত্মরক্ষার তাগিদে জনশিক্ষা সমিতির কতিপয় নেতা এক সভায় মিলিত হয়ে পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ' সংগঠন গড়ে তুলেন। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফেরত সৈনিকের কর্মসংস্থান না হওয়ায় তারা রাইফেল নিয়ে গণমুক্তি পরিষদে দলে দলে যোগ দিতে থাকে। পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়। এই সঙ্কটজনক অবস্থায় বীরেন দত্ত মুক্তি পরিষদের কর্মসূচি ছাপিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ফেরার পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। এই সময় আসাম থেকে প্রাদেশিক সম্পাদক প্রাণেশ বিশ্বাস, মোহন চৌধুরী, রঞ্জন রায়, মাখন দত্ত ও রাখাল মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে মুক্তি পরিষদকে রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও সামরিক বিষয়ে সাহায্য করতে থাকেন। মোহন চৌধুরী ছিলেন প্রাক্তন হাবিলদার, অন্যান্যদের মধ্যে যাঁরা কলকাতা থেকে আসেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিজয় বসু, নৃপেন চক্রবর্তী এবং জনৈক বন্দুক মেরামতের কারিগর।

মুক্তি পরিষদকে ধ্বংস করার জন্য সামরিক আইন জারি করা হয় (১৯৪৯, মার্চ)। বহু গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হল। অত্যাচার, নিপীড়ন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পদ্মবিলে নারী সমিতি মিলিটারির নির্দেশ মত বেগার খাটতে রাজি না হওয়ায়

জোর সংঘর্ষ বেঁধে যায়। মিলিটারির গুলিতে কুমারী দেববর্মা, মধুমতী দেববর্মা ও রূপশ্রী দেববর্মা নামে তিন যুবতী মারা যায়। এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র নারী বাহিনীর গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সদর দক্ষিণে সুধন্যা দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মার নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠে। অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্প ও থানা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে অঘোর দেববর্মা মুক্তি পরিষদকে কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব গ্রাহ্য না হওয়ায় অঘোর দেববর্মা মুক্তি পরিষদ ছেড়ে চলে যান। হেমন্ত দেববর্মাকে সাধারণ সম্পাদক করা হল। কথিত আছে অঘোর দেববর্মা দুজন অনুগামীর বিশ্বাসঘাতকতায় কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। পদ্মবিলের হত্যাকাণ্ডের পর মিলিটারিরা অভিযান শুরু করে খোয়াইয়ের চাম্পা হাওর এলাকায়। চাম্পা হাওরের অভিযানের বিরুদ্ধে উপজাতি প্রাক্তন সৈনিকরা সাধারণ উপজাতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংগ্রামে নেমেছিলেন। প্রাক্তন উপজাতি সৈনিকরা গেরিলা পদ্ধতিতে সমস্ত সংগ্রামের কৌশল অবলম্বন করার ফলে ওই সব এলাকা মিলিটারিদের নিকট দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিলেন। এই অস্থির পরিস্থিতিতে উপজাতিদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে মুখ্য ভূমিকা নেন শ্রীদশরথ দেব। 'জনশিক্ষা সমিতি'-এর মাধ্যমে ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তার ঘটিয়ে সমিতিকে একটি জনপ্রিয় সংগঠনে রূপান্তরিত করেন।

পরবর্তী সময়ে রুশ পার্টির পরামর্শে কমিউনিস্ট পার্টি নীতি ও কর্মসূচি বদল করে। অবাস্তব হটকারী নীতি ও কর্মসূচির জন্য রনদিভেকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে। রাজেশ্বর রাওকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করা হল। পুরাতন পলিটব্যুরোর সদস্যদের বরখাস্ত করে নতুন কমিটি গঠন করা হল। সি.পি.আই অতি বিপ্লবী কর্মসূচি বাতিল করে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে বেআইনী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়। ভারতের সংবিধানে, পূর্বেকার রাজ্য ও প্রদেশগুলিকে ক, খ ও ঘ এই চার শ্রেণীর রাজ্যে বিভক্ত করে নববিন্যাস ঘটানো হয়। ত্রিপুরা চিফ্ কমিশনার শাসিত 'গ' শ্রেণীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ত্রিপুরায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। উল্লেখ্য ত্রিপুরার ভারত ভুক্তির প্রস্তুতি পর্বে মুসলিম লীগপন্থী গেঁদু মিঞার নেতৃত্বে ত্রিপুরার পাকিস্তান ভুক্তির দাবিতে এক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের সূত্রে জানা যায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে একদল

মুসলিম লীগপন্থী সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবী দল ত্রিপুরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। খবর পাওয়া মাত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার প্যাটেল আসাম থেকে সেনাদল পাঠাবার নির্দেশ দেওয়ার ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। গবেষকদের ধারণা এই ষড়যন্ত্র সফল হলে অর্থাৎ ত্রিপুরা পাকিস্তানে যোগ দিলে হিন্দু উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ হত এবং যারা এসেছিল তারাও ভারতের অন্য কোন রাজ্যে সরে যেতে বাধ্য হত। এমন কি পার্বত্য হিন্দু উপজাতিরাও রাজ্য ত্যাগ না করে উপায় থাকতো না।

১৯৫১ সালের 'গ' শ্রেণীর আইনে বিধানসভা ও মন্ত্রীসভার সংস্থান থাকলেও ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তা প্রসারিত হয়নি। রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির দাবি ছিল আমলাতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ত্রিপুরার জনগণের প্রাপ্ত বয়সের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ত্রিশ সদস্যযুক্ত 'ইলেক্টোরাল' কলেজের নির্বাচন হয়। উল্লেখ্য প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যরা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। যদিও নেতাদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বহাল থাকায় আত্মগোপন অবস্থায় গ্রেপ্তার এড়িয়ে দশরথ দেব নির্বাচনে প্রার্থী হন। প্রথম নির্বাচনেই কমিউনিস্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়লাভ এক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইল। ত্রিপুরা থেকে প্রথম যে দুজন সাংসদ লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন-তাঁরা হলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শ্রীবীরেন দত্ত ও শ্রীদশরথ দেব। ১৯৫৩সালের ১৪ এপ্রিল, উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হল। তাঁদের মধ্যে শচীন্দ্রলাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত ও জীতেন্দ্রমোহন দেববর্মা দলীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। উপদেষ্টা পরিষদের কাজ ছিল ত্রিপুরার মুখ্যপ্রশাসক বা চিফ কমিশনারকে শাসনকার্যে পরামর্শ ও সাহায্য করা। এই সময় রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য ভারতের কোনো কোনো রাজ্যে দাবি উঠতে থাকে। ভাষার ভিত্তিতে ভারতের প্রথম রাজ্য অন্ধ্র পুনর্গঠিত হয়। অন্ধ্রের পর সারা ভারতেই রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য ভারতের কোনো কোনো রাজ্যে দাবি উঠতে থাকে। ভাষার ভিত্তিতে ভারতের প্রথম রাজ্য অন্ধ্র পুনর্গঠিত হয়। অন্ধ্রের পর সারা ভারতেই রাজ্য পুনর্গঠনের আরও সোচ্চার হয়ে একটি সমাধান সূত্রে আসার জন্য ফজল আলির সভাপতিত্বে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করা হল। কমিশনের অন্য দুজন সদস্য ছিলেন পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জুর এবং সর্দার কে. এম.পানিক্কর। কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালের ১০ অক্টোবর। কমিশন ত্রিপুরাকে অসমের সঙ্গে সংযুক্ত করার সুপারিশ করেন। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সমস্ত ত্রিপুরায়। ১৯৫৬

সালের ৩১ আগস্ট রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ হয়। এই আইন অনুযায়ী ভারতের রাজ্যগুলোকে দু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন পূর্ণরাজ্য এবং ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত ইউনিয়ন টেরিটরি। এই সুবাদে ত্রিপুরাকে একটি কেন্দ্রশাসিত ইউনিয়ন টেরিটরি রূপে নির্ধারণ করা হয়। ১৯৫৯ সালের ১৫ আগস্ট ত্রিপুরার টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠিত হয়। এই কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা ৩২। ৩০ জন নির্বাচিত এবং ২ জন ভারত-সরকার কর্তৃক মনোনীত। শচীন্দ্রলাল সিংহ হলেন এই পরিষদের চেয়ারম্যান। রাজ্য প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় চিফ কমিশনারের উপর। ১৯৬৩ সালের ১ লা জুলাই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়। যাঁরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন তাদের নিয়েই বিধানসভা গঠিত হল। সেই সময় থেকে টেরিটোরিয়াল বা আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল বলে ঘোষণা করা হল। পাঁচ সদস্যযুক্ত মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব দেন শচীন্দ্রলাল সিংহ। তিনি হলেন ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে ৩০ সদস্যযুক্ত ত্রিপুরার দ্বিতীয় বিধানসভার নির্বাচন হয়। এবারও শচীন্দ্রলাল সিংহ দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পূর্বের চিফ কমিশনারের পদটি লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদ-এ উন্নীত হয় (১৯৭০, ১লা ফেব্রুয়ারি)। এ. এল.ডায়াস ছিলেন রাজ্যের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর। এই সময়েই এক জেলা বিশিষ্ট ত্রিপুরা রাজ্যকে তিনটি জেলায় বিভক্ত করা হল। এই তিনটে জেলা হল উত্তর ত্রিপুরা জেলা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা।

১৯৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর লোকসভায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মেঘালয় পূর্ণরাজ্যে উন্নীত হয়। ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখে এই আইন কার্যকরী হয় এবং ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। একই সঙ্গে ত্রিপুরার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পদটি 'গভর্নর' বা রাজ্যপাল পদে উন্নীত হয়। বি.কে নেহরু ত্রিপুরার প্রথম রাজ্যপাল হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৭১সালে বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়। বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার শরণার্থী ত্রিপুরায় আসতে থাকে, সেই সময়ে ত্রিপুরায় যত লোকসংখ্যা ছিল প্রায় সমান সংখ্যক শরণার্থী ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে রাজ্যের অর্থনীতি প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে "আগরতলা ষড়যন্ত্র" (১৯৬২) মামলা প্রাসঙ্গিক। উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৬২

সালে "আগরতলা ষড়যন্ত্র" (১৯৬২) মামলা ও শেখ মুজিবের সঙ্গে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ও ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সম্পর্ক কেন পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল সেটা অনুধাবন করা প্রয়োজন। আসলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী চরম ভারতবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের উপর অবিশ্বাসী হয়ে তাদের ভাষা, কৃষ্টি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ও পশ্চিমি পাকিস্তানিদের উপনিবেশ সুলভ আচরণ বা বাঙালিরা সুনজরে দেখেনি। ১৯৫২ সালে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ২১ শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন, ১৯৬০ সালে এবং ১৯৬২ সালের ঘটনাবলী বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলেও একে অন্যের পরিপূরক। যার বিস্ফোরণ ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বর শেষ লগ্নে যার চরম পরিণতি। একটা জাতি তার সত্তাকে রক্ষার জন্য ধর্মীয় দ্বিজাতি তত্ত্ব যে অপ্রাসঙ্গিক, তার প্রমাণ বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা তথা সমগ্র ভারত একাত্ম হয়ে পড়েছিল।

১৯৭২ সালে ত্রিপুরায় পূর্ণরাজ্যে উন্নীত হওয়ায় বিধানসভা সদস্যসংখ্যা বেড়ে ৬০ জন হয় এবং প্রথম বিধানসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২সালের মার্চ মাসে। এই নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিধানসভায় ৬০টি আসনের মধ্যে ৪২টি দখল করে নেয়। সি পি এম পায় ১৭টি আসন এবং সি পি আই পায় ১ টি আসন। পরবর্তী নির্বাচনে (১৯৭৭সালের এপ্রিল) সি.এফ.ডি এবং সি পি এম কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হল। আবার কিছুদিন পরেই চার মাসের মধ্যেই রাধিকারঞ্জন গুপ্তের নেতৃত্বে জনতা সি.পি.এম কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হল। অবশেষে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয় (১৯৭৭, ৫ নভেম্বর)। ১৯৭৭সালের ৩১ শে ডিসেম্বর ত্রিপুরায় চতুর্থ বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সি পি আই এম এককভাবে পায় ৫০টি আসন। ১৯৭৮এর ৫ জানুয়ারি নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্ব ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। উল্লেখ্য, এই বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিজয়ধারা ক্রমাগত দশ বৎসর অব্যাহত থাকে (১৯৭৮-১৯৮৮)। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে একটি রাজনৈতিক দলের (কংগ্রেস দল) শাসন যা ভারতীয় রাজনীতির একক বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, তা কংগ্রেস দলের ব্যর্থতার কারণে পুরোপুরি ভেঙে পড়ল।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিষয়টি '৪৭-এর স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পটভূমিকা তুলে ধরা উচিত বলে মনে করি। ১৯৪৭ এর মাউন্টব্যাটেন এর ঘোষণাকে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 'জনগণের হাতে অস্ত্র' রূপে ব্যবহার করা যাবে বলে 'অগ্রগতি' আখ্যা দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিল।

কিন্তু ছয় মাসের ব্যবধানের মধ্যেই পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর স্বাধীনতাকে 'ঝুটা' হিসেবে চিহ্নিত করে। অবশ্য শেষোক্ত মূল্যায়ণও পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়েছিল। *স্বাভাবিক কারণেই কমিউনিস্ট পার্টির এই দুটি মূল্যায়নের কোনটি সঠিক, সেই প্রশ্নটি উঠে আসে। এই সম্পর্কে ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদ-এর অভিমত হল মাউন্টব্যাটেন এর ঘোষণাকে 'জনগণের হাতে অস্ত্র' রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে, পার্টির এই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া আপাতদৃষ্টিতে সত্য ছিল। সেই সময়ের নিরিখে ব্রিটিশ শাসনের বিদায় ও পরবর্তীকালে ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রচিত ও প্রণীত গণতান্ত্রিক সংবিধান নিঃসন্দেহে অগ্রগতি। পার্টি এই বিষয়ের তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল যে, ভারতীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পিত হলেও, ব্রিটিশ ও অন্যান্য পুঁজিপতিদের কায়েমি স্বার্থ অক্ষুণ্ণই থেকে গিয়েছিল। সহজভাবে বলা যায় ভারতকে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন দেশে রূপান্তরিত করা সত্ত্বেও তার অর্থনীতি দৃঢ়ভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে থেকে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৫১-এর অক্টোবরে পার্টির বিশেষ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সংসদ ও রাজ্য বিধানসভা সহ সমস্ত নির্বাচনকে পার্টি ব্যবহার করবে। এর মাধ্যমে বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে জনগণতন্ত্রে উত্তরণের পার্টি-নীতির পক্ষে মানুষকে সমবেত করার সুযোগ পাওয়া যাবে। ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৫২ সালের শুরুতেই প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সংসদের উভয় কক্ষে পার্টি বৃহত্তম বিরোধী গোষ্ঠীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকসভায় এ.কে.গোপালন এবং রাজ্যসভার পি. এস.সুন্দরাইয়া পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। এছাড়াও ত্রিভাঙ্কোর-কোচিন ও মাদ্রাজ রাজ্যে দুটি কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক জোটের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত ত্রিভাঙ্কোর-কোচিনের রাজপ্রমুখ ও মাদ্রাজের রাজ্যপালকে ব্যবহার করে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনলে ওই দুই রাজ্যেই কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয়। অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গে এবং হায়দারাবাদে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বাম ও গণতান্ত্রিক জোট কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধী ফ্রন্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সংসদীয় প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে জনগণের সংগ্রামকে শক্তিশালী করার ব্যাপক সম্ভাবনার সুযোগ উপস্থিত হয়। পাঁচ বছর পরে কেরলে কমিউনিস্ট শাসিত সরকার গঠিত

হলে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিশালী বিরোধী দল থেকে শাসক দলে পরিণত হওয়ার শক্তি অর্জন করে। অবশ্য এই কমিউনিস্ট সরকার বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। অন্তর্ঘাতমূলক আন্দোলন এবং কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ এই সরকারের পতন ডেকে আনে। কেরালা সরকার বরখাস্ত হবার পর থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এর ফলে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে সি.পি.আই(এম)-এর নেতৃত্বে রাজ্য সরকার গঠিত হয়। এমন কি তামিলনাড়ু , উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, পঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশ অবামপন্থী কিন্তু অকংগ্রেসি সরকার ক্ষমতায় আসে। কংগ্রেসের সংগঠনের ইতিহাসে এই প্রথমবার দশটি রাজ্যে বিরোধী আসনে বসতে বাধ্য হয়। কেন্দ্রে অবশ্য ক্ষমতার অদল বদল হয়নি। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ১৯৫৭ সালে কেরহালায় যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার দুই দশক পরে সেই প্রক্রিয়া কেন্দ্রেও উপস্থিত হয়। ১৯৬৭সালেই সর্বপ্রথম কেরালা রাজ্যে কমিউনিস্ট সরকার স্থাপিত হয়। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট সরকার স্থাপিত হয় ১৯৬৭, ১৯৬৯, এবং ১৯৭১সালে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক চেতনা এবং আদর্শগত কোন সমতা না থাকায় সরকারগুলি নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ভেঙে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৭ সালটি ছিল ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসের এক চরম যুগসন্ধিক্ষণ। এই প্রথম প্রমাণিত হল, রাজনৈতিক এবং আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমতা না থাকলে সরকারি স্থায়িত্ব লাভ করতে সক্ষম হবে না। এই রাজনৈতিক উপলব্ধিতে আশ্রয় করেই পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামজোট সরকার গঠন হয় ১৯৭৭ সালে।

পশ্চিমবঙ্গের পর ত্রিপুরার বিধানসভায় নির্বাচনেও একক প্রক্রিয়া বামজোট ৬০টি আসনের মধ্যে ৫৬ টি আসন দখল করে।

ত্রিপুরায় শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বামফ্রন্ট সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে কর্মসূচিটি গ্রহণ করেছিল সেটি ছিল উপজাতিদের স্বশাসনের অধিকার সুনিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সংবিধান সংশোধন করে ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তপশিল চালু করার দাবি উত্থাপন করে। কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ওই সময়ে জনতা পার্টির মোরারজি দেশাই। তিনি এই দাবি পূরণে অক্ষমতা প্রকাশ করলে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের অপেক্ষায় না

থেকে রাজ্যের ক্ষমতার মধ্যে দিয়েই প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। রাজ্যের একটি সুনির্দিষ্ট এলাকাকে 'উপজাতি এলাকা' হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে নির্বাচিত জেলা পরিষদ গঠন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগী হয়। উপজাতি এলাকায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে সরকারি বিলটিও সর্বসম্মতভাবে বিধানসভায় পাশ হয়।

উল্লেখ্য, রাজন্য আমলে ১৯৩১ সালে কল্যাণপুর অঞ্চলে একশ দশ বর্গমাইল এবং ১৯৪৩ সালে কৈলাসহর, খোয়াই, উদয়পুর, অমরপুর, সাব্রুম ও বিলোনিয়া অঞ্চলে উপজাতি অধ্যুষিতদের জন্য বিশেষত ত্রিপুরি, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, রিয়াং ও হালাম সম্প্রদায়ের জন্য ১৯৫০ বর্গমাইল ভূখণ্ডকে সংরক্ষিত করা হয়েছিল। ট্রাইবেল রিজার্ভ বা উপজাতি সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে এগুলি পরিচিত ছিল। এই সংরক্ষিত অঞ্চলগুলি উপজাতি সম্প্রদায়কে কমপ্যাক্ট এলাকায় অনেকখানি সংহত করে। বাস্তবিকপক্ষে এই ট্রাইবেল রিজার্ভের মধ্যেই স্বশাসিত জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার বীজ সুপ্ত ছিল। স্বাধীনতা উত্তর যুগে অ-উপজাতি উদ্বাস্তু জনস্রোত ও তাদের অধিকাংশের ত্রিপুরাতে স্থায়ী বসবাস রাজ্যের জনসংখ্যার ভারসাম্য বিঘ্নিত করে। ফলে রাজ্যের উপজাতি জনসংখ্যার চেয়ে অ-উপজাতি জনসংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ভূমির উপর চাপ বাড়ে। অসম প্রতিযোগিতায় পশ্চাৎপদ উপজাতিরা জীবনের নানা ক্ষেত্রে অ-উপজাতিদের সঙ্গে তাল মিলাতে না পেরে পিছিয়ে পড়তে থাকে। শিক্ষা ও গণতন্ত্রের প্রসারে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ ঘটে। উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠে। ১৯৬৭ সালে উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য রাজ্যে পঞ্চম তপশিল প্রবর্তনের দাবি সোচ্চার হয়।

১৯৬৯ সালে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির দুর্গা চৌধুরী পাড়া সম্মেলনে তপশিলের দাবি গৃহিত হয়। কিন্তু তদানীন্তন অসম রাজ্য ছাড়া অন্যত্র সংবিধান সংশোধন না করে ষষ্ঠ তপশিল প্রবর্তন সম্ভব ছিল না। কিন্তু ১৯৭১সালে উত্তর-পূর্বাঞ্চল (পুনর্গঠন) আইন অনুযায়ী সংশোধনী অনুসরণে অসম রাজ্যের সঙ্গে মেঘালয় রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত মিজোরাম অঞ্চলেও ষষ্ঠ তপশিলের এক্তিয়ার বর্তায়। এই দৃষ্টান্ত রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করে। সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠ তপশিলের দাবিটি ক্রমশঃ নতুন মাত্রা পেতে থাকে।

ইতিমধ্যে ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার নদীয়াপুর অঞ্চলের হুরুয়া গ্রামে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০) বামফ্রন্ট সরকার ঘোষিত 'বর্গাস্বত্ব নথিবদ্ধকরণ' কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার সংগঠিত ও কৃষক আন্দোলনের অগ্রদূত কৃষক নেতা গোবিন্দ তেলী সহ ছয়জন কৃষককে বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠিত হয়। হুরুয়া হত্যা বিরোধী সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে প্রতিবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ত্রিপুরায়। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে পশ্চিমবঙ্গেও। প্রতিবাদ জানায় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়ে এবং হত্যাকারীর শাস্তি দাবি করে ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর কাছে প্রেরিত হয় স্মারক লিপি। স্বাক্ষর করেন মহাশ্বেতা দেবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সমর সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এ.কে. দে'র নেতৃত্বে এক সদস্যের তদন্ত কমিশনের সরকারের কাছে পেশ করা রিপোর্টে 'পুলিশের ব্যাপক গুলি চালনাকে অযৌক্তিক, অকারণ এবং সমগ্র পুলিশি অভিযান গ্রেপ্তারে পরিচালিত ছিল না। কৃষকদের হত্যার উদ্দেশ্যেই প্রণোদিত ছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করে।' এরপরেও নৃপেন চক্রবর্তীর সরকার দোষী সাব্যস্ত হওয়া পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

বামফ্রন্ট সরকার অবশ্য উপজাতিদের জন্য স্বশাসনের অধিকার মঞ্জুর করার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেটি হল বেআইনিভাবে হস্তান্তরিত উপজাতি ভূমি ফিরিয়ে দেওয়ার কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করা। কিন্তু 'আমরা বাঙালি' দলের পক্ষ থেকে এইরূপ কর্মসূচিকে বানচাল করে ত্রিপুরাকে 'বাঙলিস্তান'-এ পরিণত করার জন্য প্ররোচনামূলক সাম্প্রদায়িক স্লোগান তোলা হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল 'আমরা বাঙালি' সাম্প্রদায়িক দলের মত 'উপজাতি যুব সমিতি'ও উপজাতি সর্বস্বতা বিষয়কে মূলধন করে রাজ্যের রাজনীতিতে প্রবেশ করে। খুব স্বাভাবিক কারণেই 'আমরা বাঙালির' সাম্প্রদায়িক স্লোগান উপজাতি যুব সমিতির মধ্যে তীব্র বাঙালি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে জাতি উপজাতির ঐতিহ্যগত মৈত্রীবন্ধনে চিড় ধরায়। এইরূপ সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে 'অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' বা 'আসু' -এর নেতৃত্বে আসামে 'বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন', ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে উপজাতি যুব সমিতির তৈদু সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার কাজ করে।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক প্রস্তাবে দাবি করা হয়েছিল যে, ১৯৪৯ সালের ১৯ অক্টোবর যেদিন ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তারপর থেকে যেসব বাঙালি পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে ত্রিপুরায় এসে বসবাস করছে তাদের 'বিদেশি' হিসাবে গণ্য করে বহিষ্কার করতে হবে। এই দাবির সমর্থনে যুব সমিতি ১ লা জুন থেকে সপ্তাহকাল ব্যাপী 'বাজার বয়কট' আন্দোলনের ডাক দেয়। আন্দোলন শুরু হতেই রাজ্যের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। থালছড়া, অম্পি এবং গুলিরায় বাজারে তিনজন বাঙালি নিহত হয়। ৬ ই জুন আগরতলা শহর থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরে লেম্বুছড়া বাজারে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতিগত দাঙ্গা শুরু হয়।

১৯৮০ সালের এই দাঙ্গা ত্রিপুরার ইতিহাসের সব থেকে কলঙ্কময় অধ্যায়। রাজ্য সরকার কর্তৃক দীনেশ সিং কমিটির কাছে প্রদত্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় বাঙালি ও উপজাতি উভয় জনগোষ্ঠী মিলে প্রায় দেড় হাজার মানুষ নৃশংস ভাবে নিহত হয়েছিল। তিন লক্ষাধিক বাস্তুহারা মানুষ সরকারি আশ্রয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। হাজার হাজার ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সম্পত্তি ধ্বংসের পরিমাণ মোট ২০,৯১,৬৩,০১৪ টাকা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বয়া অনুযায়ী "এইরূপ পূর্ব পরিকল্পিত গণহত্যা ভারতে ইতিপূর্বে ঘটেনি।" দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার এক পক্ষকালের মধ্যেই রাজ্য সরকার উদ্বেগজনক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেকটাই সফল হয়। উপরন্তু জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশ করতে কেন্দ্রীয় সরকার সাংসদ ও প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী দীনেশ সিংকে চেয়ারম্যান করে সাত সদস্যের একটি কমিটি নিয়োগ করে। কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে ত্রিপুরার প্রাক্তন মহারাজা শ্রীকিরিট বিক্রমকিশোর দেববর্মণ সদস্য হিসেবে ছিলেন। রাজ্যের জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিগণের বক্তব্য শোনার পর কমিটি যে রিপোর্ট দেন তার সারমর্ম ছিল এইরূপ ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপজাতি ও অ-উপজাতিদের মধ্য ক্রমবর্ধমান ফারাক (Widening gap) দাঙ্গা সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল তাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর।

এই বিষয়ে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল দীনেশ সিং কমিটির মূল্যবান সুপারিশগুলি রাজ্য সরকার অথবা রাজ্যের কোন রাজনৈতিক দল বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে কোনরূপ উদ্যোগ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। তবে এ কথাও সত্য বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিক এবং বিরামহীন প্রচেষ্টার কারণেই বছর খানেকের মধ্যেই রাজ্যে মোটামুটি স্বাভাবিক

অবস্থা ফিরে আসে। যে দাঙ্গার কারণে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন স্থগিত হয়ে গিয়েছিল, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতেই সেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগ ছিল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেন না উপজাতিদের মধ্যে আস্থার মনোভাবের জন্য এই পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত জরুরি। উল্লেখ্য, স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের প্রতি বিরোধিতার কারণ হিসেবে কংগ্রেস এই নির্বাচন বয়কট করে।

১৯৮২ সালের গুরুত্বপূর্ণ স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এক বৎসরের ব্যবধানের মধ্যে ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচন(১৯৮৩) অনুষ্ঠিত হয় তাতেও বামফ্রন্টই পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসে। ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসের লক্ষণীয় দিক হল ত্রিপুরার উপজাতি সম্প্রদায় যেহেতু মোট জনগোষ্ঠীর এক তৃতীয়াংশ,সেই কারণে এই বিরাট জনগোষ্ঠীর সমর্থন ছাড়া কোনও দলের পক্ষেই ক্ষমতা দখল করা অসম্ভব। এই অভাব পূরণের জন্য কংগ্রেসের প্রয়োজন ছিল উপজাতি যুব সমিতির সমর্থন। সহজ গাণিতিক হিসেব অনুযায়ী যেহেতু কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতি উভয় দলই রাজনৈতিকভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী, সেই কারণে কমিউনিস্ট বিরোধী অবস্থান থেকে দু-দলেরই মেলবন্ধন ছিল সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক। রাজনৈতিক ঘটনার চমৎকারিত্ব হল ১৯৮৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী নিজে উদ্যোগী হন নির্বাচনী লড়াইতে কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতিকে এক জোটে টেনে আনার জন্য। ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তপসিল চালু করার দাবি নেওয়া ছাড়া গত্যন্তরে ছিল না। ১৯৮৪ সালে সংসদে ৪৯ তম সংবিধান সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার পর ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তপশিল চালু হওয়ার পথে আর কোন বাধা রইল না। ১৯৮৮সালের ২ফেব্রুয়ারিতে বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস এবং সহযোগী উপজাতি যুবসমিতি মন্ত্রীসভা গঠন করে। উল্লেখ্য যে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব পরিকল্পিতভাবে মহারাজ বীরবিক্রমের ঘোষিত ট্রাইবেল রিজার্ভ আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকর করা থেকে বিরত থেকে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। ফলে উপজাতি জনগোষ্ঠী নিজ মাতৃভূমিতে নিদারুণ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতায় কোণঠাসা হয়ে তাদের জাতীয় জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে।

আশির জাতিগত দাঙ্গা, কিন্তু আচমকা ঘটেনি। সত্তরের দশকে অনেক

উপজাতি ছাত্র বহির্রাজ্যে বিশেষ করে শিলংয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে শুরু করে।* শিলং ফেরত বিজয় রাংখলের প্রতি নয়া প্রজন্মের কিছু সংখ্যক মিশনারি প্রভাবিত যুবক যুবতিরা আকৃষ্ট হয়। বিজয় রংখল স্বল্প কালের ব্যবধানে উপজাতি যুবসমিতির প্রধান সারির অন্যতম নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পান। ১৯৭৮ সালের ২১ শে ডিসেম্বর তিনি দলের স্বেচ্ছাসেবক এবং ত্রিপুর সেনার বাছাই করা সদস্যদের নিয়ে ত্রিপুরা ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স (টি.এন.ভি) নামে একটি গোপন সংগঠন তৈরি করেন। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালিয়ে ত্রিপুরাকে বাঙালি মুক্ত একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করা। উল্লেখ্য, ওই সময়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরামে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এম.এন.এফ)বিদ্রোহীরা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। এম.এন.এফ্-এর সঙ্গো টি.এন.ভি-এর গোপন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তারা সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে গোপন ঘাটিতে টি.এন.ভি জঙ্গিদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেবার দায়িত্ব নিয়ে একের পর এক আক্রমণ সংঘটিত করতে থাকে। কোন কোন সময় এম. এন.এফ. জঙ্গিরাও যুগ্মভাবে আক্রমণে অংশ নেয়। টি.এন.ভি-র ঘটনা প্রকাশ্যে চলে আসার পর ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী তাদের সঙ্গো সমঝোতা করেন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ সালে। কিন্তু চার মাসের মধ্যেই ৬ জুন, ১৯৮০ তে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গো ১৯৮০ সালের ২৪ শে জুন আগরতলায় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেয়া বিজয় রাংখলের স্বীকারোক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন : "১৯৮০ সালের ৪ঠা জুন দুপুরে কল্যাণপুর থেকে দুসকী বাজার বয়কট করতে যাই। বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত আমি শ্রীহাকিম দেববর্মার বাড়িতে থাকি। যুব সমিতির খোয়াই বিভাগীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীকর্ণ সিং জমাতিয়া এবং ত্রিপুরা সেনার খোয়াই-এর মেজর জেনারেল সমর দেববর্মা সেখানে আমার সঙ্গো দেখা করতে আসেন। একই সময়ে চুনী কলই সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাকে বলেন:"সদরের কোন একটি স্থানে আমরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। আমাদের বাধা দেবেন না। আমরা ছাত্ররা এবং ত্রিপুর সেনারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত"* অথচ মজার ব্যাপার হল আশির জাতিগত দাঙ্গায় জড়িত থাকার ফলে বিজয় রাংখল সহ উপজাতি যুব সমিতির নেতৃস্থানীয় অনেকেই জেলে আটক ছিলেন। জামিনে মুক্ত হয়ে রাংখল জনসমক্ষে বোঝাতে চাইলেন তিনি সন্ত্রাসবাদের পথে যেতে অনিচ্ছুক। সেই সময় তিনি ব্যাবসা বাণিজ্য শুরু করেন। কিছুকাল পর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করেন এবং

টি.এন.ভি-র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, রাংখলের অনুপস্থিতিতে টি.এন.ভি.তে নেতৃত্বের বিরোধ উপস্থিত হলে বিনন্দ জমাতিয়া মূল সংগঠন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অল ত্রিপুরা পিপলস লিবারেশন অর্গানাইজেশন (এ.টি.পি.এল.ও) নামে দিয়ে একটি স্বতন্ত্র বৈরী সংগঠন সৃষ্টি করে এবং স্বল্পকালের মধ্যেই রাজ্য সরকারের সঙ্গো বোঝাপড়ার মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করেন ও আকাশবাণীর সামনে নিজের ভুল স্বীকার করে জনগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং উপজাতিদের মূলস্রোতে আসার জন্য আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৫৮ জন টি.এন.ভি.যুবক আত্মসমর্পণ করেন।

মজার ব্যাপার হল ১৯৯৮ সালের বিধানসভার নির্বাচন যতই নিকটবর্তী হচ্ছিল টি.এন.ভি-র সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ওই সময়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নির্বাচনী প্রচারে প্রকাশ্য জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী ও উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবকে টি.এন.ভি-র জন্মদাতা বলে আক্রমণ করেন। নির্বাচন শুরু হওয়ার (বাহাত্তর ঘন্টা) আগে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরাকে উপদ্রুত রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করে সেনাবাহিনী নামিয়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্বাচনের প্রাক্কালে ত্রিপুরায় আসেন। লক্ষ্য উচ্চপদস্থ আমলাদের সাহায্যে প্রশাসনকে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। কিন্তু তবুও ভোটের ফলাফল নিয়ে নিশ্চিত হতে না পারায় আগরতলা ভোট গণনা কেন্দ্রে কারচুপির আশ্রয় নিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রহসনে পরিণত করেন। কংগ্রেস-উপজাতি জোট বিজয়ী হয় কিন্তু ব্যবধান ছিল মাত্র তিন সদস্যের।

কংগ্রেস-যুবসমিতি জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই টি.এন.ভি. আত্মসর্পণে সম্মত হয় এবং ১৯৮৮ সালের ১২ আগস্ট-এ কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের সঙ্গো এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির নেপথ্য রাজনৈতিক পটভূমিকা উল্লেখযোগ্য মনে করি। নির্বাচনের বেশ কিছুকাল আগে থেকেই মিজোরামের কংগ্রেস নেতা লালথানহাওলার মাধ্যমে টি.এন.ভি সভাপতি বিজয় রাঙ্খল এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিং-এর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। * এই যোগাযোগ অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল। ১৯৮৭ সালের ২৭শে অক্টোবর বিজয় রাঙ্খল মিজোরামের কংগ্রেস

নেতা লালথান-হাওলার মারফতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, ''জাতীয় এবং বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের একসঙ্গে বসা দরকার এবং আমাদের সমস্যা সমাধান করা দরকার। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে লিখিত উত্তর পেতে চাই.....কোনও আলোচনা শুরু করার আগে আপনাকে দুটি শর্ত মেনে নিতে হবে। প্রথমত, সি.পি.আই.(এম) পরিচালিত ত্রিপুরা সরকারকে ভেঙে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, উভয়দিকে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে হবে। ''৬ ই ডিসেম্বর লালথানহাওলা বিজয় রাঙ্খলকে যে চিঠিখানা দিয়েছিলেন সেটিও ছিল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। চিঠিতে তিনি জানালেন : ''আপনার চিঠি পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে দিল্লিতে ছুটে যাই এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৮৭ সালের ২৮ শে নভেম্বর আমরা একসঙ্গে ত্রিপুরা যাই এবং ত্রিপুরা থেকে ফিরি। আমি আগেই বলেছি, নয়াদিল্লি ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে থেকে কোনো সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষপাতী। তবে তার জন্য দরকার পরস্পরের উপর আস্থা ও বিশ্বাস এবং আপসে মনোভাব। যা হোক, নয়াদিল্লির পক্ষে এখনি কোনো উদ্যোগ নেয়া সম্ভব নয়। কারণ ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসার নির্বাচন হবে ঘোষিত হয়েছে। তাই নয়াদিল্লির হাতে সময় এখন খুবই কম। আরও বড় কথা হল আমাদের পার্টি ত্রিপুরায় এখন ক্ষমতায় নেই। তার জন্যেই কেন্দ্রের পক্ষে আরো বেশি অসুবিধা। কাজেই কেন্দ্র মনে করছে, নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপোস-আলোচনা শুরু করার মত আবহাওয়া এটা নয়। তবে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, শ্রীরাজীব গান্ধী এবং শ্রীবুটা সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করে যা বুঝতে পারলাম তাতে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য তারা আগ্রহী। নির্বাচনের পরেই সে আলোচনার উদ্যোগ তাঁরা নেবেন, আমরা সরকারে আসি বা না আসি''।

কংগ্রেস-যুবসমিতির জোটসরকারের আমলে সকলেই আশা করেছিল রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ ফিরে আসবে। কিন্তু দু-বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই জন্ম নেয় নতুন নতুন উগ্রবাদী সংগঠন যেমন অল ত্রিপুরা ট্রাইবেলস ফোর্স (এ.টি.টি.এফ), টি.এন.ভি-এর সহ সভাপতি ধনঞ্জয় রিয়াং-এর নেতৃত্বে আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের একটি অংশ আবার জঙ্গল জীবনে ফিরে যায় এবং ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (এন.এল.এফ.টি) নামে বৈরী সংগঠনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বল্পকালের ব্যবধানে

ক্ষমতা দ্বন্দ্বে পরাজিত ধনঞ্জয় রিয়াং তাঁর অন্যান্য বৈরী সমর্থকদের নিয়ে ত্রিপুরা রিসারেকশন আর্মি (টি.আর.এ) প্রভৃতি বৈরী সংগঠনের সৃষ্টি হয়। পাঁচ বছর সন্ত্রাস ও দুর্নীতি চালিয়ে যাওয়ার পর কংগ্রেস-যুবসমিতির জোট সরকার ১৯৯৩সালের বিধানসভা নির্বাচনে কঠিন সমস্যায় পড়ে। ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রপতির শাসনাধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কংগ্রেস-যুব সমিতি জোট বিপুল ব্যবধানে হেরে যায়। কংগ্রেস পায় ১০টি আসন এবং যুবসমিতি পায় একটি মাত্র আসন। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বামফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় আসে। ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ার পর এই প্রথম উপজাতি সম্প্রদায়ের শ্রীদশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং যে সমস্ত বিভ্রান্ত উপজাতি যুবকেরা সন্ত্রাসবাদের আত্মঘাতী পথ বেছে নিয়েছিল তিনি তাদের অস্ত্র ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে উপজাতিদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন প্রকল্পে এক গুচ্ছ প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে ধনঞ্জয় রিয়াং সহ টি.আর.এ জঙ্গিরা ১৯৯৭ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করে। উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের ঘটনা। কিন্তু টি.আর.এ-র অবলুপ্তির পরও দুটি উগ্রপন্থী সংগঠন ছিল খুবই শক্তিশালী যেমন এ.টি.এফ যে সংগঠনটির আসামের আলফা এবং মণিপুরের পি.এল.এ-র সঙ্গে গভীর নৈকট্যের সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে এন.এল.এফ.টি-র সঙ্গে নাগা বৈরী সংগঠন এন.এস.সি.এন(আই.এম)ও আসামের বোরো সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। বৈরী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ওরা সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশকে গোপন ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করত এবং ভারত বিরোধী বিভিন্ন বিদেশী এজেন্সি ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্যের হাত সর্বদাই প্রসারিত করতো। এইরূপ কার্যকলাপ সাধারণ উপজাতিরা সহজভাবে মেনে নেয়নি। কারণ এইরূপ কার্যকলাপ একদিকে যেমন অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল, আবার আর্থিক দিক থেকেও উপজাতিরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। বিশেষ করে উগ্রপন্থী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে নিরাপত্তার অভাবে স্কুল শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির ফলে ওই অঞ্চলের অনেক স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া গরিব উপজাতিরা একই কারণে চিকিৎসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছিলেন কারণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডাক্তার-নার্স কর্মস্থলে যেতে অনিচ্ছুক ছিল।

যেহেতু উগ্রপন্থীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল প্রধানত বাঙালি সেই কারণে জাতি-উপজাতি সম্পর্কের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল। এইরূপ কঠিন পরিস্থিতিতে সমস্যার মোকাবিলার কারণে রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েই এ.টি.এফ.এবং এন.এল.এফ.টি. এই দুইটি উগ্রপন্থী সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। রাজ্যের ৪৫টি থানার মধ্যে ১৯টি থানা এলাকাকে 'উপদ্রুত অঞ্চল' বলে ঘোষণা করে এবং ওই সব এলাকার মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলার রক্ষার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় সেনাবাহিনী, আসাম রাইফেলস এবং সি.আর.পি.এফ এর হাতে। ফলে অশান্ত পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮৮ সালে বিধানসভায় মানিক সরকার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার অত্যল্পকালের মধ্যেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হন। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর মানিক সরকার উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের উপর সব থেকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন না। উগ্রপন্থীদের উদ্দেশ্যে কোন শর্ত আরোপ না করেই ঘোষণা করেন, উগ্রপন্থীরা যদি সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনায় বসতে চায়, সেক্ষেত্রেও তিনি ব্যবস্থা করে দিতে প্রস্তুত। এমন কি বিপথগামী উপজাতি যুবকদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের উদ্যোগকেও স্বাগত জানান। বিধানসভার প্রদত্ত ভাষণে তিনি দলীয় সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের জন্য শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষের মধ্যে সহযোগিতার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে সরকারি উদ্যোগে একটি সর্বদলীয় বৈঠকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যেমন ঃ

১. উপজাতিরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন সেগুলি সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ না গ্রহণ করার কারণে উপজাতিদের মধ্যে বঞ্চনার মনোভাব গভীরতর হয়েছে। এই মনোভাব থেকেই কিছু কিছু উপজাতি যুবক অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য অতিদ্রুত দূর না করতে পারলে উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা বাড়তেই থাকবে। সুতরাং উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে এমনভাবে চালু করতে হবে যার ফলে উপজাতি প্রধান অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের গতি উল্লেখজনকভাবে বৃদ্ধি পায়।

২. বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত উপজাতি ভূমি ফেরত দেওয়ার কর্মসূচি ত্বরান্বিত করতে হবে। এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষ

খুবই তীব্র। বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত ভূমি ফেরত দেয়ার আইন প্রণীত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। কিন্তু তারপর চব্বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হলেও এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি যে অসমাপ্ত থেকে গেল তার অন্যতম প্রধান কারণ রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। এরজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল তা হল আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য ভূমি আইনের ষষ্ঠ সংশোধনী পাশ করা। আইনের সুফল উপজাতিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রশাসনিক আন্তরিকতার উপর উদ্যোগী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৪. উপজাতি ভাষা সংস্কৃতি বিকাশের বিষয়টি রাজতন্ত্রের আমল থেকেই উপেক্ষিত ছিল। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৯৭৯ সালে উপজাতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভাষা কক্‌বরক ভাষাকে দ্বিতীয় রাজ্যভাষার মর্যাদা দিয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৬৪ সালে বাংলা ভাষা এবং ১৯৭৯ সাল থেকে ককবরক ভাষা সরকারি হিসেবে স্বীকৃত হলেও সরকারি কাজে এখনও ইংরেজি ভাষারই প্রাধান্য। বর্তমান মন্ত্রীসভাকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিতে বলা হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন প্ররোচনা সত্ত্বেও নতুনভাবে যে জাতিগত দাঙ্গা সৃষ্টি হয় নি, তা থেকে এটাই প্রমাণিত যে, নিষ্ঠা এবং সদিচ্ছার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার উপজাতি এবং অ-উপজাতি, এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য এবং একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। উল্লেখ করা প্রয়োজন অবিভক্ত আসামের বাইরে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যেখানে উপজাতিদের স্বশাসনের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করে ষষ্ঠ তপশিল চালু করা হয়েছে।

আবেদনে সাড়া দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২৬ শে জানুয়ারি, ১৯৯৭ এর আগে পর্যন্ত এবং সরকার ঘোষিত আত্মসমর্পণের সর্বশেষ সময় সীমা অতিক্রান্তের পর ১৯৯৭ এর মে মাস পর্যন্ত বিভিন্ন আত্মসমর্পণকারী বৈরী গোষ্ঠীর নাম এবং মোট আত্মসমর্পণকারীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল।

ক্রমিক নং	আত্মসমর্পণকারী বৈরী গোষ্ঠীর নাম	১৯৯৭,২৬ জানুয়ারীর আগে আত্মসমর্পণকারীর সংখ্যা	১৯৯৭,২৬ জানুয়ারীর পরে আত্মসমর্পণকারীর সংখ্যা	মোট সংখ্যা
১	এ টি টি এফ	১৬৩৫	-	১৬৩৫
২	টাইগার	৯৯৭	৭৩	১০৭০
৩	এন এল এফ টি	১৮৬	১	১৮৭
৪	টি টি এ	৪৬	-	৪৬
৫	টি টি ওয়াই এফ	২২৪	২৬	২৫০
৬	টি আর এ	০৪	১৫০	১৫৪
৭	টি টি ভি এফ	৩৭৪	-	৩৭৪
৮	টি এন এস এফ	১২২	৭৩	১৯৫
৯	এ টি ভি এফ	২৬৫	১৯	২৮৪
১০	টি ইউ এস	২০	-	২০
১১	এস ডি এফটি	১৮	-	১৮
১২	এ টি ভি এ	৫৯	-	৫৯
১৩	টি এল ও	৩৮৩	৭৭	৪৬০
১৪	টি টি এ ও এফ	১৬৫	-	১৬৫
১৫	টি আর এস এফ	৩১	-	৩১
১৬	টি এইচ এস	৬	-	৬
১৭	এ টি এস ও এফ	৭	-	৭
১৮	টি আর এফ	৭	-	৭
১৯	এল টি টি ই	৩০	-	৩০
২০	টি টি এস এফ	৬	-	৬
২১	এ টি ভি এস এফ	৪১	১১	৫২
২২	টি ওয়াই আর	৫৯	-	৫৯
২৩	টি এল আর	৪৬	-	৪৬
২৪	টি এন এ	২৪	-	২৪
		মোট ৪,৭৫৫	মোট ৪৩০	মোট ৫,১৮৫

(উৎস : দৈনিক সংবাদ, ১৫ জুলাই, ১৯৯৭)

উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মূল কারণগুলি চিহ্নিত করা যেতে পারে।

১. অসম-জনবিন্যাস

চল্লিশের দশক থেকেই বার বার পূর্ব বাংলা থেকে বাঙালি হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক কবলে পড়ে ত্রিপুরায় আসতে বাধ্য হয়। ১৯৪২ সালে রায়পুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বহুলোক ভিটেমাটি ছেড়ে ত্রিপুরায় পালিয়ে আসেন। আবার ১৯৪৬ সালে ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক এর প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালি এবং চাঁদপুর থেকে অগণিত মানুষ ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। প্রতিবারেই শরণার্থীদের জন্য রাজন্য-শাসিত ত্রিপুরার দ্বার ছিল উন্মুক্ত। স্বাধীনতার পর সীমাহীন উদ্বাস্তুদের স্রোতে ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্য শোচনীয় চেহারা নেয়। ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,১৩,৪৭০ জন। জনবিন্যাসের চিত্রটি উল্টে যায়। স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৪১সালের সেন্সাসে যেখানে উপজাতি ও অ- উপজাতির জনসংখ্যার অনুপাত ছিল প্রায় অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৫০.০৯ শতাংশ, কিন্তু ১৯৫১ সালে অ-উপজাতি জনসংখ্যার অনুপাত দাঁড়ায় ৬৬.৮৫ শতাংশ। সংখ্যার অনুপাতে পরিচিতি হারিয়ে যাওয়ায় আশঙ্কায় উপজাতি সম্প্রদায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। জন্ম হল উগ্রপন্থার।

২. অপরিকল্পিত পুনর্বাসন ব্যবস্থা

ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর ১৯৪৯, ১৫ অক্টোবর রাজন্য শাসনের পরিবর্তে নতুন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের ত্রাণের ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছিল। কিন্তু আগামী দিনের নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে উপজাতিদের সংরক্ষিত অঞ্চলে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিতিবিরক্ত হয়ে ১৯৫৬ সালের ৩১ শে আগস্ট লোকসভায় ভাষণ দান কালে সাংসদ দশরথ দেব উপজাতিদের বিপন্নতার বিবরণ দিয়ে বলেন: মহারাজার শাসনকালে সম্ভবত ১৯৪৪ সালে ত্রিপুরায় একবার জমির জরিপ হয় এবং ১৯৫০ বর্গ মাইল জমি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত হয়। কিন্তু উপজাতীয় নয় এমন লোকদের পুনর্বাসনের জন্য অথবা অন্য কারণে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অধিকাংশ জমি মুক্ত করা হয়েছে। উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত ১৯৫০ বর্গ মাইল জমি এখন আর সম্পূর্ণভাবে বর্তমানে নেই। উপজাতি জনসাধারণের প্রতি এই

ধরনের ব্যবহার করা হচ্ছে। মোটের উপর অপরিকল্পিত পুনর্বাসন ব্যবস্থা উপজাতিদের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

৩. জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে জমি দখলের তীব্র প্রতিযোগিতা

ত্রিপুরার মিশ্র জনবসতির শতকরা পঁচাশি শতাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। এদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিভিত্তিক। স্বাভাবিক কারণেই জাতি-উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ের কাছে জমির চাহিদা খুব প্রবল। লক্ষণীয় বিষয় হল শরণার্থীদের যারা এখানে এসেছিল তারা কপর্দকশূন্য হলেও এদের সামন্ত-পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। অপরদিকে উপজাতি কৃষকদের আদিম আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে মুক্তি ঘটেনি। ফলে অসম প্রতিযোগিতায় উপজাতি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

৪. সরকারি ব্যর্থতা এবং দুর্নীতি

উল্লেখ করা যেতে পারে তপশিলি উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে ট্রাইবেল কমিশনারের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত যে প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যায় ১৯৭৪-৭৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শূন্য পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল যথাক্রমে ১১,৬৫ এবং ৬টি। ১৯৭৫-৭৬ এবং ১৯৭৭-৭৮ সালে কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। ১৯৭৯-৮০ সালে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবেদনই পাঠানো হয়নি। এমন কি স্বশাসিত জেলাপরিষদ গঠিত হওয়ার পরেও শিক্ষিত উপজাতি সম্প্রদায়ের অভিযোগ, অপর্যাপ্ত অর্থ এবং ক্ষমতার কারণে সর্বাঙ্গীনভাবে উপজাতিদের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। খরচ হচ্ছে কাগজপত্রে। বাস্তবে কিছু নেতা ও কর্মচারীদের মধ্যে ভাগাভাগি হচ্ছে পরিকল্পনার টাকা। ফলে হতাশাগ্রস্ত উপজাতি সমাজ সন্ত্রাসবাদের হিংসাত্মক পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়।

৫. সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক মানসিকতা

সঙ্কীর্ণমুখী রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যই হল জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও জীবন সম্পর্কে মানুষের তীব্র ঔদাসীন্য এবং সচেতনতার অভাব। এইরূপ জনগোষ্ঠীর অঙ্গীকার সাধারণত গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতি, কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শের

প্রতি নয়। বলা যেতে পারে ষাটের দশকে উপজাতি সম্প্রদায়ের একটি অংশ ঠিক একই মানসিকতার প্রভাবে শুধু উপজাতির সমস্যা সমাধানের ইচ্ছুক ছিলেন।

৬. উপজাতি সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং নতুন ধনিক শ্রেণির আবির্ভাব

ঐতিহ্যগত উপজাতি অর্থনীতি এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বেশি নয় কিংবা কমও নয় এই ধারণার পরিবর্তে অন্য ধারণা আত্তীকরণের ফলে উপজাতি সমাজে সামন্ত প্রথার উদয় হয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে নতুন ধনিক-সামন্ত শ্রেণি। এদের মধ্যে রয়েছে আমলা, জোতদার, ব্যবসায়ী এবং ঠিকাদার প্রভৃতি। সমাজে ওরা বৈষয়িক, বৌদ্ধিক এমন কি নৈতিক ক্ষেত্রেও প্রাধান্য খাটায়। দুর্বল অসহায় দরিদ্র উপজাতি অংশের মানুষ এই ধনিক শ্রেণির দ্বারা শোষিত হচ্ছে। মূলত শোষক শ্রেণির সঙ্গে জাতি-উপজাতির কোনো ভেদাভেদ নেই। এরা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করার জন্য সন্ত্রাসবাদকে জিইয়ে রাখে।

উপরে যেসব কারণে সন্ত্রাসবাদের চিহ্নিতকরণ হল তাতে এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে উপজাতিরা একদিকে যেমন আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার, অন্যদিকে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী প্রচার ও অপপ্রচার দ্বারা ওরা বিভ্রান্ত। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অসম জনবিন্যাস প্রশ্নে সমাধানের সূত্রটি এইরূপ হতে পারে। যেমন: একদিকে উপজাতি জনসমাজকে মেনে নিতে হবে। দেশভাগ ইতিহাসের এক অনিবার্য পরিণাম। অন্যদিকে সীমান্ত বরাবর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে নতুন করে অনুপ্রবেশ না ঘটে। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের ব্যবধান কমাতে শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার প্রস্তাবটি অনুধাবনযোগ্য। তাঁর মতে, ''এ ডি সি যাতে উপজাতিরা সংখ্যালঘুরা না হয় তা নিশ্চিত করতে ইনার লাইন পারমিট বা অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া দরকার''। দ্বিতীয়ত, জাতি ও উপজাতির মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা যাতে না ঘটে সেজন্য ভূমিকেন্দ্রিক জীবিকার পরিবর্তে ব্যাবসা বাণিজ্য এবং কারিগরির ক্ষেত্র প্রসারিত করে উভয় সম্প্রদায়ের যুবকদের সেখানে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া। তৃতীয়ত, বৈরী গোষ্ঠীগুলি, যারা মনে করছে রাজনৈতিক

ক্ষমতালাভের জন্য সন্ত্রাসবাদকে জিইয়ে রাখা প্রয়োজন, তাদের অবশ্যই রাজনীতি ইতিহাসের শিক্ষা নিতে হবে যে, একটি সরকার যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আসে তবে সেই সরকারকে হিংসাত্মক উপায়ে সন্ত্রাস চাপিয়ে দিয়ে কখনো ক্ষমতাচ্যুত করা যায় না। চতুর্থত, জাতি-উপজাতি উভয় অংশের জনগণের এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে, সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করা যায় না। সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন অনুকূল রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবেশ। সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টি হলে স্বাজাত্যবোধের উপসংস্কৃতি কখনোও প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে সমুন্নত বিশ্বসংস্কৃতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চাবিকাঠি। এখানে জাতি-উপজাতির কোনো স্থান নেই। রাজনৈতিক মূল্যবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলে ত্রিপুরায় আসা বাংলাদেশি চাকমাদের ফেরত দেওয়া যাবে, কিন্তু বাঙালিদের ক্ষেত্র হলে ওটা হবে বিতাড়ন। এরূপ মনোভাবের পরিচয় যেমন পাওয়া যাবে না, ঠিক তেমনি, বাঙালিরা উপজাতির শত্রু, এদের তাড়াতে হবে,- এই দৃষ্টিভঙ্গিও সমানভাবে নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হবে। এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরার কিংবদন্তি নেতা দশরথ দেবের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: "দেশভাগ ইতিহাসের এক অনিবার্য পরিণাম। ত্রিপুরায় বাঙালি উদ্বাস্তুদের প্রবেশ সেও এক ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য। ত্রিপুরার শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন বাঙালি অংশের মানুষের সঙ্গে সহবাসের সুযোগ না পেলে আদিবাসীদের চেতনার উন্মেষ বিলম্বিত হত। বাঙালি অংশের মানুষকে তাড়িয়ে দিয়ে, যা বাস্তবে সম্ভবও নয় শুধু উপজাতিদের নিয়ে ত্রিপুরা গড়ার দাবির মধ্যে উপজাতি সমস্যার সমাধান নেই।"

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় ত্রিপুরার রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করতে যে ব্যর্থ তার প্রমাণ জনগণের মধ্যে একদিকে জেনেভায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আই.এন.পি.টি-এর সভাপতি বিজয়কুমার রাঙ্খলের বক্তব্য যদি বিশুদ্ধ উপজাতীয় আন্দোলনের প্রতীক হয়, তাহলে বামফ্রন্টের আমলের শিক্ষামন্ত্রীর হুশিয়ারি-পাহাড়ে হাঙ্গামা হলে সমতলে পাল্টা প্রতিরোধ "উপরাজনৈতিক"-সংস্কৃতির ত্রুটির চরম দৃষ্টান্ত। এইরূপ সঙ্কীর্ণ সংস্কৃতির প্রকাশ জাতি-উপজাতির দীর্ঘদিনের পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য এবং সম্মিলিত আন্দোলন উভয়েরই চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

দশম অধ্যায়

ত্রিপুরার প্রত্নতত্ত্ব

ত্রিপুরার রাজবংশ যে খুবই প্রাচীন এবং মধ্যযুগের পূর্বেও এর অস্তিত্ব ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রাচীন রাজকীয় দলিল-পত্রাদি এবং আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাম্রশাসন থেকে জানা যায় গুপ্তযুগ থেকে আরম্ভ করে মুসলমান আমলের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ নব-জাতির সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ছিল। মহারাজ বৈন্যগুপ্ত, লোকনাথ, বৈদ্যদেব, শ্রীচন্দ,গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রশাসন, দেবখড়গ, মহারানি প্রভাবতী দেবীর শিলালিপি এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। পূর্বোক্ত রাজগণ ত্রিপুরায় প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে নাকি ত্রিপুরা সামন্ত-রাজ্য হিসাবে এদের অধীন ছিল, এ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায়নি। তবে পঞ্চদশ শতকের শেষার্দ্ধে চন্দ্রবংশীয় মাণিক্য রাজগণ যে স্বাধীন নরপতি হিসাবে ত্রিপুরায় শাসনকার্য আরম্ভ করেন তার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ রয়েছে। ইতিহাসের মৌলিক সিদ্ধান্তে আসার জন্য প্রত্ন-উপকরণ থেকে শুরু করে সাহিত্যের অবদান এবং রাজমালার সাহায্যে ত্রিপুরার মধ্যযুগের ইতিহাসের সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হবে না। এ পর্যন্ত যেসব প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে ইতিহাস রচনায় তার মূল্য বড় কম নয়। এদের মধ্যে পাথর, পোড়ামাটি ও ব্রোঞ্জের কারুকার্য, সীলমোহন ও মুদ্রাই প্রধান। এ যুগের প্রত্ন-বস্তুগুলি প্রধানত দক্ষিণ ত্রিপুরার পিলাক, উদয়পুর ও অমরপুর অঞ্চল এবং উত্তর ত্রিপুরার ঊনকোটি উল্লেখযোগ্য। এইসব অঞ্চলে খনন কার্য চালাবার মত স্থান আছে যার বিস্তৃতি খুব কম নয়। তাছাড়া এর আশে পাশে ছড়ানো দেবদেবীর মূর্তির সন্ধানও পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এখানে অনুসন্ধান চালালে ফলপ্রসূভাবে ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসের বেশ কিছু অংশ

নতুনভাবে উদঘাটিত হতে পারে।

পিলাকের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক বুদ্ধ মূর্তি, হিন্দুদেবীর মূর্তি ও পোড়ামাটি শিল্পের নিদর্শন। এখানকার মূর্তিগুলির মধ্যে বিশালাকার অবলোকিতেশ্বর মূর্তির সময়কাল খ্রিস্টীয় নবম শতক বলে অনুমান করা হয়। এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে এই অঞ্চল মহাযান বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। একই অঞ্চলে প্রাপ্ত কয়েকটি হরিকেল নামাঙ্কিত মুদ্রা থেকে মনে হয় এই অঞ্চল বৌদ্ধ হরিকেল রাজবংশের অধীন ছিল। পার্শ্ববর্তী কুমিল্লার ময়নামতী অঞ্চলের বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সঙ্গেও এদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বুদ্ধমূর্তি ছাড়াও এখানে নরসিংহ, মহিষাসুরমর্দিনী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া পোড়ামাটির অলংকরণ, প্রাচীন মৃৎপাত্রের অংশ ও পুরাতন ইটের জোগান দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অভিমত এ সকল বস্তু খ্রিস্টীয় ৭ম থেকে ১১শ-১৩শ শতাব্দীর অন্তর্গত। উল্লেখ্য, প্রাপ্যবস্তুর কিছু কিছু অংশ আগরতলার সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এই বস্তুগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের ময়নামতী বৌদ্ধ বিহারে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সাদৃশ্য দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে পিলাক অঞ্চলেও এক বর্ধিষ্ণু বৌদ্ধধর্মকেন্দ্র ছিল। বালিপাথরে তৈরি বৌদ্ধমূর্তিগুলির বিশালত্বে অনুমান করা যেতে পারে আয়তনে পিলাক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বাংলার মুসলিম রাজত্বের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গ এবং সমতলে বৌদ্ধ ধর্মের বিশাল প্রভাব ছিল সত্য, কিন্তু রাজপৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে ধর্মসংস্কৃতির এতবড় নিদর্শন সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

পিলাকে প্রাপ্ত দেবদেবীর মূর্তিগুলির মধ্যে সূর্যমূর্তির সংখ্যা পাঁচটি। গবেষকদের মতে আবিষ্কৃত মূর্তিগুলির সময়কাল দশম শতাব্দী। পাঁচটি প্রস্তরের সূর্যমূর্তির মধ্যে দুটি মূর্তি বিশাল আকৃতির। এদের একটি প্রোথিত রয়েছে ঠাকুরানি টিলার ওপর। সূর্যের এই প্রস্তর মূর্তিটি উচ্চতায় সাড়ে দশ ফুটের ওপর। সূর্যদেব দুই হস্তে দটি পদ্ম নিয়ে দণ্ডায়মান। মূর্তিটির দেহের কিছুটা অংশ মাটির নীচে প্রোথিত। একই ধরনের আর একটি সূর্যমূর্তি ঠাকুরানি টিলার অদূরে আর একটি টিলাভূমিতে জানু পর্যন্ত প্রোথিত। বুদ্ধমূর্তির পাশাপাশি হিন্দু দেবদেবী এবং সূর্যমূর্তির অস্তিত্ব আপাতবিরোধী মনে হলেও যে অস্বাভাবিক নয় তাঁর কারণ এই অঞ্চল এক সময়

হিন্দুরাজবংশের অধীন ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে বাংলার পাল রাজবংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁদের আমলে হিন্দু দেবদেবী নির্মাণে কোন বাধা ছিল না। সুতরাং অনুমান করা যেতেই পারে বৌদ্ধ রাজবংশের অধীনে পিলাক অঞ্চলে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ অসম্ভব ছিল না।

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে প্রায় ১৮০ কি : মি: দূরে ভাস্কর্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের মতে অন্তত পক্ষে অষ্টম-নবম শতক থেকে ঊনকোটি শিব উপাসনার তীর্থ ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত ছিল। কোটি লিঙ্গ বা দেবতার অবস্থানের কারণে অথবা দেবমূর্তি বহুল সমধিক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলেই বারাণসী কোটি-তীর্থ। অপরদিকে কোটির পূরেই ঊনকোটি। কোটির থেকে এক কম ঊনকোটি। অসংখ্য শৈব-প্রতিমা ও পারিবারিক দেবমূর্তি যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানেই হল ঊনকোটি তীর্থ। জনশ্রুতি এইরূপ কৈলাসপতি শম্ভু একদিন নানা দেবদেবী পরিবৃত হয়ে বারাণসী দর্শনে যাত্রা করেন। তাঁরা যখন ঊনকোটিতে উপস্থিত হন তখন সন্ধ্যা সমাগত। একে সায়ংকাল। তার উপর দীর্ঘ পথশ্রমে দেবদেবীরা পরিশ্রান্ত। স্থির হয়, সে রাত্রিতে ঊনকোটিতে অতিবাহিত করে প্রত্যুষে আবার যাত্রা শুরু করা হবে বারাণসীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যুষে শুধুমাত্র মহাদেবের নিদ্রাভঙ্গ হল। অন্যদের নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে মহাদেব একাই ঊনকোটি স্থান পরিত্যাগ করেন। কাকের কর্কশ রবে প্রভাত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য দেবদেবীরা পাষাণে পরিণত হন। এক মহাদেবের অভাবে কোটি দেবদেবী পূর্ণ না হওয়ার স্থানটি ঊনকোটি নামে পরিচিত হল।

ঊনকোটির সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি উচ্চতায় দেড়শো ফুট। এই শৃঙ্গের উপরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইট পাথর দেখে অনুমান করা স্বাভাবিক, প্রাচীনকালে এই শৈলশৃঙ্গে হয়ত কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব থাকতে পারে। অনুমানের উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধানকারীরা ঊনকোটি সন্নিহিত নুনছাড়া অঞ্চলে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এক ভগ্নশীর্ষ প্রাচীন মন্দির আবিষ্কার করেন। মন্দিরটি আজও বিদ্যমান। মন্দিরের অদূরে জঙ্গলের মধ্যে পরিত্যক্ত শিবলিঙ্গ এককালে হয়ত ওই মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ঊনকোটির পুরাকীর্তি প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে দুই শ্রেনিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। (১) পর্বত গাত্রে খোদিত মূর্তি (২) প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর মূর্তি। খোদিত মূর্তি অসংখ্য এবং বিচিত্র রকমের। সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে অতিকায়

শিব মুন্ড ও গণেশ মূর্তি। সর্বোচ্চ পাযাণ-কুন্ডের পাশ্ববর্তী পর্বত গাত্রে খোদিত শিব যেটি এ অঞ্চলে, ঊনকোটিশ্বর কালভৈরব নামে প্রসিদ্ধ। প্রায় দশ ফুট উঁচু জটামুকুট শোভিত এই মুন্ডের মোট উচ্চতা প্রায় ত্রিশ ফুট। দুই নেত্রে তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গি। ললাটে তৃতীয় নয়ন। কুন্ডলে কর্ণযুগল ভূষিত। এককালে এই মুন্ডের চতুর্দিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্রাকার নরমুণ্ড এবং প্রকৃতি যন্ত্র খোদিত ছিল। নিম্নদেশে স্থানচ্যুত তিনটি সুবৃহৎ বৃষ মূর্তি শায়িত। শিব মুন্ডের দু-দিকে দুই পূর্ণযৌবনা মোহিনী নারী। শিল্পকার্য দেখে মনে হয়-মূর্তি দুটি পরবর্তীকালের সংযোজন। খানা পর্বত গাত্রে সিংহবাহিনী দুর্গা ও একটি নারী মূর্তি খোদিত, যার বাম দিকে ধনুর্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান মুকুট ও কুন্ডল শোভিত আর একটি মূর্তি। এই মূর্তিটির অদূরে আর একটি নারী মূর্তি প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত। কুঞ্চিত জটাজাল প্রলম্বিত এবং কণ্ঠে মণিহার। গঙ্গামূর্তি বলে অভিহিত এই মূর্তির সঠিক পরিচয় নির্ণীত হয়েছে বলে মনে হয় না। নির্ঝরের উপরে রুদ্রাক্ষভূষিত, কুন্ডল পরিহিত শিবমূর্তি। স্কন্ধে ত্রিশূল, ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ। মুকুটের দুই পার্শ্বে শৃঙ্গসদৃশ পিন্ড মূর্তিটির বৈশিষ্ট্য।

কৈলাসহর থেকে ঊনকোটিগামী নতুন পথের প্রান্ত থেকে দেখা যায় সামনের পর্বতগাত্রে খোদিত শিব ও দুর্গার অতিকায় মুণ্ড। দুটিমুণ্ডই ত্রিনয়নবিশিষ্ট ও কুণ্ডল শোভিত।

তৃতীয় পাযাণ কুন্ডের খোদিত 'ত্রিগণেশ' মূর্তিটি গাণপত্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের ইঙ্গিত বহন করছে। এই গণেশ গোষ্ঠিতে একেবারে বামদিকে উপবিষ্ট গণেশ উচ্চতায় প্রায় ২২ ফুট। দক্ষিণ পার্শ্বে দুই অতিকায় গণেশ দণ্ডায়মান। সর্ব দক্ষিণে নানা আয়ুধধারী চতুর্মুখ বিষ্ণু। কর্ণের শঙ্খাবরণ ঊনকোটি গণেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ঊনকোটির ভাস্কর্য সম্ভারের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য অসংখ্য মুণ্ডাকৃতি মূর্তি। মুন্ডের গঠনে আদিবাসীদের মুখাবয়বের ডৌল সুস্পষ্ট। মুণ্ডগুলি কোথাও সারিবদ্ধভাবে আবার কোথাও পৃথকভাবে খোদিত। প্রসঙ্গক্রমে ত্রিপুরার চতুর্দশ মুণ্ডদেবতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্ণাবয়ব মূর্তির পরিবর্তে শুধু মুণ্ডপূজা হিন্দু পূজা পদ্ধতিতে দেখা যায় না। ত্রিপুরা ছাড়া দক্ষিণবঙ্গের ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণবায়ের অনুরূপ মুণ্ড পূজার প্রচলন আছে।

দেবতামুড়ার ভাস্কর্য

উত্তর ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরার মধ্যবর্তী অঞ্চল অমরপুর এবং উদয়পুরে গোমতী নদীর তীরস্থ বড়মুড়া পাহাড়ের অংশটি দেবতামুড়া নামে চিহ্নিত। এই অঞ্চলের পর্বতগাত্রেও বহু দেবদেবীর মূর্তি খোদিত আছে। যেমন, মহিষাসুরমর্দিনী, নন্দীবাহন শিব, নটরাজ, কার্তিক, গণেশ এদের নিয়ে একটি রাজকীয় শোভাযাত্রার মত। মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটি বিশাল আকারের প্রায় পঁয়তাল্লিশ ফুট দীর্ঘ। নির্মাণ শৈলী দেখে মনে হয় এগুলি যোড়শ শতকের পূর্ববর্তী নয়। এই সব মূর্তির পোশাক, গহনা, আকৃতি ইত্যাদিতে ত্রিপুরার আদিবাসী জনজীবনের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকেরা ত্রিপুরায় বিদ্যমান মূর্তিগুলি সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে অষ্টম-নবম শতকে এই পুণ্যক্ষেত্র শৈবতীর্থে পরিণত হয়েছিল। ঊনকোটির বৈশিষ্ট্য হল খোদিত মূর্তির একত্র অপূর্ব সমাবেশ। বহু শতাব্দীর বিভিন্ন ধর্মমতের দ্বন্দ্ব-সংমিশ্রণ-সমন্বয়ে এক দুর্লভ ভাস্কর্যশিল্পের অদ্বিতীয় সংগ্রহশালা। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় ত্রিপুরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত যেখানে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সংস্কৃতি বিশেষ করে বাংলার কৃষ্টির সঙ্গে আরাকান, ব্রহ্মদেশ, প্রভৃতির মিলন ঘটা অসম্ভব নয়। তবে এ কথাও সত্য যে দু-একটি উদাহরণ দিয়ে এ যোগাযোগের প্রকৃতি বা পরিধি নির্ণয় করা দুষ্কর। ত্রিপুরার জম্পুই, ডুম্বুর এলাকায় এবং পশ্চিম ত্রিপুরার আশে পাশে অনুল্লেখ্য পরিমাণ প্রাগৈতিহাসিক পাথুরে অস্ত্রগুলি নিঃসন্দেহে বিক্ষিপ্ত উদাহরণ। বর্তমানে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে ধরনের প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য চালানো হচ্ছে তাতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতেই পারে।

ত্রিপুরাতেও অনুরূপ অনুসন্ধানকার্য প্রচলন হলে বিক্ষিপ্ত পাথুরে প্রমাণগুলি আসাম বা নাগাল্যান্ডে প্রাপ্ত নব্য প্রস্তর যুগে নিদর্শনেরই স্বরূপ হবে। মোটের উপর লক্ষ্যণীয় বিষয় হল ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলের খোদিত বিশাল মূর্তিগুলির এমন কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে যাতে মনে হয় ঊনকোটির শিল্পধারা একান্তই স্থানীয়। ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্গত হলেও এর গঠন শৈলী স্থানীয় লোকায়ত শিল্পের অনুরূপ। আদিম লোকশিল্পকে গবেষকরা কালহীন বলে বর্ণনা করে থাকেন। তবে আদিম লোকশিল্পের পাশাপাশি এমন কিছু হিন্দু দেব দেবীর মূর্তিও পাওয়া গেছে যেগুলির গঠন রীতি বাংলার পাল-সেন যুগের অন্তর্গত। এমন তো হতে

পারে, সেন যুগে বাংলার হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে ধর্মকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সাধারণের মন থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দূর করার জন্য রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচারের জন্য ঊনকোটির পর্বতগাত্রে দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা হয়েছিল এবং একই সঙ্গে তৎকালীন মূর্তিতত্ত্বের কঠোরতা লাঘব করে স্থানীয় লোকায়ত শিল্পের সহায়তা নেওয়া হয়েছিল। ত্রিপুরার ইতিহাস রচনায় ত্রিপুরার প্রাচীন শিল্পসম্ভার যে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তা মোটের উপর অস্বীকার করা যায় না।

ত্রিপুরার লিপি

ত্রিপুরার যে সব লিপি আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে সেগুলো বিশ্লেষণ করে দু-ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক : উৎসর্গ পত্র, দুই : দানপত্র। লিপিগুলি হয় প্রস্তর ফলকে খোদিত অথবা তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ। উৎসর্গীকৃত লিপিগুলি মন্দির নির্মাণ এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে মন্দির গাত্রে অথবা পাথরের ফলকে খোদিত হয়েছে। ব্রাহ্মণদের ভূমি দানের কথা তাম্রপত্রে বর্ণিত। কিছু কিছু তাম্রলিপিতে মুসলমানদের ভূমি দানের বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। লিপিগুলি সংস্কৃত ভাষায় বাংলা হরফে লেখা। রাজমালায় ধর্মমাণিক্যের ১৩৮০ শকাব্দের (১৪৫৮খ্রি:)একটি তাম্রশাসনের কথা উল্লেখ রয়েছে। উক্ত তাম্রশাসনে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে শূন্য-কষ্ট-হর নেত্রৌ অর্থাৎ অঙ্কস্য বামাগতি নিয়ম অনুসারে এর তারিখ হল ১৩৮০ শকাব্দ। সুতরাং সঙ্গত কারণেই ধর্মমাণিক্য বা মহামাণিক্যকে ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।তবে রাজমালায় ভুলবশত ধর্মমাণিক্যকে রত্নমাণিক্যের পিতা না বলে তাঁর প্রপৌত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরিউক্ত তাম্রশাসনে কিন্তু ধর্মমাণিক্যের পিতা মহামাণিক্যের নামের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মহামাণিক্য থেকে যদি মাণিক্য উপাধি বাদ দিলে শুধু 'মহা' বলে রাজার কোন নামের অর্থ হয় না। সম্ভবত মহান বা অতি বড় রাজা বলে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ওই সময় থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজাভাষা সংস্কৃত ও বাংলা।

মধ্যযুগে (১৪৫৮খ্রি:) প্রাপ্ত প্রথম তাম্রলিপিটিতে মহারাজ প্রথম ধর্মমাণিক্যের আমলে ধর্মসাগর নামে একটি নতুন দিঘি খনন উপলক্ষ্যে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের কথা উদ্ধৃত হয়েছে। রাজমালায় এই লিপিটির কথা উল্লেখ থাকলেও বর্তমানে এই লিপিটি পাওয়া যায় না। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য তাম্রলিপি

১৪১০ শকাব্দের অর্থাৎ ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দের। মহারাজা বিজয়মাণিক্যের শ্বশুর ও রাজ্যের সেনাপ্রধান দৈত্যনারায়ণের পত্নী পুণ্যবতীর সমতল ত্রিপুরায় একজন ব্রাহ্মণকে গ্রামদানের বিষয় এই লেখনে উল্লেখ করা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত পাতলা তাম্রফলকের একদিকে লেখনটি লিপিবদ্ধ অন্যদিকে কোন রাজকীয় সিলমোহর নেই। মনে হয় প্রথম বিজয়মাণিক্য মুকুটমাণিক্যের পূর্ববর্তী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রাজমালায় একেই প্রতাপমাণিক্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির গাত্রে পাঁচটি খোদিত লিপি আছে। পূর্বদিকের মন্দিরের গাত্রে খোদিত দুটি লিপিতে বলা হয়েছে যে এই মন্দির ১৫০১ খ্রিস্টাব্দের ধন্যমাণিক্য নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরটি বজ্রাঘাতে এক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং পরে ১৬৮১খ্রিস্টাব্দে কল্যাণমাণিক্যের পৌত্র ও গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রাম মাণিক্য মন্দিরটি সংস্কার সাধন করেন। উত্তর দিকের খোদিত লিপিটি বাংলা ভাষায় লিখিত। এই লিপিতে বলি ভীমনারায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত রত্নমাণিক্যের মাতুল বলি ভীম নারায়ণ মন্দিরটি সংস্কার কার্যে তদারকি করেছিলেন বলে তাঁর নামও খোদিত লিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। দক্ষিণ দিকে খোদিত লিপির মধ্যে একটি বাংলা ভাষায় লিখিত। এই লিপিটিতে ধন্যমাণিক্য, বর্ণগণ, রামমাণিক্য ধর্মরাজ নামগুলির উল্লেখ আছে। অপর লিপিটিতে রানি সুমিত্রা দেবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মন্দিরটি সংস্কার সাধন করেন।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য স্থাপিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুরের নিকটে মহারানি অঞ্চলে। সেখানে বিশাল ধনুকাকৃতি প্রস্তর খণ্ডে তারিখ সম্বলিত প্রস্তরলিপি উদ্ধার করা হয়। উপরোক্ত প্রস্তরলেখ থেকে জানা যায় লক্ষ্মীপুরে নির্মিত এই মন্দিরটি মহারাজা ও মহারানি ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। অনুমান করা হয় তিনজন বিভিন্ন রাজপণ্ডিত ত্রিপুররাজ দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের প্রশস্তি গাথা এতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। পরবর্তীকালে মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের শাসনকালেও কতগুলি উৎসর্গলিপি উদ্ধার করা হয়েছে। এই লিপিগুলির একটি পাওয়া গেছে উদয়পুরের গোপীনাথ মন্দিরের তোরণ দ্বারে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কল্যাণমাণিক্য গোপীনাথের এই মন্দিরটি ১৫৭২ শকাব্দে ১৬৫৮ (খ্রিস্টাব্দ) নির্মাণ করেন।

উদয়পুরে মহাদেব মন্দির গাত্রে খোদিত অনুরূপ একটি উৎসর্গ লিপি থেকে

জানা যায় যে এই মন্দিরটি ধন্যমাণিক্যের আমলে নির্মিত হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে ১৫৭৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে কল্যাণমাণিক্য এই মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। দশ বছর বাদে জগন্নাথ দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে অবস্থিত জগন্নাথ মন্দির নামে পরিচিত মন্দিরটি গোবিন্দমাণিক্যের সহযোগিতায় তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন (১৬৬১খ্রি:)। একই অঞ্চলে মহাদেব বাড়ির অদূরে পূর্ব-রাধাকিশোরপুরের অপর একটি মন্দির গাত্রে গোবিন্দমাণিক্যের মহিষী রানি গুণবতীর একটি উৎসর্গ লিপির সন্ধান পাওয়া যায়। এই লিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে ১৫৫০ শকাব্দের বৈশাখ মাসে(১৬৬৮খ্রি:) রানি গুণবতী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। পাঁচ বৎসর বাদে গোপীনাথ মন্দিরের পশ্চিমদিকে অন্য আর একটি মন্দির গাত্রে খোদিত একটি লিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্যের আমলে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। লিপিতে মন্দিরটি কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার পরিবর্তে পারিজাত হরণের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে মন্দিরটি হয় কৃষ্ণরূপী বিষ্ণু অথবা লক্ষ্মীনারায়ণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত বৈষ্ণব মন্দির। গোপীনাথ মন্দিরের পূর্বদিকে দ্যুতিয়ার বাড়ি নামে পরিচিত দুটি মন্দির আছে। দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের মাতুল বলি ভীমনারায়ণের দ্বিতীয় পত্নী দ্যুতিয়াদেবী এই মন্দিরগুলি সম্ভবত নির্মাণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। এ দুটির মধ্যে মন্দিরগাত্রে খোদিত একটি লিপি এতটাই অস্পষ্ট যে কোন কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে ডঃ সরকারের মতে এই লিপিটির সময়কাল ১৬২১ শকাব্দ বা ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দ। উল্লেখ্য সমসাময়িককালে বিশেষ করে কল্যাণমাণিক্য এবং গোবিন্দমাণিক্যের বেশ কতগুলি তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। উৎকীর্ণ লিপিগুলি ভূমিদান সংক্রান্ত সনদ, যেমন ব্রহ্মোত্তর সনদ ও আয়মা সনদ। ব্রহ্মোত্তর সনদগুলি ব্রাহ্মণদের এবং আয়মা সনদগুলি মুসলমানদের প্রদান করা হয়েছিল। উল্লেখ্য কল্যাণমাণিক্যের কিছু সংখ্যক উভয় প্রকার সনদ গোবিন্দমাণিক্যের দ্বারা নবীকরণ করা হয়। এই সব সনদগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গোবিন্দমাণিক্যের একটি ব্রহ্মোত্তর সনদ, যেটিতে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের পুরোহিতকে বিশ দ্রোণ নিষ্কর জমি দান করা হল। স্বল্পকালের ব্যবধানে ধাতুনির্মিত একটি সিংহাসনে খোদিত দুটি শ্লোক আছে। বাংলা হরফে সংস্কৃত ভাষায়। শ্লোক দুটিতে বলা হয়েছে যে ১৫৭১ হর্ষে

(১৬৪০ খ্রিঃ) হিমালয় কন্যা দেবী গিরিজার উদ্দেশ্যে গোবিন্দমাণিক্য এই সিংহাসনটি উৎসর্গ করেছিলেন। বর্তমানে এই সিংহাসনটি চতুর্দশ দেবতার পূজায় একটি বিশেষ অঙ্গ।

ত্রিপুরার মুদ্রা

ত্রিপুরারাজ্যের মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে রাজমালার শিলালেখ ও মুদ্রাই প্রধান। রাজমালার বেশ কিছু তথ্য পরস্পর বিরোধী এবং একদেশদর্শী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাজামালার উল্লিখিত রত্ন ফা-এর সমসাময়িক ও তাঁর তথাকথিত পৃষ্ঠপোষক ও তাঁকে 'মাণিক্য' উপাধি প্রদানকারী বাংলার সুলতান যে ঠিক কে ছিলেন তা এতদিন অনুমানের বিষয় ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সংগৃহীত রত্নমাণিক্যের একটি মুদ্রায় স্পষ্টভাবে প্রকাশকালের উল্লেখ পাওয়ায় এই প্রশ্নের সমাধান সম্ভব হয়েছে। তিনি ১৩৮৬ শকে বা ১৪৬৪ খ্রিস্টাব্দে উপরোক্ত মুদ্রাটি নির্মাণ করেন। এই মাপকাঠিতে তাঁর সমসাময়িক সুলতান শুধু হতে পারেন মাহমুদ শাহের পুত্র রুকনুদ্দীন বারবক শাহই (১৪৫৫-১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে) হতে পারেন। এই মহামূল্যবান মুদ্রাটিই আবার রাজামালায় প্রা রত্নফা ও তাঁর পরবর্তী ছয়জন ত্রিপুরারাজের নিম্নলিখিত আনুপৌর্বিকতাকে কাল্পনিক বলে প্রতিপন্ন করেছে। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রত্নের মুদ্রায় যখন ১৩৮৬, ১৩৮৮, ও ১৩৮৯ শকের তারিখ পাওয়া যাচ্ছে তখন তারই তথাকথিত পৌত্র মহামাণিক্যের ও পৌত্র ধন্যমাণিক্যের প্রাথমিক মুদ্রাগুলিতে '১৪৪২ শকের' তারিখ পাওয়া যায়। রাজমালার কথা সত্য হলে বলতে হবে যে ১৩৮৯ হতে ১৪৪২ শকাব্দের মধ্যে রত্নের পরে ও ধন্যের আগে মাত্র ২৩ বৎসরে চার পুরুষ পরম্পরায় পাঁচজন রাজা ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। এই বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য নহে। আবার রাজমালাতেই মহামাণিক্যের পুত্র ধর্মমাণিক্য-এর ১৩৮০ শকের একটি তাম্রলেখের উল্লেখ আছে। এই বক্তব্য সত্য হলে মহামাণিক্য ও তৎপুত্র ধর্মমাণিক্য রত্নের পূর্ববর্তী রাজা ছিলেন ধরে নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, "লন্ডনস্থ, মুকুটমাণিক্য ধন্যের অব্যবহিত পূর্বে ১৪১১ শকে সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। মুকুটের পক্ষে ধন্যের প্রপিতামহ হওয়া সম্ভব নহে"। মোটের উপর ইতিহাসজ্ঞ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মূল্যবান বিশ্লেষণ অনুযায়ী অন্যরূপ তথ্য ও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত রাজমালায় বর্ণিত ত্রিপুরার প্রথম সাতজন রাজার আনুপৌর্বিকতা নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করা যেতে পারে।

যেমন প্রথম ঐতিহাসিক রাজা মহামাণিক্য। রাজমালায় বর্ণিত আছে যে ত্রিপুরার পরবর্তী ৯৩ জন রাজার পরে রাজত্বকারী ছেংথুম্ ফা কোনো এক গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করেন। সেই গৌড়েশ্বর সমসাময়িক কোনো বাংলার সুলতানই হবেন। মনে হয়, এই ছেংথুম্ ফাই ত্রিপুরার প্রথম ঐতিহাসিক রাজা এবং তিনিই সর্বপ্রথম মাণিক্য উপাধি ধারণ করেন। পরবর্তীকালে 'মহামাণিক্য' বলে খ্যাত হন। মহামাণিক্য সম্ভবত কোন ব্যক্তিগত নাম নয়। কারণ 'মাণিক্য' অংশটুকু বাদ দিলে যে 'মহা' শব্দটি থাকে সেটি কাহারও নাম হতে পারে না।

উল্লেখ্য, রাজমালায় ছেংথুমের প্রপৌত্র ডাঙ্গর ফার কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত তিনি ছেংথুমের পুত্র ছিলেন, প্রপৌত্র নন। ইতিহাসবিদ্‌দের বিশ্বাস এই দ্বিতীয় বিশিষ্ট রাজা ডাঙ্গর ফারই হিন্দু নাম ধর্মমাণিক্য। তাম্রলিপি এবং মুদ্রার প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় রত্নমাণিক্যের ঠিক পূর্বেই ছিলেন ধর্মমাণিক্য। সুতরাং ডাঙ্গর ফা ও ধর্মমাণিক্য অভিন্ন হওয়াই সম্ভব। (ধর্মমাণিক্যের আমলে তাম্রলেখ-শক ১৩৮০)। ধর্মমাণিক্যের ঠিক পরেই পরবর্তী রাজা ছিলেন রত্ন ফা বা রত্নমাণিক্য। রত্নমাণিক্য ১৩৮৬ শকে প্রথম তারিখ যুক্ত মুদ্রা প্রচলন করলেও ঐ সময়ের অন্তত দু-তিন বৎসর পূর্বেই যে সিংহাসনে বসেন তার কয়েকপ্রকার তারিখবিহীন মুদ্রাই তার সাক্ষ্য দেয়। মুদ্রাগুলির উভয় পার্শ্বে লেখনযুক্ত মুদ্রা (১)(মুখ্যদিকে) শ্রীনারায়ণচরণপর ঃ (গৌণদিকে) শ্রীশ্রীরত্নমাণিক্যদেব ঃ, (২) (মুখ্যদিকে)শ্রীশ্রীরত্নমাণিক্যদেবঃ (গৌণদিকে) সিংহমূর্তি ও তাহার নীচে শ্রীদুর্গা, (৩) (মুখ্যদিকে) শ্রীনারায়ণচরণ পরঃ শ্রীশ্রীরত্নমাণিক্যদেব ঃ (গৌণদিকে) সিংহমূর্তি ও তাহার নীচে শ্রীদুর্গা, (৪)মুখ্য দিকের লেখন দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রার মত, কিন্তু গৌণদিকে শুধু সিংহের অবয়ব আছে।

রাজমালার কাহিনি অনুযায়ী ডাঙ্গর ফার অষ্টাদশতম পুত্র ছিলেন রত্নফা। তিনি বেশ কিছুদিন তদানীন্তন বাংলার সুলতানের দরবারে থেকে তাঁরই সাহায্যে পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতাদের পরাজিত করে ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ করেন। সুলতানকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রত্ন ফা একটি মহামূল্য 'মাণিক' উপহার দেন। মাণিক উপহার পাওয়ার পরে গৌড়েশ্বর রত্নফাকে ত্রিপুরা রাজগণের পরিচয় সূচক ''মাণিক্য'' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই কাহিনি কিংবদন্তি মাত্র। কেননা, এই কাহিনির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বাংলা রাজমালায় মাণিক্য উপাধি প্রদানকারীকে 'গৌড়েশ্বর' বলা

হয়েছে। অপর দিকে সংস্কৃত রাজমালায় মাণিক্য উপাধি প্রদানকারীকে দিল্লিশ্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যাই হোক রত্নমাণিক্যের আমলে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি পরীক্ষা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে একটি উপজাতির অধীশ্বর রত্ন ফা শাক্তদেবী দুর্গা ও নারায়ণ বা বিষ্ণুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেন। তিনি প্রাথমিক একপ্রকার তারিখ ও চিত্রণহীন মুদ্রায় 'শ্রীনারায়ণ-চরণপরঃ'একথা লেখেন।পরবর্তী সময়ে মুদ্রাগুলির একদিকে রত্নমাণিক্য নিজের নাম ও অপর দিকে দুর্গার বাহন সিংহের মূর্তি ও শ্রীদুর্গা এই লেখন অঙ্কিত করেন। ১৩৮৬ এবং ১৩৮৮ শকের মুদ্রাগুলিতে দুর্গা ও বিষ্ণু উভয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। রত্নমাণিক্যের ১৩৮৯ শকে প্রাপ্ত মুদ্রা সিংহমূর্তিবিহীন কিন্তু বিচিত্র লেখন যুক্ত ইহারমুখ্যওগৌণদিকে যথাক্রমে 'পার্বতী-পরমেশ্বর-চরণপরৌ এবং'শ্রীলক্ষ্মীমহাদেবী শ্রীশ্রীরত্নমাণিক্যদেব' লেখা থাকে। এই মুদ্রা রাজমালায় অনুল্লেখিত রত্নের মহিষী লক্ষ্মীর নামই শুধু ঘোষণা করছে না, উপরন্তু তাঁকে নামেরও পূর্বে স্থান দেওয়া হয়েছে।

রত্নমাণিক্য-এর রাজত্বকাল নির্ণয় করা কঠিন। রাজমালার মতে রত্নের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম প্রতাপমাণিক্য রাজা হন। তিনি অত্যাচারী ও অধার্মিক ছিলেন। তার বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। গভীর রাত্রে দশজন সেনাপতি অতি সংগোপনে প্রতাপ মাণিক্যকে নিহত করে। প্রতাপ মাণিক্য কতদিন সিংহাসনে বসেছিলেন তার কোনো শিলালেখ ও মুদ্রাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না। প্রতাপের পর সেনাপতিরা তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুটমাণিক্যকে সিংহাসনে বসান। মুকুটমাণিক্যের আমলে প্রাপ্ত মুদ্রাটির বিবরণ এইরূপঃ

মুখ্যদিক ঃ (লেখণ) ''শ্রীম [-] মহাদেবী শ্রীশ্রীমুকুট মাণিকৌ'' গৌণদিকঃ (চিত্রণ) গরুড় মূর্তি;(গরুড়ের চারিদিকে বৃত্তাকারে লেখন)''নরনারায়ণে শ্রীশ্রীমুকুট মাণিক্যদেব ঃ ১৪১১ শক''।

প্রশ্ন হল ১৪১১ শকের এই অনন্য ও অজ্ঞাতপূর্ব মুদ্রাটি যদি তাঁর রাজ্যাভিষেকের সময় মুদ্রিত হয়ে থাকে, তবে বলতে হবে যে তাঁর রাজ্যকাল ছিল অত্যন্ত সীমিত। কারণ ১৪১১ শকের তারিখযুক্ত ধন্যমাণিক্যের মুদ্রা ঠিক পর বৎসরেই মুকুটের রাজত্বের সমাপ্তি ও ধন্যমাণিক্যের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা ঘোষণা করে।

পরবর্তী রাজা ধন্যমাণিক্যেরও কতগুলি মুদ্রা পাওয়া গেছে। মুদ্রাগুলি

রত্নমাণিক্যের মুদ্রার অনুরূপ সিংহ মূর্তি সমন্বিত। তবে ধন্যমাণিক্যের কোনো কোনো মুদ্রায় বিকল্প হিসাবে ত্রিপুরেন্দ্র কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনো কোনো মুদ্রায় ''বিজয়ীন্দ্র'' শব্দটির উল্লেখ আছে। তাঁর ১৪৩৬ শকাব্দের মুদ্রাগুলি চাটিগ্রাম বিজয়ের স্মারক মুদ্রা হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। এর মুখ্য দিকে,লেখা আছে 'চাটিগ্রাম বিজয়ী শ্রীধন্যমাণিক্য শ্রীকমলাদেব্যৌ'।

মোটের উপর, 'রাজমালা', 'ত্রিপুরবংশাবলী' এবং মুদ্রায় প্রাপ্ত তথ্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করে ধন্যমাণিক্যের রাজ্যাবসান কাল থেকে বিজয়মাণিক্যের অভিষেক কাল পর্যন্ত ত্রিপুরা ইতিহাসের একটি খসড়া রচনা করা অসম্ভব নয়। মনে হয়, ১৪৩৭ শকে শেষবার চাটিগ্রাম জয়ের পরই ধন্যমাণিক স্বর্গারোহণ করেন। সম্ভবত ধন্যমাণিক্যের পর অখ্যাত ধ্বজমাণিক্য ১৪৪২ শক পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তারপর আসেন দেবমাণিক্য। তিনি ১৪৫২ শকাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁকে হত্যার পর তাঁর শিশুপুত্র ইন্দ্রমাণিক্যকে সিংহাসনে বসানো হয় এবং অচিরেই এই ভাগ্যহীন রাজপুত্রকে হত্যা করে তাঁর স্থলে তাঁর বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠপুত্র প্রথম বিজয়মাণিক্যকে ১৪৫৪ শকে বা তার কিছু পূর্বে রাজা করা হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন বিজয়মাণিক্য ১৪৫০ থেকে ১৪৯২ শকাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু এই তারিখ দুটির কোনটিই বিজয়ের রাজত্ব কালের মধ্যে পড়ে না। ১৪৫৪ শকের তাঁর প্রাথমিক মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওই বৎসর বা তার কিছু পূর্বে বিজয়মাণিক্য এবং অভিষিক্ত হন এবং ১৪৮৫ ও ১৪৮৬ শকাব্দে মুদ্রিত তাঁর ও তাঁর পুত্র অনন্তমাণিক্যের মুদ্রাগুলি থেকে জানা যায় যে ১৪৮৫ বা ১৪৮৬ শকে বিজয়মাণিক্যের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিজয়মাণিক্যের মুদ্রাগুলি নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এই মুদ্রাগুলিতে চারটি বিচিত্র বিরুদ ও চারজন মহিষীর নাম পাওয়া যায়। চার প্রকার মুদ্রায় তাঁকে কুমুদীদর্শী, প্রতিসিন্ধসীম, ত্রিপুরমহেশ ও বিশ্বেশ্বর বলা হয়েছে। এগুলির লেখনে যথাক্রমে বিজয়া লক্ষ্মী, সরস্বতী ও বাক্‌দেবীর নাম আছে। বিজয়মাণিক্যের তিনপ্রকার স্মারক-মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথমটি সুবর্ণগ্রাম জয়ের পর ব্রহ্মপুত্রতীরে অবস্থিত ধ্বজঘাট স্নানের, দ্বিতীয়টি ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী লক্ষ্যস্নানের এবং তৃতীয়টি পদ্মাবতী স্নানের স্মরণে মুদ্রিত হয়। বিজয়মাণিক্যের মুদ্রায় মূর্তির বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। লক্ষ্যস্নানের স্মারক মুদ্রায় শিবলিঙ্গ ও সিংহাসনে

স্থাপিত গরুড়বাহিত বিষ্ণুর মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। কোনো কোনো মুদ্রায় ষাঁড়ের উপর উপবিষ্ট চতুর্ভুজ শিব এক অংশে এবং অপর অংশে সিংহের উপর উপবিষ্ট দশভূজা দুর্গার মূর্তি অঙ্কিত আছে। পরবর্তী সময়ে যশোধরমাণিক্যের মুদ্রায় গোপীসহ বংশীবাদক কৃষ্ণের মূর্তি একদিকে এবং অন্যদিকে সিংহ ও ত্রিশূল অঙ্কিত। মুদ্রায় উভয় দিকে রাজার নানা উল্লেখ আছে।

যশোধরমাণিক্যের ১৫২২ শকে নির্মিত তিন প্রকার মুদ্রায় 'ত্রিপুরা সিংহের' উপর বংশীবাদক কৃষ্ণের মূর্তি'' অঙ্কিত আছে। এদের একটিতে কৃষ্ণের পার্শ্বে শুধুমাত্র একজন এবং অন্যগুলিতে দুজন গোপিনির মূর্তি দেখা যায়। মুদ্রণের তারিখ, রাজার নাম ও রানির নাম লিখিত থাকায় ত্রিপুরার মুদ্রাগুলি ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। এগুলি বহু ক্ষেত্রে রাজমালার বর্ণিত তথ্যই যে শুধু সমর্থন করে তা নয়; রাজমালায় নাই এমন নূতন তথ্যও এই মুদ্রার লেখনে উদ্‌ঘাটিত হয়। এই মুদ্রাগুলি কখনও কখনও রাজামালার কোনো কোনো উক্তিকে সংশোধন না ভুল বলে প্রতিপন্ন করেছে। কল্যাণমাণিক্যের (১৫৪৮ শক) শকাব্দযুক্ত অর্ধ ও এক চতুর্থাংশ মুদ্রা পাওয়া গেছে। কল্যাণমাণিক্যের মুদ্রায় শিবলিঙ্গ খোদিত ছিল। ১৫৮২ শকাব্দে বা কিছু পূর্বে কল্যাণ মাণিক্যের মৃত্যুর পর ঐ বৎসরেই তাঁর পুত্র গোবিন্দমাণিক্য মুদ্রা নির্মাণ করেন। গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্ব নিরঙ্কুশ ছিল না। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্ররায় সাময়িকভাবে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজা হন এবং ছত্রমাণিক্য নাম ধারণ করে ১৫৮৩ শকে তারিখ সম্বলিত মুদ্রা নির্মাণ করেন। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য যে পুনর্বার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৫৮৩ শকে উৎকীর্ণ তার একখানি শিলালেখ থেকে। পরবর্তী রাজা রামদেবমাণিক্য মহিষী রত্নাদেবীর নাম সম্বলিত মুদ্রা নির্মাণ করেন। রামদেবমাণিক্যের পর ত্রিপুরার ইতিহাস কিছু সময় তমসাবৃত। রামদেব মাণিক্যের পর দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য রাজা হন কিন্তু স্বল্প সময়ের ব্যবধানে খুল্লতাত-পুত্র নরেন্দ্র কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। নরেন্দ্রমাণিক্যও অচিরেই বিতাড়িত ও নিহত হলে রত্নমাণিক্য(দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহন করেন এবং কিছুদিন রাজত্বের পর স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্র কর্তৃক নিহত হন।

এ যাবৎ শুধু ১৬০৭ শকে-নির্মিত দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যেরই কতকগুলি মুদ্রার কথা জানা যায়। কিন্তু সম্প্রতি নরেন্দ্রমাণিক্য এবং মহেন্দ্রমাণিক্যের দুটি মুদ্রার অস্তিত্বের কথা লন্ডনের জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত ১৬১৫ শক নির্মিত ত্রিপুরার

সমসাময়িক ঘটনাবলীর উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে।(উৎসঃ ভারতত্ব-ভাস্কর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড(মধ্য যুগ)

মুদ্রায় লিখিত ত্রিপুরার মহিষীদের নাম

রাজার নাম	মহিষীদের নাম (মুদ্রার তারিখ)
প্রথম রত্নমাণিক্য	লক্ষ্মী মহাদেবী (শক ১৩৮৯)
মুকুটমাণিক্য	মুদ্রার লেখন থেকে মহিষীর নাম উদ্ধার করা যায় নি।
ধন্যমাণিক্য	কমলা মহাদেবী (শক ১৪১২)
দেবমাণিক্য	পদ্মাবতী দেবী (শক ১৪৪২)
প্রথম বিজয়মাণিক্য	(১) বিজয়া দেবী (শক ১৪৫৪,১৪৫৬) (২) লক্ষ্মী মহাদেবী (শক ১৪৫৮,১৪৭৯ ১৪৮০, ১৪৮২) (৩) সরস্বতী মহাদেবী (শক ১৪৭৮) (৪) বামা দেবী (১৪৮৫)
অনন্তমাণিক্য	রত্নবতী মহাদেবী (শক ১৪৮৭)
উদয়মাণিক্য	হীরা মহাদেবী (শক ১৪৮৯)
প্রথম জয়মাণিক্য	শুভদ্রা মহাদেবী (শক ১৪৯৫)
অমর মাণিক্য	অমরাবতী মহাদেবী (শক ১৪৯৯)
রাজধর মাণিক্য	সত্যবতী মহাদেবী (শক ১৫০৮)
যশোধর মাণিক্য	(১) লক্ষ্মী মহাদেবী (শক ১৫২২) (২) লক্ষ্মী-গৌরী মহাদেবী (শক ঐ) (৩) গৌরী-লক্ষ্মী-জয়া
কল্যাণমাণিক্য	কলাবতী মহাদেবী (শক ১৫৪৮)
গোবিন্দমাণিক্য	গুণবতী মহাদেবী (শক ১৫৮২)
ছত্রমাণিক্য	মুদ্রায় মহিষীর নাম নাই (শক ১৫৮৩)
রামদেবমাণিক্য	(১) সত্যবতী মহাদেবী (শক ১৫৯৮) (২) ভাগ্যবতী (ঐ)
দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য	মহিষীর নাম নেই (শক ১৬০৭)
নরেন্দ্র মাণিক্য	মহিষীর নাম নেই (শক ১৬১৫)
মহেন্দ্রমাণিক্য	মহিষীর নাম নেই (শক ১৬৩৪)
দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য	ধর্মশীলা মহাদেবী (শক ১৬৩৬)
দ্বিতীয় জয়মাণিক্য	জয়াবতী মহাদেবী (শক ১৬৬১)
দ্বিতীয় ইন্দ্রমাণিক্য	মুদ্রায় মহিষীর নাম নেই (শক ১৬৬৬)

মুদ্রায় প্রাপ্ত ত্রিপুরার রাজগণের শকাব্দের মুদ্রা

রাজার নাম	মুদ্রায় লিখিত শকাব্দ	খ্রিস্টাব্দ
প্রথম রত্নমাণিক্য	(১)১৩৮৬ (২)১৩৮৮ (৩) ১৩৮৯	(১)১৪৬৪(২)১৪৬৬ (৩)১৪৬৭
মুকুটমাণিক্য	(১) ১৪১১	(১) ১৪৮৯
ধন্যমাণিক্য	(১) ১৪১২(২)১৪১৯(?) (৩)১৪২৮(৪) ১৪৩৪	(১)১৪৯০(২)১৪৯৭(?)
দেবমাণিক্য	(১) ১৪৪২(২)১৪৪৮ (৩)১৪৫০(৪)১৪৫৩(?)	(১)১৫২০ (২)১৫২৬ (৩)১৫২৯(৪)১৫৩০(?)
প্রথম বিজয়মাণিক্য	(১) ১৪৫৪ (২)১৪৫৫ (৩)১৪৫৬(৪)১৪৫৮ (৫)১৪৭৬(৬)১৪৭৯ (৭)১৪৮০(৮)১৪৮২ (৯)১৪৮৫	(১)১৫৩২ (২)১৫৩৩ (৩)১৫৩৪(৪)১৫৩৬ (৫)১৫৫৪(৬)১৫৫৭ (৭)১৫৫৮(৮)১৫৬০ (৯)১৫৬৩
অনন্তমাণিক্য	(১)১৪৮৬(২)১৪৮৭	(১)১৫৬৪ (২)১৫৬৫
উদয়মাণিক্য	(১)১৪৮৯	(১)১৫৬৭

প্রথম জয়মাণিক্য	(১)১৪৯৫	(১) ১৫৭৩
অমরমাণিক্য	(১)১৪৯৯ (২)১৫০২	(১) ১৫৭৭ (২)১৫৮০
	(৩)১৫০৩	(৩) ১৫৮১
রাজধরমাণিক্য	(১)১৫০৭(?)(২)১৫০৮	(১) ১৪৮৫(?)(২)১৫৮৬
যশোধরমাণিক্য	(১)১৫২২	(১) ১৬০০
কল্যাণমাণিক্য	(১)১৫৪৮	(১) ১৬২৬
গোবিন্দমাণিক্য	(১)১৫৮২	(১) ১৬৬০
ছত্রমাণিক্য	(১)১৫৮৩	(১) ১৬৬১
রামদেবমাণিক্য	(১)১৫৯৮	(১) ১৬৭৬
দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য	(১)১৬০৭	(১) ১৬৮৫
নরেন্দ্রমাণিক্য	(১)১৬১৫	(১) ১৬৯৩
মহেন্দ্রমাণিক্য	(১)১৬৩৪	(১) ১৭১২
দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য	(১)১৬৩৬	(১) ১৭১৪
দ্বিতীয় জয়মাণিক্য	(১)১৬৬১	(১) ১৭৩৯
দ্বিতীয় ইন্দ্রমাণিক্য	(১)১৬৬৬	(১) ১৭৪৪

একাদশ অধ্যায়

ত্রিপুরার অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সচেতনতা

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ত্রিপুরার উপজাতি সমাজ কখন কিভাবে জুমচাষ থেকে সমতলে স্থায়ী কৃষিকার্যের দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হল এবং রাজনৈতিক সচেতনতায় রাজ্যগঠনে উদ্যোগী হল তা অনুসন্ধানের জন্য আমাদের যেতে হবে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। হাজার হাজার বছর আগে চীন ভূখণ্ড থেকে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী তিব্বত, ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করে উত্তর-পূর্ব ভারত ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। নৃতাত্ত্বিক গবেষকদের মতে ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর আদিবাসীরা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধারায় আসাম, শ্রীহট্ট এবং কাছাড় অথবা চট্টগ্রাম হয়ে যারা ত্রিপুরায় প্রবেশ করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আদিবাসীরা ছিল ত্রিপুরি, চাকমা, জামাতিয়া, রিয়াং,হালাম, কুকি এবং লুসাই ইত্যাদি। ওরা ত্রিপুরায় এসেছিল সম্ভবত জীবিকা নির্বাহের অনুকূল পরিস্থিতির কারণে। উল্লেখ করা প্রয়োজন আদিবাসীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য জুম-চাষই ছিল একমাত্র অবলম্বন। ত্রিপুরার সত্তর শতাংশ ভূখণ্ড জুড়ে রয়েছে পাহাড়, তরঙ্গায়িত টিলাভূমি এবং অবশিষ্টাংশ নদী উপত্যকায় অবস্থিত সমভূমি ও লুঙ্গাজমি যা টিলাভূমির পাদদেশে সংকীর্ণ উর্বর নিম্নভূমি। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত সমতল পশ্চিমাঞ্চল বাঙালিদের দ্বারা অধ্যুষিত।

প্রাচীন যুগে হিন্দু আমলে ত্রিপুরার পাহাড়ি অঞ্চলের কোনো বিশিষ্ট রাজনৈতিক সত্তা ছিল না। ত্রিপুরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু না বলা গেলেও খ্রিস্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে বাংলার সুলতানদের রাজত্বকালে উপজাতি জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ত্রিপুরিরা এ সত্য উপলব্ধি করেছিল যে রাজনৈতিকভাবে

রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য জুম চাষের উপর নির্ভর করা যাবে না, রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর জন্য প্রয়োজন উদ্বৃত্ত সম্পদ। উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির জন্য একই রাজনৈতিক, পৌর সামাজিক বা প্রাদেশিক অবস্থাভুক্ত গোষ্ঠীর কাছ থেকে বশ্যতা বা অধীনতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদত্ত কর আদায় করা, অপরদিকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে উন্নয়নের পথ সুগম করে তোলা দরকার। ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ত্রিপুরিরাই সর্বপ্রথম সমতলের বাঙালিদের সংস্পর্শে আসে এবং প্রযুক্তি কৌশল আয়ত্ত করে। ফলে একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষমতা এবং অন্যদিকে প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের ফলে অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর আদায়ে সমর্থ হয়। একই সঙ্গে সমতল অঞ্চলে বাঙালিদের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে রাষ্ট্রীয় প্রস্তুতি হিসেবে প্রথমে কাছাড় সন্নিহিত অঞ্চলে এবং পরে ধর্মনগর ও কৈলাসহরে রাজপাট স্থাপিত হয়। ত্রিপুরি উপজাতির 'ফা' উপাধিধারী দলপতি বা রাজা পার্বত্য ত্রিপুরায় রাজ্য গড়ে তোলার পর ত্রিপুরায় সমতল অঞ্চলে রাজ্য প্রসারিত করতে থাকেন। ত্রিপুরি রাজারা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। পরবর্তীকালে তাঁরা 'ফা' উপাধির পরিবর্তে মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় ত্রিপুরা রাজ্য ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

আধুনিক ঐতিহাসিকরে ধারণা ছেংথুম ফা- প্রথম মাণিক্য উপাধি ধারণ করেছিলেন এবং মহামাণিক্য নামে ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় প্রথম ঐতিহাসিক রাজা যিনি ত্রিপুরা রাজ্যকে একটি সুসংবদ্ধ রূপ দেন।

রাজমালায় ধর্মমাণিক্যের (১৯৪৮খ্রিঃ) একটি তাম্রলিপিতে মহামাণিক্যকে ধর্মমাণিক্যের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ত্রিপুর বংশাবলীর মতে ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৪৩১ খ্রিঃ থেকে ১৪৬২ খ্রিঃ পর্যন্ত। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় মহামাণিক্য ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দে পূর্বেই রাজত্ব করেছিলেন এবং তিনিই গৌড়ের সুলতানের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূভাগ জয় করে প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের পত্তন করেন। কথিত আছে ছেংথুমফা বা মহামাণিক্য মেহেরকুল(বর্তমান বাংলাদেশে-র কুমিল্লা) আক্রমণ ও লুণ্ঠন করলে গৌড় সুলতানের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে ত্রিপুরার রাজমহিষী মহাদেবীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি ত্রিপুর সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দেন এবং নিজে

হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। রানি মহাদেবীর সুদক্ষ নেতৃত্বে, ত্রিপুরার সেনাবাহিনী গৌড়ের সেনাবাহিনীকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে। পরবর্তী সময়ে গৌড়ের সঙ্গে ত্রিপুরার সুসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় বাংলার সুলতান রত্নমাণিক্যের অনুরোধে অনতিবিলম্বে বঙ্গদেশের নানা গ্রাম থেকে দশ হাজার নবশাক পাঠালেন। নবশাক হল যথাক্রমে কর্মকার, কুম্ভকার, গোপ, তেলী, তাঁতি, নাপিত, বারুই, মালাকার ও মোদক। ঢাকার নিকটবর্তী স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রাম অথবা সোনারগাঁও হইতে কতিপয় শ্রীকর্ণ অর্থাৎ লিপি ব্যবসায়ী বা কেরানি আনলেন। প্রতিরক্ষার কাজে বাঙ্‌লা থেকে চার হাজার সেনা পাঠানো হল। অত্যাবশক জরুরি কাজগুলি সমাধানের পর রত্নমাণিক্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরার রাজপরিবারের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের প্রসার ঘটে। এই শতাব্দীতে ত্রিপুরার মাণিক্যরাজগণ বঙ্গদেশ থেকে বাঙালি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের ত্রিপুরাতে বসতি স্থাপনে উৎসাহ যোগান এবং প্রচুর পরিমাণে ভূমিদান, করেন। ড: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের-এর মতে, "এর ফলে রাজপরিবার এবং সাধারণ ইন্দো-মঙ্গোলীয় আদিবাসীদের সাথে বাঙালিদের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং ধর্মের দিকে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং সাধারণীকরণ ঘটতে থাকে" ফলে এক মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে।

ভারতের ব্রিটিশ সরকার ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিপুরার পৃথক সত্তার কথা স্বীকার করেছিল। কিন্তু ওই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজা এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে চাকলা রোশনাবাদ জমিদারির রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে বিতর্ক দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতি হল মাণিক্য শাসনাধীন ত্রিপুরা একটি দেশীয় রাজ্যে পরিণত হল যার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, স্বাধীনতা থাকলেও বাহ্যিক ব্যাপারে মোটামুটি ব্রিটিশ কর্তৃত্ব স্বীকার করতে হল। তবে একথাও সত্য, অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের চাইতে ব্রিটিশ সরকারের সাথে ত্রিপুরার সম্পর্ক ও শাসনতন্ত্রের পার্থক্য ছিল। উইলিয়াম হান্টারের মতে অন্য দেশীয় রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরার মাণিক্য রাজারা অনেক-বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

উনবিংশ শতকে বাঙ্‌লার রেনেসাঁর প্রভাব ত্রিপুরাতেও পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরার রাজপরিবার এই নবজাগৃতিকে সাদরে গ্রহণ করে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবও ত্রিপুরায় রাজনৈতিক সচেতনতার সৃষ্টি হয়। রাজ্যের

শাসনযন্ত্রের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহ এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলন ব্যাপকভাবে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরার ভারতভুক্তি হয় এবং চিফ কমিশনারের দ্বারা শাসিত 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। ১৯৫৩ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়ল কাউন্সিল ত্রিপুরা বিধানসভায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৩ সালে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

মাণিক্য শাসনাধীন অর্থনীতি

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে মাণিক্য শাসনাধীনে ত্রিপুরা রাজ্যের বেশির ভাগই ছিল অরণ্য ও অকর্ষিত জঙ্গলময় যা জুম চাষের দ্বারা আরও বেশি জনসংখ্যার ভরণপোষণ করতে সক্ষম ছিল। এমনকি ১৮৩৮ সালেও হাল চাষ অজ্ঞাত ছিল। ধীরে ধীরে জঙ্গল আবাদি মেয়াদি বন্দোবস্তে জমি প্রদান করা হয় যা চার থেকে দশ বছর পর্যন্ত খাজনা মুক্ত। তারপর বিঘা প্রতি ২ থেকে ৩ আনা, বাড়তে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ খাজনা মোটামুটি মাত্রাবদ্ধ হয়। এরূপ কম খাজনার কারণ ছিল পার্বত্য জমির কম উৎপাদিকা শক্তি এবং জমির নিকৃষ্ট গুণসম্পন্নতা। পার্বত্য ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলের ভোগদখলের কাল বা ভোগদখল ব্যবস্থা ছিল পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ শাসিত ত্রিপুরা জেলার (বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলা) মত। পার্বত্য অঞ্চলে কোনো ভোগদখলই ছিল না,কারণ সেখানে জুমচাষ প্রথাই প্রচলিত ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই মহারাজ ভূমি মঞ্জুরী করতেন নির্দিষ্ট খাজনার ভিত্তিতে চিরস্থায়ীভাবে। নামমাত্র খাজনার বিনিময়ে ছোটো ছোটো তালুক চিরস্থায়ীভাবে প্রদান করা হত। প্রথা এমন, যাকে এরূপ জমি দেওয়া হত সে যদি প্রকৃত চাষি হয় তবে সে হবে প্রকৃতপক্ষে মালিক চাষি। সমতল অঞ্চলে ছিল তিন রকমের চাষি জোত যেমন ঃ (এক) ১৫ বিঘা বা ৫ একরের বড়ো জোত, (দুই) ১২বিঘা বা ৪ একরের মাঝারি আয়তনের জোত এবং (তিন) ৬ বিঘা বা ২ একরের অতি ক্ষুদ্রায়তনের জোত। বিঘা প্রতি ১২ মন ধান উৎপন্ন হলে তাকে ন্যায্য উৎপাদন বলে মনে করা হত। মোট উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ রাজ্যের বাইরে রপ্তানি হত। সে সময় আমদানি-রপ্তানির অবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক আদিম অবস্থার রূপ বলা যেতে পারে। স্থানীয় উৎপাদন স্থানীয় চাহিদা মিটাতে পারত না। মোটা

কাপড় তৈরী হত। অন্য সব ধরনের কাপড় বাইরে থেকে আমদানি হত। রাজ্যের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল তিল, কার্পাস, কাঠ, বাঁশ, প্রধানত মুলি বাঁশ,বেত, ছনঘাস এবং জ্বালানি কাঠ।

বিগত ১৯৩০ (১৩৪০ত্রিং) সালে ত্রিপুরাতে কৃষিজাত এবং বনজাত রপ্তানির পরিমাণ নিম্নে উল্লিখিত হল।

সারণি -১

কৃষিজাত দ্রব্যসমূহ

ক্রমিক সংখ্যা	পরিমান	মূল্য
১ ধান	২৬,১৮,৮৭০ মন	৫২,৩৭,৭৪০ টাকা।
২ পাট	৭৩,৬৬২ মন	৩,৬৮,৩১০ টাকা।
৩ সরিষা	৩১,৩৭৬ মন	১,৫৬,৫৮০ টাকা।
৪ গুড়	১,০৫,২০০ মন	৪,২০,৮০০ টাকা।
৫ কার্পাস	১৭,৫৮৩ মন	
৬ তিল	২৩,২১০ মন	
৭ চা	১৫,৩১০ মন	
৮ ফল, মূল এবং তরকারি	-	৭২,০০০ ,,
৯ গবাদি পশুর খাদ্য বিচালি, খড় ইত্যাদি		৩৯,০০০ ,,
১০ গো,মহিষাদি	২০,০০০ টি	৩,০০,০০০ ,,
১১ চর্ম (পশুর)	৬০০ মন	৪,০০০ ,,
১২ হাড় (,,)	৭০০ মন	১৭০ ,,
১৩ খৈল	৫০০০ ,,	১৫,০০০ ,,
	মোট মূল্য	৭৩,০৯৩৬০ টাকা

উৎস : সেন্সাস বিবরণী, ১৩৪০, ত্রিং, ঠাকুর সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা

সারণি-২

বনজাত দ্রব্যসমূহ

ক্রমিক সংখ্যা		পরিমাণ	মূল্য
১	কাঠ	৫,১৩,৩৬৫ ঘন ফুট	৭,৯৬, ৭১৪ টাকা।
২	বাঁশ	১২,৭৬,১৭২ বোঝা	৮,০৫,৪৪৪ ,,
৩	ছন	১০,৯৩,১৯০ ,,	৩,০৪,৪ ৭৪ ,,
৪	জ্বালানি কাষ্ঠ	৪,০৩,৬২৭ ,,	৮৩, ৯১৭ ,,
৫	ধারি	১, ৫০,০০০ টি	৭,৫০০ ,,
৬	ছাতার বাট	২০,০০০ টি	৬,০০০ ,,
৭	অন্যান্য দ্রব্যাদি	-	১০,৮৮৭৬ ,,
		মোট মূল্য	২১,১২,৯২৫টাকা

রপ্তানিকৃত মালগুলির মধ্যে ধান, চা, গুড়, সরিষা, তিল, কাঠ, বাঁশ ও ছন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষিপ্রধান স্থান বলে এ রাজ্যে আমদানিকৃত মালগুলির মধ্যে যন্ত্র দ্বারা নির্মিত দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত অধিক। ১৩৪০ ত্রিং সনে কি পরিমাণ মাল এ রাজ্যে প্রবেশ করেছিল তার একটি আনুমানিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল।

সারণি-৩

	দ্রব্যের প্রকার	মূল্য
১	কাপাসজাত বস্ত্রাদি	৮,৬১,৯০০ টাকা।
২	পশম নির্মিত বস্ত্রাদি	২২,৫০০ টাকা।
৩	ধাতব নির্মিত বস্ত্রাদি	১,২৬,০০০ টাকা।
৪	মোটর গাড়ি, সাইকেল ইত্যাদি	২৬,০০০ টাকা।
৫	নানাবিধ কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	১,৩৩,০০০ টাকা।
৬	চিনি	৩৫,০০০ টাকা।
৭	গুড়	১৫,০০০ টাকা।
৮	কেরোসিন	৮৫,০০০ টাকা।
৯	পেট্রোল	২৬,১৫০ টাকা।
১০	কাগজ, স্টেশনারি	২৫,০০০ টাকা।
১১	ঔষধ	২০,০০০ টাকা।
১২	লবন	২,১৯,৮৭০ টাকা।
১৩	শুটকি মাছ	৬,০০,০০০ টাকা।
১৪	তাজা মাছ	২,৬০,০০০ টাকা।
১৫	পুস্তক	৭,০০০ টাকা।

(উৎস : ১৩৪০, ত্রিং সনের সেন্সাস বিবরণী সৌমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা)

উপরে উল্লিখিত সারণি ১,২ এবং ৩ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ত্রিপুরা থেকে ১৩৪০ ত্রিং সনে কৃষিজাত দ্রব্যাদি এবং বনজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি বাবদ ৭৩, ০৯৩৬০.০০ টাকা এবং ২১,১২৯২৫.০০টাকা অর্থাৎ কৃষিজাত এবং বনজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি বাবদ মোট মূল্য ৯৪,২২,২৮৫টাকা। অপর দিকে কৃষিপ্রধান স্থান বলে এ রাজ্যে আমদানিকৃত মালগুলির মধ্যে যন্ত্রনির্মিত দ্রব্যাদির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। উল্লেখ করা প্রয়োজন তৎকালীন সমাজে কৃষিজাত পণ্যাদি ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার তিক্ত অভিজ্ঞতা অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেন, কৃষিজাত দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় সাধারণত সাহা মহাজনগণের একচেটিয়া ব্যাবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শ্রেণির ব্যবসায়ীগণ আবার নিকৃষ্ট কুসীদজীবীরূপে বিখ্যাত... এই সাহা মহাজনগণ কৃষিজীবীগণের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত। ধান্যবপন করার পূর্বে যখন কৃষকদের অর্থের আবশ্যক হয়, তখন ইহাদের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সেই সময় সাধারণত বার্ষিক শতকরা ১৫০ হইতে ৩০০ টাকা সুদে ইহারা কর্জ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। শুধু সুদ দিয়াও ইহাদের করাল কবল হইতে হতভাগ্য কৃষিজীবীগণ মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ্য হয় না। কর্জ দিবার সময় চুক্তি থাকে যে, উৎপন্ন ফসলাদি সেই মহাজনের নিকটই নির্দিষ্ট একটি দরে বিক্রয় করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, দাদন গ্রহণের ফলে বাজার হইতে কম মূল্যে মহাজনদের নিকট ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হওয়ায়, জিনিসের ন্যায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয়ত, মাল বিক্রির সময়েও ওজন করার কারসাজিতে অনেক সময়েই আর এক দফা প্রতারিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণির মহাজনদের পাল্লায় যাহারা পড়িয়াছে তাহারা বংশ পরম্পরায় ইহাদের ঋণের জের টানিয়া চলিতেছে। উপরন্তু হাট বাজারের অভাবে দুর্গম পর্বতবাসী প্রজাগণ অনেকক্ষেত্রে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল

দূরবর্তী স্থান থেকেও বাজার করার জন্য আসতে বাধ্য হয়। ওই সময়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন বিভাগে হাট বাজারের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

সারণি-৪

বিভাগ হাট	বাজার সংখ্যা
সদর (আগরতলা)	২৩
কৈলাসহর	১৮
খোয়াই	৯
ধর্মনগর	৮
সোনামুড়া	১১
উদয়পুর	৯
অমরপুর	২
বিলোনিয়া	৮
সাব্রুম	৫
মোট	৯৩

রাজন্য আমলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রসঙ্গে ১৭০৯ এবং ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালের মধ্যে দুজন অসমিয়া রাজদূতের বিবরণ থেকে জানা যায় যে ঋণ, আলু,তুলা, আখ, তৈলবীজ, কাঁঠাল প্রভৃতিই ছিল ত্রিপুরার কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য। উভয়ে উদয়পুর অঞ্চলে যে বাজার দেখেছিলেন তাতে অমার ও কাঁসার জিনিস, তুলা, দুধ এবং ঘি বিক্রির জন্য রাখা হত। বৃত্তিমূলক শ্রেণির মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ব্যবসায়ী, তাঁতি, স্বর্ণকার, কাঠমিস্ত্রি, রজক এবং মালাকার ইত্যাদি। রাজন্যবর্গ এবং সম্ভ্রান্ত অমাত্যবর্গ দালাল এবং কাঠের বাড়িতে বাস করতেন। রাজ পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু পরগনায় রাজস্ব নির্ধারিত ছিল।

উইলিয়াম হান্টার তাঁর 'স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল' পুস্তকে উল্লেখ করেন ১৮৭৪-৭৫ সালে ত্রিপুরার হিসাবিকৃত জনসংখ্যা ছিল ৭৪,২৪২ জন। তার মধ্যে ৪৭,৫২৩ জন উপজাতি এবং ২৬,৭১৯জন ছিল সমতলবাসী। উপজাতি শ্রেণীর মধ্যে ১৯১৪ জনকে কোনো কর প্রদান করতে হত না কিন্তু এর

পরিবর্তে রাজাকে সামরিক বা অন্যান্য সেবামূলক কাজ দিতে হত। জুমচাষের জন্য কোনো খাজনা দিতে হত না। পাহাড়ের অধিবাসীদের বাৎসরিক ঘরচুক্তি কর দিতে হত। করের হার ছিল নিম্নরূপ ঃ

সারণি-৫

আদিবাসী শ্রেণী	পরিবার পিছু হার		
	টাকা	আনা	পয়সা
ত্রিপুরি	৩	৮	০
জমাতিয়া	৩	৮	০
নোয়াতিয়া	১০	০	০
রিয়াং	১০	০	০
কুকি	৫	৪	০
হালাম	২	১০	০

বা আরও কম হারে পরিবর্তিত হত

(সূত্র: Hunter. w.w.Statistical Accounts of Bengal)

১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজস্বের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

সারণি-৬

(পরিমান পাউন্ডে)

	রাজস্বের উৎস	১৮৭৩-৭৪	১৮৭৪-৭৫
১	ভূমি রাজস্ব	৩৮৬৫	৩,৮৭৮ টাকা
২	ঘরচুক্তি কর	২,৪৭৭	২,৪২২ ,,
৩	তুলা ও তিল রপ্তানির উপর ধার্য কর	৪,৫৬৯	৪,৭১৮ ,,
৪	অন্যান্য বনজাত দ্রব্য রপ্তানির উপর ধার্য কর	২,৭৩২	৪,০৪০ ,,
৫	হাতি ধরার উপর রয়্যালটি	১,৮০২	২,৪০০ ,,
	মোট ঃ কলাম ১-৫	১৫,৪৪৫	১৭,৪৫৮ ,,

(উৎস ঃ হান্টার)

উপরোক্ত সারণি থেকে রাজস্বের পর্যবেক্ষণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে উনিশ শতকের শেষ ভাগে ত্রিপুরার অর্থনীতি প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে রাজ্যের বনসম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল, যা ব্যাখ্যাকারদের মতে অর্থনীতির আদিম রূপ। উপজাতি জনগোষ্ঠী সমতল লুঙ্গা এবং উপত্যকা ভূমিতে হলকর্ষণে অভ্যস্ত না থাকায় ত্রিপুরায় রাজন্যবর্গ পার্শ্ববর্তী বঙ্গাদেশের জেলাসমূহ থেকে বসতকারীদের অভিবাসনে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। বিংশ শতকের প্রথম দিকে বঙ্গাদেশ থেকে ভূমি এবং উর্বর লুঙ্গাভূমি চাষ করতে ও ফসল কাটার সময় বাড়তি লোকের প্রয়োজনে পাশ্ববর্তী এলাকা থেকে অনেক চাষি আসত। কিন্তু ফসল তোলা শেষ হয়ে গেলে ওরা নিজ নিজ অঞ্চলে চলে যেত। সাময়িক অবস্থিতির কারণে এরূপ চাষিরা 'জিরাতিয়া প্রজা' নামে পরিচিত ছিল। অপর দিকে অকৃষি পেশায় বঙ্গাদেশের অনেক বাঙালি হিন্দুরাও ত্রিপুরায় এসে ব্যবসায়ী, শিক্ষক,পুরোহিত, প্রশাসনিক কর্মচারী হিসাবে বৃত্তি গ্রহণ করে বসবাস করতে শুরু করে।

মাণিক্যশাসনাধীন ত্রিপুরার ১৯২১সালে সেন্সাসে দেখা যায় এই রাজ্যের জনসংখ্যার শতকরা ৭৮ জনের জীবিকা কৃষি কার্যের উপর নির্ভর করে। ১৯৩১ সালের সেন্সাসেও উপার্জনকারীদের মধ্যে শতকরা ৭৭ জনই কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করত। শ্রম শিল্পের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। একমাত্র চা-বাগান ব্যতীত ত্রিপুরার আর উল্লেখযোগ্য কোন সুনিয়ন্ত্রিত শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর বিভাগের হীরাছড়ায় চা-বাগান খোলা হলেও ১৯৩১ সালে সমগ্র ত্রিপুরার চা-বাগানের সংখ্যা ছিল মোট ৫০টি। ১৯৮১ সালে অর্থাৎ ৬৬ বছর পরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র ৫৫তে দাঁড়িয়েছে। তবে একথাও সত্য যে ত্রিপুরার চা-শিল্পের উন্নতিকল্পে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের উৎসাহ না থাকলে ত্রিপুরার চা-শিল্প আদৌ প্রতিষ্ঠা হতো কিনা সন্দেহ ছিল। অধ্যাপক ভট্টাচার্য (১৯০২)-এর মতে, স্বদেশী অনুপ্রেরণা শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছিল। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা রাজ্য এই সময়ে ভারতীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চা-শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে।

মোটের উপর বঙ্গাদেশ থেকে ত্রিপুরায় অভিবাসন প্রক্রিয়া রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথমত, এর ফলে রাজ্যে ধান, পাট, সরিষা, আখ প্রভৃতি কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, অভিবাসী প্রজাদের কাছ থেকে পাওয়া ভূমি রাজস্ব ও নজরানা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তৃতীয়ত, এই বর্ধিত জনসংখ্যা কৃষিজ উৎপাদন ও আমদানিকৃত

শিল্পজাত দ্রব্যের বর্ধিত বাজার হিসাবে কাজ করেছিল। ১৯৩০-এর দশকে যদিও ত্রিপুরার অর্থনীতি প্রাথমিক অবস্থায় ছিল তথাপি বহুফসলি চাষ, পাট চাষের প্রবর্তন, ক্রমবর্ধমান ব্যাবসা বাণিজ্য এবং দ্রব্য বিনিময় ক্ষেত্রের পরিবর্তে মুদ্রা বিনিময় ক্ষেত্রের প্রসারতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দিগন্তের সূচনা করলেও ১৯৪৭সালের ভারত বিভাজনের ফলে ত্রিপুরার অর্থনীতি মহাসঙ্কটে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির কারণে ত্রিপুরা ভারতের মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ত্রিপুরা ও ভারতের নিকটতম বৃহৎ ব্যাবসা বাণিজ্য কেন্দ্রের স্থলভাগের সংযোগ দীর্ঘ ও জটিল আকার ধারণ করে। ফলে জিনিসপত্রের পরিবহন ব্যয় অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে হিন্দু শরণার্থীর সংখ্যা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। নিম্নের সারণি-৭-এ ত্রিপুরার ১৯৪১-১৯৯১, পর্যন্ত মোট জনসংখ্যা, উপজাতি জনসংখ্যা এবং উপজাতি জনসংখ্যার আনুপাতিক হার দেওয়া হল।

সারণি-৭

(পরিমান পাউন্ডে)

সেন্সাস বছর	মোট জনসংখ্যা	উপজাতি জনসংখ্যা	উপজাতি জনসংখ্যার আনুপাতিক হার
১৯৪১	৫,১৩,০১০	২,৫৬,৯৯১	৫০.০৯
১৯৫১	৬,৪৫,৭০৭	২,৩৭,৯৫৩	৩৬.৮৫
১৯৬১	১১,৪২,০০৫	৩,৬০,০৭০	৩১.৫৩
১৯৭১	১৫,৫৬,১৪২	৪,৫০,৫৪৪	২৮.৯৫
১৯৮১	২০,৫৩,০৫৮	৫,৮৩,৯২০	২৮.৪৪
১৯৯১	২৭,৫৭,২০৫	৮,৫৩,৩৪৫	৩০.৯৫

উপরের সারণি-৭ এর মোট জনসংখ্যা, উপজাতি জনসংখ্যা এবং উপজাতি জনসংখ্যার আনুপাতিক হার খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে উপরের দশকগুলিতে বৃদ্ধির হার ক্রমবর্ধমান থাকলেও উপজাতি জনসংখ্যার আনুপাতিক হার হ্রাস পেয়েছে লক্ষ্যণীয়ভাবে। অন্যদিকে দেশবিভাগ হেতু ছিন্নমূল মানুষের রাজ্যে আগমন ও স্থায়ী বসতি স্থাপনের মুখ্য কারণ। এই অভুতপূর্ব জনসংখ্যাবৃদ্ধি ত্রিপুরার স্বল্প ভূমি সম্পদের উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করে এবং এই বর্ধিত জনসংখ্যার আত্মস্থ করার মত ত্রিপুরার অর্থনীতিতে-কৃষিমূলক ক্ষেত্র ছিল না। উপরন্ত রাজ্যের জনসংখ্যার বিন্যাস আমূল পরিবর্তন ঘটে। উপজাতি জনগণ যেখানে স্বাধীনতার পূর্বে প্রধান জাতিগত সমষ্টি ছিল তা কমে গিয়ে ১৯৯১ সেন্সাস বছরে ৩০.৯৫

শতাংশ দাঁড়িয়েছে।

"স্বাধীনোত্তর ত্রিপুরার অর্থনীতি"

স্বাধীনোত্তর ত্রিপুরায় বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আগমনের কৃষি উন্নয়নের গতির রূপান্তর ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯২৯-৩ সালে ফসলের আওতায় নীট এলাকা যেখানে ছিল ১১শতাংশ, সেটা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৪-৭৫ সালে রাজ্যের মোট এলাকার২৩.১ শতাংশে পৌঁছয়। একবারের বেশি কোনো ফসলের এলাকা উপরোক্ত সালে২.৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৪-৭৫ সালে রাজ্যের মোট এলাকার ১২.৮ শতাংশ দাঁড়ায়। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে মেস্তা ও তামাকের মত নতুন শস্যের চালু হয়। এই সময় থেকেই বোরো ধান ও আলুর চাষ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে যাট দশকের শেষের দিকে ত্রিপুরাতে গমের চাষ ও উচ্চ ফলনশীল (HYV) ধানের প্রবর্তন হয়। নিম্নের সারণিতে ত্রিপুরায় ১৯৫০-৫১ এবং ১৯৭৪-৭৫সালে প্রধান শস্যের আওতায় মোট এলাকা, মোট উৎপাদন এবং গড় উৎপাদন নিম্নে দেওয়া হল।

সারণি-৮

ক্রমিক সংখ্যা	শস্যের নাম	প্রাসঙ্গিক বছর	বপিত এলাকা (০০০হেক্টরে)	মোট উৎপাদন (000 M/TBale)	গড় উৎপাদন (000MT/Bale)
১	ক)ধান (স্থানীয়)	১৯৫০-৫১	১৩৫.২৫	১৩৪.৯৬	৯.৯৮
		১৯৭৪-৭৫	২২৫.১৫	২০৯.৪৬	৯.৩০
	খ) ধান (উচ্চফলনশীল)	১৯৭১-৭২	২৫.৬৬	৫১.৩৯	২০.০৩
		১৯৭৪-৭৫	৭৩.১	১১৬.৫৩	১৫.৮১
২	পাট	১৯৫০-৫১	৭.৬৯	৪৭.৫০	১১.১২
		১৯৭৪-৭৫	৬.৪৪	৫০.০০	১৩.৯৫
৩	মেস্তা	১৯৬০-৬১	১৪.১৫	৭০.০০	৮.৯০
		১৯৭৪-৭৫	৯.২৮	৫৫.০০	১০.৬৫
৪	তুলা (বীজ ছাড়ানো)	১৯৫০-৫১	৯.৩১	৯.০০	১.৭৪
		১৯৭৪-৭৫	২.০০	২.২০	১.৮৮
৫	আখ	১৯৫০-৫১	২.০২	৬.৪১	৩১.৭৩
		১৯৭৪-৭৫	২.১৭	৮৬.০০	৩৯৫.০০
৬	তৈলবীজ	১৯৫০-৫১	৮.৩০	৩.৫১	০.৭৬
		১৯৭৪-৭৫	৫.৬৬	২.৫৭	৪.৫৪
৭	আলু	১৯৫০-৫১	০.৬৪	৩.১৬	৪.৯৪
		১৯৭৪-৭৫	২.৮৩	৩০.৮০	১০৮.৮৩
৮	গম	১৯৭১-৭২	০.৪০	০.৯০	২২.৫০

		১৯৭৪-৭৫	০.৫৪	১.২৮	২২.১৮

সূত্র : ক)Agriculture Directorate, Tripura for figures ref.to 1950-51

খ) Govt.of Tripura, A Guide to Tripura Agriculture,1977

গ) ডঃ এন.আর.দত্ত, ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়ন

উপরের সারণী থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে ১৯৫০-৫১ এবং ১৯৭৪-৭৫ সময়কালে ধানের আওতায় মোট জমি এবং ধানের উৎপাদন (উচ্চফলনশীল সহ) উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। কিন্তু স্থানীয় ধানের ক্ষেত্রে হেক্টর পিছু গড় উৎপাদন প্রায় স্থিতাবস্থায় (৯ কুইন্টলের থেকে কিছুটা বেশি) অবস্থান করে। যদিও উচ্চ ফলনশীল ধানের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ১৯৭১-৭২ সালে ২০ কুইন্টল থেকে ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৬ কুইন্টলে কমে যায়। পাটের ক্ষেত্রে মোট ও গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে। মেস্তার ক্ষেত্রে ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের সময়কালে লক্ষণীয়ভাবে কমেছে কিন্তু হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৮.৯০ কুইন্টল থেকে ১০.৬৫ কুইন্টল পর্যন্ত বেড়েছে। অন্যদিকে তুলার ক্ষেত্রে এরূপ পতন আরো তীব্রতর হয় যদিও হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন প্রায় ২ কুইন্টলের কাছাকাছি স্থির অবস্থায় থাকে। আখ ও আলুর ক্ষেত্রে হেক্টর পিছু মোট এবং গড় উৎপাদন বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যদিও আখের এলাকা হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেনি কিন্তু মোট উৎপাদন ১৩ গুণের চাইতে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হেক্টর প্রতি উৎপাদন ১৯৫০-৫১ সালের চাইতে ১৯৭৪-৭৫ সালে ১১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আলুর ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি মোট উৎপাদন এবং গড় উৎপাদন যথাক্রমে ১০ গুণ এবং ২২ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। তৈলবীজের এলাকার ক্ষেত্রে ১৯৫০-৫১ সালের চাইতে ১৯৭৪-৭৫ সালে তৈলবীজের এলাকা এবং মোট উৎপাদন কমে যায় কিন্তু হেক্টর প্রতি উৎপাদনশীলতা ১৯৭৪-৭৫ সালে হেক্টর পিছু উৎপাদন ২২কুইন্টল যা উচ্চ ফলনশীল ধানের চাইতেও (১৬ কুইন্টল) বেশি ছিল।

যদিও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অত্যাবশক শর্ত হল দ্রুত শিল্পায়ন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ত্রিপুরার অর্থনীতির দুর্বলতম ক্ষেত্রই হচ্ছে শিল্পায়ন। শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার মূল কারণ দুটি। এক ঃ কৃষিক্ষেত্রে জনসংখ্যার অসম্ভব ভিড়। দ্বিতীয়ত, সেবাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ছিল অপ্রতুল। স্বাভাবিক কারণেই ত্রিপুরার শিল্পক্ষেত্রের ভিত্তিভূমি প্রসারিত করা প্রয়োজন। স্বাধীনোত্তর যুগে রাজ্যের একমাত্র

সংগঠিত শিল্প ছিল চা। ১৯৩০ সালে রাজ্যে চা বাগানের সংখ্যা ছিল ৪০টি। মোট আয়তন ৯৬০ হেক্টর এবং প্রায় ১ কোটি টাকা এ শিল্পে লগ্নি করা হয়েছিল। বাগানগুলির আয়তন ছিল ছোটো এবং যে গুণমানের চা উৎপন্ন হত তা শুধুমাত্র রং করার কাজেই ব্যবহৃত হত। শিল্পের অবস্থা ১৯৫০ সাল অবধি ভালো ছিল না। অসংগঠিত গৃহশিল্পের ক্ষেত্রে কাপড় বয়নই ছিল সবচেয়ে পুরাতন ও গুরুত্বপুর্ণ শিল্প। আদিবাসী জুমিয়ারা জুম উৎপন্ন তুলা থেকে সুতা তৈরি করত এবং নিজস্ব ব্যবহারের জন্য তাঁতযন্ত্রে রিয়া, পাছড়া ইত্যাদি বস্ত্র উৎপন্ন করত। প্রায় প্রতি পরিবারেই তাঁত ও সুতা কাটার চরকা ছিল। নিম্নে (সারণি-৯) ১৯৫১, ১৯৬১ এবং ১৯৭১ সালে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে কর্মী জনসংখ্যা বন্টন দ্রষ্টব্য।

সারণি-৯

শিল্প ক্ষেত্রে ১৯৫১, ১৯৬১ এবং ১৯৭১ সালে কর্মীর সংখ্যা

ক্রমিক নং	বৃত্তি	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১
১	ম্যানুফ্যাক্চারিং	১৯, ৭১৮	৩৫,৪০৯	১৫,২২৯
	(গৃহস্থালি ও	শতকরা হার	শতকরা হার	শতকরা হার
	অগৃহস্থালি)	(৭.৪০)	(৮.৩০)	(৩.৫১)
২	নির্মাণ কার্য	১৮৪	৪,১০০	৩,১৩৮
	গৃহস্থালি ও	(০.০৭)	(০.৯৪)	(০.৭২)
	অগৃহস্থালি			
	মোট মাধ্যমিক কর্মী	১৯.৯০২	৩৯,৫০৯	১৮,৩৬৭
		(৭.৪৭%)	(৯.০৪%)	(৪.২৩%)

উৎস Census of India 1950,1956,1971

উপরের সারণি থেকে ত্রিপুরার অর্থনীতির অপসরণের গতি সুস্পষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উল্লেখ করা প্রয়োজন ত্রিপুরায় কোনো বৃহদায়তন শিল্পের অস্তিত্ব নেই। মাধ্যমিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পই বিরাজমান। এসব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সরকারি সহায়তায় বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে গড়ে উঠে। The Report of Industrial Survey in Tripura 1955-55 হল একমাত্র দলিল যা থেকে দেখা যায় যে ত্রিপুরার কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের অসংগঠিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৫০০০ এবং ২৫ রকমের বিভিন্ন ট্রেড। Center of Small Indus-

tries in Tripura, 1960-61 হল আর একটি উল্লেখযোগ্য দলিল যা থেকে দেখা যায় ঐ রকম ক্ষুদ্র কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২,১৭৭ এবং ট্রেডের সংখ্যা ৪১। পাঁচ বছরের সময়কালের মধ্যে এরূপ হ্রাস থেকে বোঝা যায় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উন্নয়নের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য ছিল না।

উন্নয়নের সমস্যা

ভারত বিভাগের ফলে ত্রিপুরার উদ্বাস্তুর স্রোত রাজ্যের জনসংখ্যার ভারসাম্যকে ভীষণভাবে বিঘ্নিত করে। এখানকার জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৯৭১ সালে ছিল ১৪৯ সেটা ২০০১ সালে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৩০৪ অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ১০৪ শতাংশ। অথচ উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যেমন মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও অরুণাচলের ঘনত্ব ছিল যথাক্রমে ৪৮, ৪৫, ৩১, ১৬ এবং মাত্র ৬। দেশ বিভাগের কারণেই ১৯৪৯সালে ত্রিপুরা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের পর থেকে এ রাজ্যে উদ্বাস্তুদের আগমন ঘটতে থাকে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৩,২০,০০০ জনসংখ্যা সমন্বিত ৭০,৩৩৯ পরিবারকে এ রাজ্যে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। অবশ্য সরকারি হিসেবের বাইরেও কিছু সংখ্যক পরিবার নিজেদের সামর্থ্যেই এখানে বসতি স্থাপন করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঐতিহাসিক কারণে এইভাবে দ্রুত ত্রিপুরায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে তাও এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী ছিল। মনে রাখা প্রয়োজন ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও ত্রিপুরার ভারতভুক্তি বিষয়টির বহু পূর্বেই ত্রিপুরার শাসকগণ পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ ভারতের জেলাসমূহ থেকে বাংলা ভাষাভাষীদের এ রাজ্যে আগমন ও বসতি স্থাপনে রাজ্যের স্বার্থে উৎসাহিত করেছেন। মূল কারণ ছিল এতে ত্রিপুরার কৃষি, যোগাযোগ ও সার্বিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পূর্বে ও পরে বহিরাগতগণের স্থায়ীভাবে বসবাস করার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে একটা গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই গতিবেগ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বন্টন বৈষম্যকে খর্ব করে কিভাবে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছান যায় তা ভেবে দেখা প্রয়োজন এই সম্পর্কে অধ্যাপক গাঙ্গুলীর ১৯৭৫-এর মূল্যবান বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, "ত্রিপুরার ভূমি সমস্যাকে গ্রামী দারিদ্র্য সমস্যা থেকে পৃথক করে দেখা চলে না"। গ্রামঞ্চলে অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে দুর্বল অংশ হল ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক এবং জুমচাষিগণ, যাদের আইনগত অধিকারে কোনো জমি নেই। যাদের হাতে অল্পমাত্রায়ও জমি আছে, তাঁরাই পুঁজি, শ্রম ও পণ্যের বাজারে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে থাকে। সাধারণত দেখা যায় যাদের হাতে কিছু জমি আছে, তারাই

রায়ত ভাগচাষি হিসাবে অপরের জমি চাষ করে থাকে। কিন্তু যে একেবারে ভূমিহীন সে এই সুবিধাও পায় না। আবার যার হাতে বেশি জমি আছে সে-ই বেশি পরিমাণে কৃষি ঋণ ও অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে। শুধু তাই নয়, উৎপন্ন শস্য মজুত রেখে বাজারে বেশি দামে বিক্রি করে মুনাফা লাভ করতে পারে। এইরূপ দৃষ্টান্তও আছে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কৃষক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অর্থ বা শস্য ঋণ দিয়ে থাকে ও তার বিনিময়ে, শস্যে বা শ্রমে সুদ ও আসল আদায় করতে থাকে। এর সরল অর্থ ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র চাষি অনেক সময় তাদের শ্রম ও উৎপন্ন শস্যের ন্যায্য দাম থেকেও বঞ্চিত হয়। কাজেই গ্রামঞ্চলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূল ভিত্তি ভূমি বন্টনে অসাম্য ও অপরদিকে গ্রামীণ দারিদ্র্যের মূল কারণ ভূমিহীনতা। বলা যেতে পারে, বন্টন বৈষম্য হ্রাস করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগকে তখনই ত্বরান্বিত করা যাবে যখন উৎপাদন ব্যবস্থার বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হয়, যার ফলে সামগ্রিক উৎপাদনে কৃষির আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পায়। সুতরাং ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যদি উৎপাদন কাঠামোর এমন পরিবর্তন আনা যায় যার ফলে শিল্প, যোগাযোগ, পরিবহন, শক্তি ও ব্যাবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবামূলক কর্মে নিয়োগের ও উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে কৃষির উপর নির্ভরশীলতার গুরুত্ব কমানো যায় তা হলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির চাপ গ্রামীণ অর্থনীতির ততটা বিপর্যয় ঘটাতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে ত্রিপুরায় ভূমি ব্যবহারের বিন্যাস নিম্নে দেওয়া হল ঃ

সারণি-১০

(পরিমান পাউন্ডে)

ক্রমিক সংখ্যা	কি কার্যে ব্যবহৃত হয়	ভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	মোট ভূমির কত শতাংশ
১	বন ও জঙ্গলাবৃত ভূমি	৬,৩৫,২৫২	৫৯.৬
২	চাষের জন্য যে ভূমি পাওয়া যাবে না (কারণ অকৃষি সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত হয় অথবা অসার জমি যেখানে আবার চাষ করা সম্ভব নয়)	৪৪,১১৫৪.১	৪.১
৩	অন্যান্য কারণে অকর্ষিত জমি (পতিত ব্যতীত) এর মধ্যে আছে স্থায়ী তৃণ ও গোচারণ ভূমি, বিভিন্ন বৃক্ষ, শস্যের জন্য ব্যবহৃত এবং উদ্ধার করে (কর্ষণযোগ্য ভূমি)।	১,৪৪,০৯৩	১৩.৩
৪	পতিত জমি	৭,১৭৯	০.৮
৫	নীট আবাদি জমি	২,৪০,০০০	২২.২

(উৎস ঃ ত্রিপুরা সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, 'ত্রিপুরার পরিসংখ্যান রূপরেখা' ১৯৭১)

উপরের সারণি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একমাত্র পতিত জমি ব্যতীত অন্যান্য কারণে অকর্ষিত জমি, যার পরিমাণ ১,৪৪,০৯৩ হেক্টর, তা উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা যেতে পারে। কিন্তু এই জমির সবটাই আবাদের জন্য উদ্ধার করা সম্ভব যে হবে না তা বলাই বাহুল্য। তদুপরি উদ্ধার করতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে এবং তাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। অপরপক্ষে যেহেতু জনসংখ্যাও বাড়তে থাকবে সেই কারণে আরও জমির প্রয়োজন পড়বে। নীট আবাদি জমি ২,৪০,০০০ হেক্টর যা মোটভূমির ২২.২ শতাংশ। বন্টন বৈষম্য দূর করে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করার বিষয়টিও তাই গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, ত্রিপুরার চা বাগানগুলির মালিকানাধীন ২০ হাজারেরও বেশি হেক্টর জমি আছে অথচ এর সবটাই চা উৎপাদনে নিয়োগ করা হয় না। এখান থেকেও কিছু পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ করে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টিত হতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার দ্বিবিধ ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য ত্রিপুরার উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন,শক্তি ও শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে রাজ্যের মোট উৎপাদনে কৃষির গুরুত্ব কমিয়ে অন্যান্য উৎপাদনশীল কর্মে উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

ত্রিপুরার মতো পার্বত্য এলাকায় অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচন্ডভাবে ব্যাহত হলেও পরবর্তীকালে জনসংখ্যা ও মানব সম্পদের কারণে কৃষিজ উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং একই সঙ্গে উদার হস্তে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সম্পদ হস্তান্তরের ফলে আর্থিক সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত সূচনা হয়।

সারণি-১১

বৎসর	মোট জনসংখ্যা	দশকীয় পরিবর্তনের হার
১৯৭১	১,৫৫৬,৩৪২	৩৬.২৮
১৯৮১	২,০৫৩,০৫৮	৩১.৯২

১৯৯১	২,৭৫৭,২০৫	৩৪.৩০
২০০১	৩,১৯১,১৬৮	১৫.৭৪

(সূত্রঃ ১.Govt.of Tripura, Some Barie Statistics of Tripura, 2000, ২. Census of India-1971,1981,1991,2001)

উপরের সারণি থেকে লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল যেখানে ১৯৭১ সালে জনসংখ্যার দশকীয় পরিবর্তনের হার ছিল ৩৬.২৮, ১৯৮১ সালে সেখানে পরিবর্তনের হার নেমে দাঁড়ায় ৩১.৯২। ১৯৯১সালে পরিবর্তনের হার-এর ধারাবাহিকতা বজায় না থেকে সংখ্যার হার দাঁড়ায় ৩৪,৩০ কিন্তু পরবর্তী সেন্সাসে,(২০০১) আশ্চর্যজনকভাবে দশকীয় পরিবর্তনের হার নেমে আসে ১৫.৭৫-এর মধ্যে। এইরূপ পরিবর্তনের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ বলে মেনে নেওয়া যায় না। সম্ভবত পরিসংখ্যানের গ্রহণগত অসম্পূর্ণতা এর জন্য দায়ী।

ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সীমাবদ্ধতা থাকলেও পরিকল্পনাসমূহের কৌশলগত পরিবর্তন ঘটিয়ে জনমুখী পরিকল্পনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তদুপরি "ভিশন উত্তর-পূর্বাঞ্চল ২০২০" পার্বত্য অঞ্চলের জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। বিশ্বায়নের কর্মসূচিতে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্য আশা করা যায় বাংলাদেশে তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থে পূর্বোত্তর রাজ্যগুলিতে বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে ত্রিপুরার স্বাভাবিক বাণিজ্য এবং যাতায়াতের দরুণ ত্রিপুরা ভৌগোলিক দিক থেকে প্রতিকূল অবস্থা কাটাতে সক্ষম হবে। উপরন্তু দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে চালু হলে পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলোর বাণিজ্য ত্রিপুরার মাধ্যমে প্রবাহিত হতে পারে এবং ভবিষ্যতে ট্রান্স-এশিয়ান-হাইওয়ে এবং ট্রান্স-এশিয়ান-রেলওয়ে রুট ত্রিপুরার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল এরূপ ভাবা যেতে পারে।

পরিকল্পনা বিশারদ-দের অনুমান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের জন্য ভবিষ্যতে আগরতলা বিমান বন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। 'ভিশন্ উত্তর-পূর্ব ২০২০'-এর কর্মসূচি অনুযায়ী বায়ুপথ সংযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে গুয়াহাটিকে বায়ুপথ সংযোগ ব্যবস্থার নাভিকেন্দ্রে পরিণত করার উল্লেখ রয়েছে। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মাস্টার প্ল্যান ২০১৫সালের মধ্যেই শেষ করার

কথা। জাতীয় সড়ককে চারটি লেনে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। সোনালি চতুর্ভুজকে আসামের শিলচর পর্যন্ত আনার কথা পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছে এবং অপর দিকে আগরতলা পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল সড়ক যোগাযোগ ২০২০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যতে, আর একটি ইতিবাচক দিক হল ২০০৭ সালে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের ঘোষণা ছিল, ভারত ন্যূনতম উন্নত সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাথে শুল্কমুক্ত নীতি অনুসরণ করবে এবং সীমান্ত অঞ্চলে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিকাঠামো উন্নয়ন করবে যা বাণিজ্যক বিষয়কে ত্বরান্বিত করবে। প্রতিবেশী দেশগুলির ভিতর এবং একই সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে পণ্য দ্রুত চলাচলের সুবিধা প্রদান করবে। এই নীতিতে নিঃসন্দেহে ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের ভিতর ব্যাবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে এবং উভয় দিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। 'ভিশন উত্তর পূর্বাঞ্চল ২০২০'-এর দলিলেও প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের অধিকাংশকেই বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে আনতে হবে বলা হয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগে আগ্রহ সৃষ্টির পূর্বশর্ত হল পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো। যদিও উন্নয়নের পথ সহজলভ্য নয় তথাপি উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার উন্নয়নের সম্ভাবনা উজ্জ্বল তবে উন্নয়নের কর্মকাণ্ডকে সফল করে তুলতে অবশ্যই দায়িত্বশীল এবং সংবেদনশীল দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

দ্বাদশ অধ্যায়

মিশ্র সংস্কৃতি

আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করলে বলতে হয় জীবন যাত্রার প্রণালীর উৎকর্ষই হল মানুষের সংস্কৃতি। সভ্যতা যদি উন্নততর এবং শোভন জীবনযাত্রার প্রণালী হয় তাহলে সংস্কৃতি হচ্ছে তার উৎকর্ষ বা গুণ অর্থাৎ একটি প্রণালী অপরটি তার গুণবাচক শক্তি।

অধ্যাপক নীলকান্ত শাস্ত্রী প্রদত্ত সংস্কৃতির সংজ্ঞা যেটি ইউনেসকো ক্রনিক্‌ল-এ অনুমোদিত, সেখানে বলা হয়েছে "সংস্কৃতির অর্থ সমস্ত জড়বস্তু, ভাবরাজি,প্রতীক, বিশ্বাস, অনুভূতি, মূল্যবোধ এবং সামাজিক সংগঠন সমূহের সম্মিলিত রূপ যা একটি সমাজ ব্যবস্থায় স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সংস্কৃতি সাধারণভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি বস্তুনিষ্ঠ সংস্কৃতি এবং অপরটি আন্তর সংস্কৃতি। আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে এই দিক থেকেই বিচার করে দেখা যেতে পারে। যেমন, যে-কোন সংস্কৃতির বিকাশের সূচনা হয় বস্তুগত সমৃদ্ধির মাধ্যমে। ইতিহাসকে আশ্রয় করে বলা যেতে পারে মানবজাতির প্রথম লিখিত বিবরণী ঋগ্বেদে আমরা তৎকালীন সমাজের যে চিত্র পাই তাতে দেখা যায় যে সমাজবদ্ধ মানুষ কৃষি, কারিগরি শিল্প এবং সংস্থা ভিত্তিক জীবনধারায় অভ্যস্ত। আবার একই সঙ্গে একদিকে জীবন ও কাব্যে এবং অন্যদিকে যুদ্ধের প্রতি তাদের আগ্রহ। বস্তুনিষ্ঠ সংস্কৃতি এবং আন্তর সংস্কৃতি প্রাক্-ঋগ্বেদীয় সভ্যতার যুগেও, অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার যুগে এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সম্পন্ন নগর সভ্যতার এক উন্নত রূপ। নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের মতে কোনো গোষ্ঠী যখন কৃষি এবং শিল্পের দ্বারা স্থিতাবস্থা এবং নিরাপত্তা লাভ করে তখন অবসর সময়টা অন্তরজীবনের মহত্তর ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে। এইভাবে আন্তর

সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটে। এই দার্শনিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের সামগ্রিক জীবনচর্যাই হচ্ছে সংস্কৃতি। এই জীবনচর্যার দুটি ভাগ। একটি বস্তুগত। যেমন ঃ অর্থ, বাসগৃহ, বস্ত্র বা আচ্ছাদন, খাদ্যরুচি ইত্যাদি, অন্যটি ভাবগত। যেমন ঃ শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, নৈতিকতা, ভাষা, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি। সুতরাং বলা যেতে পারে বস্তুগত এবং ভাবগত দিক নিয়েই সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি ভৌগোলিক অস্তিত্বের কথাও আমরা ভাবি। যেমন, বঙ্গসংস্কৃতি বলতে বঙ্গভূমির ভৌগোলিক অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনচর্যার কথা বুঝি। অনুরূপভাবে ত্রিপুরার সংস্কৃতি বলতে বুঝি ত্রিপুরার অধিবাসীদের সংস্কৃতি। এই সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি পঞ্জাবি সংস্কৃতি, রাজস্থানি সংস্কৃতি, অসমিয়া সংস্কৃতি ইত্যাদি। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উল্লেখ করা যেতে পারে কোনো জনসমষ্টির মধ্যে যখন একটি জাতিগত চেতনার উদ্ভব হয় তখন এই নতুন বোধকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার মূলে কয়েকটি বিশেষ উপাদানের একত্র সমাবেশ। যেমন ঃ ভৌগোলিক পরিধিগত ঐক্যবোধ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্যবোধ, জাতিসত্তার উৎপত্তিকাল সংক্রান্ত কোনো এক ঐতিহাসিক, অর্ধ-ঐতিহাসিক বা বহু পরিমাণে কল্পিত ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্তি, কোনো এককেন্দ্রিয় শক্তির প্রযুক্ত শাসনব্যবস্থার প্রতি স্বেচ্ছানুগত্য, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও পরিকাঠামোর ভূমিতে সমদৃষ্টি ও সর্বোপরি অপরাপর জাতিসত্তাবিশিষ্ট জনসমষ্টি থেকে একটি সামগ্রিক স্বাতন্ত্রবোধ-এই উপাদানগুলির একত্র সমাবেশ ও সমন্বয়ের ফলে নির্দিষ্ট জনমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমশ জাতিসত্তা স্ফুরিত হয় এবং ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ফলে কালক্রমে বিভিন্ন জাতির প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে।

নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, বর্তমান ত্রিপুরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের সুবিস্তৃত কিরাতভূমির অন্তর্গত কিরাতগোষ্ঠীর অন্যতম শাখা বোরো উপজাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। ভারতে সুলতানি আমলেও স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন বহুদূর প্রসারিত ছিল। মোগল আমলে এই রাজ্যের আয়তন কিছুটা খর্ব হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ রাজশক্তির আগ্রাসী নীতির ফলে এর আয়তন অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়। ত্রিপুরার সমতল ভূমির অংশ নিয়ে গঠিত হল ইংরেজ সরকারের অধীন ত্রিপুরা জেলা আর পাহাড়ে অঞ্চল নিয়ে গঠিত হল পার্বত্য ত্রিপুরা। এই অংশটি ইংরেজ সরকারের মিত্র রাজ্যে পরিণত হল। সমতল অংশ নিয়ে গঠিত

হল চাকলা রোশনাবাদ পরগনা যেটি ত্রিপুরা মহারাজার জমিদারিতে পরিণত হল। বলা যেতে পারে বস্তুগত দিক এবং ভাবগত দিক থেকে ত্রিপুরার সমতল এবং পাহাড়ি অংশ শত শত বছর ধরে একে অন্যের সম্পূরক এবং পরিপূরক হওয়ার ফলে সামাজিক প্রক্রিয়ায় এক বিশেষ মৈত্রী ভাবের সঞ্চার হয়ে সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ হিসাবে, নয়া সংস্কৃতির সৃষ্টি হল।

উপরের প্রসঙ্গটি পূর্ণ করার জন্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে ত্রিপুরারাজ রত্ন ফা-এর রাজত্বকালে বঙ্গদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠযোগাযোগ ঘটে। কথিত আছে পিতা ও ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলা নবাব তুগ্রল খাঁর সহায়তায় রত্ন ফা ত্রিপুরার সিংহাসন দখল করেন। গৌড়েশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত রত্ন ফা ত্রিপুরার দশটি মূল্যবান হাতি এবং সঙ্গে একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন তাঁকে উপহার দেন। নবাব সন্তুষ্ট হয়ে রত্ন ফাকে 'মাণিক্য' উপাধি দেন। সেই থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে যতদিন মহারাজাদের শাসনব্যবস্থা চালু ছিল ততদিন ত্রিপুরেশ্বরগণের নামের সঙ্গে মাণিক্য উপাধি যুক্ত ছিল। রত্নমাণিক্যের আমল থেকেই ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে মুসলমান নবাবদের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে। নবাবি আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু কিছু ফারসি ভাষার প্রচলন হয়। রত্ন মাণিক্য তিনজন বাঙালি হিন্দুকে ত্রিপুরা রাজ্যে আনিয়ে জায়গির ও নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। এঁরা হলেন বড় খান্দব ঘোষ, পন্ডিত রাজ এবং জয়নারায়ণ সেন। এদের সাহায্যে রত্নমাণিক্য মুসলমান নবাবদের অনুকরণে ত্রিপুরায় শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন এবং সেরেস্তা প্রথা চালু করেন। রত্নমাণিক্যের সময়ে ত্রিপুরায় প্রধানত তিন শ্রেণীর রাজকর্মচারী ছিল। উপজাতি সম্প্রদায় থেকে চন্তাই, গালিম, কবরা, চুনিয়া, গাভোর। হিন্দু সম্প্রদায় থেকে নারায়ণ এবং মুসলমান সম্প্রদায় থেকে নাজির দেওয়ান ইত্যাদি।

বঙ্গদেশে থাকাকালীন সময়ে মহারাজ রত্নমাণিক্য গ্রামে গঞ্জে নানারকম কলা-কুশলীর কাজ-কর্ম স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর তিনি উপলব্ধি করলেন ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়নে এমন কলা-কুশলীদের স্থায়ীভাবে বসবাস প্রয়োজন। তিনি গৌড়ের সুলতানকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করায় সুলতান বঙ্গদেশের নানা গ্রাম থেকে দশ হাজার 'নবশাক' পাঠালেন। উল্লেখ্য নয়টি জাতি নিয়ে 'নবশাক' জাতির সৃষ্টি। এই নটি জাতি শূদ্র শ্রেণীর বলে বিবেচিত। পরাশর সংহিতায় এর

উল্লেখ রয়েছে। ''গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী/কুলালঃ কর্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কঃ'' অর্থাৎ গোপ, মালাকার, তিলি,তাঁতি, মোদক, বারুই, কুম্ভকার, কর্মকার এবং নাপিত-এই নটি জাতি নবশাক বা নবসেনা-র মধ্যে গণ্য। নবশাক ছাড়াও ঢাকার নিকটবর্তী স্বর্ণগ্রাম থেকে কিছুসংখ্যক শ্রীকর্ণ অর্থাৎ করণিক এবং প্রতিরক্ষার কাজের বঙ্গদেশ থেকে চার হাজার সেনা পাঠানো হল।

রত্নমাণিক্যের আমল থেকে যে অভিবাসন এবং সাংস্কৃতিক ধারার সূচনা হল তা পরবর্তী রাজাদের আমলেও অব্যাহত ছিল। মাণিক্যশাসকবর্গের অভিবাসন প্রক্রিয়ার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের রাজস্ববৃদ্ধি এবং উন্নয়ন। রাজন্য ত্রিপুরার শাসন সম্মিলনিতে বলা হয়েছে রাজ্যের উন্নয়ন ও প্রগতির পথ উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে স্থায়ী অভিবাসন ব্যবস্থা চালু রাখা প্রয়োজন। অভিবাসীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি বন্টনের পরিবর্তে নিদেন পক্ষে ৫০০ দ্রোণ (৩২০০একর) অথবা তার বেশি পরিমাণের জমি মঞ্জুর করা উচিত। এই প্রক্রিয়ায় ধনী এবং সংস্কৃতিবান সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ অভিবাসীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে এদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টায় রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। সুতরাং বলা যেতে পারে ত্রিপুরার রাজস্ব আদায়ের মূল উৎস ছিল সমতল বাংলার চাকলা রোশনাবাদে মহারাজার জমিদারি। দীর্ঘ ছয় সাত বৎসরেরও অধিক কাল থেকে ভৌগোলিক পরিধিগত ঐক্যবোধের প্রযুক্ত শাসনব্যবস্থায় স্বেচ্ছানুগত্য এবং পাহাড় ও সমতল অংশের পরিপূরক অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থের সমন্বয়ে জাতি-উপজাতির মিশ্র সত্তার ভিত্তিতে ত্রিপুরার ভাষা, সাহিত্য, শিল্প এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের ধর্ম নিয়ে এক স্বতন্ত্র মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠে।

ত্রিপুরার ভাষাতত্ত্ব

ত্রিপুরায় বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোকের মধ্যে বাংলা, কক-বরকভাষী জনগোষ্ঠী যেমন ত্রিপুরি, জামাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া, রূপিণী, কলই, উচই, মুরাসিং, চাকমা, হালাম,গারো, খাসিয়া, কুকী, লুসাই,মগ, মনিপুরি,নেপালি, গুরুং এবং হিন্দি প্রধান রাজ্যের পুব দিক থেকে কক-বরক ভাষী গোষ্ঠীর আদিবাসীরা এসে বসতি স্থাপন করে। দক্ষিণ দিক থেকে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর ব্রহ্মদেশীয় মগ জনগোষ্ঠী প্রাচীনকাল থেকেই বসতি স্থাপন করেছিল এবং পরিশেষে পশ্চিম দিক থেকে বাংলা ভাষীরা

এ রাজ্যে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন দু-'শ বছর ইংরেজের ভারত শাসন কালেও ত্রিপুরা ইংরেজি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। পক্ষান্তরে সমগ্র ভারতে একমাত্র ত্রিপুরাতেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছিল। সে সময় শুধুমাত্র মুদ্রা,লিপি বা আদেশ পত্রেই বাংলা ভাষা ছিল তা নয়, এমন কি ত্রিপুরার রাজচিহ্ন, স্ট্যাম্প, শিলমোহরে, তাম্রশাসনে, সনদে বাংলার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার সেনসাস্ বিবরণী অনুযায়ী "ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করত ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ৯৭,৯৫৮ জন, ১৯২০খ্রিস্টাব্দে ১,২৮,৪২৩ জন, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ৬৫,৫৪০ জন চাকমা ভাষা ব্যবহার করত ৫,২২০ জন। সেই সময় হিন্দুস্থানী ভাষার মধ্যে ১২,৮০৪ জন হিন্দি ভাষায়, ১ জন উর্দুভাষায় এবং ৫ জন পার্সি ভাষা ব্যবহার করত। নেপালি গুরুং এবং মুর্মি ভাষা হিমালয়ের পাদদেশের অধিবাসীদের ভাষা এবং কোচ ভাষা আসামে ও বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যে সেই সময় ৪৯৪ জন গুরুং, ৩৪১ জন নেপালি ভাষা মাতৃভাষা রূপে ব্যবহার করা হত। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরি ভাষা ৯৩,৯৮০ জন এবং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরি ভাষা ১,২৫,৭৯৩ জন ব্যবহার করত। এর মধ্যে মণিপুরিভাষা ১৯,৫৩৬ জন, গারো ২৭৪০, লুসাই ২০০০, কুকি ১৪৭০, অসমিয়া ৪৬৭, বোরো ১৮১এবং খাসিয়া ২৩ জন মাত্র।

বর্তমানে রাজধানী আগরতলায় যে কথ্য ভাষা প্রচলিত তা স্মরণাতীত কালের কথ্য ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আগরতলা সদর অঞ্চলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ধ্বনিগত বিচারে দেখা যায় :(১) অপিনিহিতির আধিক্য-কাইখ্যা,কইর‍্যা। (২)যুক্তব্যঞ্জনের পূর্বে স্বরধ্বনির আগম:-কাব্য-কাইব্য। (৩) ওকার-উকারে-চুর, গুলবাজরে। (৪) আনুনাসিক স্বরধ্বনির বিলুপ্তি-বাশ-বাঁশ।(৫) মহাপ্রাণের অল্পপ্রাণতা-বারি,গাটলা। (৬)শ,স, র হতে রূপান্তর-হে, হমান। (৭)পদ দুই মধ্যবর্তী'চ'-র লোপ। (৮)স্বরাগম-ইস্কুল, আস্তাবল, মাই ঝে। (৯) বর্ণ বিপর্যয়-বাস্ক,রিসকা, নস্কা। (১০) ঘোষী ভবন-হগ্গল।(১১) বর্ণদ্বিত্ব-কাক্কু, চুট্ট (১২) য় শ্রুতি-মোয়া।(১৩) ড়-এর র-গারি, চিরা,মুরি।(১৪)'ক'-হ ট্যাহা, বেহা, ঠেহা।(১৫) কর্তায় 'এ' বিভক্তি-মায়ে কইছে।

(১৬) সম্বন্ধে গো বিভক্তি-আমাগো বারি। (১৭) ভবিষ্যৎ কালের অর্থে নিত্যবৃত্ত-অতীতের প্রয়োগ আমি খেলুম।(১৮) ঘটমান কালের অর্থে সামান্য বর্তমান -মায়ে ডাকে।(১৯) সম্পন্ন কালের পদ গঠনে 'ই' করছি, আর অসম্পন্ন কালে 'ই' তে করতে আছি। (২০) দ্বিতীয় স্থলে ষষ্ঠী-তোমার যাইতে অইব। (২১) 'এ' বিভক্তির লোপ-'জল অ গেছে'। (২২) অন প্রত্যায়ান্ত শব্দের সঙ্গে যা ধাতুর প্রয়োগ-এত ভাত খাওন যায় না ইত্যাদি।

ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাঞ্চল জুড়ে রয়েছে শ্রীহট্টের মানুষ। যেমন-কৈলাসহর, ধর্মনগরের ভাষার বৈশিষ্ট্য হল বর্ণের মহপ্রাণতা যেমন খবর-কবর। খেলা-কেলা। খেয়েছে-কেয়েছে। ইত্যাদি। ঘর-গর, ভাত-বাত। আবার অল্পপ্রাণ উচ্চারণে কণ্ঠনালীর আকুঞ্চন। যেমন,পাকা। করিমগঞ্জ থেকে 'আইরাম' শোনায় 'কহরিমগঞ্জ থাহি আইরাম' ইত্যাদি অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে-(ক) অপিনিহিতি- দুইটা দিয়টা। (খ) বিপর্যয়-লাফ্-ফাল (গ)আগম-চাইন করইন। (ঘ) বিপ্রকর্ষ-সিনান-স্নান। (ঙ) বর্ণ গুচ্ছ লোপ করিয়া-করিয়ারি। (চ) 'হ' 'র' 'অ' তে রূপান্তর অইব হইব। (ছ) আদ্য অক্ষর নিষেধ বাচক হইলে 'অ' উচ্চারণ অবিকৃত থাকিয়া যায় যেমন অসুখ, অধীর। ব্যতিক্রম-ওতিথ-অতিথ (জ) যুগ্ম শব্দের সৃজনে স্বকীয়তা-পানউন, খনি ধনি, ঘোড়া উড়া। (ঝ) উত্তম ও মধ্যম পুরুষে ক্রিয়ার ব্যবহার-আপনি কিতা কইলা বুঝেরাম নাই'। (ঞ) আদরার্থে 'বা' তে'র প্রয়োগ ইত্যাদি।

ত্রিপুরার দক্ষিণঞ্চলে নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামের ভাষার প্রভাব দেখা যায় বিলোনিয়া, সাব্রুম এবং উদয়পুরের এলাকায়। যেমন (১) তৎসম শব্দের অত্যধিক বাহুল্য। (২) অসমাপিকা ক্রিয়ার অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ। কাম করি। ভাত খাই ইত্যাদি। (৩) স্বর মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন ঘোষ বৎ হয়ে পরে লোপ যেমন-মাঠারান (৪) স্বরাগম-আস্পর্ধা। (৫) এক স্বরের প্রভাবে অন্য স্বরের রূপান্তর। যেমন-না কি, নি কি। (৬) স্বতোনাসিক্যভবন-চাঁ,পুঁথি (৭)মহাপ্রাণহীনতা সৃজনে ঘোষভবন-কচ্ছুর। (১০) অঘোষী ভবন অপসর। (১১) শব্দের শেষে ক বর্গ থাকলে ও তার পরবর্তী শব্দের আদ্যক্ষর 'ন' হলে অন্তক্ষরের বিলুপ্তি যেমন এক নম্বর-এঙ নম্বর। মাঘ মাস-মাঙ মাস।(১২) বর্ণগুচ্ছ লোপ-কোন ঠাঁই-কন্যে। আঁচমনীয় স্থল-আঁই চচাল। কোন ওকে-কঁ বে। স্থির হও-থিয়াও। (১৩) অধিকরণে 'তে' বিভক্তি-হাঁটত যামু। জয়ারত মিয়া (১৪) সংক্ষিপ্ত করণ প্রবণতা সেই অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। (১৫)

না বাচক 'ন' র পূর্বে ব্যবহার ধারণ-ন-যায়।

ব্রিটিশ ভারতে পার্বত্যজাতিদের মৌখিক ভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত করার জন্য বহুদিন ধরে উদ্যোগ নিলেও ত্রিপুরার মহারাজারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি এতটাই আকৃষ্ট ছিলেন যে রাজ্যের অফিস আদালত সমূহে বাংলা ভাষার সাহায্যে সকল প্রকার কার্য নির্বাহিত হত। সর্বশ্রেণির প্রজাবর্গ যাতে ক্রমাগত বাংলা ভাষা তাদের মাতৃভাষা হতে পারে সে কারণে বিভিন্ন পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছিল। যেমন মহারাজ রাধাকিশোর একটি আদেশ লিপিতে জানান ঃ''এখানে আবহমানকাল রাজকার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। ইহা বঙ্গাদেশীয় হিন্দুরাজার পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষত আমি বঙ্গ ভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয় তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্তব্য মনে করি।'' গবেষকদের ধারণা জাতিত্বের বিচারে ইন্দো মঙ্গোলীয় পরিবার ভুক্ত ত্রিপুরিরা বাদে অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়গুলি একে অন্যের ভাষা বুঝতে পারতো না। সেই কারণেই বাংলার মত একটি সমৃদ্ধশালী ভাষাকে রাজ্যের করা হয়েছিল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করে বলা যেতে পারে মহারাজ রত্ন মাণিক্য (১৩২৫-১৩৫০খ্রীঃ)এর আমলেই হাজার হাজার বাঙালি পরিবারকে ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট করান হল''। বাঙালি ধর্ম সংস্কৃতি এবং বাংলাভাষার সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগের এটাই ছিল সর্বপ্রথম সূচনা। পরবর্তী সময়ে মহারাজ ধর্মমাণিক্য(১৩৩১-১৪৬২) যদিও তিনি বোরোভাষী তথাপি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনিই বাংলা ভাষায় 'রাজমালা'(পদ্যে ত্রিপুর কাহিনি) রচনার প্রবর্তক। তাঁর আদেশেই সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করা হয়। পরবর্তী মহারাজ ধন্যমাণিক্য(১৪৬৩-১৫১৫) ছিলেন মধ্যযুগীয় ত্রিপুরার সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। ত্রিপুরার এ পর্যন্ত প্রাপ্ত মুদ্রার মধ্যে মহারাজ ধন্যমাণিক্যের মুদ্রায় সর্বপ্রথম প্রাচীন বাংলা হরফে সংস্কৃত ভাষায় ধন্যমাণিক্য ও রাজমহিষী কমলা দেবীর নাম উৎকীর্ণ-শ্রী শ্রী ধণ্যমাণিক্য-শ্রীকমলাদেব্যৌ (১৪২২ শকাব্দ =১৫০০খ্রিঃ)। তিনি সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের শুধু উৎসাহদাতাই ছিলেন না উপরন্ত সংস্কৃত গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করে রাজ্যে বাংলাভাষার প্রচারে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

যদিও ত্রিপুরার 'রাজমালা' অনুসারে রত্নমাণিক্যকে প্রথম মাণিক্য উপাধি ধারী বলে দাবি করা হয় আসলে এ সম্পর্কে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ নেই। কারণ রাজমালায় রত্নের পূর্বেপ্রথম ধর্মমাণিক্যের ১৩৮০ শকাব্দের (১৪৫৮-৫৯খ্রিঃ)একটি তাম্রশাসনে উল্লেখ রয়েছে ধর্মের পিতার নাম মহামাণিক্য। তাম্রপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

''চন্দ্র বংশোদ্ভব স্বাপ মহামাণিক্যজ ঃ সুধীঃ।

শ্রীশ্রী মদ্ধর্ম্ম মাণিক্য ভূপশ্চন্দ্রকুলোদ্ভবঃ।।

শাকে শূন্যষ্ট বিশ্বাদে বর্ষে সোমদিনে তিথৌ।

ত্রয়োদশ্যাং সিতেপক্ষে মেষে সূর্য্যাস্য সংক্রমে।।''

ইত্যাদি

উপরোক্ত তাম্রপত্রের মর্মার্থ ঃ চন্দ্রবংশে উদ্ভব মহামাণিক্যের সুধী পুত্র, চাঁদ সদৃশ্য শ্রীশ্রীমৎধর্মমাণিক্য ১৩৮০ শকাব্দের (১৪৫৮ খ্রিঃ) চৈত্র মাসের শেষ দিনে, সোমবার, শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কৌতুক কনৌজী ৮ জন ব্রাহ্মণকে শস্য, ফল ও বৃক্ষাদি পূর্ণ উনত্রিশ দ্রোণ ভূমি দান করেন।

তাম্রশাসনটির ভাষা সংস্কৃত। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ত্রিপুরার মাণিক্য শাসনের প্রথম পর্যায় থেকেই রাজসভায় বাংলা ও সংস্কৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়। এটিও লক্ষ্য করার বিষয় যে ঐ সময়ে রাজদরবারে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় ছিল। তবে এ যাবৎ আবিষ্কৃত রত্নমাণিক্যের(১৪৬৪ খ্রিঃ-১৪৬৭খ্রিঃ) চল্লিশ ধরনের মুদ্রা তার রাজত্বের অন্যতম কীর্তি। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীন মুদ্রার বিশিষ্ট সংগ্রাহক শ্রীজহর আচার্য -এর মতে ''এসব মুদ্রায় বাংলার সুলতানদের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।'' সম্ভবত এসব মুদ্রার নকশাকারী শিল্পীদেরকে বঙ্গাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। অধিকন্তু আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলির সাহায্যে এ সত্যটি প্রমাণিত যে মহারাজ প্রথম রত্নমাণিক্য চৌদ্দ দেবতা, শ্রীদুর্গা, নারায়ণ এবং হর-পার্বতী নামযুক্ত মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন। বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝা যায় রত্ন ফা ওরফে রত্নমাণিক্য তাঁর রাজত্বকালে হিন্দু ধর্ম এবং তাঁর তাত্ত্বিকভাব শুধু পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করেন নি উপরন্তু তিনি ভারতীয় অধ্যাত্ম দর্শন সম্বন্ধে পরিপক্কতর যথেষ্টপরিচয় রেখেছিলেন। কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক ত্রিপুরার রাজারা মুদ্রা নিজ নামের পরে রানীর নাম ব্যবহার করেছেন আবার এমন নজিরও আছে যেখানে রানীদের নাম রাজার নামের

আগে স্থান পেয়েছে। নৃতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এইরূপ নজির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কেননা এইরূপ বৈশিষ্ট্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই নিদর্শন। উল্লেখ করা যেতে পারে ত্রিপুরার প্রায় সবগুলি আদিবাসী সম্প্রদায় মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মঙ্গোল গোষ্ঠীভুক্তদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এখনো উত্তর-পূর্ব ভারতের খাসিয়া এবং গারোদের মধ্যে বিদ্যমান। আবার ত্রিপুরার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ-পদ্ধতিতে জামাইখাটা রীতি অনুসারে পাত্র অপেক্ষা পাত্রীর মর্যাদা বেশী হওয়াতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে যে সুদূর অতীতে এক সময়ে ত্রিপুরার কোন কোন আদিবাসী বিশেষ করে ত্রিপুরী সম্প্রদায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তিনি একাধারে যেমন শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের উপাসক আবার একই সাথে তিনি রাজন্য কুলদেবতা চৌদ্দদেবতারও সমান উপাসক ছিলেন।

পরিশেষে বলা যেতে পারে সব দেশের রাজারাই যেমন মুদ্রা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেন, ঠিক তেমনি ত্রিপুরায় রাজাদের ক্ষেত্রেও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ত্রিপুরার অধিকাংশ মুদ্রাই হাতে পেটা ছাঁচে তৈরি। মুদ্রাগুলির আকৃতি গোল। পূর্ণ মুদ্রার সাধারণ ওজন সাড়ে দশ গ্রাম। পরিমাপ ২৩ থেকে ২৭ মি মি। মুদ্রাগুলি সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন বাংলা হরফে লেখা। প্রথম দিকের প্রায় প্রত্যেকটি মুদ্রায় শকাব্দ এবং শেষ দিকের মুদ্রাগুলিতে ত্রিপুরাব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আবার সবকটি মুদ্রায় রাজা ও রানিদের নাম একসঙ্গে রয়েছে। মুদ্রার নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তারা মহিষীদের নামকরণ করতেন। যেমন : বিজয়-বিজয়া,কিংবা ঈশ্বর-ঈশ্বরী ইত্যাদি। মহারাজ মুকুটমাণিক্যের মুদ্রায় বিরল ব্যতিক্রম, যেমন একজন আদিবাসী মহিলার নাম রয়েছে। তিনি 'মচত্রী'দেবী। কোন কোনো রাজা বাঙালি মহিলাকে রানি বা পাটরানি হিসেবে বরণ করেছেন। মহারাজা যশোধরমাণিক্যের (১৬০০খ্রিঃ)মুদ্রায় গোপীসহ বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের স্কেচটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। আবার কোনো কোনো রাজা তাঁদের মুদ্রায় মূর্তি খোদাই না করে শুধুমাত্র তাঁদের আরাধ্য দেবদেবীর নাম ব্যবহার করেছেন। যেমন নারায়ণ চরণপর-শ্রী শ্রী রত্নমাণিক্যদেব অথবা রাধাকৃষ্ণ-বীরচন্দ্রমাণিক্য ইত্যাদি। প্রাসঙ্গিক আলোচনা উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ তার 'রাজর্ষি' উপন্যাসে ত্রিপুরার যে রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে ইতিহাসে অক্ষয় করে গেছেন, তিনি ছিলেন মোগল সম্রাট

শাজাহানের সমসাময়িক। গোবিন্দমাণিক্যের আমলের সংস্কৃত ভাষায় বাংলা হরফে খোদিত একটি সোনার মোহর দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পুলকিত হয়ে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বলেছিলেন "তবে আমার বাঙ্গালা রাজভাষা"। এই ঘটনার পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মকর্তা, ত্রিপুরার তদানীন্তন মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যকে পত্রের দ্বারা বঙ্গভাষা সংবর্ধনা সভার পৃষ্ঠপোষক রূপে পেয়েছিলেন।

ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ যে নজিরবিহীন প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষার প্রসারণ ঘটিয়ে একে রাজভাষায় উন্নীত করেছিলেন সে সম্পর্কে ত্রিপুরার 'রাজমালার' প্রথম সংগ্রাহক কৈলাশচন্দ্রের উক্তিটি ঐতিহাসিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন ঃ "ত্রিপুরার রাজভাষা বাংলা। ইহার অধিকাংশ তাম্রশাসন বাংলা ভাষা ও বাংলা অক্ষরে লিখিত। এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসে 'রাজমালা' প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের রত্নমালা স্বরূপ। সুতরাং ত্রিপুরার গৌরবে বাঙালী ও বাংলা ভাষা গৌরবান্বিত"।

কক-বরক ভাষা

'ককবরক' শব্দের অর্থ মানুষের ভাষা। কৌতূহল হয় এই কারণে যে সাধারণত ভাষায় নামাকরণ হয় কোন জাতি গোষ্ঠী বা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। ত্রিপুরার বৃহত্তম উপজাতি সম্প্রদায় 'ত্রিপুরা 'জাতিতত্ত্বের বিচারে ইন্দো-মঙ্গোলীয় -বোরো পরিবারভূক্ত এবং সংখ্যার বিচারে ত্রিপুরিরা মোট উপজাতি সম্প্রদায়গুলির তিন-চতুর্থাংশ হওয়ার সুবাদে 'ককবরক' ভাষার পরিবর্তে 'বোরো' ভাষাই নামাকরণ হতে পারতো। সম্ভবত বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রহণ যোগ্যতার প্রশ্নে 'ককবরক' বা 'মানুষের ভাষা' এই নামকরণ হয়েছে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরার ১৮টি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রিপুরি, জমাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া, রূপিণী, কলই, উচই এবং মুরা সিং সম্প্রদায়ের ভাষা ককবরক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। নৃতত্ত্ববিদদের মতে ত্রিপুরার উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ ইন্দো-মঙ্গোলিয় জাতি গোষ্ঠীর শাখা হিসেবে পরিচিত। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব দিক থেকে অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর চাপে তারা ধাপে ধাপে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছেন। ইতিহাস আশ্রিত তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরার উপজাতিদের বৃহত্তর অংশ ব্রহ্মদেশ থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন। এঁরা ব্রহ্মদেশের 'শান' বংশের শাখা নিঃসৃত। ত্রিপুরার নরপতিদের 'ফা' পদবি ব্যবহার

ব্রহ্মদেশীয় ঐতিহ্য বহন করে। 'ফা' প্রভুবাচক শব্দ। 'ফা' শব্দটির শান ব্রহ্মা প্রভৃতি জাতির ফ্রা রূপের 'অপভ্রংশ'। সেই জাতির নরপতিগণ এই 'ফা' উপাধি ধারণ করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ছেংথুম ফা, ডাঙ্গুর ফা। রত্ন ফা (রত্ন ফা পরে মাণিক্য উপাধি ধারণ করেন) ইত্যাদি।

একথা অনস্বীকার্য যে প্রাক্-আর্য পর্বের ভারতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জগুলিতে অস্ট্রিক ভাষা-ভাষীর এক উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু 'ঋগ্বেদ'-এর ভূমিকা ছিল মানবসভ্যতার একটি প্রাচীন ও মহান সভ্যতার ধবংসের জয়গাথা হিসাবে। মজার ঘটনা হল বিজয়ী সভ্যতা বিজিতের সভ্যতার সুদৃঢ় ধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত রাখতে পারেনি। বাঙ্গালির ইতিহাস এই দুই ধারার সংমিশ্রণের ইতিহাস। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ববঙ্গ বিশেষ করে সমতল ত্রিপুরার অঞ্চলে নিম্নোক্ত শব্দগুলি মূলতঃ অস্ট্রিক। যেমন ঃ কুড়ি গণনা পদ্ধতি-(এক কুড়ি, দুই কুড়ি) এছাড়া বাঁখারি (চেরা বাঁশ); কানি (ছেড়া কাপড়ের টুকরো); বাইগন (বেগুন); পগার (জলময় গর্ত), লাঙল, বরজ; লাউ; তলম্ব; কলা; কার্পাস, বাণ, ধনু ইত্যাদি অসংখ্য অস্ট্রিক শব্দ কৃষি জীবনের সঙ্গে জড়িত পূর্ব বাংলার ভাষার অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, অবিভক্ত বঙ্গদেশের চারটি সমৃদ্ধ জনপদ যথা রাঢ়, পুন্ড্র, বঙ্গ, এবং সমতট প্রাচীনকাল থেকেই এক উজ্জ্বল সংস্কৃতির ইতিহাস বহন করে আসছে। অথচ এই জনপদের ভৌগোলিক অবস্থিতি কানিংহাম-এর অনুমান এবং অসম্পূর্ণ তথ্য নির্ভর হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলা নির্ণীত ছিল। অধুনা ইতিহাসবেত্তারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে ত্রিপুরা জেলা (সমতল ত্রিপুরা) এবং সংলগ্ন ভুখণ্ডই ছিল প্রাচীন বাংলার সমতট রাজ্য। সুতরাং এই সূত্র ধরে বলা যেতে পারে পার্বত্য ত্রিপুরা এবং সমতল ত্রিপুরার ইতিহাস এই দুই ধারার সংমিশ্রণের ইতিহাস। এই বক্তব্যের স্বপক্ষে রাধামোহন ঠাকুরের 'কক বরক মা' ব্যাকরণ গ্রন্থটি (১৯০২) উল্লেখের দাবি রাখে। উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ "এই ভাষা (ত্রিপুরি ভাষা) অধিকাংশে আর্যসংস্কৃত ভাষা এবং স্থানীয় আদিম ভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট নিবন্ধনে রূপান্তরিত।" প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, 'অন্বেষণ' অর্থে সংস্কৃত ধাতুরূপ 'তুক' শব্দ থেকে ককবরকে 'তুকদি' এবং জল অর্থে সংস্কৃত 'তোয়া' কক বরকে 'তৗয়' বা তৗই। কৈলাশচন্দ্র সিংহ(১৮৯৬)-এর মতে'ত্রিপুরা' শব্দটির উৎপত্তি ককবরক ভাষার দুটি শব্দ থেকে। যেমন 'তৗঈ' এবং

'প্রা'। ককবরক ভাষায় 'তৗঈ'-এর অর্থ জল। 'প্রা'-এর অর্থ নিকটে। সুতরাং 'তৗঈ' এবং 'প্রা' মিলে অর্থ দাঁড়ায় জলের নিকটে ভূমি বা স্থান। সৌমেন্দ্র দেববর্মা (১৯৩১) তাঁর 'সেন্সাস বিবরণী'তে বলেছেন "এই রাজ্যের (ত্রিপুরা) গৌরবময় যুগে এর ভৌগোলিক সীমা দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত ছিল।" সুতরাং অনুমান করাই যেতে পারে এই রাজ্যের নামের উৎস 'তৗই' এবং 'প্রা' এর সমন্বয়ে তৗইপ্রা/তুইপ্রা। পরবর্তী সময়ে 'তুইপ্রা' অপভ্রংশের স্তর, বেয়ে 'তৃপ্রা' বা তিপ্রা। 'তিপ্রা' এর সাংস্কৃতিক রূপ হচ্ছে 'ত্রিপুরা'। উল্লেখ্য, গ্রিক শব্দ 'সাল' অর্থাৎ সূর্য ককবরক ভাষাতেও 'সাল', শব্দটি হুবহু একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে গ্রিক শব্দ 'ফাদার' থেকে ককবরকে 'ফা' শব্দটি এসেছে। আবার বাংলা ভাষায় 'বুঝেছি', 'সেজেছি' ককবরকে রূপান্তরিত হয়েছে ' বুঝিয়া,' সাধুখা। আবার বাংলার হওয়া অর্থে ক্রিয়াপদের ককবরকে 'অঙি' 'জায়গা' হয়েছে 'জাইগা' বা 'জাগা' ইত্যাদি। ককবরক ভাষার গবেষকদের মতে কেউ কেউ মনে করেন বর্তমান ত্রিপুরায় প্রচলিত পূর্ববাংলার যে আঞ্চলিক কথা বা লোকভাষাগুলি রয়েছে সেখানে ককবরক ভাষার প্রয়োগের প্রভাব পড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ রিয়াং উপজাতিদের ককবরক 'হা' 'হাঁ' 'বা' 'না' ধ্বনির প্রাধান্য নোয়াখালি অঞ্চলের বাংলা উপভাষা বা কথ্যভাষার চলনে রয়েছে। যেমন টাকা হচ্ছে 'টেহাঁ'। শুদ্ধ বাংলায় 'যেও না' এর রিয়াং ককবরকে তা থাংদিন, নোয়াখালি ভাষায় 'ন যাও', উত্তর ত্রিপুরিরা 'নি', মনি ' ধ্বনি বা প্রত্যয়ের ব্যবহারের প্রাধান্য ককবরকে এবং শ্রীহট্টের আঞ্চলিক প্রাকৃতিক বাংলায় লক্ষ্য করা যায়। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৫৩) এ প্রসঙ্গে বলেন কতকগুলি বাংলা শব্দ ত্রিপুরি (ককবরক) ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে-যেমন, বাবা, দাদা, বাজার,ছড়া, পূজা, ছাতি, ধুতি, কলম, ডাক, দোয়াত, কাজ,পুথি, গামছা প্রভৃতি। তবে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে অসংখ্য বাংলা শব্দের প্রচলন ককবরকে রয়েছে।"

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ত্রিপুরায় বাংলাভাষা রাজভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকায় ককবরক সহ নপলি, মণিপুরি, চাকমা,হিন্দুস্তানি, নেপালি ইত্যাদি ভাষাভাষী ব্যক্তিগণও অনেক সময় বাংলা ভাষায় স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করতে বাধ্য হত ফলে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা আশি শতাংশ ব্যক্তি বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় স্বাধীনতা লাভের পর পয়ষট্টি বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ককবরক ভাষা-সংস্কৃতির প্রান্তিক দশা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অস্বীকার

করার উপায় নেই স্বাধীনতার পূর্বে রাজন্যবর্গের অবহেলা এবং উদাসীনতা এর অন্যতম কারণ।

বর্তমান ভারতের সংবিধানের গণতান্ত্রিক আদর্শকে ভিত্তি করে নবীন ত্রিপুরার নেতৃত্বে যে সব উপজাতি এবং অনুপজাতির গবেষকরা রয়েছেন তাঁরা ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদে ককবরক ও বাংলা ভাষায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির কারণে ক্রমশ এগিয়ে আসছেন। ইতিমধ্যে ককবরক ভাষা-সাহিত্য -সংস্কৃতি চর্চা ও প্রসারে যেসব বিষয় নিয়ে গ্রহণযোগ্য কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সেগুলি হলঃ ককবরকভাষী জনগোষ্ঠীদের বিরহ সঙ্গীত, প্রেমসঙ্গীত, বিবাহ সঙ্গীত এবং জুম সঙ্গীত; নৃত্যাবলী, নাটক বা যাত্রাপালা (জমাতিয়াদের); লোককথা, রূপকথা, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব ও মেলা; জাদু ও মন্ত্রতন্ত্র, দেব দেবী, হস্তশিল্প ও বয়ন শিল্প, অচতাইদের চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদির সংগ্রহ প্রচার ও প্রসার। এইরূপ পদক্ষেপ ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিক হলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যখন ককবরক ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্ন উঠল তখনও গণতান্ত্রিক সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের ফলে কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। এই মন্তব্যের সংখ্যালঘু কমিশনের প্রতিবেদনটি উল্লেখ করা যেতে পারে:The Tripura Government have not yet issued order for providing facilities for instruction through the mother tongue according to the agreed scheme of safeguards for huguistic minorities (Source : Report of the Minority Commission, Govt.of India,Page 132)পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলেই ১৯৭৯ সালের ১৯ জানুয়ারি প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ককবরক ভাষাকে সরকারি ভাষায় স্বীকৃতি সহ ককবরক সাহিত্য সংস্কৃতি প্রসার এবং উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজ্যের বিশিষ্ট ভাষাবিদ কুমুদকুণ্ডু চৌধুরীকে সভাপতি করে ত্রিপুরার ভাষা কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে অচিরেই ভাষা কমিশনটির বিলুপ্তি ঘটে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ককবরকভাষী পাঠকদের মাতৃভাষার প্রতি অনাগ্রহ এবং ভাষার হরফ নিয়ে অবাঞ্ছিত বিতর্ক শুরু হয়। রোমান হরফ বনাম বাংলা হরফ-এর প্রসঙ্গ নিয়ে বিষয়টি স্পর্শকাতর। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রথমে বাংলা হরফে পাঠ্যপুস্তক লেখাও হয়েছিল, কিন্তু স্বল্প কালের ব্যবধানে রোমান হরফে ককবরক পাঠ্য বই লেখা হবে সিদ্ধান্ত হল। রোমান হরফের উগ্র সমর্থকরা বাংলা

হরফে লেখা বইগুলি নষ্ট করে ফেলে অথচ রোমান হরফে ককবরক শিক্ষা চালু করতে ব্যর্থ হল। উল্লেখ করা যেতে পারে। ভাষা গবেষকরা কোন্ অবস্থায় কোন্ হরফ চালু করা হলে বেশি ফলপ্রসু হয় তা বিচার বিশ্লেষণ করেই অভিমত জ্ঞাপন করেন। এই প্রসঙ্গে ককবরক ভাষার বিশেষজ্ঞ ড:কুমুদকুণ্ডু চৌধুরী বলেনঃ মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়ে যে হরফ চলে ত্রিপুরায় তা চলে না এবং ত্রিপুরায় যে হরফ চলে সে সমস্ত রাজ্যে চলে না।

ভাষা গবেষক কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরীর অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য। ত্রিপুরার বুদ্ধিজীবীরা যদি রাজনীতির উর্ধে উঠে জাতিগতভাবে ককবরক ভাষা বিকাশের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে তাহলে দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী বরকভাষাও যে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম হবে তা বলাই বাহুল্য।

সাহিত্য

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক গ্রন্থ অত্যন্ত বিরল। যে কয়টি ঐতিহাসিক কাব্যের লিখিত গ্রন্থের নাম জানা যায় তাদের নির্ভরযোগ্য বিবরণ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস দুর্লভ। সম্প্রতি ত্রিপুরার মহারাজ ধর্মমাণিক্য ১৪৩১-১৪৬১খ্রিঃ প্রদত্ত অধুনা লুপ্ত এক তাম্রপট্টের মূল যে পাঠ উদ্ধৃত হয়েছে তা অকল্পনীয়। কারণ তার কাল নির্দেশটি ১৩৮০শক, মেষসংক্রান্তি, শুক্লা ত্রয়োদশী, সোমবার। গণনায় পাওয়া যায় ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মার্চ চৈত্র সংক্রান্তি দিনটি বাস্তবিকপক্ষেই শুক্লা ত্রয়োদশী এবং সোমবার ছিল। (উৎস :দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য: বাংলা সাহিত্যের কতিপয় ঐতিহাসিক কাব্য: শাশ্বত ত্রিপুরা ১৯৭৬)। ত্রিপুরায় সাহিত্য ইতিহাসের উপাদান হিসেবে তাম্রশাসন একটি মূল্যবান শক্তিস্তম্ভ। মূল রাজমালা ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দের পরে ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের অর্থাৎ পরবর্তী রাজা ধন্যমাণিক্যের অভিষেক শকাব্দের কিছুকাল পূর্বে ১৪৭০-৮০ খ্রিঃ-এর মধ্যে রচিত। সুতরাং রাজমালা বাঙলা সাহিত্যের আদি যুগের একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

রাজমালার পরে তাম্রশাসনের বাইরে ত্রিপুরার প্রশাসনিক গদ্যের নিদর্শন দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের আমলেই পাওয়া গিয়েছিল। সেই সময় (১৬৮৫-১৭১২খ্রিঃ) 'চম্পক বিজয়' নামে একখানা বাংলা কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা ছিলেন কবি মহীউদ্দিন। কাব্যগ্রন্থে মূলত ত্রিপুরার রাজাদের কিছু কাহিনী এবং হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী স্থান পেয়েছে। 'চম্পক বিজয়'-এর মত 'কৃষ্ণমালা'

কাব্যগ্রন্থ মহারাজা রাজধরমাণিক্যের আমলে ১৭৮৫খ্রিঃ) রচিত হয়। পরবর্তীকালে মহারাজা কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের আমলে (১৮৩০-১৮৪৯) কবি নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়' এবং 'গীতকল্পতরু' দুটি কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষার লিখিত প্রচার করার মত সুকঠিন কাজটির অবশ্য সূচনা হয়েছিল মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের (১৮৬২-১৮৯৬) আমলে। তিনিই সর্বপ্রথম সাধারণের বোধগম্য প্রচলিত সুললিত সাধুভাষার আইন তৈরী ও প্রশাসনিক কাজ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গাদর্শনে "বাংলা ভাষা"(১৮৭৮)শীর্ষক প্রবন্ধে ভাষাকে সকলের বোধগম্য করে তোলার জন্য গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তিনি লিখলেন, "রচনা সকলেই বুঝতে পারে এবং পড়িবার মাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়। অর্থ গৌরব থাকলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা।"

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে বীরচন্দ্রের সাহিত্যিক দূরদৃষ্টি অবাক করার মত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মধুসূদন বাংলা নাটকে প্রথম নিঁখুত গদ্য প্রবর্তন করেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র সাধু গদ্যের আদর্শ নজির স্থাপন করেছিলেন।

বীরচন্দ্র এই দুই প্রতিভাধর কবি সাহিত্যিকের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে শেষ পর্যন্ত চলিত ভাষাই সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করবে। এই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বীরচন্দ্রের মূল্যায়নের সপক্ষেই রায় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বীরচন্দ্রের সম্পর্ক ছিল নৈকট্যের। যদিও দু'জনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল বিশাল। রবীন্দ্রনাথ কিশোর কবি। বীরচন্দ্র প্রৌঢ় মহারাজ, তিনি নিজেও কবি। রবীন্দ্রনাথের অপরিণত আরম্ভের মধ্যে তাঁর রচিত 'ভগ্নহৃদয়' কবিতার ভাব মহারাজ বীরচন্দ্রকে মুগ্ধ করে। রাজা ও কবি বীরচন্দ্র কিশোর রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম কবি হিসেবে রাজ স্বীকৃতিতে সম্মানিত করেন।

অপরদিকে ত্রিপুরার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের অন্যতম কারণ সম্ভবত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য অনুরাগী রাজপরিবার, ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্রমাণিক্যের সঙ্গে যে দিন 'মঙ্গল-সম্বন্ধ' স্থাপিত হয়েছিল তা কালক্রমে যে ফলপ্রসু হয়েছিল কবি তা নিজেই উল্লেখ করেছেন তার 'রাজর্ষি' 'মুকুট' ও 'বিসর্জন'-নামক ত্রিপুরার ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস ও নাটকগুলিতে। ত্রিপুরার এই বরেণ্য মহারাজা নিজেও কিছু উচ্চমানের কাব্যগ্রন্থ লিখে রেখে গেছেন। যেমন অকাল-কুসুম (১৮৮৬),

উচ্ছ্বাস(১৮৮৬), শ্রীশ্রী ঝুলন গীতি (১৮৯২), হোরী (১৮৯২), প্রেম মরীচিকা (১৮৯৬)। মহারাজা প্রচারবিমুখ ছিলেন বলে তিনি কখনও বিদগ্ধমণ্ডলীর কাছে তা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। বরং অপরের সাহিত্য সাধনায় শ্রদ্ধাশীল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উল্লেখ্য 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থের একখানা বাংলা সংস্করণ প্রকাশের জন্য তিনি ওই যুগে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন এবং নিজ অর্থব্যয়ে 'শ্রীশ্রী হরিভক্তি বিলাস' গ্রন্থটিরও ছাপাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য' পুস্তকটি গুণের কারণে তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড:দীনেশচন্দ্র সেনের মহামূল্য গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থখানি মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের অর্থানুকূল্যের জন্যই প্রকাশনা সম্ভব হয়েছিল।

মহারাজা বীরচন্দ্রের পুত্র মহারাজ রাধাকিশোর ছিলেন কবির পরম সুহৃদ। তাঁর আগ্রহে আগরতলায় একটি বাংলা সাহিত্য সংগঠন গড়ে উঠেছিল। উপরন্তু তাঁরই প্রচেষ্টায় আগরতলা থেকে পর পর 'বার্যিক', 'বঙ্গভাষা' এবং 'অরুণ' নামে তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলি রাধাকিশোর, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষীগণের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছত। পিতা বীরচন্দ্রের মত রাধাকিশোরেরও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল সীমাহীন উৎসাহ। রবীন্দ্রনাথ রাধাকিশোরের পত্রাবলীর শৈল্পিক বিন্যাসের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "মাতৃভাষাকে (অর্থাৎ বাংলা ভাষা) এমন সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা এ যে তাদের রাজোচিত সৌজন্যরই অঙ্গ"। এই প্রসঙ্গে কবি পিতা-পুত্রের (বীরচন্দ্রমাণিক্য এবং রাধাকিশোরমাণিক্য) পত্রাবলীর উৎকর্ষের কথা বলতে গিয়ে সংযোজন করলেন, "মহারাজা বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোরের যে সমস্ত চিঠি আমার কাছে আছে সেগুলি অমূল্য সম্পদ বিশেষ।" এমন চমৎকার চিঠি আজকালকার দিনে লেখাও অসম্ভব।

ত্রিপুরার রাজপরিবারে বাংলাভাষা ও সাহিত্যপ্রীতি বিগত শতকের শেষকাল অবধি ধারাবাহিকভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর তার পিতা রাধাকিশোরের মত বঙ্গাসাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। "কিশোর সাহিত্য সমাজ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান মূলত তারই উদ্যোগে আগরতলায় গড়ে উঠেছিল। এই সাহিত্য সমাজের পরিচালনাতেই 'রবি' নামে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন নৃপতি মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর নিজেও বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে নাট্যকার হিসাবে তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'চাঁদ কুমুদিনী,' 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস' কলকাতায় অভিনীত হয় এবং তাঁর খ্যাতি সংস্কৃতি-প্রেমী মহলে ছড়িয়ে পড়ে।

ত্রিপুরাধিপতিগণ ছাড়াও ত্রিপুরার রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের নাম বঙ্গ সাহিত্যে উল্লেখের দাবি রাখে। বঙ্গের মহিলা কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী মহারাজ বীরচন্দ্রের কন্যা। এই প্রতিভাময়ী রাজকুমারী যে তিনটি কাব্য রচনা করেন সেগুলি হল-'কণিকা' (১৯০১), 'শোক গাথা' (১৯০৬) ও 'প্রীতি' (১৯০৭)। রবীন্দ্রনাথ অনঙ্গমোহিনীদেবীর কবি প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন : "আপনার কবিতাগুলির মধ্যে কবিত্বের একটি স্বাভাবিক সৌরভ অনুভব করি। ইহাদের সৌন্দর্য বড় সরল এবং সুকুমার। কবি অনঙ্গমোহিনী দেবী ছাড়াও যাঁরা এ রাজ্যে কবিতা রচনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছে কুমুদিনী বসু ('লহরী' ১৮৮৭), ('আভা' ১৯০২), গিরীন্দ্রবালা দেবী, মৃণালিনী দেবী (স্মৃতি), চারুবালা দত্ত, হেমপ্রভা রায়, সুচারু দেবী, ক্ষীরোদবালা দেবী, উজ্জ্বলা দেবী এবং কমলপ্রভা (দেবী বৈজয়ন্তী)। সলিল কৃষ্ণ দেববর্মণের সম্পাদনায় ত্রিপুরার কবিদের প্রথম কবিতা সংকলন 'প্রান্তিক' প্রকাশিত হয়। সাহিত্যবাসরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন যশস্বী অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন রণেন্দ্রনাথ দেব, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, সত্যব্রত চক্রবর্তী, প্রদীপ চৌধুরী, কিরণশঙ্কর রায়, অশোক দাশগুপ্ত, প্রবীর দাস, করবী দেববর্মন এবং অপরাজিতা রায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছিলেন কবি বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী। আশি সালের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা কবি-চিত্তকে যে কতটা ব্যথিত করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় '১৯৮০' শীর্ষক কবিতা। তিনি লিখেছেন :

যাচ্ছ, যাও, কী রেখে দিয়ে দিয়ে গেলে
ফিরে তাকাবে কি?
ম্লানমুখ শিশু
হৃতসর্বস্ব পিতা
সন্তান হারা মা

ছিন্নমস্তা গৃহশ্রেণী
আর
হৃদয়ের ভিতরের ঝনঝনিয়ে ওঠা কঙ্কাল
যাচ্ছ, যাও কী রেখে দিয়ে গেলে
ফিরে তাকাবে কি?

কবি করবী দেববর্মন প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে কবিতা লিখে তাঁর একান্ত নিজস্ব ভুবন সৃষ্টি করেছেন। ভারত বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শচীন দেববর্মনকে নিয়ে তাঁর অসাধারণ কবিতা 'অলৌকিক ভ্রমণে রাজপুত্র'-এ ত্রিপুরার রাজপুত্র ব্যক্তি শচীন দেববর্মনের পটভূমি যথাযথভাবে রূপ লাভ করেছে!

এক হিরণ্ময় রাজপুত্র জলে ভেসে যায়
দেখ, আশ্চর্য ভ্রমণ তার জলে জলে সুরে সুরে
ভাটিয়ালি গায়
বাউল হৃদয় তার জলে ভেসে যায়।
জীবন দেখেছ তার?
রাজ্যপাট ছেড়ে যে জীবন
ঘাসে মাঠে নদী বুকে
তিতাসের ছায়া মেঘে মেঘনা আদরে
ঘুঘু ডাকা বৈরাগীর বিষণ্ণ দুপুরে
সোনালী মাছের মত পাখা ছড়ায়
উদাস আকুল হাওয়া ভাটিয়ালি গায়
দেখ, রাজপুত্র একা একা সুরে ভেসে যায়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে অন্যান্য যাঁরা বিশিষ্টতার পরিচয় দেন তাঁরা হলেন কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, মিহির দেব, অনিল সরকার, রাখাল রায় চৌধুরী, প্রদীপ বিকাশ রায়, পীযূষ রাউত, জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল, সিরাজুদ্দিন আমেদ, শিশিরকুমার সিংহ, মানস দেববর্মন, শংকর বসু, স্বপন সেনগুপ্ত, প্রদীপ দত্ত চৌধুরী, স্বপন সেনগুপ্ত

প্রমুখ।

ত্রিপুরার শতবর্ষের সাহিত্যের ইতিহাস (১৮৮০-১৯৮০) পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ত্রিপুরার জেটা গ্রামের রক্ষাকর ভট্টাচার্য (১৮৮০-৯০)-এর 'সঙ্গীত সার' তিন খণ্ড এবং তারই কন্যা স্বর্ণময়ী দেবীর 'সঙ্গীতমালা' (১৮৯৯) সে যুগে প্রশংসিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, কালীগচ্ছ গ্রামের কৈলাসচন্দ্র সিংহ সে সময়ে বঙ্গদর্শনের অন্যতম লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস,' 'সেন রাজাদের বাংলার ইতিহাসের একটি অধ্যায়','যোহানের জীবন চরিত,' 'সাধক সঙ্গীত', 'দারুব্রহ্ম' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সুসাহিত্যিক রামকানাই দত্ত ক্ষেপারাম শর্মা ছদ্মনামে চল্লিশটি পুস্তক রচনা করেন। কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন 'আভাষ' (১৯০২) এবং মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের পুত্র বিমলচন্দ্র দেববর্মন বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবে 'গোপবালা'(১৯০৪) নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দান করেন। চুন্টার গুরুচরণ চক্রবর্তীর 'স্থানুশ্রী' (দার্শনিক গ্রন্থ ১২ খন্ড-১৮৯০-১৯০৮) গোবিন্দচন্দ্র দে-এর 'স্বামীদান' নাটক (১৮৯৫),জয়কুমার বর্ধন-এর 'অদৃষ্ট চক্র'(১৯১৭), বেগম ফয়জন্নেসা-এর 'রূপ জালাল', মহারাজা বীরবিক্রমমাণিক্যের 'আমার সোনামুড়া বিভাগ পরিভ্রমণ' ডায়ারি (১৯২৩খ্রিঃ) এবং ব্রজেন্দ্রনাথ দত্তের 'উদয়পুর বিবরণ'(১৯৩০) প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত ত্রিপুরার শ্রীরাজমালা প্রথম লহর (১৯২৬ খ্রিঃ) দ্বিতীয় লহর-(১৯২৭), তৃতীয় লহর-(১৯৩১) এবং পঞ্চমাণিক্য (১৯৪১) রচনা করে ঐতিহাসিক পন্ডিত হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। মহারাজকুমার সমরেন্দ্র দেববর্মন-এর ভারতীয় স্মৃতি (১৯২৬), ত্রিপুরার স্মৃতি(১৯২৭), আগ্রার চিঠি (১৯২৮), মহম্মদ সিরাজুদ্দিন আবু জাফর বাহাদুর শাহ(১৯৩০) রচনাগুলিতে প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখেন। পরবর্তী সময়ে দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য-এর প্রবন্ধ রত্নাবলী(১৯৩৮) এবং শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী (উমাকান্ত একাডেমী প্রধান শিক্ষক)-এর আদি আর্য ভূমি(১৯২৭), ত্রিপুরায় প্রাচীন ইতিহাস(১৯২৮) প্রকাশিত হয়।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মুদ্রণ জগতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হিতৈষণা প্রেস(পরবর্তীকালে সন্তান প্রেস-এ রূপান্তরিত)। ঐ সময়ে যে সব কৃতি লেখক সাহিত্যচর্চা শুরু করেন তাদের মধ্য উল্লেখযোগ্য ছিলেনঃ গঙ্গাচরণ নমঃশূদ্র (জ্ঞানামৃত-১৯১৮), আক্রামউদ্দিন(হাদিম ১৯১৮), মৌলবী

আবদুল লতিফ খান(সত্যপ্রকাশ-১৯২০), বঙ্গচন্দ্র (বসন্তোৎসব-১৯২০), মনিরুদ্দিন আহাম্মেদ (সম্যক চিত্র-১৯৩৮) মৌলভী জিল্লুর, রহমান (কংগ্রেস ও মুসলিম সমাজ-১৯৩০), বঙ্গচন্দ্র সেন, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী (কৈবর্তনাথ জাতীয় সমিতি-১৯০৮) বিধুভূষণ সরকার (শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম-১৯০৯), প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্তী জ্ঞান উদাহরণ-১৯১১), সুরেশচন্দ্র ঘোষ (স্নেহ উপহার-১৯১৪) প্রভৃতি। একথা অনস্বীকার্য যে পঞ্চদশ শতক থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের প্রযত্নে বাংলা সাহিত্য চর্চা প্রাসাদী মহলের গন্ডি অতিক্রম করতে পারে না। আশার কথা, স্বাধীনতা উত্তরকালে স্থানীয় লেখকগোষ্ঠী যেভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বকীয়তাবোধ এবং বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্যের সঙ্গে গণচেতনার আত্মীকরণের প্রচেষ্টায় রত তাতে ত্রিপুরার সাহিত্য জগতে যে নবদিগন্তের সৃষ্টি হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উপজাতি সাহিত্য

রাজন্য ত্রিপুরায় ককবরক ভাষা প্রাসাদীমহলের আশীর্বাদ পুষ্ট না হলেও মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্যের আমলে ত্রিপুরি ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ত্রিপুরার দুইজন কৃতী সন্তানের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। তারা হলেন সোনামুড়া মহকুমার লব্ধ প্রতিষ্ঠিত উকিল দৌলত আহাম্মদ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সে সময়কার হাইকোর্টের বিচারক, ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মন। কবি দৌলত আহাম্মদ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'ককবরকমা' নামে ত্রিপুরি ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। পরবর্তী সময় কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বইটি প্রকাশ করেন। ঠাকুর রাধামোহন স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তিনটি মূল্যবান বই যথাক্রমে ত্রৈপুর ব্যাকরণ (১৯০৩), ত্রৈপুর ভাষা অভিধান (১৯১৭) এবং ত্রৈপুর কথামালা(১৯১৯) প্রকাশ করেন। কথিত আছে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে জে.ডি. এন্ডারসন সাহেব পার্বত্য ত্রিপুরার গ্রাম্যশব্দ সংগ্রহ করেন। A short history of words of the Hill Tiperah Language নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকটির হদিস পরবর্তীকালে পাওয়া যায় নি। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'রবি' পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র দেববর্মার উল্লেখযোগ্য কিছু সংখ্যক উপজাতীয় রূপকথা এবং প্রাক্তন সাংসদ বীরেন দত্ত এর 'ত্রিপুরার লোকগীতি' প্রকাশিত হয়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ত্রিপুরার উপজাতিদের সাহিত্য নিয়ে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অজিতবন্ধু দেববর্মন এবং প্রভাতচন্দ্র রায়। অজিত বন্ধু দেববর্মন সম্পাদিত 'অভ্যুদয়' পত্রিকায় উপজাতিদের শিক্ষা, ভাষা এবং বিশেষ করে তাঁদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে প্রখ্যাত শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণ ঠাকুর, জিতেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুর, প্রভাতচন্দ্র রায় প্রভৃতি বিদগ্ধজনদের মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হত। প্রভাতচন্দ্র রায়-এর 'চিনিহা' (সাপ্তাহিক) পত্রিকাও জনপ্রিয় ছিল। উক্ত পত্রিকার উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে ছিল, ললিতমোহন জমাতিয়ার 'ত্রিপুরার লোকসংগীত,' 'ত্রিপুর রুচামুং' 'ত্রিপুর রুয়ামুরুয়াই, ধরণীকান্ত দেববর্মার 'উপজাতীয় সঙ্গীত' এবং ধর্ম রায়ের 'উপজাতি গান'। দেশ বিভাগের ফলে ভিটে মাটি থেকে উৎখাত হওয়া পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙালী অংশের মানুষ যখন ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয় তখন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রীতি, সৌহার্দ্য এবং ভাবের আদান প্রদানের কারণে ত্রিপুরি ভাষা শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভূত হয়। সে সময় অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ত্রিপুরি ভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য স্টেট কংগ্রেস কমিটির মাধ্যমে সমগ্র ত্রিপুরায় ত্রিপুরা ভাষা প্রচার সমিতি গঠন করে।১৯৫৪সালে ২১ শে নভেম্বর আগরতলার কংগ্রেস ভবনে ত্রিপুরা ভাষা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন অমরেন্দ্র দেববর্মন ওরফে বংশী ঠাকুর। প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের অভাবে বংশী ঠাকুর যথেষ্ট পরিশ্রম করে 'ককতাংলই' নামে ত্রিপুরি ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন। ঐ বছরের জুলাই মাসে সুধন্বা দেববর্মন ত্রিপুরি ভাষায় মাসিক 'কতাল কথমা' (নূতন কাহিনী) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 'কতাল কথমা' সাময়িকীর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ককবরক ভাষী জনগণের মাঝে নবযুগের সূচনা হয়। কিংবদন্তি জননেতা দশরথ দেব সহ অন্যান্য লেখকদের রচনায় ককবরক সাহিত্য নতুনভাবে সমৃদ্ধ হতে থাকে। ধারাবাহিকভাবে সুধন্বা দেববর্মার রচিত 'চেথুয়াং' উপন্যাস পাঠককুলে আলোড়নের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্বল্পকালের মধ্যেই রাজনৈতিক কারণে বিহারের হাজারীবাগে কারান্তরালের সময় তার প্রকাশিত 'হাচুক খুরিঅ' (পাহাড়ের কোলে) উপন্যাস চারটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমাদৃত হয়। উপরোক্ত পত্রিকায় জ্যোতিলাল রতিমাণিক এবং রুবিরং দেবী 'ফুমুক মং'(ধাঁধা) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে যাদের

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল যেমন নবলক্ষ্মী দেবীর 'ছিক্লাবাই ছিক্লিবাই' (যুবক যুবতীদের ভাগ) দশরথ দেববর্মার 'গান্ধীজী কক্লাম', রবীন্দ্র দেববর্মার 'ত্রিপুরী প্রবন্ধ', মহেন্দ্র দেববর্মনের ত্রিপুরি শব্দার্থ ইত্যাদি। উল্লিখিত লেখক লেখিকা ছাড়াও প্রায় একই সময়ে ত্রিপুরার প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ এবং সাহিত্যিক সুধীরকৃষ্ণ দেববর্মনের 'ককতাং' নামে ত্রিপুরি ভাষা শিক্ষার জন্য একটি মূল্যবান বই প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি 'সুরুং মা ইয়াক্লি' নামে অপর একটি বই লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর শক্তি চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ত্রিপুরার শিক্ষা অধিকার কর্তৃক 'সাক্ষর' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মনের 'আদিবাসী লোকসংগীত', অজিতবন্ধু দেববর্মনের 'রূপকথা' এবং শান্তিময় চক্রবর্তীর 'য়্যাপ্রিকতাল' প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, ত্রিপুরার প্রাক্তন উপদেষ্টা জীতেন্দ্রমোহন দেববর্মনের ত্রিপুরি ভাষায় শব্দের অভিধান 'ককবরক সুরুংমা' প্রকাশিত হয়।

ষাটের দশকে জুমভিত্তিক সংস্কৃতি থেকে যখন আদিবাসীরা হালকৃষিতে অধিক মাত্রায় প্রবেশ করছিল তখন আদিবাসী সংস্কৃতি বিলুপ্তির আশঙ্কায় যে সব লেখক গোষ্ঠী ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন অজিতবন্ধু দেববর্মন ('('কক-ছুরুংমা'-১৯৫৯), জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ('ত্রিপুরা কোরং কথমা'-১৯৫৯), নেপালদেবের সম্পাদিত কল্লোল পত্রিকায় (১৯৬০), মহেন্দ্র দেববর্মন লিখিত উপজাতীয় ছড়া গান; ত্রিপুরার অধিকার কর্তৃক ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মনের 'ত্রিপুর কথামালা'র পুর্নমুদ্রণ, শান্তিময় চক্রবর্তী-র মহাভারতের ত্রিপুরিভাষায় অনুবাদ গ্রন্থ 'ভারতানি পান্চলি'(১৯৬০) এবং অজয় দেববর্মার ত্রিপুরি ভাষায় 'কক্‌তুন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে কিছু রবীন্দ্রসংগীত যেগুলি ত্রিপুরায় অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন সেগুলি অজিতবন্ধু দেববর্মন 'ত্রিপুরা সংহতি' পত্রিকায়(১৯৬১)প্রকাশ করেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন এই পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রিয়ংবদা দেবীর 'মখরাছা' (বানরটা), মায়ুংকুফুর(সাদা হাতি), 'খুমপুরি বাররুরুক' (ভুইচাঁপা), সিপিংতুই মাইরুংতুই (নাম) 'ছাক্‌লক মতাই' (পূজা), 'কমলাবতী নিকক্' 'রাজপুত রিয়াং' প্রভৃতি রূপকথা প্রকাশিত হয়। এছাড়া অজিতবন্ধু দেববর্মন এবং প্রিয়ংবদা দেবী মিলিতভাবে 'তিপ্রা' এবং শান্তিময় চক্রবর্তীর রামায়ণের ত্রিপুরি অনুবাদ রামায়ণ কচরজাক্ একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বল্পকাল পরে

ক্ষীরোদপ্রভা দেবীর 'তালনি বছাজা' ও 'ত্রিপুরার রূপকথা'(১৯৬৫) এবং অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরার 'ত্রিপুর সংহিতা' (১৯৬৬) প্রকাশিত হয়।

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে উপজাতি সাহিত্য রচনায় যে বিশেষ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল সেটি আন্দোলনের রূপ নেয় ষাট এবং সত্তরের দশকে। ১৯৬২ সালে মোহন চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন কক্‌বরক ভাষীদের নিয়ে 'ককবরক উন্নয়ন পরিষদ' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ত্রিপুরি ভাষাকে লিখিতরূপে উন্নত করার উদ্দেশ্যে ওই সমিতির উদ্ভব। সমান্তরালভাবে, অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা আগরতলা জগন্নাথবাড়ি রোডে সৌমেন্দ্র দেববর্মনের বাড়িতে ত্রিপুরি ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনে 'ককবরক রিগ্‌থাইমা'(১৯৬৭)নামে একটি পুস্তক রচিত হয়। ঐ সময়ে মহেন্দ্র দেববর্মনের সম্পাদনায়, সাপ্তাহিক 'ইয়াপ্রি', অজয় দেববর্মনের সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'চিনি-কক্‌' পত্রিকার ত্রিপুরিভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয়। একক উদ্দেশ্যে অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরার ত্রিপুরী শিক্ষক' ও 'ইয়াপ্রি' পত্রিকার নিখিল দেববর্মনের রচনা 'সহজ ত্রিপুরী শিক্ষা' এবং শান্তিময় চক্রবর্তীর রচনার অনুবাদ 'খনা সামানি কক্‌বথপ' প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখ্য একই সময়ে অজিতবন্ধু দেববর্মন কর্তৃক ত্রিপুরি ভাষার ইংরাজি-ত্রিপুরি অভিধান 'কক্‌রবাম (১৯৬২)প্রকাশিত হয়। এছাড়া সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শাতিময় চক্রবর্তীর যুগ্ম সম্পাদনায় ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকার কর্তৃক 'রিয়াং'(১৯৬৮) বইটি আত্মপ্রকাশ করে। এক বছর বাদে বিশ্রামগঞ্জ আদিবাসী ছাত্ররা ত্রিপুরি ভাষায় 'আনি ত্রিপুরা'(১৯৬১) নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করে। মোটের উপর ষাটের দশকে ককবরক ভাষার উন্নয়নের জন্য যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করেই ককবরক সাহিত্য সভার সৃষ্টি এবং এই সাহিত্য সভা থেকেই পরবর্তীকালে কক্‌বরক লিপি সমস্যার 'মত ও পথ' (১৯৭০) নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন ত্রিপুরা কক্‌বরক উন্নয়ন পরিষদের সাহচর্যে অধ্যাপক সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভাষাতত্ত্বের গবেষক কুমুদরঞ্জন কুণ্ডু এবং শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য মিলিতভাবে ত্রিপুরি কথ্যভাষাকে লেখ্য ভাষায় রূপদানের গবেষণায় দীর্ঘসময় রত থেকে ত্রিপুরার কক্‌বরক ভাষার লিখিত রূপে "উত্তরণ"(১৯৪২) নামে একটি বই প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে গত পঞ্চাশ বছরে উপজাতি সাহিত্যের যে

চর্চা হয়ে আসছে তাতে ত্রিপুরার উপজাতি সাহিত্যের ক্রম বিবর্তনের রূপ ধরা পড়ে। সত্তর দশকের প্রথমার্ধে দশরথ দেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের মুখপত্র 'লামা'। মুখপত্রটিতে উপমাবহুল প্রবন্ধ, গল্প এবং বিশেষ করে তাঁর 'আনি ময়তু রায় গণমুক্তি পরিষদ'(আমার স্মৃতিতে গণমুক্তি পরিষদ) কৃতিত্বের সাক্ষর বহন করে। পরবর্তীকালে মুখপত্রটির সম্পাদনায় দায়িত্ব বর্তায় সাহিত্যিক নিরঞ্জন দেববর্মার ওপর। সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে দীনেশ দেববর্মা, জীবনমুক্তি ত্রিপুরা, নরেশ দেববর্মা, নগেন্দ্র জমাতিয়া, হরিপদ দেববর্মা, নিতাই আচার্য, সুনীল দেববর্মা, শ্যামলাল দেববর্মা, স্নেহময় রায়চৌধুরী, কুঞ্জবিহারী দেববর্মা, রবীন্দ্রকিশোর দেববর্মা, নরেন্দ্র দেববর্মা, চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং, উদয় কলই, চিত্তরঞ্জন জমাতিয়া, নন্দকুমার দেববর্মা, কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী, গীত্যকুমার রিয়াং, বিকাশ রায় দেববর্মা প্রমুখ লেখকগণ কক্‌বরক সাহিত্যের সমৃদ্ধির কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। আগামী দিনে ককবরক সাহিত্যের লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক গবেষকরা উপজাতি সাহিত্যের মর্যাদাবিকাশে সমর্থ হবেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

।। লোকসঙ্গীত।।

মিশ্র বসতির কারণেই ত্রিপুরায় লোকসঙ্গীতের ধারাও মিশ্র প্রকৃতির। ত্রিপুরার রাজমহল জারিগানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আগরতলা-আসাম রোড যা কুর্তি রোড নামে পরিচিত সেই রাস্তাটি নির্মাণের সময় মাটি কাটার প্রয়োজনে ঠিকাদারের শ্রমিক হিসাবে বংশ পরম্পরায় অবস্থানরত পাহাড়ের মুসলমান শ্রমিকদের নিয়োগ করতেন। শ্রমিকেরা তাদের কাজের অবসরে জারিগানের আসর বসিয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন। এইরূপ জারিগানের প্রত্যক্ষ শ্রোতা ও গবেষক রমাপ্রসাদ দত্ত কয়েকটি নমুনা তুলে ধরেছেন। যেমন ঃ

দোহারবৃন্দ ঃ ওই কৈলাশহরের পাখি
আমার সকল নিয়া কই গেলাগা তুমি?
১ ম গায়ক ঃ আমি পরথম বন্দনা করি ঊনকোটি মায়
সকল বিপদ কাটিবে তোমার জানিবা নিশ্চয়।

২য় গায়ক ঃ আমার গুরু চৌদ্দ দেবতা ত্রিপুরাতে ঘর
হেন কাছেতে বাধা আমার জমিন বাড়িঘর।
৩য় গায়ক ঃ হের পারে বন্দনা করি ত্রিপুরেশ্বরী মার
যার দৌলতে দেশ বিদেশে জারি গায়েন গায়

উপরোক্ত জারিগানে সমতল ত্রিপুরা, কুমিল্লা, নোয়াখালীএবং শ্রীহট্টের প্রভাব সুস্পষ্ট। উল্লেখ্য সুফি সম্প্রদায়ের মত মানুষ শব্দের অর্থ হল সব সংস্কার মুক্ত পূর্ণ মানুষ। সেখানে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নেই। তারা মনে করেন যে মানুষের মৃত্যু হয়েছে তার আবার জাত কি? আত্মার মৃত্যু নেই। তাই সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত ইন্দ্রনগরের ঝুনকো শেখ, গজারিয়ার আবদুল বারি প্রভৃতি কণ্ঠে শোনা যেত ঃ

"মাণিক চিনতে কয়জন পারে,
গুরু যারে কৃপা করে।"
কিংবা
"উইড়্যা যায়রে হংসের পাখি
পইড়্যা রইছে ছায়া,
দেশের মানুষ দেশে যাইবে
কে করিবে মানা।"

এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরার বাউল গানের গায়কদের মধ্যে রমেশ বাউল, অনুকূল দাস, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দেশ বিভাগের পর রমেশ বাউল ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আগরতলায় চলে আসেন। তাঁর গাওয়া জনপ্রিয় গানটি ছিল।

"ভিক্ষা দেওগো লক্ষ্মী মাগো
বিধি লিখছে দুখ
কাওয়া লাগাইছে গন্ডগোল।"

এখানে উল্লেখ্য ত্রিপুরার উপজাতি সম্প্রদায়ের কুকিদের ভাষায় অনেক লোকগীতি আছে। বাংলা ভাষার লোকগীতিও কোনো কোনো কুকি কবি লিখেছেন। যেমন মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর কুকি রাজা বানখুম্পই রাজাকে উদ্দেশ

করে যে সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন সেটিও তৎকালে ত্রিপুরার খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। যেমন ঃ

"কে ভাঙ্গিল মোর হেন ঘুম ঘোর
সুখের স্বপন নাশি
শুনাইল কথা বিষম বারতা
কানের নিকট বসি।"

সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে ত্রিপুরার মহারাজ যশোধরমাণিক্য (১৬০০-১৬২২খ্রি:) যখন মুঘলদের হাতে পরাজিত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন জনৈক গ্রাম্য বাঙালী কবির রচিত গানে প্রজাগণের অন্তরের অনুভূতির আশ্চর্য রূপ লাভ ঘটে-

"রাজা কৈ গেলারে
তোমার সোনার উদয়পুর কারে দিলারে।
কতদূর গিয়া রাজা ফির‍্যা ফির‍্যা চায়,
(আমার) সোনার মোরান পাল্কী
মোজ্ঞালে দৌড়ায়....."

ত্রিপুরার আদিবাসীদের জীবন সঙ্গীত মুখর। এদের প্রধান উপজীবিকা জুম চাষ। জুমচাষকে কেন্দ্র করেই এদের জীবনচর্চা, এদের সংস্কৃতি। আজও প্রাচীন পদ্ধতিতে তারা জুম চাষ করে। জুমকে কেন্দ্র করে এদের লোকসংগীত খুবই জনপ্রিয়। জুমের কাজ করতে করতে যুবকরা যুবতীদের উদ্দেশে সুর ধরে গান করে

"অ যাদু হাপুং চলংগ তকছা পুংমানি
বাছাই হারুংগ খনা?
প্রাণ যাদু সংবাই কক সলায় মানি
বাহাই মাই অ সখ্না"?

বঙ্গানুবাদ:

হে প্রিয় পর্বত শিখরে পাখির কুজন
কেমনে গুহায় শোনা যায়?

প্রেমিকের সাথে প্রেমালাপ
কেমনে মা-বাপ জানতে পায়?

এভাবে জুমচাষের কাজ চলতে চলতে এক সময়ে কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেবার সময় যুবক যুবতীদের মনে লাগে বসন্তের ছোঁয়া। চলতে থাকে রাগ অনুরাগের পালা। ঘরে ঘরে ফসল উঠার পর অভিভাবকরা মন দেয়া নেয়া যুবক যুবতীদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন। উভয়পক্ষ সম্মতি দিলে পাত্রকে পাত্রীর বাড়িতে 'জামাই খাটা' হিসাবে থাকতে হয়। পাত্র যদি পাত্রীর এবং পাত্রীর মা বাবার মন জয় করতে পারে তাহলেই পাত্র প্রণয়ীকে লাভ করতে সক্ষম হবে।

আদিবাসী লোক সঙ্গীতের মধ্যে 'সিয়ার খাগড়া' আর একটি জনপ্রিয় সঙ্গীত। এই সঙ্গীত মূলত যুদ্ধসঙ্গীত। স্বামী যখন যুদ্ধ করতে যায় তখন তার স্ত্রী স্বামীর বিরহে যে গান গায় সেটি 'সিয়ার খাগড়া' নামে পরিচিত। বিরহিনীর গানটি এইরূপ ঃ

"হাছছক্ কলক্ মাইসুই পিংজাগই
পাগড়ি নুরুগলিয়া যাহ পাগড়ি নুরগলিয়া"

বঙ্গানুবাদ :

দীর্ঘ পার্বত্য পথ দোপাটি ফুলের গাছ বপন করায় তার (স্বামীর) গোড়ালি আর দেখা যায় না। কল কল শব্দকারী ঝরনার ধারে মাঠ প্রস্তুত করায় ডাকলেও শুনতে পায় না।

উপজাতীয় লোকসঙ্গীত তাঁদের জীবন যাত্রার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। যেমন সুতো কাটা, কাপড় বুনা, জুম কাটা, জুম লাগানো, ধান কাটা, তুলা সংগ্রহ, শিকার, মাছ ধরা, নবান্ন খাওয়া, গড়িয়া পূজা, বিবাহ, শোক প্রকাশ, ইত্যাদি যাবতীয় উৎসবে জীবনের চিত্র তাদের লোকসঙ্গীতের উৎসমূল। বৎসরের শেষে প্রকৃতিকে বিদায় জানিয়ে নতুন বর্ষকে আহ্বান করে 'গড়াইয়া' নৃত্য এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে।

"গড়িয়ানি ছেংগারক
আমা মাইলুমা, আমা খোলোমা,

গড়িয়া রাজা দেশ বেড়ায়
চাব ঃ চাবাইয়্যা নুং বঃ থুং বাইয়্যা"

সারা বছর হাড় ভাঙা খাটুনির পর জুমের পাহাড় থেকে যখন ফসল ঘরে উঠল তখন নারী পুরুষ সবারই মনে এক অনাবিল আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। খুশিতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখ ঝলমল হয়ে উঠে। নতুন ফসলের দ্বারা 'নবান্ন' রাঁধা হয় এবং 'সমিতা' দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে সকলে মিলে ওই অন্ন গ্রহণ করে। এই নবান্ন 'মামিতা' উৎসবে, ছেলে মেয়ে যুবক যুবতী সকলে দলবদ্ধভাবে নৃত্যের তালে গাইতে থাকে ঃ

রাজা বা কাইসং অশনি মতাই,
কাঙ্গাল মামিতা মতাই।
সাগমি সাগ্ বাক্শা, দশ বায়ারক
কাঙ্গাল মামিতা মতাই।
কামিং কাচঃকক্ নক কুড়ি দক্
চৌধুরী খাখুল যাইছি
কাঙ্গাল মামিতা মতাই রমানি
চা-নামি কাদ্-নামি ফাইছি...." ইত্যাদি।

ভাবার্থ :

রাজারা করে দুর্গোৎসব, কাঙ্গালেরা করে নবান্ন পূজা। সবাই সমান। গ্রামের লোক, কাঙ্গালের নবান্ন পূজা ছয় কুড়ি ঘর বড়পাড়া, সর্দার চৌধুরী দেখো কাঙ্গালের নবান্ন পুজোর খাওয়াতে সকলে মিলে এসো।

ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে মণিপুরি সঙ্গীত ও নৃত্যের উল্লেখ আবশ্যক। কথিত আছে মণিপুরের মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র(১৮২১-২৬খ্রিঃ) মনিপুরে প্রথম বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করেন। এই রাজার কন্যাকে ত্রিপুরেশ্বর রাজধরমাণিক্য (১৫৮৬-১৫৯৯)তাঁর মহিষী রূপে বরণ করেন। মণিপুরিরা অবশ্য রাজপরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই প্রথম ব্রহ্মাযুদ্ধের সময় থেকেই রাষ্ট্রবিপ্লবের দরুণ রাজ্য পরিত্যাগ করে অনেকেই কাছাড়, শ্রীহট্ট, এবং ত্রিপুরায়

বসতি স্থাপন করেন।

আগরতলায় রাধানগর এলাকায় মণিপুরিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নাট মন্দিরটি রাসলীলার স্থান। রাসলীলাকে কেন্দ্র করেই মণিপুরিদের লোকসঙ্গীত ও নৃত্য চর্চার সূচনা। মণিপুরি গ্রামের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি গ্রামের কেন্দ্র স্থানে একটি মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত হয়। মণ্ডপে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে দেবতার সেবা পূজার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করা হয়। ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে স্ত্রী পুরুষগণ সম্মিলিত হয়ে সংকীর্তন করে। স্থানীয় প্রথা অনুসারে রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলন যাত্রা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বৈষ্ণব পর্বোপলক্ষ্যে প্রতি মণ্ডপে সংকীর্তন এবং রাসলীলার অভিনয় হয়ে থাকে।

রাসনৃত্যের সময় মণ্ডপ সজ্জাটিও দেখার মতো। মণ্ডপটিকে পাতা, ফুল, রঙ বেরঙের কাগজ দিয়ে সাজানো হয়। চারদিকের বারান্দাটি বাদ দিয়ে ভিতরের স্থানটি দুটি বৃহৎ চক্রাকারে সাজান হয়। একটি রঙ চক্রের মাঝে আর একটি চক্র রাখার নিয়ম। কাষ্ঠস্তম্ভের শীর্ষ অল্প প্রশস্ত লাল কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়। ভিতরের সজ্জিত চক্রের মধ্যস্থলে একটি উঁচু কাষ্ঠ বেদিতে শ্রীরাধাকে বামে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াবেন। বেদিটি মঞ্চের চতুর্দিকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করা যায়।

রাসলীলা শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে একটি দল খোল-করতাল নিয়ে সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে। পরবর্তী পর্বে পুরোহিত যখন মঞ্চে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার মূর্তি স্থাপন করেন তখন মণিপুরি নর্তকীদের অপূর্ব ভঙ্গিমায় নৃত্য চলতে থাকে। নৃত্যের সময় এক পঙ্‌ক্তির পিছনে অন্য আর এক পঙ্‌ক্তির সুসজ্জিত নর্তকীরাও পালাক্রমে নাচে। নৃত্যের সাজসজ্জায় মারোয়ারি লারী(ব্রজনারী) এবং মণিপুরি নারীদের পোশাকের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। কানে ফুল, মাথার উপরে চূড়ার মত করে খোঁপা বাঁধা, সঙ্গে পুষ্পগুচ্ছ। ঘোমটার জন্য এক টুকরো সাদা নেটের কাপড় মাথা থেকে মুখ পর্যন্ত ঢাকা থাকলেও মুখশ্রী অদৃশ্য থাকে না। সবার একরকমের অলঙ্কার থাকে না। কারোর সোনার বালার মধ্যে লাল চুড়ি, কারোর বা কাঁধে জরির কাজ করা আঁচল ঝুলত। আঁচলে কাচের টুকরো বসানো অথবা সোনালি রঙের শেকলে ঝুলানো পুতি থেকে আলো ঠিকরে পড়ত। জনশ্রুতি, রাজা ভাগ্যচন্দ্র রায় গোপিদের যেরূপ পোশাক স্বপ্নে দেখেছিলেন সেরূপ পোশাকই আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। এই পোশাকের আর কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবে

বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে তাঁরই নির্দেশে নর্তকীরা গায়ে একখানা কুসুম রঙের পৃথক ওড়না বেঁধে নিত। উল্লেখ্য, ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ মালাবারের 'কথাকলি', তাঞ্জোরের 'ভারতনাট্যম', জয়পুর, দিল্লি এবং লক্ষ্ণৌ-এর 'কত্থক নৃত্য' এবং মণিপুরি 'রাসনৃত্য' শুধু ভারতে নয় সারা বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজে স্বীকৃত। কলা-কুশলীদের মতে 'কথাকলি', 'ভারত নাট্যম' আর 'কত্থক'-এর মধ্যে আঙ্গিকের জটিলতা এবং করণ-কৌশলের কাঠিন্য জনগণের নিকট থেকে নৃত্যসমূহকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে মণিপুরি নৃত্যকলা তা থেকে অনেকাংশে মুক্ত। বলা যেতে পারে, ভারত মুনি, নন্দিকেশর প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্র রচয়িতাদের উল্লিখিত বিভিন্ন ভঙ্গি করণ কৌশল এখানে সমভাবে প্রযুক্ত। যেমন 'অবেষ্টিত' 'উদ্‌বেষ্টিত', 'ব্যবর্তিত', পরিবর্তিত এই চারটি মৌলিক হস্তভঙ্গি মণিপুরি নৃত্যকলায় বিশেষ অঙ্গ রচনা করেছে। এছাড়া উন্নত কটি ও সমুন্নত কটি শাস্ত্রোক্ত এই দুই মণিপুরি নৃত্যের গঠন শৈলীকে মনোরম করে তুলেছে। ছয় মাত্রায় 'দাদরা', সাত মাত্রার 'তেওড়া', দশ মাত্রার ঝাপতাল, চৌদ্দোমাত্রার 'আড়া চৌতাল', এবং পনেরো মাত্রার 'পঞ্চম সেয়োরী' আর নানা জটিল মাত্রা 'লক্ষ্মী', 'বিষ্ণু' ও ব্রহ্মতালের বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ মণিপুরি নৃত্যছন্দকে অপরূপ গতিময় করে তুলেছে।

ত্রিপুরায় মণিপুরি নৃত্য ও সঙ্গীতে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বুদ্ধিমন্ত সিংহ, নবকুমার সিংহ, বৈকুণ্ঠনাথ সিংহ, চন্দ্রজিৎ সিংহ, নরেন্দ্রকুমার সিংহ প্রমুখ। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবনী (তৃতীয় খণ্ড) থেকে জানা যায় বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মণিপুরি নৃত্য প্রবর্তনে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে একজন অভিজ্ঞ মণিপুরি নৃত্য শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে লিখেছিলেন। মহারাজকুমার তখন বুদ্ধিমন্ত সিংহকে ত্রিপুরা থেকে পাঠিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে বুদ্ধিমন্ত সিংহ-এর পরিচালনায় তাঁর খোলের বোলের সঙ্গে মণিপুরি লোকনৃত্য শিক্ষা শুরু হয়(১৯১৯খ্রি)। শোনা যায় ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ, আগরতলায় মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোরের বাড়িতে 'রাসনৃত্য' দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে আরো ব্যাপকভাবে নৃত্যশিক্ষার প্রবর্তনে উৎসাহী হন। বুদ্ধিমন্ত সিংহের পর নবকুমার সিংহ শান্তিনিকেতনে যোগ দেওয়ায় এখানকার সঙ্গীত ধারা মণিপুরি নৃত্যের সমন্বয়ে অভিনবত্ব লাভ করে। উল্লেখ্য, স্বল্পকালের ব্যবধানে নবকুমার সিংহ 'নটীর পূজা'

নৃত্যনাট্যের নবরূপ দান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সদলবলে সিংহল গিয়েছিলেন, সে দলে তিনি নবকুমার সিংহকেও নিয়েছিলেন। সেখানে কবির 'শাপমোচন' নাট্য অভিনীত হয়। এই গীতি ও নৃত্যনাট্যের রূপায়ণে নবকুমার সিংহের অবদান ছিল সিংহভাগ।

ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে মণিপুরি সঙ্গীত ও নৃত্যের কলাকুশলীদের যাদের নামোল্লেখ করা হল তা সম্পূর্ণ নয়। সন্ধান করলে আরও অনেকের নাম জানা যাবে যারা বৃহত্তর ত্রিপুরার সংস্কৃতিতে এসেছিলেন এবং আছেন যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

নাট্যচর্চা

ত্রিপুরায় নাট্যচর্চার শুরু ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্যের আমল থেকেই। ওই সময়ে ত্রিপুরার দুটি নাট্য সংস্থা ছিল। একটি ছিল রাজার অঞ্চলে এবং অন্যটি আচার্য পাড়ায়। রাধাকিশোরমাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য ধারার অনুকরণে থিয়েটার 'উজ্জয়ন্ত নাট্যসমাজ' গড়ে উঠে। এদের প্রথম নিবেদন ছিল কুমার মহেন্দ্র দেববর্মনের লিখিত নাটক 'পতিব্রতা'। এই সংস্থার অধিকাংশ নাটক পরিচালনা করতেন ব্রজেন্দ্র মুখার্জি। উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজের মঞ্চে একই দিনে অভিনীত হয়েছিল কবিগুরুর 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন'। সমকালীন সময়ে ত্রিপুরায় নিজস্ব নাটক 'ত্রিপুর গৌরব' ঐ মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য আধুনিক নাটকের রীতি ও ধারার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি উজ্জয়ন্ত নাট্যসমাজের সঙ্গে জড়িত থাকলেও নিজস্ব পরিচালনায় গড়ে তুলেছিলেন 'পুষ্পবন্ত নাট্য সমাজ'। সঙ্গে ছিলেন নাট্যকার ব্রজেন্দ্র মুখার্জি এবং তাঁর সহকারী হিসাবে হরিপদ সেন এবং ম্যাজিসিয়ান শিল্পী প্রফুল্ল সেন। স্বল্পকালের ব্যবধানে মহারাজা বীরবিক্রমের রচিত ঐতিহাসিক নাটক জয়াবতী বা ত্রিপুরা সতী নাটকটি অভিনীত হয়েছিল।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে (১৯১৫) মহারাজকুমার সুরেন্দ্র দেববর্মনের পৃষ্ঠপোষকতায় খোসবাগ এলাকায় আর একটি নাট্য সংস্থা গড়ে উঠেছিল। ১৯১৮-১৯ সালে রণবীর থিয়েটার পার্টি আত্মপ্রকাশ করার পর আরও কয়েকটি নাট্যসংস্থা যেমন উমাকান্ত একাডেমীর 'ছাত্রনাট্য সংস্থা', এডওয়ার্ড মেমোরিয়েল মেডিকেল ইনস্টিটিউটের 'থিয়েটার পার্টি,' শ্রীপাটের তরুণ সংঘ ইত্যাদি গড়ে

উঠেছিল। বর্তমান গভর্নমেন্ট মিউজিক কলেজেই তৎকালে মেডিকেল ইনস্টিটিউট ছাত্রাবাস ও নাট্যমঞ্চ ছিল। উপরোক্ত তিনটি নাট্যসংস্থা তখনকার আগর এবং মফস্সলের জনপদে নাট্যাভিনয় করতো। ১৯২৬ সালে উমাকান্ত প্রাক্তণ ছাত্রদের উদ্যোগে 'স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন' নামে নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠিত অবশ্য মহারাজা বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করার পূর্বে সালে শারদীয়া পূজার সময়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিপুরা 'নাট্য সম্মিলনী' প্রতি হয়েছিল। এই নাট্য সংস্থা পর পর তিনটি নাটক 'গুরুদক্ষিণা', 'হিন্দুবীর' 'চাঁদকুমুদিনী' মঞ্চস্থ করেছিল। স্বল্পকালের মধ্যেই মন্ত্রী রাণা বোধজং পৃষ্ঠপোষকতায় 'মাতৃমন্দির থিয়েটার' এবং 'ত্রিপুর শিল্পায়তন' গড়ে উঠে উল্লেখ্য এই প্রথম ত্রিপুর শিল্পায়তনের নাটকে শিশির ভাদুড়ীর নাট্যরীতি প্র পরিলক্ষিত হয়। নৃত্যধারাটি লোকায়ত করার প্রধান কৃতিত্বের দাবিদার ত্রিপুরেশ মজুমদার। নাট্যচর্চায় তাঁর ত্যাগ, নিষ্ঠা ও অবদান ছিল অপরিসীম। শিল্পায়তন' নাট্য সংস্থার অধিকাংশ নাটকেরই পরিচালক ছিলেন শ্রীমজুমদার।

পরবর্তীকালে স্থানীয় নাট্যচর্চায় গতি সঞ্চার করেছিল ত্রিপুরা পুলিশ নাট্যসংস্থা। এরপর পরিচালক শিল্পী শক্তি হালদার ১৯৫৫ সালে 'লোকশিল্পী প্রতিষ্ঠা করেন। লোকশিল্পী সংসদের আগে পর্যন্ত ত্রিপুরায় নাটকের স্ত্রী পুরুষ অভিনেতারাই অভিনয় করতো। এই সংস্থার উল্লেখযোগ্য, অভি নাটকগুলির মধ্যে ছিল যথাক্রমে 'রক্তঝরা', 'ধৃতরাষ্ট্র,' 'রূপালী চাঁদ', 'বারো 'লক্ষ্মীপিয়ার সংসার', 'রানী জয়াবতী', 'কাঞ্চন রঙ্গ', 'আমাদের গ্রাম,' 'জটা বাঁধ', 'মঞ্জু', 'সীমান্তের ডাক', 'মেঘে ঢাকা তারা', ইত্যাদি। সমসাময়িক যুগে শিল্পী নাট্যসংস্থার মুখ্য পরিচালক শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচলিত নবনাট্য আন্দোলন ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে একাধিক নাটক যেমন -'দুঃখীর ইমান', 'শেষ কোথায়', প্রভৃতি মঞ্চস্থ করে কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন। এরপর ১৯৫৭ সালে ত্রিপুর শি সংহতির উদ্যোগে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য ও 'জুম পদ্ধতি' অনুষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যায় ১৯৪৭ সালের পর থেকেই বহু শিল্পী,সঙ্গীতশিল্পী ও অভিজ্ঞ অভিনেতার আগমনে ত্রিপুরায় নাট্যচর্চায় নৌ আবির্ভাব ঘটে। সৃষ্টি হয় নব নব নাট্য সংস্থা। বর্তমানকাল পর্যন্ত উল্লেখযো নাট্যসংস্থাগুলি হল 'নাট্যশিল্পী সংসদ', 'শিল্পশ্রী' 'শিল্পী সংগঠনী', 'পঞ্চপ্রদী

'শিল্পী সংসদ', 'আর্টিস্ট এসোসিয়েশন', 'শিল্পী সমাজ' 'কালচারাল ইউনিট', 'শিল্প-সন্ধানী', 'কৃষিগোষ্ঠী', 'কলাকার গোষ্ঠী', 'ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ,' 'মুখোশ', 'রঙ্গাম', 'রূপম', 'রূপারোপ', 'রূপায়ণ', ইত্যাদি। অভিনেতা হিসাবে যাঁরা কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন সুধাংশুমোহন দত্ত, হৃষিকেশ দেববর্মন, স্বদেশরঞ্জন পাল, সমরজিৎ চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্র চৌধুরী, সুখময় সেনগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ দাশগুপ্ত, সোমেন্দ্র মুখার্জি, ত্রিপুরেশ মজুমদার, নীলরতন গাঙ্গুলি , রানি কর, কণিকা দেবনাথ, লীলা দেব, মায়া দেব, যুথিকা গুপ্তা, শক্তি হালদার, শিশু সেন, তপেশ রায়, সুখময় ঘোষ, বামাপদ মুখোপাধ্যায় , সরোজ চৌধুরী, মানস দেববর্মা, সীতানাথ ব্যানার্জি প্রমুখ। উল্লেখযোগ্য নাট্যকারদের মধ্যে অগ্নিকুমার আচার্যের 'মৃত সৈনিকের ডায়েরী,' তমাল চক্রবর্তীর 'জয়াবতী' বা 'ত্রিপুরী সতী', রামকৃষ্ণ দেবনাথের 'হকুনার ছাও,' অজিত মজুমদারের 'নক্সীকথার মাঠ' রতীশ মজুমদারের 'দিন দিন প্রতিদিন', সুধাংশুবিকাশ সাহার 'বিদ্রোহী সন্ন্যাসী', চন্দন সেনগুপ্তের 'সাদা পায়রার জন্য' ইত্যাদি।

চারু ও কারুশিল্প এবং আরণ্যক সংস্কৃতি

রাজগি ত্রিপুরার মহারাজারা অতি প্রাচীনকাল থেকেই চারুশিল্প এবং কারুশিল্পের অনুরাগী এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাপড়ের উপর নকশা তৈরির কাজ, 'রিয়া' ও 'পাছড়া'তে সূক্ষ্ম কারুকাজ বিদেশেও সমাদৃত ছিল। তবে ত্রিপুরায় শিল্পচর্চা বিশেষভাবে বীরচন্দ্রমাণিক্যের (১৮৬২-১৮৯৬)-এর আমল থেকে শুরু হয়েছে। বীরচন্দ্রমাণিক্য নিজেই জল রং, তৈল রং ও আলোক চিত্রে পারদর্শী ছিলেন। কথিত আছে 'কে. ডি' নামে ঢাকার একজন ইংরেজ চিত্রকর বীরচন্দ্রের রাজসভায় ছিলেন। তিনি বীরচন্দ্র মাণিক্যের একটি অবিকল প্রতিকৃতি এঁকে দেওয়ায় মহারাজ খুশি হয়ে 'কে ডি' কে রাজসভায় নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের আঁকা ঝুলন সন্ন্যাসী, বংশীবাদন শিক্ষা প্রভৃতি ছবিগুলি এই যুগের শিল্পীদের নিকটও উচ্চ প্রশংসিত। মহারাজকুমার মহেন্দ্র দেববর্মন রাজ শিল্পশালার শিল্পীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। রাজ দরবারের শিল্পী ছিলেন শ্যামাচরণ চক্রবর্তী। এই সময় বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন অনিল কৃষ্ণ দেববর্মন। তাঁর আঁকা বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে ছিল 'মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য,' 'যিশুখ্রিস্ট' ইত্যাদি। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রমেন্দ্র চক্রবর্তী। ত্রিপুরায় তাঁর বিশেষ অবদান ছিল ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মজুমদার-এর

বহু মূল্যবান ছবি 'মডার্ন রিভিয়্যু' আন্তর্জাতিক আর্ট জার্নাল এবং লন্ডনের ডেলী মেল জার্নালেও উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। শিল্পী সুরেশকৃষ্ণ দেববর্মন এবং শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের শৈলেশ দেববর্মন যিনি নন্দলাল বসুর ছাত্র উভয়েই ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত সার্থক শিল্পী অপর দিকপাল প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন যিনি এক সময়ে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্র ছিলেন এবং পরে লন্ডন থেকে চারুশিল্পে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছিলেন। চিত্রকলায় তাঁর ছিল ভারত-জোড়া খ্যাতি। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে চিত্রনিভা দেবী একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর প্রদর্শিত ছবি সম্পর্কে 'যুগান্তর'-এর (১৩নভেম্বর, ১৯৭৩) ভাষ্য ছিল; আমাদের দেশে পোর্ট্রেট আঁকার চর্চা খুব কম-বিশেষ করে কোনো মহিলা শিল্পী নেই বললেই চলে। শ্রীমতী চিত্রনিভা দেবী এর মধ্যে এক মস্ত ব্যতিক্রম। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন সমরেন্দ্র ঘোষ, কমল চৌধুরী, কালীনাথ ভট্টাচার্য, শক্তি বর্মন, বিপুলকান্তি সাহা, মনোরঞ্জন পাল, শৈলেশ সিংহ রায়, সুনীল কর, রঞ্জনা চৌধুরী প্রমুখ।

দেশ বিভাগের পর যে সব শিল্পী সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন, শক্তি হালদার, বিমল কর, বিমল দেব, সুমঙ্গল সেন, শান্তি মুখার্জি, হৃষিকেশ দেববর্মন, সুধীর লস্কর, প্রশান্ত সেন,সত্যেন চক্রবর্তী মানস ভট্টাচার্য, বিপুলকান্তি সাহা, গৌতম দেববর্মন, স্বাতী দেববর্মন, সংঘমিত্রা নন্দী, স্বপন নন্দী, বিজন চক্রবর্তী, পার্থ দেব, মৃণাল চক্রবর্তী, স্নিগ্ধা দাশগুপ্ত, ধর্মনারায়ণ দাসগুপ্ত, মহারাজকুমার সহদেবকিশোর দেববর্মন প্রমুখ। বর্তমান ত্রিপুরার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থা ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ-এর উদ্যোগে প্রতি বৎসর স্থানীয় শিল্পকার্য নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন হয়ে থাকে।

কারুশিল্প ও আরণ্যক সংস্কৃতি

ত্রিপুরায় বাঁশ ও বেতের কারুশিল্প খুব প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী। রাজ্যের এক বিরাট জনগোষ্ঠী আদিবাসী, বাঙালি এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় এই শিল্পটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই শিল্পে বিধৃত রয়েছে গ্রামীণ ত্রিপুরার জীবনচর্যারূপ রেখা। গবেষকদের মতে কারুশিল্পের তিনটি মুখ্য ধারা। প্রথম ধারাটি ধর্ম এবং আচার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর একদিকে সৃষ্টি করেন আবার অন্যদিকে ধ্বংসও করেন। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে মানব কল্পনাকে মূর্ত করে কারুশিল্পীরা বংশ পরম্পরায় হাজার হাজার বছর ধরে এই ধারাটিকে অনন্য উৎকর্ষ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় ধারাটি সৌখিন কারুশিল্প সামগ্রীর। পূর্বে এই ধারার

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সামন্ত প্রভু-রাজা-বাদশা, জমিদাররা। বর্তমানে সামন্ত প্রথা বিলুপ্ত, এদের স্থান পূরণ করেছেন লোকায়ত সরকার, ধনী বণিক, শিল্পপতি এবং পেশাদাররা। তৃতীয় ধারাটি গড়ে উঠেছে দৈনন্দিন ব্যবহার উপযোগী সামগ্রী নিয়ে। এই ধারাটির ব্যাপ্তি বিশাল এবং উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর পৃষ্ঠপোষক আম জনতা।

কালের বিবর্তনে আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় এবং রাজনৈতিক কারণে পাহাড়ি-বাঙালি পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। এই জীবন-ধারায় এক মিশ্র সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটেছে। সাম্প্রতিক কারুশিল্পে এবং বয়ন শিল্পে মিশ্র সংস্কৃতির রূপরেখাটিও অত্যুজ্জ্বল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে আদিবাসীদের 'রিহা' ও 'রিগনোই' এর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নক্শা বর্তমানে উঠে এসেছে বাঙালির তাঁতে বোনা শাড়িতে, বেড-কভার ও চাদরে, সকল প্রকার আসবাবপত্রাদি বা গৃহসজ্জায়। আবার অন্যদিকে বাংলা তাঁতের নক্শা শোভা পাচ্ছে আদিবাসীদের পরিধেয় বস্ত্রে, আসবাব পত্রে। এই বিনিময় প্রক্রিয়া চলছে বহুদিন ধরে। উল্লেখ করা প্রয়োজন ত্রিপুরার কাঠের কারুশিল্প শুধু প্রাচীন নয় এর গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। বাঙালি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী যৌথভাবেই এর বিকাশ ঘটিয়েছে, যদিও উভয়ের শিল্পরীতি ভিন্ন ধরনের। ত্রিপুরার কারুশিল্পীদের তৈরি খোদাই করা কাঠের মূর্তি, মূর্ত ও বিমূর্ত ভাবনার অবয়ব, জন্তু-জানোয়ারের প্রতিমূর্তি, কাঠের সূক্ষ্ম কাজ করা আসবাব পত্র এবং সিংহাসন, খেলনা-পুতুল, গৃহ-সামগ্রী এবং শৌখিন শিল্প সামগ্রী খুবই জনপ্রিয়। ত্রিপুরার কাঠ দিয়ে শিল্প শোভন বাদ্যযন্ত্র তৈরিরও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। সাম্প্রতিককালে দরজা জানালায় কাঠের পাল্কিতে খোদাই-এর কাজ করে প্রাচীন বাঙলা ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস চলছে।

কারুশিল্প

ভারত সরকারের কারুশিল্প বিষয়ক উন্নয়ন কমিশনারের একটি প্রতিবেদনে (১৯৯৫-৯৬)দেখা যায় ত্রিপুরার মোট ২,৪৪,৪০০ জন কারুশিল্পী আছেন। প্রতিষ্ঠানগত হিসাবে ত্রিপুরায় মোট ৭৭,২৮০টি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রায় ২০০ টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আছে। মোট ২,৩৯,০৩৯ জন কারুশিল্পী গ্রামে বাস করেন। সামাজিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রাজ্যের মোট কারুশিল্পীর ৪১.৩৩ শতাংশ তপশিলি উপজাতি, ২১.৩৮ শতাংশ তপশিলি জাতি, ২১.২০শতাংশ অন্যান্য পশ্চাদপদ সমাজের। ত্রিপুরায় মহিলা কারুশিল্পীর সংখ্যা

বেশি। মোট ২,৩৩,৫৬০ জন কারুশিল্পীর আর্থিক অবস্থা দারিদ্র্য সীমারও অনেক নীচে। প্রতিটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান কারুশিল্প মাধ্যমে বছরে উপার্জন করেন ৪২৭১টাকা। প্রতি কারুশিল্পীর গড় উপার্জন বছরে মাতর ২১৪০টাকা। কারুশিল্পের শাখার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে ত্রিপুরার বাঁশ ও বেতের শিল্পেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কারুশিল্পী নিযুক্ত রয়েছেন। এদের সংখ্যা ২, ৪৯,৩৮০জন। অন্যান্য শাখায় সম্মিলিতভাবে নিযুক্ত আছেন মোট ৯৫,১১৫জন। রাজ্যের কারুশিল্পের মোট উৎপাদন ১৯৯৫-৯৬ সালে ছিল ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের। তার মধ্যে বাঁশ ও বেতের কারুশিল্পের উৎপাদন ছিল মোট ৩৫ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা মূল্যের। (তথ্য সূত্র ঃ সুবিমল রায় ঃ ত্রিপুরার বাঁশ ও বেতের কারুশিল্প)

সূক্ষ্ম কারুকার্য সমন্বিত বাঁশ ও বেতের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির স্বীকৃতি হিসেবে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের কথা ঘোষণা করার সময় থেকে আজ পর্যন্ত ত্রিপুরার কারুশিল্পীদের মধ্যে অনেকেই রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন গৌরাঙ্গ দাস,নীরদবিহারী দাস, শৈলেশ দাস, মন্টুচন্দ্র দাস, শুভেন্দু বিকাশ রায়, সুশীল নমঃ, মিহিরকুমার পাল, সবিতা নাথ, দুলুরানী দেবনাথ প্রমুখ।

ত্রিপুরার কারুশিল্পের প্রসারণে যারা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজকুমারী কমলপ্রভা ছিলেন অন্যতমা। আধুনিক শহুরে চাহিদা সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রখর বাস্তব ধারণা। তাঁর উদ্যোগে তৈরি হতে থাকে নানা নতুন ধরনের সামগ্রী। যেমন ঃ লেডি উইথ ল্যাম্প, কাসকেট, দেয়ালে রাখার হরিণের মাথা, পুতুল, আয়নার ফ্রেম, কলমদানি, ঝাড়বাতি ইত্যাদি। এইসব শৌখিন সামগ্রীর চাহিদাও প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু পর্যাপ্ত সরকারি আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় কমলপ্রভা দেবী তাঁর হাতের গড়া প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় সরকারি ঔদাসীন্যে এমন একটি যোগ্য প্রতিভাকে ত্রিপুরার বাঁশ ও বেতের শিল্প উন্নয়নের কাজে লাগানো গেল না। পরিতাপের বিষয় হল এমন একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্পের চাহিদা ক্রমশ কমে যাচ্ছে ধাতুর এবং প্লাস্টিকের সামগ্রী বাজারে আসার পর থেকে। শুধু শহরে নয় এমন কি গ্রামীণ সমাজেও বাঁশ ও বেতের সামগ্রী ব্যবহার এখন অনেকাংশে কমে গেছে। গ্রামের অনেক কারুশিল্পী চাহিদার অভাবে বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরি করার কাজে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

ত্রিপুরার বাঁশ ও বেতের শিল্প যথার্থই লোকায়ত শিল্প। এই শিল্পে রাজ্যের আদিবাসী এবং বসবাসকারী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রয়াসে শিল্পটিকে সমৃদ্ধ করেছে। ঐতিহ্যবাহী এই লোকায়ত শিল্পটি ত্রিপুরাবাসীর এক সাংস্কৃতিক সম্পদ। একে রক্ষার দায়ও ত্রিপুরাবাসীর।

পার্বত্য ত্রিপুরা এবং সমতল ত্রিপুরা এই দুই ত্রিপুরা মিলে বৃহৎ ত্রিপুরা। বহু শতাব্দি ধরে বাঙালি-পাহাড়ি এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে বসবাস করছে এক ভৌগোলিক সীমানায়। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক সীমানা বার বার পরিবর্তিত হলেও পাহাড় সমতলের সীমানা সব সময়েই আদিবাসী এবং বাঙালির মহামিলনের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। জীবন ও জীবিকার তাগিদে উভয়ের কাছাকাছি এসেছে। আদিবাসীরা সমতলের বাঙালিদের শুধু কাঁচামাল সরবরাহ করেনি উপরন্তু বাঁশ ও বেতের পণ্য তৈরি করার প্রকৌশল এবং প্রযুক্তিও সরবরাহ করেছে। বাঙালি কারুশিল্পীরা আদিবাসীদের কাছ থেকেই কারুশিল্পের প্রযুক্তিগত কৌশল লাভ করেছে। ত্রিপুরা মণিপুরি কারুশিল্পেরও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। রাজ্যে কারুশিল্পের ইতিহাসে এই ত্রিধারা ত্রিপুরা, বাঙালি, এবং মণিপুরি জনগোষ্ঠীর এক মিলিত ঐতিহ্যবাহী শিল্প ত্রিপুরার সংস্কৃতিকে এক নান্দনিক মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে।

ত্রিপুরার আদিবাসীদের জুমচাষভিত্তিক জীবনচর্যা তাদেরকে দিয়েছে এক বিশেষ সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতিকে বলা যায় আরণ্যক সংস্কৃতি। ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে পূজা-পার্বণ, ব্রত ও অনুষ্টান, বিবাহ ও উৎসব, খাওয়া-দাওয়া, নৃত্য সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য সব কিছুই আরণ্যক সংস্কৃতির বিবিধ উপাদান। আদিবাসী জীবন ও জীবিকায় এবং ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে সুপ্রাচীন কাল থেকে বাঁশ, বেতের ব্যবহার হয়েছে সর্বাধিক। তির, ধনু, গুলতি, বর্শা, পাখি রাখার খাঁচা, মাছ ধরার চাই, সেউতি, নানা ধরনের পাত্র সবই আদিবাসীরা তৈরি করেছে। উল্লেখযোগ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে খাড়া, খুদবক, কুলা বা কল্লি, রামফোরা, কিসির, খামযাই, লামযাই, উড়া, উফ্রা, কানিয়া, তপঙ, ডালা, ছিচিং, লামকোই, উছা ইত্যাদি।

আদিবাসীদের বিবাহ উপলক্ষ্যে যে মঞ্চ বা কুঞ্জটি তৈরি করা হয় সেটিও বাঁশ ও বেত শিল্পের উৎকৃষ্টতম নিদর্শন। ককবরক ভাষায় বলা হয় 'কাইলাই হাইয়া'। কেউ কেউ আবার বিবাহ মঞ্চকে 'কাইলাই হাইয়া দেবী' অথবা 'কাইলাই' বাড়িও বলেন। বাঁশ দিয়ে তৈরি ফুল কুঞ্জের প্রধান উপাদান। আদিবাসী কারুশিল্পীরা বাঁশ

দিয়ে নানা ধরনের ফুল তৈরি করতে পারেন। বাঁশের পাতলা চটি দিয়ে ফুলের তোড়া তৈরি করা হয়। ফুল, ফুলের তোড়া ছাড়াও বিবাহকুঞ্জে থাকে নানা ধরনের কারুশিল্প নিদর্শন।

ত্রিপুরার আদিবাসীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রধান গড়িয়া পূজা, খারচি পূজা এবং কের পূজা। গড়িয়া পূজা আদিবাসীদের সর্বজনীন পূজা। বিগ্রহটি বাঁশের তৈরি। এই পূজায় পাতাসহ কচি মূলী বাঁশের অগ্রভাগ ব্যবহার করা হয়। কের পূজাতেও থাকে বাঁশের বিচিত্র ব্যবহার। বাঁশ, তির-ধনু এবং বাঁশের শলাকা দিয়ে তৈরি করা হয় দেবতার প্রতীক। পূজার অগ্নি উৎপাদন করা হয় দুটো বাঁশের টুকরো ঘষে ঘষে। বাঁশের ব্যাপক ব্যবহার হয় তাদের পারলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে।

আদিবাসী সমাজের প্রতিটি পরিবারে এক বা একাধিক কোমর তাঁত আছে। একে ককবরক্ ভাষায় 'থানতি' বলে। স্মরণাতীত কাল থেকে আদিবাসীরা এই 'থানতি'র সাহায্যে তৈরি করে তাদের পারিবারিক প্রয়োজনীয় বস্ত্র সম্ভার। উল্লেখ্য, একমাত্র সুতা খাপি করার পাটাতন ছাড়া কোমর তাঁতের বাকি সব অংশই বাঁশের তৈরি। পাটাতনটি শুধু সুপারিগাছের কাণ্ড থেকে তৈরি। এমন কি মাকুটিও তৈরি করা হয় বাঁশ দিয়ে। বাঁশের শলাকায় ধরে রাখেন নকশা যা বংশ পরম্পরায় ব্যবহৃত হয়। আদিবাসী কারুশিল্পীদের আরেকটি দক্ষতার চমৎকার নিদর্শন-এদের গয়নার বাক্স কোনো জোড়া ছাড়াই একটি বাঁশের বিচিত্র রকমের বোনায় নির্মাণ করে। আদিবাসী কারুশিল্পীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী বাঁশের পণ্য সামগ্রী তৈরি করারসময় কোনো কৃত্রিম আঠা পর্যন্ত ব্যবহার করে না। এমন কি এমন জিনিস তৈরির সময় কোনো যন্ত্রপাতিও ওরা ব্যবহার করে না। বাঁশ কাটা থেকে শুরু করে সলাকা সূক্ষ্ম বেত বোনা পর্যন্ত সব কাজই এরা করে 'টাক্কালের' (অর্ধাকৃতি ধারালো ছোট দা) সাহায্যে।

আদিবাসী তাঁতীদের তাঁতবস্ত্রে বয়ন পারিপাট্যের নিদর্শন রয়েছে। নকশায় থাকে জ্যামিতিক প্রাধান্য। একই রেখা নানা বিন্যাসে সাজিয়ে তৈরি করা হয় পাহাড়, উপত্যকা, ঝরনা,পাখি আরও কত কি। বস্ত্রের জমিতে নানা বৈশিষ্ট্য। এদের বোনা প্রতিটি রিহা ও রিগনাই কারু শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে মণিপুরিদের বোনা তাঁতবস্ত্রও উল্লেখ করা যেতে পারে। মণিপুরি তাঁতবস্ত্রের মধ্যে লাইসাম্ফি বিখ্যাত। ত্রিপুরিদের মত এই তাঁতবস্ত্রগুলিও 'কোমর' তাঁতে বোনা হয়। লাইসাম্পির

ভিতরে থাকে কার্পাস তুলোর মোটা দড়ি। বস্তুটি হয় বেশ মোলায়েম এবং আরামপ্রদ। অল্প শীতে ব্যবহারের খুবই উপযোগী। এটি মণিপুরিদের ঐতিহ্যবাহী তাঁতবস্ত্র। কয়েক বছর আগেও এর চাহিদা ছিল তুঙ্গে। বর্তমানে এর উৎপাদন অনেক কমে গেছে দক্ষ শ্রমিকের অভাবে। কয়েকটি কারুশিল্পের উৎপাদন বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এইগুলির মধ্যে আছে হাতির দাঁতের শিল্প, পটচিত্র, শাঁখের কাজ, ছাতার বাট তৈরির কাজ, কুর্শির কাজ, মাটির সাজের কাজ, নারকেলের ছোবরা, মালা এবং আর্টের সামগ্রী। সুখের বিষয়, মৃতপ্রায় শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য ক্র্যাফটস্ কাউন্সিল অব্ ত্রিপুরা এবং মহিলা সমিতি ভারত সরকারের সহায়তা নিয়ে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে এসেছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ত্রিপুরা থেকে কিছু শিক্ষক এবং প্রশিক্ষককে শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হচ্ছে।

নক্‌শি কাঁথা ত্রিপুরার আর একটি উল্লেখযোগ্য কারুশিল্প। এটি মূলত বাঙালির লোকসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। সারা বাংলাতেই নক্‌শি কাঁথা শিল্পের প্রচলন রয়েছে। তবে পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) গ্রামীণ মহিলারাই এই কাজে বিশেষভাবে নৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পেরেছে। কথিত আছে ত্রিপুরায় নক্‌শি কাঁথার ঐতিহাসিক সূত্রপাত হয়েছিল রাজা রামগঙ্গামাণিক্যের আমলে(১৮১৩-১৮২৬খ্রিঃ) তাঁর রানি চন্দ্রতারা দেবী ছিলেন শ্রীহট্টের বঙ্গললনা। এককালে এ রাজ্যে 'সুজনি' (বসার আসন) শিল্পের বিশেষ খ্যাতি ছিল। রানি চন্দ্রতারা দেবী সুজনি শিল্পে অভিজ্ঞ মহিলা কর্মীদের শ্রীহট্ট থেকে এখানে নিয়ে এসে এই সূচি শিল্পের প্রবর্তন ও প্রসার ঘটিয়েছিলেন। তবে রাজতন্ত্রের যুগে এই সুজনিতে বসার একচেটিয়া অধিকার ছিল রাজপরিবারর লোকজনদের।

নক্‌শি কাঁথা তৈরি করাহয় সাধারণত ব্যবহার করা পুরনো কাপড় একত্রে দুই-তিনটি ভাঁজ করে নানা আকারের কাঁথা সেলাই করা হয়। সেই কাঁথার জমিতে বর্ডারে পুরনো শাড়ির পাড় থেকে নানা রঙের সূতো নিয়ে অথবা তাঁতিদের কাছ থেকে রঙ বেরঙের সূতো সংগ্রহ করে ছুঁচের মাধ্যমে কাঁথা সেলাই করা হয়। সেলাই-এর সময় তোলা হয় নানা রকমের নকশা উঠে ছুঁচের ফোঁড়ের বৈশিষ্ট্যে এবং রঙিন সূতোর নানা বিন্যাসে। পরিশেযে সূক্ষ্ম কাজের অপূর্ব প্রকাশ ঘটে নকশাতে। ভাল নক্‌শি কাঁথার শিল্প নৈপুণ্যের এক অপূর্ব শিল্পকীর্তি। বর্তমানে নক্‌শি

কাঁথার শিল্পশৈলী ব্যবহৃত হচ্ছে বেড্-কভার, টেবিল-কভার থেকে শুরু করে ব্লাউজে, রুমালে এবং অন্যান্য বিলাস সামগ্রীতে। ত্রিপুরার নক্‌শি কাঁথার শিল্পশৈলী দেশে ও বিদেশে স্বীকৃত এবং সমাদৃত।

আদিবাসী এবং বাঙালি, উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের অলঙ্কার প্রীতি, সুবিদিত। তারা গলায়, কানের প্রান্তে, সমস্ত কানে, নাকে, হাতের কবজি, কপালে, চুলের খোঁপায়, আঙুলে, রজুতে, পায়ের পাতায়, কোমরে, হাতের উপরিভাগে এক কথায় সর্বাঙ্গে গহনা পরতে ভালোবাসেন।

অতীতে আদিবাসী মহিলারা কাঠ, বাঁশ, দাঁত,হাড় এবং নানা জাতের বীজ দিয়ে অলঙ্কার তৈরি করতেন। আধুনিককালে ব্রোঞ্জ, তামা, পিতল, রূপা, সোনার অলঙ্কার প্রথম পছন্দ। অলঙ্কারের বিভিন্ন নাম, যেমন ঃ হাঁসুলি, কর্ণহার, পাঁচনরী হার প্রভৃতি। কানে দুল, ঝুমকা, কানপাশা। প্রত্যেক অলঙ্কারে থাকে নকশার বৈশিষ্ট্য। আদিবাসী এবং বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের অলঙ্কার তৈরি করেন বাঙালি স্বর্ণরৌপ্যের শিল্পীরা। এদের একটি গোষ্ঠী ত্রিপুরায় বসবাস করছেন রাজন্য আমলের সূচনা কাল থেকে। বাকিরা এসেছে পূর্ব বাংলা থেকে উদ্‌বাস্তু হয়ে।

ধর্ম ও সংস্কৃতি

জীবনচর্যার ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বত্রগামী। সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, সমাজনীতি, আচার-অনুষ্ঠান এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজ্ঞানও ধর্মাশ্রিত। সুতরাং ধর্ম নিয়ে আলোচনায় সংস্কৃতির প্রসঙ্গও অনিবার্যভাবে চলে আসে। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাক্-বৈদিক ও অবৈদিক ধারাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। প্রাক-বৈদিক ধর্মব্যবস্থা, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান নির্ভর, অপরদিকে উপজাতিদের ধর্মব্যবস্থার যে পরিচয় নৃতত্ত্ববিদদের অনুসন্ধানের ফলে পাওয়া যায় তা থেকে অবৈদিক ধারাটিকে সনাক্ত করা সম্ভব, যদিও তা সম্পূর্ণ অবিমিশ্র নয়। মোটের উপর প্রাক্-বৈদিক এবং অবৈদিক ধারাদুটিকে বিশদভাবে চিহ্নিত করার কার্যকর সূত্র হল ধর্মীয় সাহিত্য ও নানা ধর্মব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য যে পদ্ধতিকে বিদগ্ধজন সংস্কৃত আখ্যা দেন। সেটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তা কখনও একমুখী নয়। এই পদ্ধতির দ্বারা উচ্চতর সংস্কৃতির নানাদিক যেমন নিম্নতম ও উপজাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তেমনি ওই সকল সংস্কৃতির অনেক বিষয়কেই

উচ্চতর সংস্কৃতি আপন করে নিয়েছে। অবৈদিক, উপজাতীয় ও লৌকিক বিষয়াবলীর সংস্কৃতকরণের ক্ষেত্রে চারটি পর্যায় ও মাত্রাভেদ ছিল। যেমন ঃ পূর্ণ, অংশ, কলা ও কলাংশ। ভিন্ন সংস্কৃতির যতটা যে মাত্রায় অর্থাৎ সমগ্রভাবে, অথবা আংশিকভাবে, অথবা ভগ্নাংশে কিংবা আরও স্বল্প মাত্রায়। সমগ্রভাবে হলে জাতি কাঠামোর সোপানে তাদের অবস্থান শীর্ষে। যারা যত দূরবর্তী তাদের অবস্থান তত নীচের দিকে। এই পদ্ধতি এখনও অব্যাহত।

প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের সাক্ষ্য থেকে উপজাতি ধর্ম সম্বন্ধে জানা যায় যে, তারা জগৎ ও জীবনের উৎস হিসাবে মাতৃকাদেবীর উপাসক ছিল। দেবীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তিনি শবর, বর্বর ওপুলিন্দদের দ্বারা বিশেষভাবে পুজিতা হন। মহাভারতের দুর্গাস্তোত্রে দেবীকে বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলের নিবাসিনী বলা হয়েছে। শুধু তাই নয় তিনি মদ্য-মাংস-পশুপ্রিয়ারূপে কল্পিতা হয়েছেন। যা থেকে স্পষ্টতই সে যুগের উপজাতীয় শিকারজীবী মানুষদের দেবীর সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। মহাভারতের কিরাত পর্ব অধ্যায়ে শিব ও দেবী যথাক্রমে কিরাত ও কিরাতিনীর ছদ্মবেশে অর্জুনের সামনে হাজির হয়েছিলেন।

'বরাহ পুরাণে' দেবীকে 'কিরাতিনী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাক্পতির 'গৌড়বহো' নামক প্রাকৃত কাব্যে (শ্লোক ৩০৫) দেবীকে 'শবরী' বলা হয়েছে। বৌদ্ধ দেবী পর্ণশবরী আদিতে বৃহৎ সংহিতা কথিত পর্ণশবর উপজাতির দেবী ছিলেন। দুর্গাপূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গের নাম শাবরোৎসব বা শবরদের উৎসব যা অনুষ্ঠিত হত বিজয়া দশমীর দিনে। জীমূতবাহনের কালবিবেক গ্রন্থে শাবরোৎসবের বিশদ বর্ণনা আছে। 'বাক্পতি'র গ্রন্থে (শ্লোক-২৮৫-৩৪৭) বিন্ধ্যবাসিনীকে কালী ও পার্বতীর সঙ্গে অভিন্ন ঘোষণা করা হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে দেবীর সম্মুখে নরবলি দিয়ে শবরদের পূজা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'য় শবরদের উপাসিতা রক্তপিপাসু দেবী কাত্যায়নী বা ভগবতীর উল্লেখ আছে। অসমের চুটিয়া উপজাতিদের ধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গেইট বলেছেন যে তাদের দেবতা কেচাইখাতি 'কালী-র সঙ্গে অভিন্না হিসাবে বিবেচিতা যার পূজারিদের বলা হয় দেওরি। পূর্বে দেবীর সামনে নরবলি দেওয়া হত। আসামের বিখ্যাত কামাখ্যাদেবীও যে এককালে পরম রক্তপিপাসু ছিলেন তার প্রমাণ যখন নতুন মন্দিরের উদ্বোধন হত তখন দেবীর উদ্দেশ্যে ১৪০টি নরবলি হয়েছিল। অনুমান করা হয় আদিতে এই দেবী ছিলেন খাসি উপজাতির মাতৃদেবী 'কা-মে-খা',

যিনি পরে কামরূপের জাতীয় দেবীতে এবং পরবর্তীকালে তান্ত্রিক দেবী হিসাবে সর্বভারতে প্রসিদ্ধা হন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ও মধ্যপ্রদেশের উপজাতিদের পুরাতন মাতৃদেবীরা অনেকক্ষেত্রে হিন্দু নাম পেয়েছেন। উত্তর ভারতের আহিরদের মাতৃদেবী সচরাচর দেবী নামেই পরিচিত। যার প্রেমিক শিব। সিংভূম ও লোহারডাগার ভুঁইয়ার ঠাকুররানিরা বর্তমানে দুর্গা বা কালী নামে পূজিতা। উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে উপজাতি সংস্কৃতির অনেক ধর্মীয় বিষয় উচ্চতর সংস্কৃতি বৈদিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত হয়ে যায়। শুধু উপজাতি সংস্কৃতির ধর্মীয় ভাবই নয় এমন কি বৈদিক ভাষার শব্দভান্ডারেও অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষায় প্রচুর শব্দ ও ভাব-এর অস্তিত্ব রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে অস্ট্রিক দেবীবাচক শব্দ মাতৃকা তাই (পলিনেশীয় মাতরিকি) বৈদিক সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে। অস্ট্রিক 'রাকা' ও 'কুহু', পূর্ণিমা ও অমাবস্যার চাঁদ, বৈদিক সাহিত্যে দেবী হিসাবে স্থান পেয়েছে। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহে আমরা যে সকল নূতন দেবীর পরিচয় পাই সেই সকল দেবী কল্পনার উৎস প্রাক্‌বৈদিক কৃষিনির্ভর সমাজ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহে রাজপেয় যজ্ঞের প্রসঙ্গে যে ভূমি দেবীকে আহ্বান জানানো হয়েছে তিনি মানুষকে অন্ন ও পেয় প্রদান করেন। ফসল কামনায় তাঁকে যজ্ঞে আহ্বান করা হয়। এই ভূমি দেবী ঋগ্বেদের পৃথিবীদেবীর চেয়ে ভিন্ন। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (৪/৫৭) সীতার উল্লেখ আছে কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে সূক্তটি পরবর্তীকালের। কিন্তু ঋগ্বেদ-পরবর্তী সাহিত্যে শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে কর্ষিতা ভূমির প্রতীকরূপিণী দেবী সীতা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। অম্বিকা, কাত্যায়নী, ভদ্রকালী, দুর্গা, শ্রী বা লক্ষ্মী প্রভৃতি যে সকল দেবীকে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাঁদের সংক্রান্ত রূপকাত্মক কাহিনি সমূহ আসলে প্রাক্-বৈদিক উৎসের ইঙ্গিত। মজার ব্যাপার হল, আরও পরবর্তীকালে এই সকল দেবীর বহু পল্লবিত কাহিনি পুরাণসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁরা একই মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। এরই ফলশ্রুতি ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শাক্তধর্মের উদ্ভব।*

হিন্দু সমাজেও প্রাচীন যুগে প্রাকৃতিক শক্তির পুজো প্রচলন ছিল। অগ্নি, বায়ু, বরুণ এঁরা উপাস্য দেবতা ছিলেন। পিতৃপুরুষের পূজা, শ্রাদ্ধ,পিণ্ডদান ছিল। বিদেহী আত্মার স্বীকৃতি ছিল। জন্ম জন্মান্তরে বিশ্বাস ছিল। ঋষিগণ গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। অবতারবাদে প্রচলন ছিল। অপদেবতাতেও বিশ্বাস ছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণও বিশ্বাস করেন যে ভগবান বুদ্ধ গৌতম রূপে জন্মগ্রহণ করার পূর্বে

বিবিধ জীব ও মানবরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন জন্মের কাহিনি অবলম্বনে রচিত গ্রন্থটি 'জাতক' নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জিশুখ্রিস্টের 'পুনরুত্থানে' বিশ্বাসের কাহিনি উল্লেখ করা যেতে পারে।

ধর্মের ক্ষেত্রে কিভাবে সংস্কৃতিকরণ এবং আত্মিকরণ ঘটে সেটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রথম পর্যায়ে স্থানীয় পুরোহিতরা কিছু ব্রাহ্মণ্য আচার গ্রহণ করে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থানীয় দেব দেবীদের সঙ্গে হিন্দু দেব দেবীর সমীকরণ হয়। যেমন-দেবতা, 'মতাই কতর'-এর সঙ্গে শিব। 'মতাই কতরমা'-এর সঙ্গে দুর্গা ত্রিপুরার সর্বত্র বসবাসকারী ত্রিপুরি, জমাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া, কলই, খাকলু, উচই সম্প্রদায়গুলির ক্ষেত্রে অভিন্ন বলে ঘোষিত হল। একইভাবে ঘোষিত হল কুকিদের ক্ষেত্রে 'পাথিয়েন পৃ' হলেন শিব বা ঈশ্বর। দেবাদিদেব শিবরাই এবং তার পত্নী তাওচিঙ এবং কন্যাদ্বয় দেবলক্ষ্মী ও দেবতারিণী হলেন যথাক্রমে শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর নামান্তর। আবার দেবতা 'তুইমা'-এর সঙ্গে গঙ্গা;থুমনাই, রাও-এর সঙ্গে যমরাজ, সুইনাইরাও-এর সঙ্গে চিত্রগুপ্ত, গড়িয়ার সঙ্গে দেবতা সম্পদ এবং সমৃদ্ধির দেবতা গণেশ রূপে পরিচিত। বাংলার নববর্ষ, উত্তর ভারতের দশেরা, আসামের বিহু, দক্ষিণ ভারতের 'ওনম'-এর সমতুল ত্রিপুরার গড়িয়া উৎব সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব। হিন্দু সমাজের সিদ্ধিদাতা গণেশ দেবতা। নৃতাত্ত্বিক গবেষকদের মতে ত্রিপুরিদের গড়িয়া দেবতার মূর্তির পরিকল্পনায় গণপতির শুড়ের প্রতিফলন দেখা যায়। একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে গড়িয়া দেবতার মূর্তির প্রতীক বাঁকানো বাঁশে ফুটে উঠেছে গণপতির মুণ্ডমূর্তির আদল। উল্লেখ্য, গড়িয়া দেবতার উদ্ভবের নেপথ্যালোকে এইরূপ জনশ্রুতি যে গড়িয়া দেবতা মূলত যুদ্ধের দেবতা, তাই গড়িয়া নৃত্যের মধ্যে যুদ্ধরত নৃত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

ত্রিপুরার অন্যান্য লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে দুর্গোৎসবের পরেই খার্চি পূজার স্থান। খার্চি পূজায় চৌদ্দজন দেবদেবী। এই কারণে খার্চি পূজা চতুর্দশ দেবতার পূজা নামেও অভিহিত। এই দেবতারা হলেন ঃ হর, উমা, হরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা,পৃথিবী,গঙ্গা, সমুদ্র, হিমালয়, কামদেবও অগ্নি। এই চতুর্দশ দেবতাদের বিগ্রহের বিশেষত্ব হল যে মূর্তিগুলির মুখের গড়নে ইন্দো-তিব্বতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। দেবতাদের সম্পূর্ণ অবয়ব বা আকৃতি নেই। শুধুমাত্র চৌদ্দজন দেব

দেবীর চৌদ্দটি প্রতীক মুন্ড যে গুলি অষ্ট ধাতু নির্মিত। প্রতীক মুণ্ডগুলির প্রত্যেকটি অর্ধচন্দ্র দিয়ে চিহ্নিত। ত্রিপুরার মহারাজারা চন্দ্রবংশসম্ভূত বলেই কুলদেবতারা চন্দ্র চিহ্নে ভূষিত। খার্চি পুজোতে বৈদিক, অবৈদিক, উপজাতীয়, তান্ত্রিক এবং নানা ধরনের পূজা অর্চনার রীতির সংমিশ্রণ। এই পুজোতে শক্তি সাধনার অঙ্গ হিসাবে যেমন পশুবলির রীতি আছে, আবার জাগতিক মঙ্গলের জন্য তন্ত্রসম্মতভাবে পুজোর অনুষ্ঠান ছাড়াও শাক্ত, বৈষ্ণব এবং শৈবসমন্বিত সাধন প্রণালীও রয়েছে। মূর্তির পরিবর্তে প্রতীক-মুন্ডের ব্যবহারকে কেউ কেউ মনে করেন নিরাকার পরম ব্রহ্মেরই উপসনার দ্যোতক। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর সমাজ দেহে সনাতন হিন্দুধর্মের বিশ্বাসের আত্মীকরণ হল কিভাবে? এ সম্পর্কে হারবার্ট রিসলে প্রাসঙ্গিক। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ পিপল অব্ ইন্ডিয়া (১৯১৫) গ্রন্থে ভারতের জাতিগুলিকে সাতটি প্রকারে বিভক্ত করে উপজাতীয় জাতি ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক জাতিগুলিকে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অপরপক্ষে এডওয়ার্ড ব্লান্ট এর মতে ভারতে প্রধানত দুই প্রকারের জাতির কথা উল্লেখ করেছেন। একটি উপজাতীয় এবং অন্যটি বৃত্তিমূলক। উপজাতিগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন যে উপজাতীয় জাতিগুলি সেই সকল জাতি হতে উৎপন্ন যারা প্রাগৈতিহাসিক এবং পরবর্তীকালে হিন্দুদের সঙ্গে নিবিড় সংস্পর্শে এসে তাদের সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়েছিল। বহু শতাব্দী ধরে একত্রে বসবাসের ফলে প্রচুর জাতিগত সংমিশ্রণ ও সাংস্কৃতিক সংহতি স্থাপিত হয়। পরিচিত গোষ্ঠী ছাড়াও গ্রিক, বৈদেশিক অধিবাসীরাও হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং হিন্দু সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধশালী করেছিল। (অধ্যাপক শ্রীনিবাস) ১৯৫২ বলেন, ''উপরোক্ত প্রথায় উপজাতিগুলি শুধু যে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন সত্ত্বা বজায় ছিল তা নয়, উপরন্তু তারা অন্যান্য জাতিগুলির সংস্পর্শে এসে উচ্চতম রীতিনীতি এবং আচার অনুষ্ঠান অনুকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেল, ফলে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রচলন হল''।

সাধারণত সাংস্কৃতিক আত্মিকরণের প্রবণতা দাতা এবং গ্রহীতা উভয় পক্ষকে প্রভাবিত করে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এখানে লৌকিক দেবদেবীর পূজাপার্বন এবং অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে উপজাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য বা হিন্দু সংস্কৃতির একটা গভীর নৈকট্যের সম্পর্ক আছে। যেমন হিন্দু শব সৎকারের ব্যবস্থা, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পুনর্জন্মবাদ ইত্যাদি বিষয়ে উপজাতি সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়। তবে এটা কতটা দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার এবং কে কার নিকট কতটা ঋণী যেটা

সঠিকভাবে না বলা গেলেও অন্তত এটি স্বীকৃত সত্য যে ত্রিপুরার শত শত বৎসরের মিশ্র সংস্কৃতির একটা ধ্রুপদী রূপ আছে। উপজাতি সমাজের মূল ধর্ম সর্বপ্রাণবাদ বলে চিহ্নিত করা হলেও এরা কেউ হিন্দু, কেউ খ্রিস্টান, কেউ বা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। ওরা সবাই মিলে এক মিশ্র ধর্ম ও সংস্কৃতির শরিক।

উপজাতি সমাজ, ধর্ম ও নৃত্যকলা

ত্রিপুরার উপজাতি সমাজ মূলত পিতৃতান্ত্রিক। ফলে পুরুষদের প্রাধান্য বেশি। পরিবার পিতা, মাতা, কন্যা ও স্ত্রী এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাবী জামাতাসহ প্রতিটি পরিবার গঠিত। কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠিত হয়। আবার প্রতিটি গোষ্ঠী যে গ্রামে বসবাস করে তাকে বলা হয় পাড়া বা বাড়ি। গোষ্ঠী বা গ্রামের সর্দারের নাম অনুসারে গ্রামের নামকরণ হয়ে থাকে। গ্রামগুলি সাধারণত দেখা যায় পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড় বা উঁচু টিলায় অবস্থিত থাকে। সমভূমি জুম চাষের পক্ষে উপযোগী নয় তাই পাহাড়ে তারা বাস করে। কৃষি, শিল্প, পশুপালন, পশম উৎপাদন, বাঁশ, বেত, বস্ত্র উৎপাদনই পার্বত্য জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবলম্বনের একমাত্র উপায়। বর্তমানে ত্রিপুরায় যতটুকু শিল্প বাণিজ্য ও আর্থিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে ওই সব সম্ভাব্য ব্যবস্থা থেকে এখনও উপজাতীয় জনগণ কিন্তু দূরে সরে রয়েছে। চিরাচরিত প্রথায় জুম চাষ ও অন্যান্য ব্যবস্থায় তারা সুদূর অতীত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। বর্তমানে ঐসব উপায় ও ব্যবস্থার উপযোগিতা ও সুবিধা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এই কারণেই উপজাতি জনগণ দিন দিন নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হয়ে পড়ছে।

উপজাতিদের মধ্যে যাঁরা কৃষির জমি এখনও সংগ্রহ করতে পারেন নি এবং বাধ্য হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করেন সাধারণত তারাই পাহাড়ে জুম চাষ করে থাকে। বর্তমানে অধিকাংশই জমির ওপর নির্ভরশীল। প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ জুম চাষের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সমাজ জীবনেও নানাবিধ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোক ক্রমে ক্রমে তাঁদের সামাজিক জীবনের মধ্যেও প্রবেশ করছে। জুম চাষ যাদের জীবন-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য শুধুমাত্র তাঁরাই কিছু কিছু প্রাচীন জীবনধারার পরিচয় এখনও বহন করে চলেছেন।

গ্রামের প্রধান বা সর্দার সেই গ্রামের জনসাধারণের উপর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। বাস্তবিক পক্ষে, গ্রামের জনসাধারণ সর্দারদের আদেশ ও

পরামর্শ অনুসারে চালিত হয়। গ্রামের বিচার থেকে শুরু করে নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান সবকিছুই সর্দারদের আদেশ ও পরামর্শ অনুসারে হয়ে থাকে। ত্রিপুরার রাজারা এইসব সর্দারের মাধ্যমেই পার্বত্য এলাকাগুলিতে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং রাজস্বও এদের সাহায্যে সংগ্রহ করতেন। সর্দারগণ এর পরিবর্তে রাজার কাছ থেকে অনেক কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করতেন।

উপজাতি সমাজে দুই ধরনের বিবাহ প্রচলিত। যেমন : বর ও কনের অনুরাগ বা সম্মতিতে বিবাহ অথবা বর কনে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের মতামত অনুসারে বিবাহ। প্রথম বিবাহ পদ্ধতিটি 'হিকনালানী' এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটি 'বাইজগনালী' নামে পরিচিত। এছাড়া আর একটি জনপ্রিয় বিবাহের রীতি প্রচলিত যা জামাইখাটা বা জামাই উঠা রীতি নামে প্রচলিত। অভিভাবকদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিবাহে মনোনীত পাত্রকে এক, দুই বা তিন-চার বছর ভাবী শ্বশুরের বাড়িতে থাকতে হয় এবং জুম চাষে পাত্রীর পরিবারের আর সকলের মতো অংশগ্রহণ করতে হয়। যদি এই সময়ের মধ্যে পাত্রের কার্যকলাপে ভাবী শ্বশুর এবং শাশুড়ি সন্তুষ্ট হন এবং পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সদ্ভাব পরিলক্ষিত হয় তবেই তাদের মধ্যে বিবাহ ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ না হলে পাত্রকে কাজের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় দিতে হয়।

জুম চাষের আগে প্রচলিত রীতিটি এমন ঃ গৃহস্থের বাড়ির উঠানে একটি নির্ধারিত জায়গায় এক কলসী জল, একটি কালো পাতিল একটি চালনি এবং একটি ঝাড়ু কালো পাতিলটির গায়ে হেলান দিয়ে রাখা হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি জিনিস এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে রাখা হয়। সাধারণত চৈত্র-বৈশাখ মাসেই জুমে আগুন দেওয়া হয়। জুমে আগুন দেওয়ার মন্ত্রটি এইরূপঃ''বুইনি রছা তংব বুতুই তংব আম্পাই মানগ্লাক,খচাই মান গ্লাক,চিনি দাজ্ঞাইমা দাজ্ঞাইফা বকক্লাং-অইছে-চেংক্লাং অইচে ছুং মা স-গ" অর্থাৎ অপরের সন্তান-সন্ততি থাকলেও বকতে পারবে না, অভিশাপ দিতে পারবে না। আমাদের পূর্বপুরুষ যা করে গেছেন, আরম্ভ করে গেছেন তাই আমরা করছি। উপরোক্ত মন্ত্রটি উচ্চারণ করে জুমে আগুন দেওয়া হলে ঘর থেকে আনা তেল, মাইছিঙ্গা, বুচলই(এক জাতীয় জুম ফসলের বীজ)-যা থেকে আখের মত গাছ জন্মায় এবং তা আখের মত খাওয়া হয়। এর ফলই বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা হয়।) সুকুই (খিলা) হামচা বুচলুই (এক প্রকার বীজ) আগুনের মধ্যে ছিটিয়ে দিয়ে আগুনের ক্ষুধা মেটানোর

চেষ্টা করা হয়। জুমে আগুন দেওয়ার দিন জুমের মালিক জুমে উপস্থিত থাকা নিষেধ। জুমে দগ্ধ পশু-পাখিদের আত্মার সদ্গতির জন্য জুমের মালিক পূজা দিয়ে থাকেন।

ফেরার পথে দগ্ধ জুম চাষে একখন্ড হলুদ রোপণ করা হয়। উদ্দেশ্য বুড়াছা দেবতা যেন আমার কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন না করতে পারেন। এছাড়া কিছু মাইচুই (কাওয়ান) ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য যাতে বনদেবী এসে জুমে ঘাসের বীজ না বুনে যেতে পারে। পরবর্তী সময়ে এক শুভদিনে জুমে গিয়ে গাইরীং বা টংঘর তৈরি করে ছেলেরা। মেয়েরা জুমের অর্দ্ধদগ্ধ কাঠগুলি এক জায়গায় জড় করে এবং তা আবার আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়। জুম রোপণের আগে জুম চাষিকেও বৃষ্টির ওপর নির্ভর করতে হয়। তারপর এক পশলা বৃষ্টি হলেই জুম বোনার পালা শুরু হয়। এরপর কোনো এক বৃহস্পতিবারে আবার বীজ বুনতে জুমে যায়। স্নান করে শুদ্ধ দেহে বাড়ির সকল সদস্যরা এই কাজে যোগ দেয়। প্রথমে বড় একটি লাঙ্গা বা খাচিতে জল ও মাটির সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বীজ মেশানো হলে প্রত্যেকে চেম্পাই নামে ছোট খাচিতে বীজগুলি ভরে কোমরে বেঁধে নেয় আর প্রত্যেকেই হাতে একটি করে পুরনো দা রেখে সারিবদ্ধভাবে জমিতে ট্যারা করে একটা করে কোপ দেয় আর বাঁ হাতে কিছু বীজ দিয়ে দেয় গর্তে। এই বীজগুলির মধ্যে থাকে খুল (কার্পাস) মাই (ধান)চা, কুমড়া (মিষ্টি কুমড়া), খামাকাং (আলু), মাইছিঙ্গা, (জোয়াব), ‍াকালু (চাল কুমড়া),বান্তা (এক প্রকার মশলার পাতা)ইত্যাদি। বোনার আগে মেয়েরা সুমধুর কণ্ঠে লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা করে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে ঘন বর্ষণ আরম্ভ হলে, নানা প্রকার লতা-পাতা ও আগাছায় জুম পূর্ণ হয়ে যায়। জুম চাষিরা তখন জুম পরিস্কার করতে লেগে যায়। একঘেয়ে কাজকে তারা ঢোল, বাঁশী সহযোগে গান গেয়ে আনন্দমুখর করে তোলে। এই সময় যুবক-যুবতীর মধুর সরস গীতি-দ্বন্দ্বে নিস্তব্ধ বনভূমিতে এক রোমান্টিক পরিবেশ-এর সৃষ্টি করে। যুবক-যুবতীদের মনের আদান-প্রদান হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতের সুখময় দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নময় পটভূমিকা রচিত হয়।

ত্রিপুরার অধিকাংশ আদিবাসীরা অগ্নি সহযোগে মৃতদেহ সৎকার করে। তবে কুকিদের মধ্যে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার প্রথা আছে। পূর্বে এমন রীতিও ছিল কুকি সর্দারদের মৃত্যু হলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অনেক নিরীহ লোকের মস্তক কর্তন

করে সমাধিতে উৎসর্গ করা হত। শ্রাদ্ধকালে ত্রিপুরিরা সাধ্যানুসারে গোদান,অন্নদান ইত্যাদি করে থাকে। উল্লেখ্য, জমাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া প্রভৃতি উপজাতির মৃতদেহ সৎকার প্রণালী মোটামুটি ত্রিপুরিদের অনুরূপ। ত্রিপুরার আদিবাসী মহিলারা সাধারণত দেহ আবরণ হিসাবে শাড়ির বদলে রিয়া ও পাছড়া পরিধান করে। তাঁতের তৈরি রিয়া ও পাছড়া আদিবাসী মহিলারা নিজ হাতে প্রস্তুত করে। মেয়েরা ধাতব অলংকার থেকে ফুল ও সুন্দর পত্র পল্লবাদি দ্বারা তৈরি অলংকার ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করে।

সামন্ততান্ত্রিক রাজন্য ত্রিপুরায় উন্নত ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় কৃষি নির্ভরশীল যেগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার কারণে পণ্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল। অর্থের মাধ্যমে বিনিময় প্রায় ছিল না বলা চলে। সরল আদিবাসীরা অনাড়ম্বর ভাবে দিন যাপন করত বলে খাদ্য ছাড়া অন্য বিশেষ কোনো চাহিদা ছিল না। তাঁতের সাহায্যে নিজেদের পোশাক নিজেরাই তৈরি করত। বছরের কোনো নির্দিষ্ট দিনে সমতল অঞ্চলে হাটে বা মেলায় উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করত। তিল, কার্পাস, ফল ও বনজ সম্পদ বিক্রি করে নিজেদের অন্যান্য চাহিদা মেটাতো। রাজাকে কায়িক শ্রমদান বা বনজ সম্পদ রাজস্ব হিসাবে প্রদান করে তারা নিশ্চিন্ত থাকত। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমশ পরিবর্তন হতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং জুম চাষের ফলে কৃষিযোগ্য জমি সীমিত হতে থাকায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ক্রমশ ব্যাহত হতে থাকে। ফলে সমতল অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ এবং যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে আদিবাসীদের খাদ্য ছাড়াও আনুষঙ্গিক চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুদ্রার ভিত্তিতে তারা ক্রমশ পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। পূর্বের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জটিলতায় এবং ব্যয়বৃদ্ধি পেলে কায়িক শ্রম ছাড়াও মুদ্রার ভিত্তিতে নানা ধরনের কর বৃদ্ধি করা হল। একদিকে আয়ের স্বল্পতা অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজকর্মচারীকে নানা ধরনের চাহিদা মেটাবার ফলে এদের উদ্বৃত্ত কোনো অর্থ বা সম্পদ থাকত না। খরা বা বন্যা হলে এদের দুর্গতির অন্ত থাকত না। এই অবস্থায় মহাজনেরা দাদন প্রথা ও অত্যন্ত উচ্চ সুদে প্রয়োজনের সময় আগাম শস্য ঋণ দিয়ে তাদের সহজে ঋণের জালে আবদ্ধ করে ফেলে। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দিত বিক্ষোভ আর মাঝে মাঝে বিক্ষোভ রূপান্তরিত হত বিদ্রোহে।

ইতিহাসকে আশ্রয় করে বলা যায় কৃষিকে ভিত্তি করেই সমাজে প্রথম শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং মানব-সমাজ শ্রেণী বিভক্ত সমাজে পরিণত

হয়েছে। আদিম কৃষি-ব্যবস্থা থেকেই সমাজে ক্রমশ দেখা দিয়েছে মুষ্টিমেয় শোষক ভূ-স্বামী গোষ্ঠী আর শোষিত জনসাধারণ। কৃষি-ব্যবস্থার মধ্য থেকেই ভূস্বামীগোষ্ঠী ও কৃষকের মধ্যস্থলে দেখা দিয়েছে মধ্য শ্রেণী। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে যন্ত্রশিল্প গড়ে উঠতে থাকলে ভূমিহীন কৃষকেরই এক অংশ মজুরির বিনিময়ে কারখানায় শ্রমশক্তি বিক্রী করে শ্রমিক শ্রেণীরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। কৃষি ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই সামন্তপ্রথা গড়ে উঠে। কৃষিভূমি ও কৃষি-ব্যবস্থাই সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি। সুতরাং কৃষকই সামন্ততান্ত্রিক শোষণের প্রধান শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ধর্মচর্চা

ত্রিপুরার উপজাতিদের আদিম পার্বত্য রীতিতে দেবদেবীর পূজা-পার্বনের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। রাজন্য যুগে রাজারা হিন্দুধর্মাবলম্বী হলেও প্রাক্ হিন্দুধর্মীয় উপজাতীয় ধর্মানুষ্ঠানেও রাজকীয় ধর্মের অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। রাজারা শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব যাই হউন না কেন চতুর্দশ দেবতা তাদের কূল দেবতা এবং চতুর্দশ দেবতার প্রধান পুরোহিত চন্তাই রাজার কুল পুরোহিত ছিলেন। উপজাতীয় দেবতা সাধারণত বাঁশ দিয়ে নির্মিত হন। উল্লেখ্য, পার্বত্য রীতিতে ধর্মচর্চার সঙ্গে হিন্দুধর্মের একাত্মতা ঘটে মহারাজ রত্নমাণিক্যের আমল থেকে। এইপ্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন : "The Hinduisation of Tripuras started quite early and it appears to have been achieved largely by the beginning of the 15th Century." রাজা রত্নফা গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে 'মাণিক্য' উপাধি পেয়ে রাজ্যলাভ করে যখন রাজ্যে পুনরায় অধিষ্ঠিত হলেন, তখন থেকেই ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা আসতে শুরু করেন। একই সঙ্গে শুরু হয় বাঙালী হিন্দু সমাজের এবং ত্রিপুরার উপজাতি সমাজের পারস্পরিক প্রথাদি গ্রহণের ধারা বা প্রণালী। দৃষ্টান্তস্বরূপ ত্রিপুরার উপজাতি সমাজের একটি বিশিষ্ট উৎসব গড়িয়া পূজা। গড়িয়া দেবতাকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের শিব ঠাকুর অথবা গণেশ ঠাকুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। নববর্ষে শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা করে এই উৎসবের সূচনা। হারিবিযুর দিন গড়িয়া পূজার ঘট বসানো হয়। পূজার দিনে গৃহস্বামী প্রভাতে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে বন থেকে গোটা বাঁশ কেটে আচাই-এর নির্দেশ অনুযায়ী উঠোনের পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে পুঁতে রাখেন। বাঁশটি অবশ্যই কচি হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে গড়িয়া দেবতার প্রতীকী বাঁশের দৈর্ঘ্য চার থেকে পাঁচ

হাতের বেশি হয় না। প্রতীকী বাঁশকে বেজোড় গাঁট সমেত ফুল দিয়ে সাজানো হয়। প্রতীক বাঁশের নিচের দিকটার পাঁচ কি সাত গাঁটের পাতা ছেঁটে ফেলা হয়। উপরের অংশের পাতা অক্ষত রেখে অচাই বাঁশটিকে 'রিকনা' অর্থাৎ বাঁশের গায়ে দা দিয়ে সমান্তরাল রেখা এঁকে দেন। বাঁশের সবুজ রঙ দা দিয়ে সর্পিল রেখাকারে উঠিয়ে নেওয়া হয়। যে অংশে পেতে রাখা হয় সে অংশ বাদে নিচের অংশে আনকোরা সুতোয় ফুল ও তুলো গেঁথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ও নতুন পবিত্র রিসা প্রতীকে জড়িয়ে দেওয়া হয়। মালায় গাঁথা ফুল ও তুলোর সংখ্যা বেজোড় হওয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যেমন ৫ টি ফুল এবং ৫ টি তুলো অথবা ৭ টি ফুল এবং ৭ টি তুলো।

সূতো, রিসা,চাল,মদ ইত্যাদি পূজার সামগ্রী অনূঢ়া মেয়েদের হাতে তৈরি হওয়া প্রয়োজন। গড়িয়া প্রতীক উঠোনের নিভৃত কোণে বসাতে হয় কারণ প্রতীকের ছায়া মাড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রতীক বাঁশের গোড়ার কয়েকটি বাঁশের কঞ্চিও পুঁতে রাখার বিধি আছে।" পুজোর বেদীতে কলাপাতায় রকমারী ফুল ছড়ানো হয়। বিন্নি ধানের খৈ ভেজে পাতার উপর রাখা হয়। ধূপধুনা সহকারে মোরগ ডিম গড়িয়া দেবের নামে উৎসর্গ করা হয়। পুজোর পর আদিবাসী নারীপুরুষ গড়িয়া দেবতাকে নিয়ে ঘরে ঘরে পরিভ্রমণ করেন নৃত্য গীত সহকারে। উৎসব চলে এক সপ্তাহ ব্যাপী। গ্রাম-পাহাড় আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। আধুনিককালে গড়িয়া পূজা সার্বজনীন পূজার রূপ নিচ্ছে। চাঁদা সংগ্রহ করে সম্মিলিভাবে সার্বজনীন পূজার আয়োজন বর্তমানে করা হয়ে থাকে। গড়িয়া পূজা উপলক্ষে মেলা ও প্রদর্শনী এবং নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। আদিবাসী, বাঙালী ভেদাভেদ ভুলে সকলেই আনন্দে মেতে ওঠে। প্রকৃত পক্ষে জাতি-উপজাতির মিলনে গড়িয়া পূজা এখন ত্রিপুরার সর্বত্র মহোৎসবে পরিণত।

গড়িয়া পূজার পর খারচী বা খাচ্চি পূজার স্থান। মূল 'ক্ষ্যাচ্চি' থেকে 'খাচ্চি' শব্দটি এসেছে। এই পূজা ত্রিপুরার জাতীয় পূজা। আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি থেকে খাচ্চি পূজা শুরু হয়। সাতদিন ধরে এই পূজা অনুষ্ঠান চলে। এই পূজার প্রধান পুরোহিতকে বলা হয় চন্তাই এবং সহকারী পূজককে বলা হয় 'দেওরাই'। চন্তাইরা উপজাতীয় শ্রেণী মানুষ। কথিত আছে রাজা ত্রিলোচন চতুর্দশ দেবতার পূজা অনুষ্ঠান প্রচলন করেন। খাচ্চি পূজা'র অনুষ্ঠানে বিশেষ গোপনীয়তা অবলম্বন

করা হয়। এই পূজোতে বৈদিক, তান্ত্রিক এবং আরও নানা ধরনের পূজার্চনা রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। চতুর্দশ দেবতার বিগ্রহের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এখানে কেবল চৌদ্দজন দেবদেবীর চৌদ্দটি প্রতীক মুণ্ডু আছে। এই দেবতাদের মধ্যে হর বা মহাদেব হলেন—প্রথম ও প্রধান। হর, উমা, হরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী , কার্তিকেয়, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব ও হিমাদ্রি ইত্যাদি চতুর্দশ দেবতার নাম। ককবরক ভাষাতেই চতুর্দশ দেবতার চৌদ্দটি ভিন্ন নাম আছে। শিব বা হর-এর প্রতীক মুণ্ডটি রজতমন্ডিত এবং অন্যান্য মুণ্ডগুলি সুবর্ণমণ্ডিত। হর, উমা ও হরি এই তিন দেবদেবীর প্রতীক মুণ্ডগুলি নিত্য পূজিত হয় এবং অন্যান্য প্রতীক মুণ্ডগুলি একমাত্র আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে, খাচ্চি পূজার সময় একসঙ্গে সারিবদ্ধভাবে পূজিত হন। সপ্তাহকালব্যাপী খাচ্চি পূজায় প্রতিদিন প্রাতে প্রধান পুরোহিত চন্তাই কর্তৃক চন্দ্রসূর্য প্রণাম এবং মন্ত্রপাঠ ও ছাগ শিশু বলিদান পূর্বক পূজা শুরু হয়। সারাদিন পূজার্চনা চলে। মুণ্ডগুলি উপরিভাগে যুগল শৃংগ আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিশ্রণ নির্দেশ করে। বর্তমানে পুরাতন আগরতলায় চতুর্দশ দেবতার মন্দিরটি অবস্থিত। এর আগে রাঙামাটি বা বর্তমান উদয়পুরে চতুর্দশ দেবতার মন্দিরটি অবস্থিত ছিল।

কের পূজা

এই উৎসব নীরবতার উৎসব। এ উৎসবের রীতিনীতিও স্বতন্ত্র। উৎসব চলাকালীন সময়ে এই গণ্ডীর অভ্যন্তরে আগমন,নির্গমন, জন্ম-মৃত্যু নিষিদ্ধ। রাজ আমলে আগরতলা শহরের বিস্তৃত এলাকা কের পূজার গন্ডি হিসাবে নির্দিষ্ট হতো। বর্তমানে গন্ডির এলাকা যথেষ্ট সংকুচিত করা হয়েছে। কের পূজার উদ্দেশ্য দেশের ও দশের শুভকামনা। বাঁশে বাঁশে ঘষে পবিত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে কের পূজার শুভ সূচনা করা হয়। কের পূজা এখনও একান্তভাবে আদিবাসীদের উৎসব।

শারদীয় উৎসব ত্রিপুরার বাঙালিদের প্রধান উৎসব হলেও আদিবাসীরাও এই উৎসবে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেন। বাঙালিদের বারো মাসে তেরো পার্বণ ত্রিপুরাতেও উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ষমধ্যে জামাইষষ্ঠী থেকে শুরু করে রথযাত্রা, ঝুলন যাত্রা, জন্মাষ্টমী, লক্ষ্মী পূজা, শ্যামা পূজা, ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া, পৌষ সংক্রান্তি, সরস্বতী পূজা বিশেষ মর্যাদা সহ ত্রিপুরার সর্বত্র পালন করা হয়ে থাকে। দেওয়ালি ও শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে উদয়পুর ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে যে বিরাট উৎসবের আয়োজন হয় তা জাতি-উপজাতির মিশ্রসংস্কৃতির অনবদ্য

প্রকাশ।

ত্রিপুরার উপজাতিরা অন্যান্য যেসব দেবদেবীর পূজা করে থাকেন, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল মতই কতর। মতই শব্দের অর্থ দেবতা এবং কতর শব্দের অর্থ মহাদেব, 'লাম্প্রা' এর অর্থ শুচি দেবতা। কোনো পূজা আরম্ভ কালে সর্বপ্রথম লাম্প্রা দেবতার পূজা দেওয়া হয়। অনেকটা বিঘ্ন পূজার মত। 'তুইমা' বা গঙ্গা পূজা সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। তবে কারো কারো বাড়িতে অসুখ বিসুখের সময় ওঝাই পুরোহিত এনে এই পূজার ব্যবস্থা করে ('মাইলুমা' বা ধান্য বা লক্ষ্মী দেবতার কৃপা হলে, ধান্য উৎপন্ন হয়। কার্পাসের দেবতা হলেন খলুমা। তাঁর কৃপায় কার্পাস জন্মে।বুড়াছা হলেন বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,আর লকছমতাই হলেন লক্ষ্মী। নবান্ন উৎসবের দিনে গৃহকোণে দেবীর পূজা পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিজনের ঘরেই হয়ে থাকে।

লোকনৃত্য কলা

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশ জাঁদারেল প্রশাসক টি.ভি.স্টিফেন ভারতে প্রবর্তন করলেন। তাঁর আদেশ মত চালু করে দ্য ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস্ অ্যাক্ট। ভারতের কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীকে 'অপরাধপ্রবণ' আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হল। ঘোষণা করা হল এইসব আদিবাসী 'জন্ম-অপরাধী' এবং অজামিনযোগ্য অপরাধের সুবাদে কারাগারে বন্দি করে রাখার সুপারিশ করা হল। এই অবমাননাকর আইন বর্জন করতে স্বাধীন ভারতের লেগেছিল দীর্ঘ পাঁচ বছর। আদিবাসীদের প্রতি এমনি ছিল আমাদের মানসিকতা। এই সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আদিবাসী জনগণ তাঁদের উজ্জ্বল সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। পরম আন্তরিকতায় তাদের ঐতিহ্যকে লালন করে চলেছেন। সুখের কথা ১৯৫৮ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে ভারতের সব আদিবাসী গোষ্ঠীর মঙ্গলকামনায় মানবিক পঞ্চশীল নীতি নির্ধারণ করা হয়। এই নীতিতে বলা হল সৃজনশীল মানসিকতার বিকাশ ঘটিয়ে আদিবাসীদের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বাইরে থেকে কিছু চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। বনভূমি ও জমির ওপর আদিবাসীদের স্বত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। পরিসংখ্যান ও অর্থের ব্যয় দিয়ে আদিবাসীদের উন্নয়ন যেন যাচাই করা না হয় ইত্যাদি। এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে অসাধারণ সমাজবিজ্ঞান নির্ভর। এই পটভূমিকার ভিত্তিতে রূপকের আড়ালে তাদের লোককথা তথা নৃত্যকলা

সমাজ-মানসে অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে আদিকাল থেকে। গড়িয়া নৃত্য ও জীবন ও জীবিকা-কেন্দ্রিক নৃত্য। ত্রিপুরার অধিকাংশ আদিবাসী জনগোষ্ঠী গড়িয়া নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করেই গড়িয়া নৃত্যের উদ্ভব। ত্রিপুরায় গড়িয়া পূজার মূল উদ্দেশ্য হল জুম ক্ষেত্রকে শস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য গড়িয়া শস্যদেবতাকে আরাধনা। ত্রিপুরার সর্বজনীন লোকনৃত্য গড়িয়া নৃত্যের অনুষঙ্গ হিসাবে পাশাপাশি হয়েছে লেবাং বুমানি ও মশক নৃত্য প্রভৃতি। গড়িয়া নৃত্যে একদিকে ধর্মীয় সংস্কার এবং অপরদিকে লৌকিক সংস্কারও ক্রিয়াকলাপ, মূলত গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করেই। যেহেতু গড়িয়া নৃত্যের উদ্ভব সেই কারণে বলা যেতে পারে এই নৃত্যে দেবভক্তির ভাবনারসের সঙ্গে অনুষ্ঠানগত চিত্তবিনোদনের আনন্দরসের মিশ্রণ ঘটেছে। আবার কোনো কোনো গবেষকের মতে গড়িয়া পূজাকে সামাজিক উৎসবের সংজ্ঞা দেওয়া হয় এই কারণে যে গড়িয়া উৎসবে বর্ষ বিদায় ও বর্ষবরন এর পালা চলে প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী। এই সময়ে ককবরক ভাষী সম্প্রদায় যেমন ত্রিপুরি, জমাতিয়া, রিয়াংরা একত্রে এই পূজা উৎসব পালন করে থাকে। এই নৃত্যের মুদ্রার সংখ্যা ২২টি। এক একটি মুদ্রা বা ঢংয়ের জন্য এক একটি বোল থাকে। ঢোল বাজিয়ে নৃত্যের ঢং বলে দেওয়া হয়। বোলের পরিবর্তনের সঙ্গে নাচের ভঙ্গিও পাল্টে যায়। প্রত্যেক ঢং-এর অর্থ আছে। যেমন কোনোটা স্নানের, কোনোটা কাপড় কাঁচার, আয়না দেখে কেশ-বিন্যাস। কোনোটা বাচ্চা খাওয়ানো হচ্ছে। তবে প্রাচীনকালের ২২টি ঢং এর গড়িয়া নৃত্যের মধ্যে বর্তমানে পাঁচ-ছয়টির বেশি প্রচলিত নেই। নৃত্যপটিয়সীরা নৃত্যধারাকে বৈচিত্র্যময় এবং রমনীয় করার জন্য পশুপাখির বিচিত্র চলন-ভঙ্গিমার অনুকরণ করে নাচের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা চলছে।

সংগীত হচ্ছে লোকনৃত্যের অনুষঙ্গ। আবার সংগীতের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাল,লয়, ছন্দ, গীত ও বাদ্য। লোকনৃত্যে কণ্ঠ সংগীতের ভাব ও অর্থ প্রকাশ হয় না। প্রকাশ হয় দেহজাত সংগীত অর্থাৎ তাল-লয়-ছন্দবদ্ধ দেহ সুষমা, দেহভাষা, দেহচলন। বেশির ভাগ লোকনৃত্য গীতকেন্দ্রিক। সব লোকনৃত্যের ব্যাপারেই তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। লোকনৃত্যকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন-(১) প্রকৃতি নির্ভর সহজ-সরল-সাবলীল-স্বতঃস্ফূর্ত লোকনৃত্য এবং (২) গুরুমুখী নৃত্য। প্রথমটির ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এটি একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের

নৃত্য। সাধারণত এইসব নৃত্যগীত ও তালকে আশ্রয় করে একজন কেউ নেতৃত্ব দিয়ে শুরু করেন, অন্যরা তা অনুকরণ করেন। ফলে একটি শিল্পরূপ তৈরি হয়ে যায়। যে গানকে কেন্দ্র করে নাচ সৃষ্টি হয়, সেই গানের নামেই নাচের নাম হয়। অপর দিকে গুরুমুখী নৃত্য প্রচুর অনুশীলিত-চর্চিত হয়ে একটি কাঠামোতে গন্ডিবদ্ধ হয়ে যায়। প্রথম পর্যায়ের নাচে যেমন একজন নেতৃত্ব দেন তাকে অনুসরণ করে সকলে মিলে একটা শিল্পছক ফুটিয়ে তোলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় প্রাথমিক পর্যায়ের নাচগুলিকে স্মরণে রেখে বারবার অনুশীলন চর্চা করে একটা কাঠামোবদ্ধ করে নেওয়া হয়। এই সময়ে নাচটিকে সুন্দর ও কলাকৌশলগত করার প্রচেষ্টা থাকে।

ভারতীয় লোকনৃত্য বিজ্ঞানের রীতি অনুসারে লোকনৃত্যের যে কয়টি শ্রেণি আছে তা ত্রিপুরার লোকনৃত্যেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন:(ক) নির্দিষ্ট কর্মভিত্তিক গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের নৃত্য, (খ) সামাজিক দলবদ্ধ নৃত্য এবং (৩) ব্যবসায়িক নৃত্য। মূলত এই তিন ভাগে ভাগ করা গেলেও দ্বিতীয় বিভাগের সামাজিক দলবদ্ধ নৃত্যকে আরও তিনটি উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যথা, (ক) লৌকিক (খ) ধর্মীয় এবং (গ) ব্যবহারিক।

সামাজিক দলবদ্ধ নৃত্য

এই নৃত্যের কোনো নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ পরিধি নেই। জাতপাত, গোষ্ঠী,উচ্চ-নীচ, ধনীদরিদ্র কোনো বালাই নেই। সমাজের সকল স্তরের লোক দলবদ্ধভাবে তা করে থাকে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ত্রিপুরার জনপ্রিয় লৌকিক গড়িয়া নৃত্য যেটি জীবন ও জীবিকা-কেন্দ্রিক নৃত্য। ত্রিপুরার অধিকাংশ উপজাতীয় জনগোষ্ঠী উপরোক্ত গড়িয়া নৃত্যটি পরিবেশন করে থাকে। গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করেই গড়িয়া নৃত্যের উদ্ভব। গড়িয়া পূজার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমখেতকে শস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য গড়িয়া শস্যদেবতাকে আরাধনা করা। গড়িয়া দেবতাকে সম্পদ ও সমৃদ্ধির দেবতারূপে কল্পনা করা হয়। কৃষিভিত্তিক বঙ্গীয় সমাজেও আচরিত উৎসব-অনুষ্ঠানের দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়ে উঠে সেখানকার গাজন, ব্রত ও বিবিধ আচারের নৃত্য। ওই সব উৎসব-অনুষ্ঠান জীবন ও জীবিকাভিত্তিক। ধর্মীয় আচার-আচরণও একই সঙ্গে এসে মিশেছে এই সমস্ত নৃত্য-সংস্কারে।

ত্রিপুরার সর্বজনীন লোকনৃত্য গড়িয়া নৃত্যের অনুষঙ্গ হিসেবে পাশাপাশি

রয়েছে 'লেবাং বুমানি' ও মশক নৃত্য প্রভৃতি। গাজন নৃত্যে যেমন একদিকে ধর্মীয় সংস্কার অনুসৃত অপরদিকে রয়েছে লৌকিক সংস্কার ও ক্রিয়াকলাপ। গড়িয়া নৃত্যের মধ্যেও সেই একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করেই গড়িয়া নৃত্যের উদ্ভব। সে কারণে গড়িয়া নৃত্যে দেবভক্তির ভাবনা-রসের সঙ্গে অনুষ্ঠানগত চিত্ত বিনোদনের আনন্দরসের মিশ্রণ ঘটেছে। গড়িয়া পূজাকে সামাজিক উৎসবের সংজ্ঞা দেওয়া যায় এই জন্য যে গড়িয়া উৎসবে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের পালা চলে প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ত্রিপুরি, জমাতিয়া ও রিয়াং প্রভৃতি কক্‌বরক ভাষী উপজাতি সম্প্রদায় গড়িয়া পূজা উৎসব পালন করে থাকে। এঁদের একান্ত বিশ্বাস, গড়িয়া দেবতাকে তুষ্ট করলে জুম কৃষির ফসল ভালো ফলবে। পরিবারের সমাজের মঙ্গল হবে। তাই গড়িয়া উৎসব একদিকে যেমন সামাজিক, অপরদিকে ধর্মীয় বা পূজা পার্বনের। তাই গড়িয়া নৃত্যে ধর্মীয় আচারগত মিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল গড়িয়া-নৃত্যের মুদ্রার ভঙ্গি প্রত্যক্ষ করলে ধর্ম ও আচার নিরপেক্ষ শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রমোদ নৃত্য বলে প্রতীয়মান হতেই পারে। তবে একথা সত্য গড়িয়া নৃত্যের অনুকৃত মুদ্রা বৈচিত্র্যপূর্ণ। জনশ্রুতি এইরূপ যে প্রাকৃতিক ঘটনা ও পশুপাখির নানা অঙ্গভঙ্গিকে অনুকরণ করে গড়িয়া নৃত্যের মুদ্রার সৃষ্টি। সুরেন দেববর্মন (২০০৪) তাঁর 'ত্রিপুরার উপজাতীয় আদি ধর্ম, নৃত্যকলা ও দেবদেবী'তে উল্লেখ করেন 'প্রাচীন কালে গড়িয়া নৃত্যের মুদ্রার সংখ্যা ছিল ২২টি। এক একটি মুদ্রা বা ঢংয়ের জন্য এক একটি বোল। 'ঢোল'(ত্রিপুরি ভাষার খাম) বাজিয়ে নৃত্যের ঢং বলে দেওয়া হয়। বোলের পরিবর্তনের সঙ্গে নাচের ভঙ্গিও যায় পাল্টে।" উল্লেখ্য, প্রাচীনকালের ২২টি ঢংয়ের গড়িয়া নৃত্যের মধ্যে বর্তমানে পাঁচ-ছয়টির বেশি প্রচলিত নেই। গড়িয়া নৃত্যের ঐন্দ্রজালিক অথবা রহস্যময়তার ভাব নেই। শুধু নৃত্য মঞ্চকে বৈচিত্র্যময় এবং রমণীয় করার জন্য পশুপাখির বিচিত্র চলন-ভঙ্গিমার অনুকরণ করে নাচের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তোলা হয়।

নৃত্যকলায় সমতল ত্রিপুরা

পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতিদের প্রথাপুষ্ট লোকনৃত্যাদি যেমন সারা ভারতের সাংস্কৃতিক জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রেখেছে, ঠিক তেমনি অপরদিকে পার্শ্ববর্তী সমতল ত্রিপুরার নৃত্যকলার গৌরব গাঁথা সবিশেষ

উল্লেখযোগ্য। সমতল ত্রিপুরায় (পূর্বতন জেলা ত্রিপুরা) নানা অঞ্চলে ঢাকি নৃত্য, ঢোলি নৃত্য, জারি নৃত্য,বাউল নৃত্য, গাজন নৃত্য, ঘাটু নৃত্য প্রভৃতি নৃত্যের বহুল প্রচলন ছিল সমতল ত্রিপুরায়। 'রবীন্দ্রনাথ ১৩৩২ সনের ফাল্গুন মাসে আগরতলায় গিয়েছিলেন মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের (লালুকর্তা) বাড়িতে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে। ঐ সময়ে লালু কর্তার বাড়িতে কবি রাসনৃত্য উপভোগ করেন। কবি এই রাসনৃত্য দেখে বলেছিলেন, "ইহা দেখায় আমার পূর্ববঙ্গে আসা সার্থক হলো"। বিগত প্রায় শতবর্ষের সময় কালে ত্রিপুরার যে সব শিল্পীরা নৃত্যকলায় এসেছেন তাঁদের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরছি। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য মণিপুরি বুদ্ধিমন্ত সিং ও নবকুমার সিং-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মণিপুরি নৃত্য প্রচলন করার আগ্রহে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে একজন অভিজ্ঞ মণিপুরি নৃত্য শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে লিখেছিলেন। তদনুযায়ী আগরতলা থেকে নৃত্যবিদ বুদ্ধিমন্ত সিংহকে পাঠানো হয়। শ্রীবুদ্ধিমন্ত ছিলেন একাধারে নৃত্য ও মৃদঙ্গ বাদন পটু, একজন বিচক্ষণ কারুশিল্পী ও যন্ত্রবিদ্ আবার অসি ও অশ্ব চালনায় সবিশেষ অভিজ্ঞ।

নবকুমার সিংহ

শান্তিনিকেতনে নবকুমারের যোগদানের ফলে শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ধারায় মণিপুরি নৃত্যের ঠাট্ মিশে অভিনবত্ব বর্ধন করেছিল। অল্পদিনের মধ্যেই নবকুমার তখনকার 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্যের নবরূপ দান করে তাঁর শিল্প-সাধনাকে সার্থক করেছিলেন। নবকুমার সিংহ সম্পর্কে অধ্যক্ষ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এক শংসাপত্রে উল্লেখ করে বলেন, 'শান্তিনিকেতনে আসার আগে তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত নর্তক। যা শিখেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করতেন তিনি। নতুনভাবে নাচ রচনার কথা তিনি পূর্বে কখনো ভাবেন নি। এখানে এসে প্রথম তাঁকে সেই পথে হাত দিতে হয় এবং সকলের পরামর্শক্রমে নতুন সম্ভাবনার পথ তিনি দেখাতে সক্ষম হন। এদিক থেকে তিনি এ যুগের মণিপুরি নৃত্য আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই কারণেই শিক্ষিত দেশবাসী মণিপুরি নাচের মাধুর্য উপলব্ধি করল 'নটীর পূজা'র সময়ে (উৎস ঃ আনন্দবাজার ঃ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬৮)।

মণিপুরি নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে অন্যান্য যাঁরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন

করেছিলেন তাঁরা ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ সিংহ, চন্দ্রজিৎ সিংহ, নরেন্দ্রকুমার সিংহ প্রমুখ। সমতল ত্রিপুরার নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে যাঁরা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন যথাক্রমে মণি বর্দ্ধন,শান্তিদেব ঘোষ, শান্তি বর্দ্ধন, মণিশঙ্কর চক্রবর্তী এবং অনুপশঙ্কর অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যকলার বিকাশে শান্তিদেব ঘোষ ছিলেন কবির দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। কথিত আছে শ্রীনিকেতনের অন্যতম রূপকার কালীমোহন ঘোষ ছিলেন শান্তিদেব ঘোষের পিতা। শৈশবেই শান্তিদেব পিতামাতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সেখানকার পরিবেশেই তিনি সঙ্গীত এবং নৃত্য প্রভৃতির তালিম নিয়ে ওখানকার সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ-এর সম্পর্কে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু বলেন: রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও প্রেরণায় ভারতীয় নৃত্যকলায় যে নব নব অনুশীলন সূচিত হয়েছে তাতেও শান্তিদেবকে অগ্রণী বলা উচিত। কারণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, সিংহল, বালি, যবদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণ করে বিচিত্র নৃত্যধারার বিশেষ জ্ঞান লাভ করার সুযোগ তাঁর হয়েছে। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত নানা নৃত্যনাট্যের পরিচালনায় তাকেই নৃত্যগীত পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। (উৎস - আনন্দবাজার, ২৪ বৈশাখ, ১৩৭৭)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিবিধ ঐতিহাসিক বিষয়

ত্রিপুরাব্দ:

ত্রিপুরার সরকারি কাজকর্মে মাণিক্যবংশীয় রাজাদের নিজস্ব অব্দ ছিল, যা ত্রিপুরাব্দ নামে পরিচিত। খ্রিস্টাব্দ ত্রিপুরাব্দের ৫৯০বর্ষ পূর্ববর্তী। অর্থাৎ বর্তমান২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ত্রিপুরাব্দ হবে(২০১২-৫৯০)১৪২৩ ত্রিপুরাব্দ। খ্রিস্টানের সঙ্গে এই সনের পার্থক্য ৫৯০ বৎসর হওয়ায় প্রচলিত ধারণা ৫৯০খ্রিঃ থেকে ত্রিপুরাব্দ গণনা শুরু হয়েছে। জনশ্রুতি এইরূপ বীররাজ নামে জনৈক ত্রিপুর নরপতির বিজয় বাহিনী গঙ্গানদী অতিক্রম করেছিল। তাঁর এই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করেছিলেন। উল্লেখ্য, কালীপ্রসন্ন সেন-এর শ্রীরাজমালায় বলা হয়েছে যে ত্রিপুর বংশীয় রাজা জুঝারু ফা যিনি রাঙামাটি বা বর্তমান উদয়পুর জয় করেছিলেন তিনিই ত্রিপুরাব্দের প্রবর্তক। কিন্তু রাজমালা ছাড়া বীররাজ বা জুঝারু ফার অস্তিত্বের অন্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এদের অস্তিত্ব আদৌ ছিল কি না সন্দেহজনক। অপরদিকে কৈলাসচন্দ্র সিংহ মন্তব্য করেছেন যে প্রাচীন সনদ বা খোদিত কোনো লিপিতে এর উল্লেখ নেই। তাঁর মতে ত্রিপুরাব্দ সম্ভবত মুসলিম সন হিজরি থেকে উদ্ভূত এবং কিছুটা পরিবর্তিত রূপ। ত্রিপুরাব্দের আদি প্রবর্তক এবং সূচনাকাল সম্পর্কে ডক্টর ডি সি সরকার এই সম্পর্কে বলেন, ত্রিপুরা অব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় ত্রিপুরাব্দ বাংলা সালের তিন বছর পূর্ববর্তী। বাংলা সাল যা ফজলী অব্দের রূপান্তর, মুসলিম হিজরি সালের পূর্ববর্তী। মনে হয় বাংলার মুসলিম শাসকদের প্রতি আনুগত্য রক্ষার প্রচেষ্টায় নক্ষত্র রায় বা ছত্রমাণিক্যের

(১৬৬১-১৬৬৭খ্রিঃ) রাজত্বকালে ত্রিপুরাব্দের প্রচলন হয়েছিল। সেই সময়টা ছিল ১০৭৪ হিজরি বর্ষ অথবা ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ। পরিশেষে পাঠকের সুবিধার্থে অধ্যাপক চক্রবর্তী ১৩৪০ ত্রিংসনের ত্রিপুরা রাজ্যের সেন্সাস বিবরণী-র দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৭ ইং সনের সম্পাদকীয় নিবেদনে বলেন-'ত্রিপুরাব্দের উৎপত্তি কিভাবে হল এবং বঙ্গাব্দ বা হিজরি সনের সাথে এর সম্পর্কই বা কি এসব নিয়ে এখানে আলোচনার অবকাশ নেই। শুধু এটুকু বলাই বোধ হয় যথেষ্ট যে বাংলা পঞ্জিকায় যেমন বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি বারোটি মাসের নাম এবং সোম, মঙ্গল ইত্যাদি সাতটি দিনের নাম আছে ত্রিপুরার পঞ্জিকারও ঠিক একই নাম আছে। ত্রিপুরাব্দের সাথে ৫৯০যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায় অথবা খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৯০বাদ দিলে ত্রিপুরাব্দ পাওয়া যাবে। বঙ্গাব্দের ক্ষেত্রে এটি ৫৯৩ এবং ত্রিপুরাব্দের ক্ষেত্রে এটি ৫৯০ খ্রিস্টাব্দ যেমন, শকাব্দ খ্রিস্টাব্দের হিসাবে আনতে গেলে ৭৮ বছর যুক্ত করতে হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে তো ১৩৪০ত্রিং খ্রিস্টাব্দের হিসাবে ১৯৩০ হওয়া উচিত- অথচ আমরা বার বার ১৯৩১ এর সেন্সাস বলেছি। আসলে, কি বঙ্গাব্দ, কি ত্রিপুরাব্দ সাধারণত ইংরেজি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি শুরু হয় এবং ইংরেজি জানুয়ারি পৌষের মাঝামাঝি শুরু হয়। এরই জন্য খ্রিস্টিয় সনের পরিবর্তন হয়ে এক সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যদি পৌষ মাসের মাঝামাঝি সময়ে এটি ঘটে।

সতীদাহ প্রথা

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত ত্রিপুরা রাজ্যেও সতীদাহ প্রথা প্রাচীকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। এই সম্পর্কে রাজমালায় এই প্রকার অস্তিত্বের সম্পর্কে উল্লেখ আছে। রাজমালা যেহেতু ত্রিপুরার রাজ-রাজাদের কাহিনি সেই কারণে রাজ-পরিবারের মধ্যে সতীদাহ প্রথার উল্লেখ থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে কতটা এই প্রথা চালু ছিল তা নিশ্চয় করে বলে যাওয়া যায় না। কোনো কোনো গবেষকদের ধারণা হিন্দু প্রভাবিত হবার পরই উপজাতিদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে ধন্যমাণিক্য(১৪৯০-১৫১৫খ্রিঃ) এর মৃত্যু হলে তাঁর পত্নী কমলাদেবী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেও ত্রিপুরায় সতীদাহ প্রথা বিদ্যমান ছিল। ত্রিপুরার রাজপরিবারে সতীদাহের উল্লেখ অষ্টাদশ শতকের প্রথম দুই দশকে অহোম রাজদূত রত্ন কন্দলী ও অর্জুন দাসের বিবরণীতেও পাওয়া যায়। ১৮২৯

খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতে সতীদাহ প্রথা বেআইনি বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু ত্রিপুরায় এই প্রথা অপ্রকাশ্যে চালু থাকে।

পরবর্তী সময়ে ১৮৭১ সালে ত্রিপুরায় পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হবার পর বাংলার ইংরেজ সরকার মানবতার খাতিরে এই প্রথা যাতে নিষিদ্ধ হয় তার জন্য সচেষ্ট হন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী চট্টগ্রামের কমিশনার মিঃ ডি.আর.লায়াল কর্তৃক ত্রিপুরার অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট উমাকান্ত দাসকে এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হলে তিনি এ ব্যাপারে ত্রিপুরার রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সম্পর্কে একাধিক সতীদাহ ঘটনার বিবরণ দিয়ে ত্রিপুরা সরকারকে সতীদাহ প্রথা যাতে যথার্থভাবে নিষিদ্ধ হয় তার জন্য কমিশনার নির্দেশ দেন। পরবতী সময়ে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট ত্রিপুরার রাজদরবার থেকে এক পত্রে কমিশনারকে জানানো হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে সতীদাহ একটি পুরানো ধর্মীয় প্রথা। ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসীরা সতীদাহ করার জন্যে কোনো প্রকার বল প্রয়োগ করেন না। এই অনুষ্ঠানে সতীদের পূর্ণ সমর্থন আছে। কাজেই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো আদেশ জারির প্রয়োজন নেই। কিন্তু কমিশনার ডি.আর.লায়াল রাজদরবারে যুক্তিতে সায় না দিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট-এর মারফত জানান যে সতীদাহ প্রথা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ না করা হলে পরিণতি রাজার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হতে পারে।

বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অনুরোধে চট্টগ্রামের কমিশনার ডি.আর.লায়েল। ত্রিপুরার পলিটিক্যাল এজেন্টকে এক পত্র লেখেন। সে চিঠি পেয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট উমাকান্ত দাস মহাশয় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১১জুন রাজ্যের পররাষ্ট্র বিভাগে সতীদাহ প্রথা বন্ধের নির্দেশ দেন।

পত্রটি এইরূপ:

"Letter no.276. From Babu Umakanta Das Assistant Political Agent of Hill Tipperah. To Babu Banga Charan Bhattacharjee B.A., Office-in-charge of His Highness the Maharaja's English Office. Dated Agartala the 11th June 1888."

উপরোক্ত পত্রের দ্বিতীয় দফায় ছিল:

"During my recent moments in the Sonamura Division in March last, I heard of three cases of the kind having occurred amongst Jamatiyas in the course of the last two of three years. These cases are noted in the margin.

1. Wife of Charan Senapati of Burmachhora about three years ago.
2. Wife of Gangamohan Senapati named Beniluxmi of Falilong Cherra in about Baisak before last.
3. Wife of Milaram Burma of Hasiarai Choudhury's para on Turappacherra in about Magh last".

"৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮, উপরোক্ত চিঠির জবাবে মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য লিখলেন ঃ সতীদাহ এ রাজ্যের বহু প্রাচীন কালের প্রচলিত প্রথা এবং প্রজাসাধারণ এই প্রথাকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকে। যে সকল পার্বত্য জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত তাহারা এখনও অশিক্ষিত, সুতরাং রাজদরবার হইতে এই প্রথার প্রতিকূল হস্তক্ষেপ হইলে রাজ্যে অসন্তোষভাব এবং তজ্জনিত অশান্তি উপস্থিত হইতে পারে। বিশেষত বিগত দশ বৎসর হইতে এই প্রথা স্বতঃই উত্তরোত্তর হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এ স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে ব্রিটিশ রাজ্যে সেরূপ উৎপীড়ন বা প্ররোচনা প্রভৃতি দ্বারা সতীকে দাহ করা হইত এ রাজ্যে তাহা হয় না। সতী স্বেচ্ছায় অনুগমন করিয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দরবার এ বিষয়ে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচারের আবশ্যকতা অনুভব করেন না। কিন্তু যাহাতে কেহ উৎপীড়ন বা প্ররোচনার দ্বারা সতীদাহ না করে এবং ক্রমশ আপনা হইতে যাহাতে এই প্রথা উঠিয়া যায়, দরবার সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন"।

মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের চিঠির উত্তরে চট্টগ্রাম কমিশনার মিঃ লায়েল লিখলেন ঃ

"চট্টগ্রাম, ২রা অক্টোবর, ১৮৮৮ নং ১ পূরণ ২১ ভাগের ৬৮৭, মহাশয়, সতীদাহ সম্বন্ধে পার্বত্য ত্রিপুরার রাজদরবারের প্রত্যুত্তর সম্বলিত আপনার ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ২৬ পূরণ ১৯৯৩ নং পত্র পাইয়াছি।

"রাজদরবারের লিখিত উত্তর সন্তোষজনক নহে। মহারাজের ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট হইতে আমি এইরূপ উত্তর পাইব বলিয়া প্রত্যাশা করি না। ঐ পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না।"

"সতীদাহ পার্বত্য ত্রিপুরার আদিম প্রথা নহে। আমার বিশ্বাস পার্বত্য জাতির মধ্যে এই প্রথা নতুন প্রবর্তিত। যে সকল পার্বত্য লোক হিন্দু ধর্মোচিত আচার অবলম্বন করে তাহারা সতীদাহ প্রথার অনুসরণ করে। এই সমস্ত ব্যক্তি অসন্তোষ

প্রকাশ করিবার লোক নহে এবং ইহাদের অসন্তুষ্টি আশঙ্কাজনকও নহে।"

"এই প্রথা নিষিদ্ধ বলিয়াই সম্প্রতি হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। কৈলাসহরের গত ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনাই প্রকৃষ্ট প্রথা, যদি মহারাজের এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, এ বিষয়ে কোনরূপ রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা নাই, তবে এই প্রথা পুনর্বার প্রবল হইবে। কারণ ইহা সহজে উপলব্ধি হয় যে, যাহা নিষিদ্ধ নহে তাহাই অনুমোদিত। সুতরাং ইহাতে এই প্রথায় উৎসাহ প্রদান করা যাইবে।

আমি অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি এই বিষয় পুনর্বার মহারাজ সমীপে উপস্থিত করিবেন এবং যাহাতে ১৮২৯সনের ১০নং রেগুলেসনের ন্যায় একটি আইন জারি হয় এবং তদানুসারে কার্য হয়। তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ দিবেন। আমি বিশেষভাবে মহারাজের গোচর করিতে চাই যে, যে প্রথা ৬০ বৎসর হইল আইন বিরুদ্ধ বলিয়া ভারতবর্ষে প্রচার করা হইয়াছে এবং যাহা সমস্ত সুসভ্যজাতি অসভ্য ব্যবহার বলিয়া মনে করেন। মহারাজার বর্তমান কার্য দ্বারা সেই প্র থার উৎসাহ বর্ধন করা হইতেছে"।

এই চিঠি পাওয়ার পর মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর ১২৯৯ ত্রিপুরাব্দের ৮ জ্যৈষ্ঠ(১৮৮৯খ্রি:) এক রোবকারী বলে ত্রিপুরায় সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন। নিচে রোবকারীর আদেশটি নেওয়া হল:

S.D/B.C.Deb

রোবকারী স্বাধীন ত্রিপুরা, দরবার শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর। সন ১২৯৯ ত্রিং, তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু জানা যায় এ রাজ্যের পার্বতীয় প্রদেশের কোন কোন স্থানে সতীদাহ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয় নাই অতএব তাহা রহিত আবশ্যক। সে মতে হুকুম হইল যে এতদ্বারা উল্লেখিত সতীদাহ প্রথা রহিত করা যায় ও আদেশ প্রচারের তারিখের পর হইতে এই আদেশ লঙ্ঘন ক্রমে কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি তাহার উদ্যোগ করা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ দণ্ডনীয় হইবে। কার্য্যে পরিণত হওয়ার আদেশ এই রোবকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠানো যায়।

(স্বাক্ষর) প্যারীমোহন রায়

দাসত্ব প্রথা

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলেও দাসত্বপ্রথা চালু ছিল। রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হতো। প্রসঙ্গক্রমে, মহারাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের

সময়ের দাস-দাসী বিক্রয়ের চারটি দলিল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে রয়েছে দুটি আত্মবিক্রয়ের, একটি দাসী বিক্রয়ের, একটি কন্যা বিক্রয়ের দলিল। আত্মবিক্রয়ের একটি দলিলের নমুনা ছিল নিম্নরূপ ঃ—

সামনের দিকে রয়েছেঃ—

৭ স্বস্তি-সমস্ত সুপ্রশস্তাল কৃত সতত বিরাজমান মহারাজধিরাজ শ্রীশ্রীযুক্ত ঔরঙ্গাজেব পাদ সাহা পাদানাম ভুদায়িনি রাজ্যে তন্নিযুক্ত নবাব শ্রীযুক্ত ইবরাইম খাঁকে বঙ্গাধিকারিনী তৎসম্মত শ্রীযুক্ত রত্নমাণিক্য মহারাজাধিকারে উদয়পুর সরকারান্তর্গত মুবনগরীয় সামন্ত ঘর গ্রামে সপ্তদশাধিক ষোড়শশত শকাব্দায়াবিশ্বনস্য দ্বিতীয়াংশো শ্রীঅনন্ত রাম দেবস্য সভায়ামনকে মুসলমান দ্বিজ সজ্জানাধিষ্ঠিতানাং শ্রীভুবনেশ্বর ভট্টাচার্যস্য সকাশদ্রাজাত চতুর্মুদ্রামাদায় শ্রীসন্তোষ নাপিতেনময়া রাজস্বর্ণানোপ হত্যা লিখিত বিত্তদাতরি স্বেচ্ছায়াত্মা বিক্রিত ইতি-

সন ১১০ (৪)

এর দক্ষিণ পার্শে রয়েছে শ্রীসন্তোষ নাপিতস্য খতং অপর পৃষ্ঠায় রয়েছে-

মুসলমান ঃ

শ্রী রসিদ খাঁ ১ লাং বিদ্যাকোট

ওলদ মাদা খাঁ

এসব ক্রীতদাসদের রাজ্যে 'পিছারার সেবক' বলা হতো। ত্রিপুরার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়ির পেছন দিকে তাদের থাকার ব্যবস্থা থাকত বলে তাদের 'পিছারার সেবক' বলা হতো। তারা তাদের অন্নদাতার সেবা করতো। আবশ্যক ক্ষেত্রে তারা চাকুরি করে জীবন নির্বাহ করতো। পার্বত্য অঞ্চলের প্রজাদের থেকেই সে সময় 'পিছারার সেবক' আনা হতো। জুমচাষ করতে করতে যারা হয়রান হতেন সে সব পাহাড়ি প্রজারা সেবকী হয়ে কাজ করতে পছন্দ করত। তবে আত্মবিক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ কারণই ছিল, ঋণ গ্রহণ করে, সুদ না দিয়ে এরূপ কাজ করে তা পরিশোধ করা। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্ট মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যকে দাসপ্রথা তুলে দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কারণ হিসাবে বলেছিলেন ইংরেজ রাজত্বে দাসত্ব প্রথা থাকতে পারে না। মহারাজা বীরচন্দ্র ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দেই এক ঘোষণাপত্র প্রচার করে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ক্রীতদাস প্রথা রহিত করে দেন।

নরবলি প্রথা

প্রাচীনকাল থেকেই ত্রিপুরায় নরবলি দেবার প্রথা ছিল। যুদ্ধে পরাজিত

সেনাপতিদের দেবতার সামনে বলি দেওয়া হতো। মহারাজা বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে পরাজিত পাঠান সেনাপতি মোমারক খাঁকে চতুর্দশ দেবতার সামনে বলি দেওয়া হয়েছিল। চট্টগ্রামের অন্তর্গত দোয়াপাথর বা দৌচা পাথার স্থানটি ত্রিপুরা রাজাদের অধীনে ছিল। এই স্থানটিতে একসময়ে প্রচুর নরবলি দেওয়া হতো। পরবতীকালে মহারাজা ধন্যমাণিক্য নরবলির সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিলেন।

রাজমালায় আছে ঃ

পূর্বেতে ত্রিপুরা রাজা নরবলি দিত।
সহস্রে সহস্রে বঙ্গ বর্ষে কাটা খাইত।
শ্রীধন্যমাণিক্য মানা তাহাতে করিল।
তদবধি নরবলি নিষেধ হইল।।
তিন বৎসরে এক নব চতুর্দ্দশে দিবে।
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে।।
দৌচা পাথরে দুই নর শত্রু পাইলে হয়।
গোমতীতে দুই বলি ঘটে সে সময়।

উৎস : রাজমালা, ধন্যমাণিক্য খন্ড, পৃ :২৯

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে ত্রিপুরায় শেষ নরবলি হয়েছিল। সে সময় উদয়পুর বিভাগে পঞ্জিহাস নামে কোনো এক রিয়াং সর্দারের বাড়িতে কপি রায় নামে একজন লোক বাস করত। সে তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুক দিয়ে চিকিৎসা করে জীবিকা নির্বাহ করত। প্রাচীন সংস্কারে বশীভূত হয়ে সে গ্রামের কালাহারি রায় প্রভৃতি কিছু রিয়াং ব্যক্তি তাকে 'ডাইন' আখ্যা দেয়। তারা কপি রায়ের স্ত্রী চিখিমাকে বলে, 'তোমার স্বামী ডাইন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহাকে বধ করা উচিত'। তখন ১২৯১ ত্রিপুরাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে জঙ্গল নিয়ে গিয়ে বলি দেয়।

ঘটনার দশমাস পরে ত্রিপুরার তৎকালীন মন্ত্রী ধনঞ্জয় বাহাদুরের কাছে এ খবর পৌঁছায়। তিনি অনুসন্ধান করে কালাহারি সহ নয়জন রিয়াংকে অপরাধী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ড প্রদান করেন। সেসময় থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে নরবলি প্রথা আইন করে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। (সূত্র : রমাপ্রসাদ দত্ত, শতাব্দীর ত্রিপুরা পৃ : ২২)

চতুর্দশ অধ্যায়

মাণিক্য শাসনাধীন আধুনিক ত্রিপুরায় কতিপয় আইন

(১৮৬২-১৯৪৯ খ্রিঃ)

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরা আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। আইন, প্রশাসন, শিক্ষা, সমাজ সংস্কার সকল দিকে থেকেই ত্রিপুরাকে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা শুরু। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মাণিক্যশাসন কালের পূর্বে ত্রিপুরার প্রশাসন ছিল পিতৃতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক। পার্বত্য ত্রিপুরার পল্লীতে প্রথাগত বিধান অনুসৃত হত। অপরদিকে ত্রিপুরার সমতল ভূমিতে মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক, সংহিতা, জীমূতবাহনের দায়ভাগ, রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিগ্রন্থ অনুসারে জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ, মৃত্যু, অশৌচ, উত্তরাধিকার, প্রায়শ্চিত্য পালিত হত।

মধ্যযুগে ত্রিপুরা প্রশাসনিক দিক থেকে তুর্কি পাঠান মোঘলদের দ্বারা প্রভাবিত হত এবং রাজ্যের প্রশাসনে আরবি, ফার্সি শব্দ ব্যবহৃত হত। রাজারা নানারকম কর দিতে বাধ্য হতেন। এমন কি মোঘল দরবারে রাজপরিবারের একজনকে প্রতিনিধি পাঠানো বাধ্যতামূলক ছিল। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। পূর্বের পিতৃতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আনার জন্য মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে বাবু নীলমণি দাস, বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত এবং ডাঃ সাহেবকে ত্রিপুরার প্রশাসনে নিয়ে আসা হল। দেওয়ান নীলমণি দাস ছিলেন লিখিত আইন প্রণয়নে সিদ্ধহস্ত। ত্রিপুরা ক্রমশ আধুনিক যুগে প্রবেশ করল। নিম্নে কালনুক্রমে কতিপয় বিশেষ বিশেষ আদেশ ও আইনের নাম সংযোজিত হল।

ত্রিপুরাব্দ	খ্রিস্টাব্দ	আইনও আদেশের নাম
১২৭৭	১৮৬৭	দলিল রেজিস্টারি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী
১২৮০	১৮৭০	স্বাধীন ত্রিপুরার চলৎ ও দণ্ড বিধি
১২৮০	১৮৭০	দেওয়ানী ও ফৌজদারী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী
১২৮২	১৮৭২	উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধীয় অপরাধের দণ্ড বিধি
১২৮৩	১৮৭৩	স্ট্যাম্প সংক্রান্ত নিয়ম
১২৮৩	১৮৭৩	গৃহপালিত পশুর অনধিকার প্রবেশ ওখোয়ারবিধি
১২৮৩	১৮৭৩	কতিপয় নিয়মকে আইনের স্বীকৃতি ঘোষণা
১২৮৪	১৮৭৪	তমাদি আইন
১২৮৪	১৮৭৪	দেওয়ানি কার্যবিধির আইন
১২৮৪	১৮৭৪	নিষ্পত্তি পত্রাদি লিখিবার আইন
১২৮৪	১৮৭৪	পৌরসভা সংক্রান্ত আইন
১২৮৬	১৮৭৬	স্ট্যাম্প সংক্রান্ত সংশোধিত আইন
১২৯০	১৮৮০	রাজস্ব সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী
১২৯৬	১৮৮৬	প্রজাভূম্যধিকারী সম্বন্ধ বিষয়ক আইন
১২৯৬	১৮৮৬	আবগারি আইন
১২৯৬	১৮৮৬	পুলিশ আইন
১২৯৭	১৮৮৭	বিচারে সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত আইন
১২৯৭	১৮৮৭	বন সংরক্ষণ বিষয়ক আইন/গোহত্যা নিবারণ আইন
১৩০৪	১৮৯৪	তিল ও তুলা মহাল আইন
১৩০৬	১৮৯৬	ভূমি ক্রয়-বিক্রয় নিবন্ধীকরণ আইন
১৩০৮	১৮৯৯	ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন সংক্রান্ত আদেশ
১৩০৮	১৮৯৯	খাসভূমি সংক্রান্ত আইন
১৩০৮	১৮৯৯	আড্ডাকর সংক্রান্ত নিয়মাবলী
১৩১০	১৯০০	তাচ্চবী নিয়ামক বিধি
১৩১৩	১৯০৩	খুস্কি বনকর মহাল সম্বন্ধীয় আইন
১৩১৪	১৯০৪	ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন সংক্রান্ত আদেশ
১৩১৪	১৯০৪	সুদ নিয়ামক বিধি
১৩১৭	১৯০৭	পাট ও সরিষা রপ্তানি শুল্ক আইন
১৩১৮	১৯০৮	বিচারালয় গঠন সম্বন্ধীয় আইন
১৩২১	১৯১১	ঘাসুরি আইন

১৩২১	১৯১১	স্বাধীন ত্রিপুরার সংশোধিত চলৎ দণ্ডবিধি
১৩২২	১৯১২	বিচার কার্য পরিচালন বিষয়ক নিয়ম
১৩২২	১৯১২	জমি মহাল সম্বন্ধীয় নিয়ম
১৩২২	১৯১২	বিদ্যালয় পরিদর্শন সম্বন্ধীয় নিয়ম
১৩২২	১৯১২	ছন ক্ষেত্র মহাল সম্বন্ধীয় নিয়ম
১৩২২	১৯১২	গরু চুরি অনুসন্ধান সম্বন্ধীয় নিয়ম
১৩২২	১৯১২	উজান চৌকা সম্বন্ধীয় নিয়ম
১৩২২	১৯১২	ত্রিপুরা পৌরসভা আইন
১৩২৩	১৯১৩	ঘাসুরি আইন
১৩২৩	১৯১৩	পুরাতন কাগজপত্র ধ্বংস করার আইন
১৩২৬	১৯১৬	প্রিভি কাউন্সিল গঠন বিষয়ক আইন
১৩২৬	১৯১৬	আবগারি সংশোধিত ও আইন
১৩২৬	১৯১৬	টিকা আইন
১৩২৬	১৯১৬	সরকারি প্রাপ্য আদায় সম্বন্ধীয় আইন
১৩২৭	১৯১৬	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ সম্বন্ধীয় আইন
১৩২৭	১৯১৭	সরকারি কর্মচারীগণের জামিন গ্রহণ সম্বন্ধীয় আইন
১৩২৭	১৯১৭	চা বাগিচা ভূমি সম্বন্ধীয় আইন
১৩২৭	১৯১৭	আফিং আমদানি ও বিক্রয় সংক্রান্ত আইন
১৩২৮	১৯১৮	চা রপ্তানি বিধি
১৩২৯	১৯১৯	পার্বত্য প্রজাগণের ঘর চুক্তিকর সম্বন্ধীয় আইন
১৩২৯	১৯১৯	সিপাহি পলায়ন সংক্রান্ত আইন
১৩২৯	১৯১৯	দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি
১৩২৯	১৯১৯	ঘাসুরি আইন
১৩২৯	১৯১৯	উকিল বিষয়ক বিধি
১৩৩২	১৯২২	ঋণগ্রস্থ ভূমধ্যধিকারী বিষয়ক আইন
১৩৩২	১৯২২	মাদক দ্রব্য বিষয়ক নিয়মাবলী
১৩৩৬	১৯২৬	জুয়াখেলা নিয়ন্ত্রণ বিধি
১৩৩৬	১৯২৬	গোরুর গাড়ি নিয়ামক বিধি
১৩৩৬	১৯২৬	ভূমি রাজস্ব ও জরিপ সংশোধনী আইন
১৩৩৭	১৯২৭	প্রজা ভূম্যধিকারী সংশোধনী আইন
১৩৩৭	১৯২৭	ভূমি অধিগ্রহণ আইন

১৩৩৮	১৯২৮	মোটরগাড়ী সংক্রান্ত আইন
১৩৩৮	১৯২৮	হাতীর দাঁত পাচার নিবারণ আইন
১৩৩৮	১৯২৮	স্ট্যাম্প সংক্রান্ত সংশোধনী নিয়ম
১৩৩৯	১৯২৯	জনগণনা আইন
১৩৩৯	১৯২৯	উত্তরাধিকার বিষয়ক আইন
১৩৩৯	১৯২৯	পূর্ত ও বর্ত্মকর সম্বন্ধীয় আইন
১৩৪০	১৯৩০	An Act to constitute a Tripura State Bank
১৩৪০	১৯৩০	জরীপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী
১৩৪২	১৯৩২	বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষণ সম্বন্ধীয় আইন
১৩৪২	১৯৩২	জরীপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী
১৩৪৫	১৯৩৫	আগরতলা পৌর এলাকার গরুর গাড়ীর উপর কর আরোপ বিধি
১৩৪৬	১৯৩৬	পূর্ত ও বর্ত্মকর সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী
১৩৪৬	১৯৩৬	রাজধানী আগরতলা নগর বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান
১৩৪৯	১৯৩৯	ত্রিপুরা পৌরসভা আইন
১৩৫০	১৯৪০	General Provident Fund Rule
১৩৫০	১৯৪০	গ্রাম্য মণ্ডলী আইন
১৩৫১	১৯৪১	ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র
১৩৫১	১৯৪১	নির্বাচন কেন্দ্র বিষয়ক নিয়মাবলী
১৩৫১	১৯৪১	ত্রিপুরা রাজ্যের সাইকেল নিয়ামক বিধি
১৩৫৭	১৯৪৭	ত্রিপুরা রাজ্যের রিক্সা নিয়ামক বিধি
১৩৫৮	১৯৪৮	Tripura State Cotton cloth yarn Control order
১৩৫৯	১৯৪৯	Tripura Merger Agreement

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ত্রিপুরা

রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে পূর্ববঙ্গ ও স্বাধীন ত্রিপুরা পাশাপাশি অবস্থান করলেও স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে উভয় দেশের জনগণ বহুযুগ আগে থেকেই বসবাস করে আসছে। ১৯৪৭ সনে ভারত দ্বিখণ্ডিত হলো। দেশভাগের পর পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশেই বাঙালি জাতি ভাষার প্রশ্নে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। ভারত ভাগের পর পূর্ববাংলার সংখ্যাগুরু মুসলমান বাঙালিরা নিজেদের দেশ বাংলাদেশে থেকেও হয়ে গেল পাকিস্তানি। পূর্ববাংলার নতুন নাম হয় পূর্বপাকিস্তান। নবজাত পাকিস্তানের নতুন সংবিধানের প্রশ্ন উঠল। সংবিধানের ভাষা নিয়েই শুরু হল বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের প্রতি বঞ্চনা। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পরই 'পাকিস্তান গণপরিষদ'-এর সভায় ইংরেজি ভাষার সঙ্গে উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। ঐ সময় পূর্বপাকিস্তানের কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উক্ত প্রস্তাবে প্রতিবাদ জানান এবং উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব গণপরিষদে নাকচ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, ওই সময়ে পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশের মোট জনসংখ্যার ৫৪.৬ শতাংশ ছিল বাংলা ভাষী। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা গড়ে তোলেন 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। আন্দোলনের ডাক দেওয়া হল ১১ মার্চ, ১৯৪৮ এ। ভাষা আন্দোলনের সূচনাতে ছাত্ররা পালন করল 'রাষ্ট্রভাষা দিবস'। প্রতিবাদ সভা করা হয় এবং ১৪৪ ধারা অমান্য করে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে লাঠি চার্জ করে। ছোড়া হয় ফাঁকা গুলি এবং কাঁদানে গ্যাসের সেল ছাত্রদের উপর বিনা

প্ররোচনায়। এ ঘটনায় অনেক ছাত্র আহত হয়। ফলে, সংগ্রাম পরিষদের ছাত্ররা হাইকোর্ট, প্রাদেশিক ভবন, সেক্রেটারিয়েট প্রভৃতির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে ঘেরাও করে রাখা হয়। আন্দোলন চলে ১১ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বাধ্য হয়ে প্রতিশ্রুতি দেন-(১) পশ্চিম পাকিস্তানে সুপারিশ পাঠানো হবে যেন বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়, (২) পূর্ব-পাকিস্তানের আইনসভায় যেন বাংলা ভাষাকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়, (৩) গ্রেপ্তারকৃত ছাত্র এবং ছাত্রনেতাদের মুক্তি দেওয়া হবে ইত্যাদি।

আশ্চর্যের বিষয় হলো ১৫ মার্চ রাত্রিতে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় আন্তরিকতার অভাব অনুভূত হয়। ফলে ছাত্ররা বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। ২১মার্চ ঢাকার রমনা ময়দানে মহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে শুধু উর্দুভাষা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও জিন্না সাহেব উর্দুর পক্ষেই রায় দেন।

১৯৫০ সালের ৭ ডিসেম্বর পূর্বপাকিস্তান সরকার গঠন করেন পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি। কমিটির রিপোর্ট উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হয় বাংলা ভাষাকে নয়। ফলে ছাত্রবিক্ষোভ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে।

১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির কর্মপরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় প্রদেশ ব্যাপী ২১ দফার দাবির ভিত্তিতে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালন করা হবে। সকাল থেকে ঢাকা শহরের সকল স্তরের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে আমগাছের নিচে জড়ো হয় তাদের সঙ্গে যোগ দেন মেডিকেল কলেজের ওয়ার্ডবয় থেকে শুরু করে পথচারী, রিকশাওয়ালা এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ। ভাষা আন্দোলনের পরিবর্তন ঘটে গণআন্দোলনে। ওই দিনের সভায় জনাব শামসুল হক সাহেব ১৪৪ ধারা না ভাঙার পথে মত দেন, কিন্তু পরিশেষে আবদুল মতিন সাহেবের প্রস্তাব মত সিদ্ধান্ত হয় ১৪৪ ধারা ভাঙার। ২১শে ফেব্রুয়ারির দিশেহারা প্রশাসনগুলি চালায় আন্দোলনকারীদের উপর। শহিদ হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত, রফিকউদ্দীন আহমেদ, আবদুল জব্বার এবং সালাউদ্দিন (শুল্ক বিভাগের পিওন)। আহত হন অনেকে এবং গ্রেপ্তার হন অসংখ্য।

২২ শে ফেব্রুয়ারি গায়েবানা জানাজা নামাজ শেষ করে বিরাট গণমিছিল

হাইকোর্টের সামনে পৌছুলে আবার গুলি চলে। একুশে ফেব্রুয়ারির খবর বিকৃত করে ছাপার অপরাধে উত্তেজিত জনতা পুড়িয়ে দেয় 'দৈনিক মর্নিং নিউজ' পত্রিকার প্রেস। শহিদ হল যথাক্রমে রফিউর রহমান (হাইকোর্টের কর্মচারী), আবদুল আওয়াল (রিকশাচালক) অহিউল্লাহ (১০বছরের কিশোর ছাত্র) ও অজ্ঞাত পরিচয় এক বালক এবং নাম না জানা আরো অনেকে।

ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত বিপ্লব শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি। সেই সূত্র থেকেই আন্দোলন ক্রমশ স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণতি পায়। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে পাকিস্তানের সামরিক শাসক বাংলাদেশের ছাত্র যুবকদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালালে শহিদ হলেন সালাম, বরকত, জব্বার প্রমুখ। ভাষা সংস্কৃতির এই স্ফুলিঙ্গই ১৯ বছর পর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবানল রূপে জ্বলে উঠে। পূর্বপাকিস্তানে বাঙালি জনগণের বিরুদ্ধে চলল নিপীড়নের ভয়াবহ তাণ্ডবতা। বাঙালিরাও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাতিসত্তা রক্ষার কারণে রুখে দাঁড়ায়। গরিব চাষি থেকে শুরু করে শ্রমিক, দোকানদার, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এমন কি সামরিক বাহিনীর সদস্য ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী-সর্বস্তরের মানুষ এই মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারে বাংলাদেশের অগুণতি মানুষ ত্রিপুরার উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্বদিকে আত্মরক্ষার কারণে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ্য শরণার্থী হয়ে ত্রিপুরার মাটিতে আশ্রয় নিল, সেই সময় মুক্তিযুদ্ধ সংহতি ও মৈত্রীর বন্ধনে ত্রিপুরার ভূমিকা ছিল অনবদ্য।

ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি জনগণ কোনো দ্বিধা না করে লক্ষ লক্ষ ভিটে মাটি ছাড়া আর্তদের বুকে টেনে নিল। ১৯৭১ সনের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে রাজ্য সরকারের হিসাব অনুযায়ী ত্রিপুরায় আশ্রিত শরণার্থী সংখ্যা নিম্নরূপঃ

আগত শরণার্থী	ঃ	১২,২১,৭৫৪
শিবির সংখ্যা	ঃ	৩৬
ইউনিট	ঃ	৩৮২
শিবিরবাসী	ঃ	৬,৯২,১৫৪
ব্যক্তিগত ব্যবস্থা	ঃ	১,৫০,০০০

আত্মীয়ের সঙ্গে	ঃ	৩,৮৯,৬০০
রাজ্যের বাইরে প্রেরিত	ঃ	২৫,৪৪০
১৯৭১ আগস্ট মাস পর্যন্ত ৪৫ কোটি টাকা চিকিৎসা ব্যয়	ঃ	৩৫০ জন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী

(সূত্র ঃ রাজ্য সরকারের মহাফেজখানা)

১৯৭১ এর মার্চ মাস থেকে নভেম্বরের শেষ দিক পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানের অভ্যন্তরে ৩০ লক্ষের উপর জনগণকে পাকিস্তানি বাহিনী নৃশংস ভাবে হত্যা করে। ২রা ডিসেম্বরে গোপন সূত্রে জানা যায় পাকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরে ব্যাপক আক্রমণ চালাবে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সেই সুযোগ না দিয়ে ১ লা ডিসেম্বর ত্রিপুরা থেকে আখাউড়া, বিবির বাজার, ফেনী, চট্টগ্রাম, সিলেট,শায়েস্তাগঞ্জ, সমসের নগর, বাল্লা বিভিন্নস্থানে আঘাত হানে।এদিকে ত্রিপুরায় শিক্ষিত মুক্তিবাহিনীর 'গেরিলা', সামরিক পদ্ধতিতে হঠাৎ আক্রমণে পাকবাহিনী হতচকিত। এই সময় পাকিস্তান সৈন্য বাহিনীর বাঙালি সৈন্য এবং পদস্থ সামরিক অফিসাররা বিদ্রোহ করে মুক্তিফৌজের শক্তি বৃদ্ধি করে। এদের নেতৃত্ব ছিলেন মেজর রফিকুল ইসলাম, মেজর খালেদ মুশারফ, কর্ণেল শফিউল্লা এবং মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত।

অন্যদিকে আর এক ইতিহাস। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের নায়ক শেখ মুজিবর রহমান এবং অপরদিকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ উভয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু ২৬ শে মার্চ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী মধ্যরাতে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে অন্তরীণ করে রেখে দেয়। তাঁর অবর্তমানে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শ অনুসারে ১২ এপ্রিল ১৯৭১ এ রাজধানী আগরতলার সার্কিট হাউসে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার গঠন এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী রূপে জনাব তাজউদ্দিন ও অন্যান্য মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের নাম স্থির করা হয়।

১৯৫২ সালে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন, ১৯৬০ এবং ১৯৬২ সালের ঘটনাবলী আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলেও আসলে ঘটনাগুলি ছিল একে অন্যের পরিপূরক। যার বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৯৭১ এর ৭ মার্চ থেকে এবং চরম পরিণতি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ ওইদিন ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট পাকিস্তানি বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ জেনারেল নিয়াজির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ বাংলাদেশ স্বাধীনতার এক গৌরবময় ঐতিহাসিক দলিলরূপে বিশ্বের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

পরিশিষ্ট

রাজমালা এবং প্রচলিত ধারণা অনুসারে রত্নমাণিক্য থেকে কল্যাণমাণিক্য পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজাদের বংশতালিকা

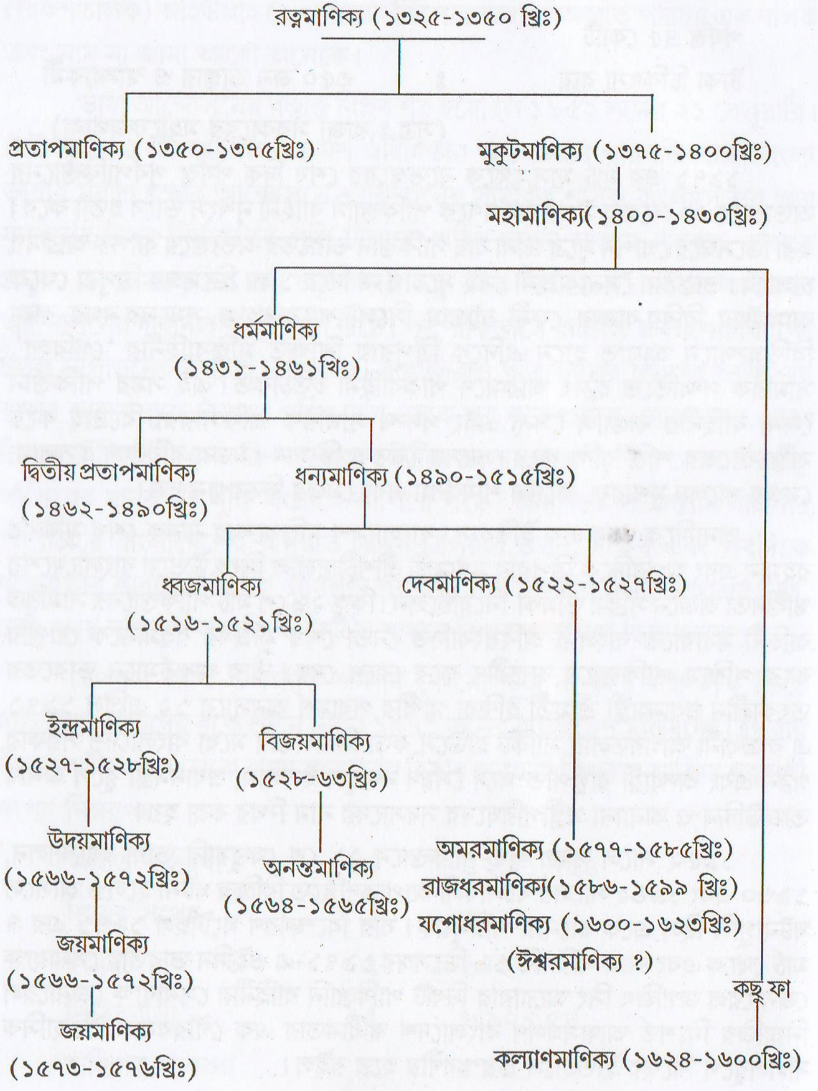

ঐতিহাসিকদের মতে ধর্মমাণিক্য রত্নমাণিক্যের পূর্বে রাজত্ব করেছেন

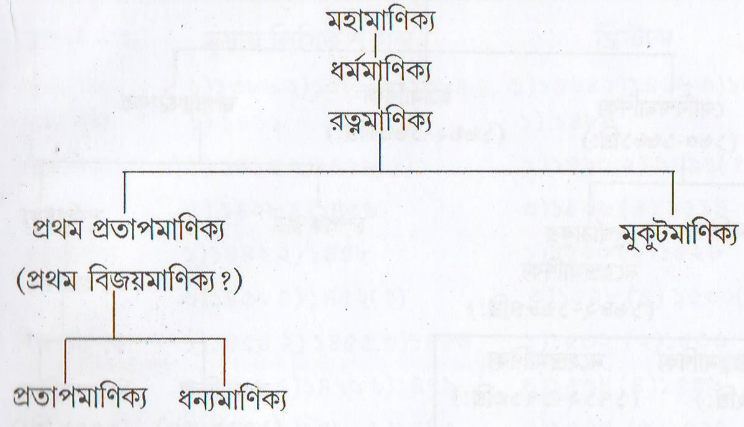

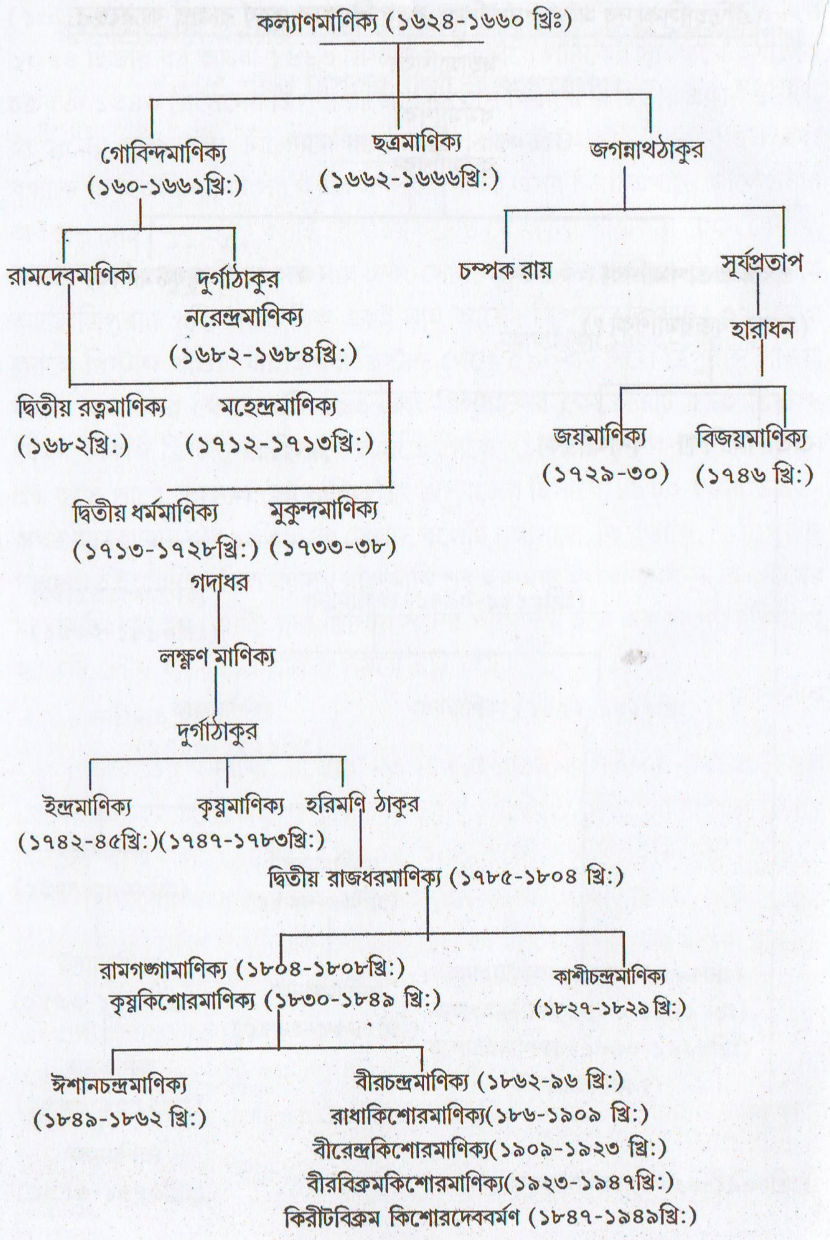

মুদ্রায় প্রাপ্ত ত্রিপুরার রাজগণের শকাব্দের মুদ্রাঙ্ক

রাজার নাম	মুদ্রায় লিখিত শকাব্দ	খ্রিস্টাব্দ
রত্নমাণিক্য	১)১৩৮৬ ২)১৩৮৮ ৩)১৩৮৯	১)১৪৬৪২)১৪৬৬ ৩)১৪৬৭
রত্নমাণিক্য	১) ১৪১১	১) ১৪৮৯
রত্নমাণিক্য	১)১৪১২ ২)১৪১৯(?) ৩) ১৪২৮ ৪)১৪৩৬	১)১৪৯০ ২) ১৪৯৭(?) ৩)১৫০৬ (৪) ১৫১৪
রত্নমাণিক্য	১)১৪৪২ ২) ১৪৪৮ ৩)১৪৫০ ৪) ১৪৫২(?)	১)১৫২০ (২)১৫২৬ ৩)১৫২৮ (৪) ১৫৩০(?)
বিজয়মাণিক্য	১)১৪৫৪ ২) ১৪৫৫ ৩)১৪৫৬ ৪)১৪৫৮ ৫)১৪৭৬ ৬)১৪৭৯ ৭)১৪৮০ ৮)১৪৮২ ৯)১৪৮৫	১)১৫৩২ (২)১৫৩৩ ৩)১৫৩৪ (৪)১৫৩৬ ৫)১৫৫৪ (৬)১৫৫৭ ৭)১৫৫৮ ৮)১৫৬০ ৯)১৫৬৩
.......মাণিক্য	১)১৪৮৬ ২) ১৪৮৭	১)১৫৬৪ ২)১৫৬৫
......মাণিক্য	১)১৪৮৯	১) ১৫৬৭
জয়মাণিক্য	১) ১৪৯৫	১)১৫৭৩
......মাণিক্য	১)১৪৯৯ ২)১৫০২ ৩)১৫০৩	১)১৫৭৭ ২)১৫৮০ ৩)১৫৮১
রাজধরমাণিক্য	১) ১৫০৭(?) ২) ১৫০৮	১)১৫৮৫ (?)২)১৫৮৬
রাজধরমাণিক্য	১)১৫২২	১)১৬০০
কল্যাণমাণিক্য	১) ১৫৪৮	১)১৬২৬
গোবিন্দমাণিক্য	১)১৫৮২	১)১৬৬০
....মাণিক্য	১)১৫৮৩	১)১৬৬১
.....মাণিক্য	১)১৫৯৮	১)১৬৭৬
রত্নমাণিক্য	১)১৬০৭	১)১৬৮৫
মহেন্দ্রমাণিক্য	১)১৬১৫	১) ১৬৯৩
মহেন্দ্রমাণিক্য	১)১৬৩৪	১)১৭১২
দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য	১)১৬৩৬	১)১৭১৪

দ্বিতীয় জয়মাণিক্য	১)১৬৬১	১)১৭৩৯
দ্বিতীয় ইন্দ্রমাণিক্য	১) ১৬৬৬	১)১৭৪৪
.....মাণিক্য	১) ১৬৮২	১) ১৭৬০
মুহুরীদেবী	১)১৬৮৩-৮৫	১)১৭৬১ (ব্রিটিশ আধিপত্য শুরু)
......মাণিক্য (২য়)	১)১৭০৭	১) ১৭৮৫
.....মাণিক্য	১) ১৭২৮	১) ১৮০৬
......	১) ১৭৩১	১)১৮০৯
....	১) ১৭৪৩	১) ১৮২১
শচীন্দ্রমাণিক্য	১) ১৭৪৪	১)১৮২২
কিশোরমাণিক্য	১) ১৭৫২	১) ১৮৩১
ঈশানচন্দ্রমাণিক্য	১) ১৭৭১	১)১৮৪৯
বীরচন্দ্রমাণিক্য	১) ১৭৯১	১) ১৮৯৬
রাধাকিশোরমাণিক্য	১) ১৮১৮	১) ১৯০৯
বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য	১) ১৮৪৫	১) ১৯২৩

মুদ্রায় লিখিত ত্রিপুরার মহিষীদের নাম

রাজার নাম	মহিষীদের নাম (মুদ্রার তারিখ)
প্রথম রত্নমাণিক্য	লক্ষ্মী মহাদেবী (শক ১৩৮৯)
মুকুটমাণিক্য	মুদ্রার লেখন হইতে মহিষীর নাম এখনও পড়া যায়নি শক (১৪১১)
ধন্যমাণিক্য	কমলা মহাদেবী (শক ১৪১২)
দেবমাণিক্য	পদ্মাবতী দেবী (শক ১৪৪২)
প্রথম বিজয়মাণিক্য	১) বিজয়া দেবী (শক ১৪১২) ২) লক্ষ্মী মহাদেবী (শক ১৪৫২,১৪৭৯,১৪৮০,১৪৮২) ৩) সরস্বতী মহাদেবী (শক ১৪৭৬) ৪) বাক্‌দেবী বা বামাদেবী (?) (শক ১৪৮৫)
অনন্তমাণিক্য	রত্নদেবী মহাদেবী (শক ১৪৮৭)
উদয়মাণিক্য	হীরা মহাদেবী (শক ১৪৮৯)
প্রথম জয়মাণিক্য	শুভদ্রা মহাদেবী (শক ১৪৯৫)

অমরমাণিক্য	অমরাবতী মহাদেবী (শক ১৪৯৯)
রাজধরমাণিক্য	সত্যবতী মহাদেবী (শক ১৫০৮)
যশোধরমাণিক্য	১)লক্ষ্মী মহাদেবী (শক ১৫২২) ২) লক্ষ্মী গৌরী মহাদেবী (ঐ) ৩)গৌরী লক্ষ্মী জয়া মহাদেবী
কল্যাণমাণিক্য	কলাবতী মহাদেবী (শক ১৫৪৮)
গোবিন্দমাণিক্য	গুণবতী মহাদেবী (শক ১৫৮২)
ছত্রমাণিক্য	মুদ্রায় মহিষীর নাম নেই (শক ১৫৮৩)
রামদেবমাণিক্য	১) সত্যবতী মহাদেবী (শক ১৫৯৮) ২) ভাগ্যবতী মহাদেবী (ঐ)
দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য	মুদ্রায় মহিষীর নাম নেই (শক ১৬০৭)
নরেন্দ্রমাণিক্য	মুদ্রায় মহিষীর নাম নেই (শক ১৬১৫)
মহেন্দ্রমাণিক্য	মুদ্রায় মহিষীর নাম নেই (শক ১৬৩৪)
দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য	ধর্মশীলা মহাদেবী (শক ১৬৩৬)
দ্বিতীয় জয়মাণিক্য	জয়াবতী মহাদেবী (শক ১৬৬১)
দ্বিতীয় ইন্দ্রমাণিক্য	লক্ষ্মীবতী মহাদেবী (শক ১৬৬৬)
কৃষ্ণমাণিক্য	জাহ্নবী দেবী (শক ১৬৮২)
রাজার নাম	**মহিষীদের নাম মুদ্রার তারিখ**
গোবিন্দমাণিক্য(২য়)	মুদ্রায় মহিষীর নাম নেই (শক ১৫৮৩)
গোবিন্দমাণিক্য (১ম)	তারাদেবী (শক ১৭২৮)
মাণিক্য	সুমিত্রা দেবী (শক ১৭৩১)
গঙ্গামাণিক্য	চন্দ্রতারা দেবী (দ্বিতীয়)(শক ১৭৪৩)
চন্দ্রমাণিক্য	কুটি লক্ষ্মী/চন্দ্ররেখা দেবী (শক ১৭৪৪) এবং(১৭৪৮) (কুটি লক্ষ্মী বাঙালি মহিলা)
কিশোরমাণিক্য	পূর্ণকলা/অখিলেশ্বরী/সুদক্ষিণা/রত্নমালা/বিধুকণাদেবী (শক১৭৫২)
চন্দ্রমাণিক্য	রাজেলক্ষ্মী/মুক্তাবলী/চন্দ্রেশ্বরী দেবী (শক ১৭৭১) ত্রিপুরাব্দ ১২৭৯(১৮৬৯খ্রিস্টাব্দ)
কিশোরমাণিক্য	তুলসীবতী/রত্নমঞ্জুরী দেবী ত্রিপুরাব্দ ১৩০৬(১৮৯৬খ্রিঃ)

চন্দ্রকিশোরমাণিক্য	প্রভাবতীদেবী(ত্রিপুরাব্দ ১৩১৯)
বিক্রমকিশোরমাণিক্য	কীর্তিমণি/কাঞ্চনপ্রভাদেবী ত্রিপুরাব্দ ১৩৩৭/১৩৩৮/১৩৪১
বাহাদুর	(১৯২৭-১৯২৮খ্রিঃ) এবং পরে ১৯২৮-১৯৩১খ্রিঃ)

ত্রিপুরার মুদ্রা

চিত্র-পরিচিতি-গ

রাজা	মুখ্য দিক ঃ লেখন	গৌণ দিকঃ চিত্রণ ও লেখন
১। ১ম রত্ন	শ্রী নারা-/য়ণ-চর- ণ-পর	(শুধু লেখন)"শ্রীশ্রীর-/ত্নমাণি/- ক্য দেবঃ"।
২। -ঐ-	শ্রীশ্রীর-/ত্ন মাণি-/ কাদেব ঃ	ত্রিপুরা সিংহ। "শ্রী দুর্গা"।
৩। -ঐ-	শ্রীশ্রীর/ত্ন মাণি-/ কাদেব ঃ	ত্রিপুরাসিংহের অবয়ব। (ভিতর দিকে লেখা প্রান্তিক লেখন)"শ্রীদুর্গা পদপরঃ(। *)রত্নপুরে শক ১৩৮৬"।
৫। -ঐ-	পার্বতী-প-/রমেশ্বর- চ/রণপরৌ(। *)/১৩৮১	(শুধু লেখন)"শ্রীলক্ষ্মী মহাদেবী/ শ্রীশ্রীরত্ন-/মাণিক্যৌ"।
৬। ধন্য	শ্রীশ্রীধ-/ন্য মাণি-/ ক্যদেব ঃ	ত্রিপুরাসিংহ (নিম্নে মৎস্য ?)। (লেখন নাই)
৭। -ঐ-	শ্রীশ্রীধন্য-/মাণিক্য শ্রী/	-ঐ-
৮। -ঐ-	ত্রিপুরেন্দ্র-শ্রীশ্রী ধন্য/ মাণিক্য শ্রীক-/মলা দেব্যৌ	ত্রিপুরা সিংহ। "শক ১৪১২"।

ত্রিপুরার মুদ্রা

চিত্র-পরিচিতি-ঘ

রাজা	মুখ্য দিক ঃ লেখন	গৌণ দিকঃ চিত্রণ ও লেখন
১। ১ম রত্ন	বিজয়ীন্দ্র/শ্রীশ্রীধন্য মাণিক্য শ্রীক-/মলা দেব্যৌ	ত্রিপুরা সিংহ। "শক ১৪২৮"।
২। -ঐ-	চাটিগ্রাম-বি-/জয়ি(য়ী) শ্রীশ্রীধ-/ন্য মাণিক্য শ্রী/কমলা দেব্যৌ	ত্রিপুরা সিংহ। "শক ১৪৩৫"
৩। -ঐ-	সুবর্ন্নগ্রা-/ম বিজয়ি(য়ী)/শ্রীশ্রীদেব-/	ত্রিপুরা সিংহ।

	মাণিক্য শ্রী/পদ্মাবতি(তী)	"শক ১৪৫০"।
৪। বিজয়	শ্রীশ্রীবিজ-/য় মাণিক্য/ দেবশ্রী বিজ-য়া দেব্যৌ	ত্রিপুরা সিংহ। "শক ১৪৫৪"।
৫। -ঐ-	শ্রীশ্রীবিজ-/য় মাণিক্য/ দেবশ্রী লক্ষ্মী/ মহাদেব্যৌ	ত্রিপুরা সিংহ। "শক ১৪৫৮"।
৬। -ঐ-	প্রতিসিন্ধু সী(ম)-/শ্রীশ্রী বিজয় মা-/ ণিক্যদেব শ্রীল-/ক্ষ্মী বালা দেব্যৌ	ত্রিপুরা সিংহ। "শক ১৪৭২"।
৭। -ঐ-	লাক্ষা রায়ি(য়ী)/শ্রীশ্রী ত্রিপুরম -/হেশ বিজয়মাণি-/ক্যদেব শ্রীলক্ষ্মী-/ বালাদেবী	বৃষবাহন চতুর্ভুজ শিব ও সিংহবাহিনী দশভূজা দুর্গার অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। "শক ১৪৮২"।
৮। -ঐ-	পদ্মাবতী (তী)সায়ি(য়ী)শ্রী/শ্রী বিশেশ্বিদ্বশ-/র বিজয়/দেব শ্রী বাক্/ দেব্যৌ/লেখনের মধ্যস্থলে চতুষ্কোণের মধ্যে শিবলিঙ্গ।	সিংহাসনের উপর গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্তি;দক্ষিণে স্ত্রীমূর্তি ও ও বামে পুরুষমূর্তি দৃশ্যমান। "শক ১৪৮২"।

ত্রিপুরার মুদ্রা

চিত্র-পরিচিতি-ঙ

রাজা	মুখ্য দিক ঃ লেখন	গৌণ দিকঃ চিত্রণ ও লেখন
১। অনন্ত	শ্রীশ্রীযুতান-/স্তমাণিক্যদে-/ ব শ্রীরত্নাব-তী মহাদেব্যৌ	ত্রিপুরা সিংহ। "শক ১৪৮৭
২। উদয়	শ্রী শ্রী যুতোদ-/য়মাণিক্য/ দেব মহাদেব্যৌ (হী)রা/	ত্রিপুরা সিংহ। "শক ১৪৮৯"।
৩। ১মজয়	শ্রীশ্রীযুত/জয় মাণি-/ক্যদেবঃ/	ত্রিপুরা সিংহ। "শক ১৪৯৫"।
৪। -ঐ-	শ্রীশ্রীযুত/জয় মাণিক্য-/দেব শ্রীসুভ-/ দ্রা মহাদেব্যৌ	ত্রিপুরা সিংহ।
৫। অমর	শ্রীশ্রীযুতাম-/র মাণিক্যদে-/ ব শ্রী অমরাব/তী মহাদেব্যৌ	ত্রিপুরা সিংহ। শক ১৪৯৯।

৬।-ঐ-	দিগ্বিজয়ি (য়ী)শ্রীশ্রী-/যুতামর মাণি-/ ক্য দেব/শ্রী অম-/রাবতী দেব্যৌ	ত্রিপুরা সিংহ। "শক ১৫০২"।
৭। ১ম রাজধর	শ্রীশ্রীযুতরাজ-/ধর মাণিক্য/ দেব শ্রীসত্যব-/তি(তী)মহা দেব্যৌ	ত্রিপুরা সিংহ। "শক ১৫০৮"।

ত্রিপুরার মুদ্রা

চিত্র-পরিচিতি-চ

রাজা	মুখ্য দিক ঃ লেখন	গৌণ দিক ঃ চিত্রণ ও লেখন
১। যশোধর	শ্রীশ্রীযুত য/শ(শো)মাণিক্য দে-/ব শ্রী গৌরী ল-/ক্ষ্মী মহাদেব্য	ত্রিপুরা সিংহের উপরে নারী-। যুগল পরিবৃত বংশীধারী কৃষ্ণমূর্তি "শক ১৫২২"।
২।-ঐ-	শ্রীশ্রীযুত যশ (শো)-/মাণিক্য দেব শ্রী/লক্ষ্মী গৌরী-জ-/য়া মহাদেব্যঃ	-ঐ-
৩। কল্যাণ	শ্রীশ্রীযুত/কল্যাণ মা-/ণিক্য দেবঃ (অর্ধ টঙ্ক)	ত্রিপুরাসিংহ। "শক ১৫৪৮"।
৪।গোবিন্দ	শি(শিবলিঙ্গ)বঃ/শ্রীশ্রীযুতগো-/ বিন্দ মাণিক্য-/দেব শ্রী গুণব-/ তী মহাদেব্যা	ত্রিপুরাসিংহ। "শক ১৫৮২"।
৫। ছত্র	শ্রী হরগৌরী প-/দপদ্মধুপ/ শ্রীশ্রীযুতছত্র-/মাণিক্যদেবস্য	ত্রিপুরাসিংহ। "শক ১৫৮৩"।
৬। ২য় রত্ন	শি(শিবলিঙ্গ)বঃ কালিকাপদে শ্রী/ যুত রত্নমাণি-/ক্যদেব শ্রীশ্রীসত্য-/ বতী মহাদেব্যৌ	ত্রিপুরাসিংহ। "শক ১৬০৭"।
৭। ২য় ধর্ম	শিবদুর্গাপ-/দাব্জমধুপ/শ্রীশ্রীযুত ধর্ম -/মাণিক্যদেবঃ	ত্রিপুরাসিংহ। "শক ১৬৩৬"।
৮।-ঐ-	শিবদুর্গাপদে/শ্রীশ্রীযুতধর্মমা-/ নিক্যদেব শ্রীধর্ম-/শীলা মহাদেব্যৌ	-ঐ-

ত্রিপুরার মুদ্রা

চিত্র—পরিচিতি—গ

ত্রিপুরার মুদ্রা

চিত্র—পরিচিতি—ঘ

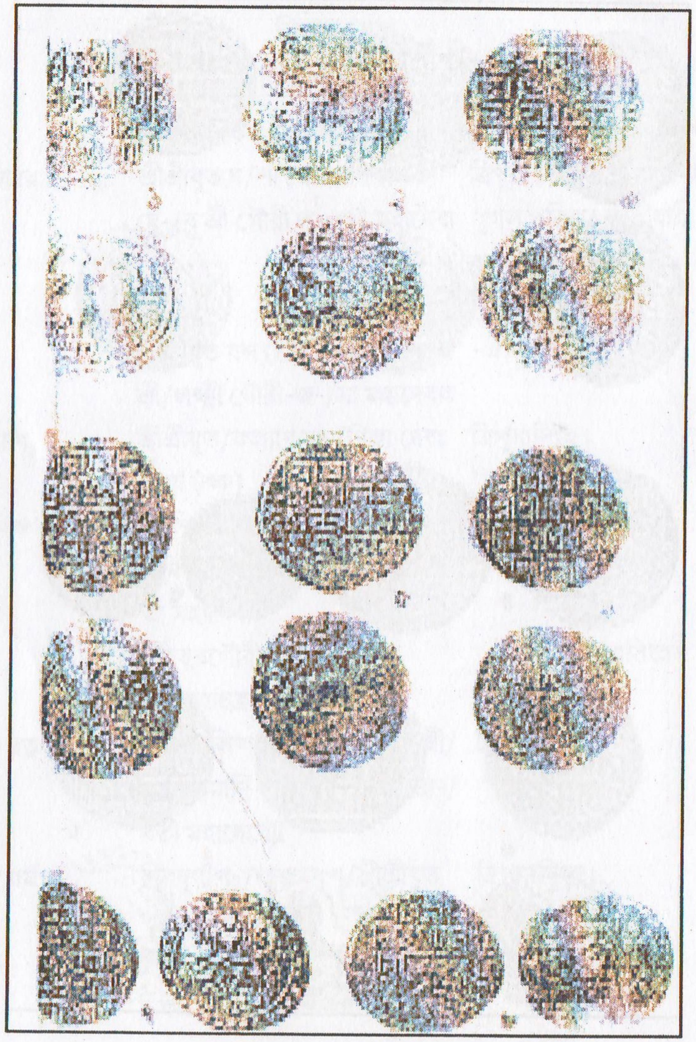

ত্রিপুরার মুদ্রা

চিত্র—পরিচিতি—ঙ

ত্রিপুরার মুদ্রা

চিত্র—পরিচিতি—চ

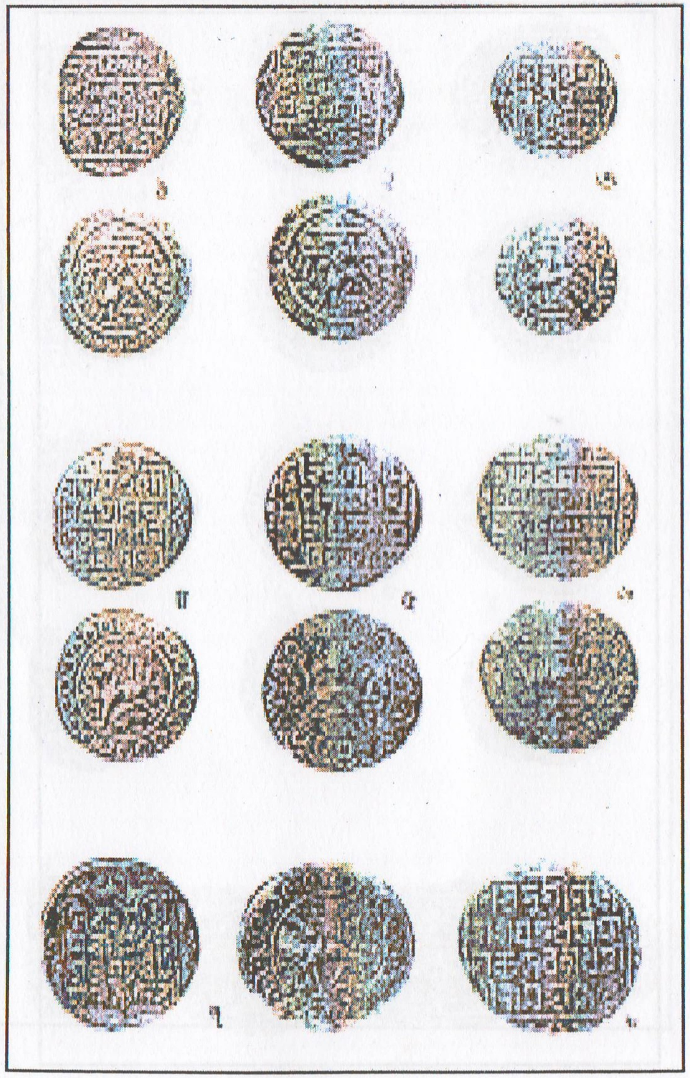

ঐতিহাসিক দলিল

ভারতে যখন সর্বত্র ইংরেজিই সারা ভারতের রাজভাষা এমন কি বাংলা খবরের মুখপত্র ক্যালকাটা গেজেট ও প্রকাশিত হত ইংরেজিতে ঐ সময় ত্রিপুরার ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছোট একটি দেশীয় রাজ্যে, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে সরকারি মুখপত্র বাংলায় 'ত্রিপুরা স্টেট গেজেট' প্রকাশ বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে কিন্তু একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইংরেজিই তখন সারা ভারতের রাজভাষা। ত্রিপুরার রাজভাষা তখনও বাংলা। বাংলা ভাষাতেই সরকারি গেজেট প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়ে কার্যত স্বাধীন ত্রিপুরার নৃপতি রাধাকিশোরমাণিক্য বাংলা ভাষার এদের বংশানুক্রমিক প্রীতির সার্থক পরিচয় দিলেন। ঘটনাটি স্মরণীয় হয়ে রইলো। বাংলা সাময়িক পত্র বা সংবাদ পত্রের অভাব ছিল না কিন্তু বাংলা সরকারি মুখপত্র হিসাবে 'ত্রিপুরা স্টেট গেজেট', নিঃসন্দেহে অনন্য। কালের হিসাবে 'ত্রিপুরা স্টেট গেজেট'-এর শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে। 'ত্রিপুরা স্টেট গেজেট' থেকে কয়েকটি ঐতিহাসিক দলিলের উদ্ধৃতি দেওয়া—

(১)

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

ত্রয়োদশ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা

বৈশাখ-২য় পক্ষ, ১৩২৪ত্রিং

বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হওয়া সম্বন্ধীয় আদেশ

সন ১৩২৪ ত্রিং, তাং ১৭ই বৈশাখ

সারকুলার নং ৩-এ রাজ্যের (ত্রিপুরা)অফিস ও আদালত সমূহের প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা এবং সর্ববিধ রাজকার্য্যে আবহমান কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখা স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরগণের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় সংসাধনোদ্দেশ্যে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দে "নিস্পত্তি পত্রাদি লিখিবার আইন" শীর্ষক এক বিধি প্রচার করিয়াছিলেন। বর্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রবল আছে। পরমপূজ্য স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর লিখিত ও বাচনিকরূপে এ বিষয়ে স্বীয় অভিমত বারম্বার কর্মচারীদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদের এই কল্যাণকর মহদভিপ্রায় সসম্মানে প্রতিপালন করা রাজকর্মচারী মাত্রেরই কর্তব্য।

সর্ববিধ রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ এবং তদুপলক্ষে ভাষার উৎকর্ষ বিধান করা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বাহাদুরের ও একান্ত অভিপ্রেত। অতএব আদালত ও আফিসসমূহের কাগজপত্রে বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত অন্যভাষা ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না।

শ্রী অভয় কুমার গুহ — শ্রী ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা

ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক — মন্ত্রী

(সূত্র ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন ঃ পৃ ৫৪-৫৫)

(২)

লেজস্‌লেটিভ কমিটি

সপ্তবিংশ ভাগ, অষ্টম সংখ্যা

শ্রাবণ-২য় পক্ষ,১৩৩৮ ত্রিং

ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যাবিবরণী

ত্রিপুরা রাজ্য ব্যবস্থাপক সভা

প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণী

তারিখ ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দ

পূর্বাহ্ন ১২ ঘটিকায় সময় উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে ব্যবস্থাপক সভার (ত্রিপুরা) অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীযুত মাণিক্য বাহাদুর (বীরবিক্রম কিশোর)তার আসন গ্রহণ

করিয়া সভার প্রারম্ভে নিম্নোদ্ধৃত বক্তৃতা প্রদান করেন ঃ

.....লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অদ্য প্রথম অধিবেশন দিবস। আজ আপনারা দরবারকে বিধি-বিধান প্রণয়নকল্পে সাহায্যার্থ সমবেত হইয়াছেন দেখিয়া পরিতোষ লাভ করিয়াছি।

সুশাসন ও সদ্বিচার প্রতিষ্ঠিত করার মুখ্য উদ্দেশ্যেই নিয়ম সমূহ প্রচলিত হইয়াছে। স্রোতে সমাজের অপরিহার্য পরিবর্তনে এই সকল বিধানের সংশোধন ও অভিনব সমুদিত হওয়ায় নতুন নিয়ম প্রবর্তনের আবশ্যকতা সর্বদাই উপলব্ধি হয়। আশা করি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সাহচর্য্যে সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া আপনারা সকল প্রস্তাব করিবেন, তাহাতে জনসাধারণের সুবিধা সৌভাগ্যের প্রসারণে কল্যাণ সাধিত হইয়া সমধিক গৌরবের বিষয় হইবে।

শ্রী জগদীশ চন্দ্র মজুমদার — শ্রী রাণা বোধজাঙ্গা বাহাদুর

সেক্রেটারি — ভাইস প্রেসিডেন্ট

ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন পৃঃ১৩৮

(৩)

....অব রিজেন্সী

...ভাগ, বিশেষ সংখ্যা

২২ শে শ্রাবণ, ১৩৫৭ ত্রিং

ঘোষণা-১ নং

আগামী ১৫ই আগস্ট (২৯ শে শ্রাবণ) শুক্রবার ভারত রাষ্ট্রের শাসনভার বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক দেশবাসীর হস্তে ন্যস্ত হইবে এবং তৎসহ উক্ত দিনে দেশীয় রাজ্যে চালিত ভারত সম্রাটের সার্বভৌম বিশেষ ক্ষমতাও প্রত্যাহৃত হইবে।

ভারত এই অশ্রুতপূর্ব হস্তান্তর উৎসবটিকে চিরস্মরণীয় করিতে প্রস্তুত হইতেছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও এই উৎসবকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অধিবাসীগণ কর্তৃক স্মরণীয় করিয়া অভিনন্দিত করা বাঞ্ছনীয়। ত্রিপুরা রাজ্য ইতঃপূর্বেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে। অতএব,এই উৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরা জাতীয় পতাকা সব সর্বজাতির প্রতীক যুক্তরাষ্ট্রের চক্রসম্বলিত ত্রিবর্ণ পতাকার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদত্ত হয়, ইহা ত্রিপুরা রাষ্ট্রের অভিমত।

উক্ত উৎসব উপলক্ষে এ রাজ্যে ও জমিদারীর অফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি আগামী ২৯শে ও ৩০ শে শ্রাবণ(১৫ইও ১৬ই আগষ্ট,১৮৪৭ইং), দুই দিবস বন্ধ থাকিবে।

-ইতি সন ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২২ শে শ্রাবণ।

Kanchan Prava Devi

(কাঞ্চনপ্রভা দেবী)

রেসিডেন্ট, কাউন্সিল অব রিজেন্সী

(সূত্র ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন-পৃঃ৩১৪)

(৪)

কাউন্সিল অব রিজেন্সি

ষটচত্বারিংশ ভাগ, অষ্টম সংখ্যা

শ্রাবণ-২য় পক্ষ, ১৩৫৭ ত্রিং

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে

"রিজেন্ট" শ্রীশ্রীমতী মহারাণী মহোদয়ার

-বাণী-

আজ তাই এই উপলক্ষে সবিশেষ গাম্ভীর্যপূর্ণ ও সম্মানজনকভাবে স্মরণীয় করিয়া তোলা শুধু আমাদের উচিত নয়, কর্তব্য বটে। আজ (১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ ইং)আমাদের রাজ্যে বৃটিশ সার্বভৌমত্বের অবসান হইল। তাই ত্রিপুরা আজ অপ্রীতিকর হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ শাসন ক্ষমতায় স্বাধীনতার নতুন পথে অগ্রসর। এই প্রাচীন রাজ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী অশান্তির ইতিহাসের মধ্যে ইহাই প্রকট হইয়াছে যে, আমরা আমাদের অমূল্য সম্পদ স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্যই দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চলে। স্বাধীনতার ন্যায় বহুমূল্য উপহার আজ ভারত ও পাকিস্তানবাসীদের প্রতি আছে।

আপনার সকলের শুভ কামনা করিতেছি এবং শ্রীশ্রী ভগবৎ পাদপদ্মে আমি আপনাদের সহিতই আন্তরিকভাবে শুভ প্রার্থনা করিতে রত থাকিবে।

ইতি-

সন ১৩৫৭ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৯ শে শ্রাবণ।

(কাঞ্চনপ্রভা দেবী)

মহারাণী রেসিডেন্ট অব্ ত্রিপুরা

(ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সঙ্কলন-পৃঃ ৩১-৫-১৬)

ঔরঙ্গজেব কর্তৃক গোবিন্দমাণিক্যের নিকট উর্দুভাষায় লিখিত পত্র

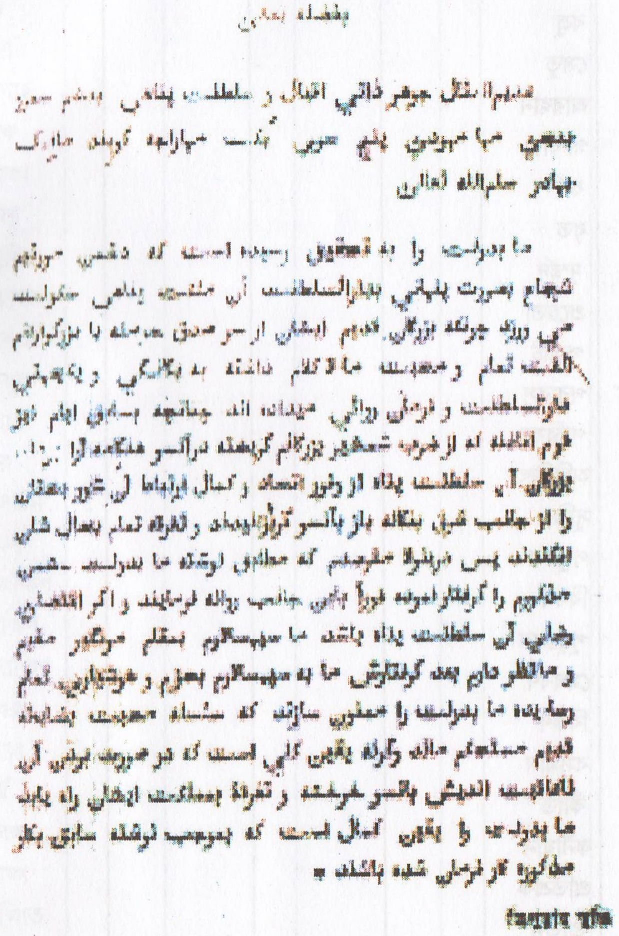

ত্রিপুরার রাজাদের কালানুক্রমিক তালিকা

প্রথম পর্ব

ক্রমাঙ্ক	রাজা	কল্যব্দ	খ্রিস্টাব্দ	ত্রিপুরাব্দ	বঙ্গাব্দ	মন্তব্য
১	দ্রুহ্য					
২	বভ্রু					
৩	সেতু					
৪	আরদ্বান					
৫	গান্ধার					
৬	ধর্ম					
৭	ধৃত					
৮	দুর্ম্মদ					
৯	প্রচেতা					
১০	পরাচি					
১১	পরাবসু					
১২	পারিষদ					
১৩	অরিজিৎ					
১৪	সুজিৎ					
১৫	পরুরবা					
১৬	বিবর্ণ					
১৭	পুরুসেন					
১৮	মেঘবর্ণ					
১৯	বিকর্ণ					
২০	বসুমান					
২১	কীর্তি					
২২	কনীয়ান					
২৩	প্রতিশ্রক					
২৪	প্রতিষ্ঠ					
২৫	শত্রুজিৎ					
২৬	প্রতর্দ্দণ					
২৭	প্রমথ					

ত্রিপুরার রাজাদের কালানুক্রমিক তালিকা

প্রথম পর্ব

ক্রমাঙ্ক	রাজা	কল্যব্দ	খ্রিস্টাব্দ	ত্রিপুরাব্দ	বঙ্গাব্দ	মন্তব্য
২৮	কলিন্দ					
২৯	ক্রম					
৩০	মিত্রারি					
৩১	বারিবার্হ					
৩২	কার্মক					
৩৩	কালাঙ্গ					
৩৪	ভীষণ					
৩৫	ভানুমিত্র					
৩৬	চিত্রসেন					
৩৭	চিত্ররথ					
৩৮	চিক্রয়ুধ					
৩৯	দৈত্য					
৪০	ত্রিপুর					
৪১	ত্রিলোচন					
৪২	দাক্ষিণ					
৪৩	তৈদাক্ষিণ					
৪৪	সুদাক্ষিণ					
৪৫	তরদাক্ষিণ					
৪৬	ধর্ম্মধর					
৪৭	ধর্মপাল					
৪৮	সুধর্ম					
৪৯	তরবঙ্গ					
৫০	দেবাঙ্গ					
৫১	নরাঙ্গিত					
৫২	ধর্মাঙ্গিদ					
৫৩	রুমাঙ্গাদ					
৫৪	সুমাঙ্গা					

ত্রিপুরার রাজাদের কালানুক্রমিক তালিকা

প্রথম পর্ব

ক্রমাঙ্ক	রাজা	কল্যব্দ	খ্রিস্টাব্দ	ত্রিপুরাব্দ	বঙ্গাব্দ	মন্তব্য
৫৫	নৌকযোগরায়					
৫৬	তরজুঙ্গ					
৫৭	তররাজ					
৫৮	হামরাজ					
৫৯	বীররাজ					
৬০	শ্রীরাজ					
৬১	শ্রীমন্ড					
৬২	লক্ষ্মীতর					
৬৩	তরলক্ষ্মী					
৬৪	মাইলক্ষ্মী					
৬৫	নাগেশ্বর					
৬৬	যোগেশ্বর					
৬৭	নীলধ্বজ					
৬৮	বসুরাজ					
৬৯	ধনরাজ ফা					
৭০	সুচঙ্গ ফা					
৭১	মাইচোঙ্গ ফা					
৭২	চন্দ্ররাজ					
৭৩	তরফালাই ফা					
৭৪	সুমন্ত					
৭৫	রূপবন্ত					
৭৬	তরহাম					
৭৭	খাহাম					
৭৯	কালাতর ফা					
৮০	চন্ড ফা					
৮১	গজেশ্বর					
৭৮	কতর ফা					

ত্রিপুরার রাজাদের কালানুক্রমিক তালিকা

প্রথম পর্ব

ক্রমাঙ্ক	রাজা	কল্যব্দ	খ্রিস্টাব্দ	ত্রিপুরাব্দ	বঙ্গাব্দ	মন্তব্য
৮২	বীররাজ					
৮৩	নাগপতি					
৮৪	শিক্ষরাজ					
৮৫	দেবরাজ					
৮৬	দুরাশা					
৮৭	বিরাজ					
৮৮	সাগর ফা					
৮৯	মলয় চন্দ্র					
৯০	সূর্য রায়					
৯১	আচঙ্গফালাই					
৯২	চরাতর					
৯৩	আচং ফা					
৯৪	বিমার					
৯৫	কুমার					
৯৬	সুকুমার					
৯৭	তৈছরাও					
৯৮	রাজেশ্বর					
৯৯	মৈছিলি					
১০০	তৈচুঙ ফা					
১০১	নরেন্দ্র					
১০২	ইন্দ্রকীর্তি					
১০৩	বিদ্বান					
১০৪	যশরাজ					
১০৫	বঙ্গ					
১০৬	গঙ্গারায়					
১০৭	চক্রুরায়					
১০৮	প্রতীত					

ত্রিপুরার রাজাদের কালানুক্রমিক তালিকা

প্রথম পর্ব

ক্রমাঙ্ক	রাজা	কল্যব্দ	খ্রিস্টাব্দ	ত্রিপুরাব্দ	বঙ্গাব্দ	মন্তব্য
১০৯	মরীচি					
১১০	গগণ					
১১১	নবরায়					
১১২	হামতার ফা					
১১৩	জাঙ্গি ফা					
১১৪	দেবরায়					
১১৫	শিবরায়					
১১৬	আদি ধর্ম পা	৩৭৩৭-৩৭৭৭	৬৩৫-৬৭৫	৪৫-৮৫	৪২-৮২	
১১৭	খাড়ুঙ্গা ফা	৩৭৭৭-৩৮১২	৬৭৫-৭১০	৮৫-১২০	৮২-১১৭	
১১৮	ছেঙ্গা ফালাই	৩৮১২-৩৮৪৭	৭১০-৭৪৫	১২০-১৫৫	১১৭-১৫২	
১১৯	ললিত রায়	৩৮৪৭-৩৮৮২	৭৪৫-৭৮০	১৫৫-১৯০	১৫২-১৮৭	
১২০	মুকুন্দ ফা	৩৮৮২-৩৯১৭	৭৮০-৮১৫	১৯০-২২৫	১৮৭-২২২	
১২১	কমল রায়	৩৯১৭-৩৯৫২	৮১৫-৮৫০	২২৫-২৬০	২২২-২৫৭	
১২২	কৃষ্ণ দাস	৩৯৫২-৩৯৮৭	৮৫৫-৮৮৫	২৬০-২৯৫	২৫৭-২৯২	
১২৩	যশ ফা	৩৯৮৭-৪০২২	৮৮৫-৯২০	২৯৫-৩৩০	২৯২-৩২৭	
১২৪	মুচঙ্গা ফা	৪০২২-৪০৫৭	৯২০-৯৫৫	৩৩০-৩৬৫	৩২৭-৩৬২	
১২৫	সাধু রায়	৪০৫৭-৪০৮২	৯৫৫-৯৮০	৩৬৫-৩৯০	৩৬২-৩৮৭	
১২৬	প্রতাপ রায়	৪০৮২-৪১১২	৯৮০-১০১০	৩৯০-৪২০	৩৮৭-৪১৭	
১২৭	বিষ্ণুপ্রসাদ	৪১১২-৪১৪৭	১০১০-১০৪৫	৪২০-৪৫৫	৪১৭-৪৫২	
১২৮	বাণেশ্বর	৪১৪৭-৪১৭৭	১০৪৫-১০৭৫	৪৫৫-৪৮৫	৪৫২-৪৮২	
১২৯	বীরবাহু	৪১৭৭-৪২০২	১০৭৫-১১০০	৪৮৫-৫১০	৪৮২-৫১৭	
১৩০	সম্রাট	৪২০২-৪২২৭	১১০০-১১২৫	৫১০-৫৩৫	৫১৭-৫৩২	
১৩১	চাম্পা	৪২২৭-৪২৪২	১১২৫-১১৪০	৫৩৫-৫৫০	৫৩২-৫৫২	
১৩২	মেঘরাজ	৪২৪২-৪২৬২	১১৪০-১১৬০	৫৫০-৫৭০	৫৫২-৫৬৭	
১৩৩	ধর্মধর	৪২৬২-৪৩২৭	১১৬০-১২২৫	৫৭০-৬৩৫	৫৬৭-৬৩২	
১৩৪	ছেংখুমফা	৪৩২৭-৪৩৫২	১২২৫-১২৫০	৬৩৫-৬৬০	৬০২-৬৫৭	
১৩৫	অচোঙ ফা	৪৩৫২-৪৩৭২	১২৫০-১২৭০	৬৬০-৬৮০	৬৫৭-৬৭৭	

ত্রিপুরার রাজাদের কালানুক্রমিক তালিকা

প্রথম পর্ব

ক্রমাঙ্ক	রাজা	কল্যব্দ	খ্রিস্টাব্দ	ত্রিপুরাব্দ	বঙ্গাব্দ	মন্তব্য
১৩৬	খিচোঙ ফা	৪৩৭২-৪৩৮২	১২৭০-১২৮০	৬৮০-৬৯০	৬৭৭-৬৮৭	
১৩৭	ডাঙ্গর ফা	৪৩৮২-৪৪০২	১২৮০-১৩০০	৬৯০-৭১	৬৮৭-৭০৭	
১৩৮	রাজাফা	৪৪০২-৪৪২৭	১৩০০-১৩২৫	৭১০-৭৩৫	৭০৭-৭৩২	
১৩৯	রত্নমাণিক্য	৪৪২৭-৪৪৫২	১৩২৫-১৩৫০	৭৩৫-৭৬০	৭৩২-৭৫৭	
১৪০	প্রতাপমাণিক্য	৪৪৫২-৪৪৭৭	১৩৫০-১৩৭৫	৭৬০-৭৮৫	৭৫৭-৭৮২	
১৪১	মুকুটমাণিক্য	৪৪৭৭-৪৫০২	১৩৭৫-১৪০০	৭৮৫-৮১০	৭৮২-৮০৭	
১৪২	মহামাণিক্য	৪৫০২-৪৫৩২	১৪০০-১৪৩০	৮১০-৮৪০	৮০৭-৮৩৭	
১৪৩	ধর্মমাণিক্য	৪৫৩২-৪৫৬৪	১৪৩১-১৪৬২	৮৪১-৮৭২	৮৩৮-৮৬৯	
১৪৪	প্রতাপমাণিক্য	৪৫৬৪-৪৫৯২	১৪৬২-১৪৯০	৮৭২-৯০০	৮৬৯-৮৯৭	
১৪৫	ধন্যমাণিক্য	৪৫৯২-৪৬১৭	১৪৯০-১৫১৫	৯০০-৯২৫	৮৯৭-৯২১	
১৪৬	ধ্বজমাণিক্য	৪৬১২-৪৬২৩	১৫১৬-১৫২১	৯২৬-৯৩১	৯২৩-৯২৮	
১৪৭	দেবমাণিক্য	৪৬২৪-৪৬২৯	১৫২২-১৫২৭	৯৩২-৯৩৭	৯২৮-৯৩৪	
১৪৮	ইন্দ্রমাণিক্য	৪৬২৯-৪৬৩০	১৫২৭-১৫২৮	৯৩৭-৯৩৮	৯৩৪-৯৩৫	
১৪৯	বিজয়মাণিক্য	৪৬৩০-৪৬৬৫	১৫২৮-১৫৬৩	৯৩৮-৯৭৩	৯৩৫-৯৭০	
১৫০	অনন্তমাণিক্য	৪৬৬৬-৪৬৬৭	১৫৬৪-১৫৬৫	৯৭৪-৯৭৫	৯৭১-৯৭২	
১৫১	উদয়মাণিক্য	৪৬৬৮-৪৬৭৪	১৫৬৬-১৫৭২	৯৭৬-৯৮২	৯৭০-৯৭৯	
১৫২	জয়মাণিক্য	৪৬৭৫-৪৬৭৮	১৫৭৩-১৫৭৬	৯৮৩-৯৮৬	৯৮০-৯৮৩	
১৫৩	অমরমাণিক্য	৪৬৭৯-৪৬৮৭	১৫৭৭-১৫৮৫	৯৮৭-৯৯৫	৯৮৪-৯৯২	
১৫৪	রাজধরমাণিক্য	৪৬৮৮-৪৭০১	১৫৮৬-১৫৯৯	৯৯৬-১০০৯	৯৯৩-১০০৬	
১৫৫	যশোধরমাণিক্য	৪৭০২-৪৭২৫	১৬০০-১৬২৩	১০১০-১০৩৩	১০০৭-১০৩০	
১৫৬	কল্যাণমাণিক্য	৪৭২৬-৪৭৬২	১৬২৪-১৬৬০	১০৩৪-১০৭০	১০৩১-১০৬৭	
১৫৭	গোবিন্দমাণিক্য	৪৭৬২-৪৭৬৩	১৬৬০-১৬৬১	১০৭০-১০৭১	১০৬৭-১০৬৮	
১৫৮	ছত্রমাণিক্য	৪৭৬৪-৪৭৬৮	১৬৬২-১৬৬৬	১০৭২-১০৭৬	১০৬৯-১০৭৩	
১৫৯	গোবিন্দমাণিক্য	৪৭৬৯-৪৭৭৪	১৬৬৭-১৬৭২	১০৭৭-১০৮২	১০৭৪-১০৭৯	
১৬০	রামমাণিক্য	৪৭৭৫-৪৪৮৪	১৬৭৩-১৬৮২	১০৮৩-১০৯২	১০৮০-১০৮৯	
১৬১	রত্নমাণিক্য	৪৭৮৪-	১৬৮২-	১০৯২	১০৮৯	
১৬২	নরেন্দ্রমাণিক্য	৪৭৮৪-৪৭৮৬	১৬৮২-১৬৮৪	১০৯২-১০৯৪	১০৮৯-১০৯১	

ত্রিপুরার রাজাদের কালানুক্রমিক তালিকা

প্রথম পর্ব

ক্রমাঙ্ক	রাজা	কল্যব্দ	খ্রিস্টাব্দ	ত্রিপুরাব্দ	বঙ্গাব্দ	মন্তব্য
১৬৩	রত্নমাণিক্য	৪৭৮৭-৪৮১৪	১৬৮৪-১৭১২	১০৯৫-১১২২	১০৯২-১১১৯	
১৬৪	মহেন্দ্রমাণিক্য	৪৮১৪-৪৮১৫	১৭১২-১৭১৩	১১২২-১১২৩	১১১৯-১১২০	
১৬৫	ধর্মমাণিক্য	৪৮১৫-৪৮৩০	১৭১৩-১৭২৮	১১২৩-১১৩৮	১১২০-১১৩৫	
১৬৬	জগৎমাণিক্য	৪৮৩১-৪৮৩২	১৭২৯-১৭৩০	১১৩৯-১১৪০	১১৩৬-১১৩৭	
১৬৭	ধর্মমাণিক্য	৪৮৩৩-৪৮৩৪	১৭৩১-১৭৩২	১১৪১-১১৪২	১১৩৮-১১৩৯	
১৬৮	মুকুন্দমাণিক্য	৪৮৩৫-৪৮৪০	১৭৩৩-১৭৩৮	১১৪৩-১১৪৮	১১৪০-১১৪৫	
১৬৯	জয়মাণিক্য	৪৮৪১-৪৮৪৪	১৭৩৯-১৭৪২	১১৪৯-১১৫২	১১৪৬-১১৪৯	
১৭০	ইন্দ্রমাণিক্য	৪৮৪৪-৪৮৪৭	১৭৪২-১৭৪৫	১১৫২-১১৫৫	১১৪৯-১১৫৩	
১৭১	জয়মাণিক্য	৪৮৪৮-	১৭৪৬	১১৫৬	১১৫২	

ত্রিপুরার রাজাদের কালানুক্রমিক তালিকা

তৃতীয় পর্ব

ক্রমাঙ্ক	রাজা	কল্যব্দ	খ্রিস্টাব্দ	ত্রিপুরাব্দ	বঙ্গাব্দ	মন্তব্য
১৭২	বিজয়মাণিক্য	৪৮৪৮-৪৮৪৯	১৭৪৬-১৭৪৭	১১৫৬-১১৫৭	১১৫৩-১১৫৪	
১৭৩	কৃষ্ণমাণিক্য	৪৮৫০-৪৮৮৫	১৭৪৮-১৭৮৩	১১৫৮-১১৯৩	১১৫৫-১১৯০	
১৭৪	জাহ্নবী দেবী	৪৮৮৫-৪৮৮৭	১৭৮৩-১৭৮৫	১১২৩-১১৩৮	১১২০-১১৩৫	
১৭৫	রাজধরমাণিক্য	৪৮৮৭-৪৯০৬	১৭৮৫-১৮০৪	১১৯৫-১২১৪	১১৯২-১২১১	
১৭৬	রামগঙ্গামাণিক্য	৪৯০৬-৪৯১০	১৮০৪-১৮০৮	১২১৪-১২১৮	১২১১-১২১৫	
১৭৭	দুর্গামাণিক্য	৪৯১১-৪৯১৪	১৮০৯-১৮১২	১২১৯-১২২২	১২১৬-১২১৯	
১৭৮	রামগঙ্গামাণিক্য	৪৯১৫-৪৯২৮	১৮১৩-১৮২৬	৩২২৩-১২৩৬	১২২০-১২৩৩	
১৭৯	কাশীচন্দ্রমাণিক্য	৪৯২৯-৪৯৩১	১৮২৭-১৮২৯	১২৩৭-১২৩৯	১২৩৪-১২৩৬	
১৮০	কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য	৪৯৩২-৪৯৫১	১৮৩০-১৮৪৯	১২৪০-১২৫৯	১২৩৭-১২৫৬	
১৮১	ঈশানচন্দ্রমাণিক্য	৪৯৫১-৪৯৬৪	১৮৪৯-১৮৬২	১২৫৯-১২৭২	১২৫৬-১২৬৯	
১৮২	বীরচন্দ্রমাণিক্য	৪৯৬৪-৪৯৯৮	১৮৬২-১৮৯৬	১২৭২-১৩০৬	১২৬৯-১৩০৩	
১৮৩	রাধাকিশোরমাণিক্য	৪৯৯৮-৫০১১	১৮৯৬-১৯০৯	১৩০৬-১৩১৮	১৩০৩-১৩১৪	
১৮৪	বীরচন্দ্রমাণিক্যমাণিক্য	৫০১১-৫০২৫	১৯০৯-১৯২৩	১৩১৮-১৩৩৩	১৩১৫-১৩৩০	
১৮৫	বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য	৫০২৫-৫০৪৯	১৯২৩-১৯৪৭	১৩৩৩-১৩৫৭	১৩৩০-১৩৫৪	
১৮৬	কিরীটবিক্রমকিশোর	৫০৪৯-৫০৫১	১৯৪৭-১৯৪৯	১৩৫৭-১৩৫৯	১৩৫৪-১৩৫৬	

হিজরি সন ও খ্রিস্টাব্দের তুলনামূলক তালিকা

খ্রিস্টাব্দের যে যে মাসের যে দিনে হিজরি সন আরম্ভ তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে

হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ	হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ
৬০০	১২০৩ সেপ্টেম্বর ১০	৬৩৪	১২৩৬ সেপ্টেম্বর ৮
৬০১	১২০৪ আগস্ট ২৯	৬৩৫	১২৩৭ আগস্ট ২৪
৬০২	১২০৫ আগস্ট১৮	৬৩৬	১২৩৮ আগস্ট ১৪
৬০৩	১২০৬ আগস্ট ৮	৬৩৭	১২৩৯ আগস্ট ৩
৬০৪	১২০৭ জুলাই ২৮	৬৩৮	১২৪০ জুলাই ২৩
৬০৫	১২০৮ জুলাই ১৬	৬৩৯	১২৪১ জুলাই ১২
৬০৬	১২০৯ জুলাই ৬	৬৪০	১২৪২ জুলাই ১
৬০৭	১২১০ জুন ২৫	৬৪১	১২৪৩ জুন ২১
৬০৮	১২১১ জুন ১৫	৬৪২	১২৪৪ জুন ৯
৬০৯	১২১২ জুন ৩	৬৪৩	১২৪৫ মে ২৯
৬১০	১২১৩ মে ২৩	৬৪৪	১২৪৬ মে ১৯
৬১১	১২১৪ মে ১৩	৬৪৫	১২৪৭ মে ৮
৬১২	১২১৫ মে ২	৬৪৬	১২৪৮ এপ্রিল ২৬
৬১৩	১২১৬ এপ্রিল ২০	৬৪৭	১২৪৯ এপ্রিল ১৬
৬১৪	১২১৭ এপ্রিল ১০	৬৪৮	১২৫০ এপ্রিল ৫
৬১৫	১২১৮ মার্চ ৩০	৬৪৯	১২৫১ মার্চ ২৬
৬১৬	১২১৯ মার্চ ১৯	৬৫০	১২৫২ মার্চ ১৪
৬১৭	১২২০ মার্চ ৮	৬৫১	১২৫৩ মার্চ ৩
৬১৮	১২২১ ফেব্রুয়ারি ২৫	৬৫২	১২৫৪ ফেব্রুয়ারি ২১
৬১৯	১২২২ ফেব্রুয়ারি ১৫	৬৫৩	১২৫৫ ফেব্রুয়ারি ১০
৬২০	১২২৩ ফেব্রুয়ারি ৪	৬৫৪	১২৫৬ জানুয়ারি ৩০
৬২১	১২২৪ জানুয়ারি ২৪	৬৫৫	১২৫৭ জানুয়ারি ১৯
৬২২	১২২৫ জানুয়ারি ১৩	৬৫৬	১২৫৮ জানুয়ারি ৮
৬২৩	১২২৬ জানুয়ারি ২	৬৫৭	১২৫৯ ডিসেম্বর ২৯
৬২৪	১২২৬ ডিসেম্বর ২২	৬৫৮	১২৫৯ ডিসেম্বর ১৮
৬২৫	১২২৭ ডিসেম্বর ১২	৬৫৯	১২৬০ ডিসেম্বর ৬
৬২৬	১২২৮ নভেম্বর ৩০	৬৬০	১২৬১ নভেম্বর ২৬

হিজরি সন ও খ্রিস্টাব্দের তুলনামূলক তালিকা

খ্রিস্টাব্দের যে যে মাসের যে দিনে হিজরি সন আরম্ভ তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে

হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ	হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ
৬২৭	১২২৯ নভেম্বর ২০	৬৬১	১২৬২ নভেম্বর ১৫
৬২৮	১২৩০ নভেম্বর ৯	৬৬২	১২৬৩ নভেম্বর ৪
৬২৯	১২৩১ অক্টোবর ২৯	৬৬৩	১২৬৫ অক্টোবর ২৪
৬৩০	১২৩২ অক্টোবর ১৮	৬৬৪	১২৬৫ অক্টোবর ১৩
৬৩১	১২৩৩ অক্টোবর ৭	৬৬৫	১২৬৬ অক্টোবর ২
৬৩২	১২৩৪সেপ্টেম্বর২৬	৬৬৬	১২৬৭ সেপ্টেম্বর ২২
৬৩৩	১২৩৫ সেপ্টেম্বর ১৬	৬৬৭	১২৬৮ সেপ্টেম্বর ১০
৬৬৮	১২৬৯ আগস্ট ৩১	৭০৫	১৩০৫ জুলাই ২৪
৬৬৯	১২৭০ আগস্ট ২০	৭০৬	১৩০৬ জুলাই ১৩
৬৭০	১২৭১ আগস্ট ৯	৭০৭	১৩০৭ জুলাই ৩
৬৭১	১২৭২ জুলাই ২৯	৭০৮	১৩০৮ জুন ২১
৬৭২	১২৭৩ জুলাই ১৮	৭০৯	১৩০৯ জুন ১১
৬৭৩	১২৭৪ জুলাই ৭	৭১০	১৩১০ মে ৩১
৬৭৪	১২৭৫ জুন ২৭	৭১১	১৩১১ মে ২০
৬৭৫	১২৭৬ জুন ১৫	৭১২	১৩১২ মে ৯
৬৭৬	১২৭৭ জুন ৭	৭১৩	১৩১৩ এপ্রিল ২৮
৬৭৭	১২৭৮ মে ২৫	৭১৪	১৩১৪ এপ্রিল ১৭
৬৭৮	১২৭৯ মে ১৪	৭১৫	১৩১৫ এপ্রিল ৭
৬৭৯	১২৮০ মে ৩	৭১৬	১৩১৬ মার্চ ২৬
৬৮০	১২৮১ এপ্রিল ২২	৭১৭	১৩১৭ মার্চ ১৭
৬৮১	১২৮২ এপ্রিল ১১	৭১৮	১৩১৮ মার্চ ৫
৬৮২	১২৮৩ এপ্রিল ১	৭১৯	১৩১৯ ফেব্রুয়ারি ২২
৬৮৩	১২৮৪ মার্চ ২০	৭২০	১৩২০ ফেব্রুয়ারি ১২
৬৮৪	১২৮৫ মার্চ ৯	৭২১	১৩২১ জানুয়ারি ৩১

হিজরি সন ও খ্রিস্টাব্দের তুলনামূলক তালিকা

খ্রিস্টাব্দের যে যে মাসের যে দিনে হিজরি সন আরম্ভ তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে

হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ	হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ
৬৮৫	১২৮৬ ফেব্রুয়ারি ২৭	৭২২	১৩২২ জানুয়ারি ২০
৬৮৬	১২৮৭ ফেব্রুয়ারি ১৬	৭২৩	১৩২৩ জানুয়ারি ১০
৬৮৭	১২৮৮ ফেব্রুয়ারি ৬	৭২৪	১৩২৩ ডিসেম্বর ৩০
৬৮৮	১২৮৯ জানুয়ারি ২৫	৭২৫	১৩২৪ ডিসেম্বর ১৮
৬৮৯	১২৯০ জানুয়ারি ১৪	৭২৬	১৩২৫ ডিসেম্বর ৮
৬৯০	১২৯১ জানুয়ারি ৪	৭২৭	১৩২৬ নভেম্বর ২৭
৬৯১	১২৯১ ডিসেম্বর ২৪	৭২৮	১৩২৭ নভেম্বর ১৭
৬৯২	১২৯২ ডিসেম্বর ১২	৭২৯	১৩২৮ নভেম্বর ৫
৬৯৩	১২৯৩ ডিসেম্বর ২	৭৩০	১৩২৯ অক্টোবর ২৫
৬৯৪	১২৯৪ নভেম্বর ২১	৭৩১	১৩৩০ অক্টোবর ১৫
৬৯৫	১২৯৫ নভেম্বর ১০	৭৩২	১৩৩১ অক্টোবর ৪
৬৯৬	১২৯৬ অক্টোবর ৩০	৭৩৩	১৩৩২ সেপ্টেম্বর ২২
৬৯৭	১২৯৭ অক্টোবর ১৯	৭৩৪	১৩৩৩ সেপ্টেম্বর ১২
৬৯৮	১২৯৮ অক্টোবর ৯	৭৩৫	১৩৩৪ সেপ্টেম্বর ১
৬৯৯	১২৯৯ সেপ্টেম্বর ২৮	৭৩৬	১৩৩৫ আগস্ট ২১
৭০০	১৩০০ সেপ্টেম্বর ১৬	৭৩৭	১৩৩৬ আগস্ট ১০
৭০১	১৩০১ সেপ্টেম্বর ৬	৭৩৮	১৩৩৭ জুলাই ৩০
৭০২	১৩০২ আগস্ট ২৬	৭৩৯	১৩৩৮ জুলাই ২০
৭০৩	১৩০৩ আগস্ট ১৫	৭৪০	১৩৩৯ জুলাই ৯
৭০৪	১৩০৪ আগস্ট ৫	৭৪১	১৩৪০ জুন ২৭
৭৪২	১৩৪১ জুন ১৭	৭৭৯	১৩৭৭ মে ১০
৭৪৩	১৩৪২ জুন ৬	৭৮০	১৩৭৮ এপ্রিল ৩০
৭৪৪	১৩৪৩ মে ২৬	৭৮১	১৩৭৯ এপ্রিল ১৯
৭৪৫	১৩৪৪ মে ১৫	৭৮২	১৩৮০ এপ্রিল ৭

হিজরি সন ও খ্রিস্টাব্দের তুলনামূলক তালিকা

খ্রিস্টাব্দের যে যে মাসের যে দিনে হিজরি সন আরম্ভ তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে

হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ	হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ
৭৪৬	১৩৪৫মে ৪	৭৮৩	১৩৮১ মার্চ ২৮
৭৪৭	১৩৪৬ এপ্রিল ২৪	৭৮৪	১৩৮২ মার্চ ১৭
৭৪৮	১৩৪৭ এপ্রিল ১৩	৭৮৫	১৩৮৩ মার্চ ৬
৭৪৯	১৩৪৮ এপ্রিল ১	৭৮৬	১৩৮৪ ফেব্রুয়ারি ২৪
৭৫০	১৩৪৯ মার্চ ২২	৭৮৭	১৩৮৫ ফেব্রুয়ারি ১২
৭৫১	১৩৫০ মার্চ ১১	৭৮৮	১৩৮৬ ফেব্রুয়ারি ২
৭৫২	১৩৫১ ফেব্রুয়ারি ২৮	৭৮৯	১৩৮৭ জানুয়ারি ২২
৭৫৩	১৩৫২ ফেব্রুয়ারি ১৮	৭৯০	১৩৮৮ জানুয়ারি ১১
৭৫৪	১৩৫৩ ফেব্রুয়ারি ৬	৭৯১	১৩৮৮ ডিসেম্বর ৩১
৭৫৫	১৩৫৪ জানুয়ারি ২৬	৭৯২	১৩৮৯ ডিসেম্বর ২০
৭৫৬	১৩৫৫ জানুয়ারি ১৬	৭৯৩	১৩৯০ ডিসেম্বর ৯
৭৫৭	১৩৫৬ জানুয়ারি ৫	৭৯৪	১৩৯১ নভেম্বর ২৯
৭৫৮	১৩৫৬ ডিসেম্বর ২৫	৭৯৫	১৩৯২ নমেভম্বর ১৭
৭৫৯	১৩৫৭ ডিসেম্বর ১৪	৭৯৬	১৩৯৩ নভেম্বর ৬
৭৬০	১৩৫৮ ডিসেম্বর ৩	৭৯৭	১৩৯৪ অক্টোবর ২৭
৭৬১	১৩৫৯ ডিসেম্বর ২৩	৭৯৮	১৩৯৫ অক্টোবর ১৬
৭৬২	১৩৬০ নভেম্বর ১১	৭৯৯	১৩৯৬ অক্টোবর ৫
৭৬৩	১৩৬১ অক্টোবর ৩১	৮০০	১৩৯৭ সেপ্টেম্বর ২৪
৭৬৪	১৩৬২ অক্টোবর ২১	৮০১	১৩৯৮ সেপ্টেম্বর ১৩
৭৬৫	১৩৬৩ অক্টোবর ১০	৮০২	১৩৯৯ সেপ্টেম্বর ৩
৭৬৬	১৩৬৪ সেপ্টেম্বর ২৮	৮০৩	১৪০০ আগস্ট ২২
৭৬৭	১৩৬৫ সেপ্টেম্বর ১৮	৮০৪	১৪০১ আগস্ট ১১
৭৬৮	১৩৬৬ সেপ্টেম্বর ৭	৮০৫	১৪০২ আগস্ট ১
৭৬৯	১৩৬৭ আগস্ট ২৮	৮০৬	১৪০৩ জুলাই ২১

হিজরি সন ও খ্রিস্টাব্দের তুলনামূলক তালিকা

খ্রিস্টাব্দের যে যে মাসের যে দিনে হিজরি সন আরম্ভ তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে

হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ	হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ
৭৭০	১৩৬৮ আগস্ট ১৬	৮০৭	১৪০৪ জুলাই ১০
৭৭১	১৩৬৯ আগস্ট ৫	৮০৮	১৪০৫ জুন ২৯
৭৭২	১৩৭০ জুলাই ২৬	৮০৯	১৪০৬ জুন ১৮
৭৭৩	১৩৭১ জুলাই ১৫	৮১০	১৪০৭ জুন ৮
৭৭৪	১৩৭২ জুলাই ৩	৮১১	১৪০৮ মে ২৭
৭৭৫	১৩৭৩ জুন ২৩	৮১২	১৪০৯ মে ১৬
৭৭৬	১৩৭৪ জুন ১২	৮১৩	১৪১০ মে ৬
৭৭৭	১৩৭৫ জুন ২	৮১৪	১৪১১ এপ্রিল ২৫
৭৭৮	১৩৭৬ মে ২১	৮১৫	১৪১২ এপ্রিল ১৩
৮১৬	১৪১৩ এপ্রিল	৩৮৫২	১৪৪৮ মার্চ ৭
৮১৭	১৪১৪ মার্চ ২৩	৮৫৩	১৪৪৯ ফেব্রুয়ারি ২৪
৮১৮	১৪১৫ মার্চ ১৩	৮৫৪	১৪৫০ ফেব্রুয়ারি ১৪
৮১৯	১৪১৬ মার্চ ১	৮৫৫	১৪৫১ ফেব্রুয়ারি ৩
৮২০	১৪১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮	৮৫৬	১৪৫২ জানুয়ারি ২৩
৮২১	১৪১৮ ফেব্রুয়ারি ৮	৮৫৭	১৪৫৩ জানুয়ারি ১২
৮২২	১৪১৯ ফেব্রুয়ারি ২৮	৮৫৮	১৪৫৪ জানুয়ারি ১
৮২৩	১৪২০ জানুয়ারি ১৭	৮৫৯	১৪৫৪ ডিসেম্বর ২২
৮২৪	১৪২১ জানুয়ারি ৬	৮৬০	১৪৫৫ ডিসেম্বর ১১
৮২৫	১৪২১ ডিসেম্বর ২৬	৮৬১	১৪৫৬ নভেম্বর ২৯
৮২৬	১৪২২ ডিসেম্বর ১৫	৮৬২	১৪৫৭ নভেম্বর১৯
৮২৭	১৪২৩ ডিসেম্বর ৫	৮৬৩	১৪৫৮ নভেম্বর ৮
৮২৮	১৪২৪ নভেম্বর ২৩	৮৬৪	১৪৫৯ অক্টোবর ২৮
৮২৯	১৪২৫ নভেম্বর ১৩	৮৬৫	১৪৬০ অক্টোবর ১৭

হিজরি সন ও খ্রিস্টাব্দের তুলনামূলক তালিকা

খ্রিস্টাব্দের যে যে মাসের যে দিনে হিজরি সন আরম্ভ তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে

হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ	হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ
৮৩০	১৪২৬ নভেম্বর ২	৮৬৬	১৪৬১ অক্টোবর ৬
৮৩১	১৪২৭ অক্টোবর ২২	৮৬৭	১৪৬২ সেপ্টেম্বর ২৬
৮৩২	১৪২৮ অক্টোবর ১১	৮৬৮	১৪৬৩ সেপ্টেম্বর ১৫
৮৩৩	১৪২৯ সেপ্টেম্বর ৩০	৮৬৯	১৪৬৪ সেপ্টেম্বর ৩
৮৩৪	১৪৩০ সেপ্টেম্বর ১৯	৮৭০	১৪৬৫ আগস্ট২৪
৮৩৫	১৪৩১ সেপ্টেম্বর ৯	৮৭১	১৪৬৬ আগস্ট ১৩
৮৩৬	১৪৩২ আগস্ট ২৮	৮৭২	১৪৬৭ আগস্ট ২
৮৩৭	১৪৩৩ আগস্ট ১৮	৮৭৩	১৪৬৮ জুলাই ২২
৮৩৮	১৪৩৪ আগস্ট ৭	৮৭৪	১৪৬৯ জুলাই ১১
৮৩৯	১৪৩৫ জুলাই ২৭	৮৭৫	১৪৭০ জুন ৩০
৮৪০	১৪৩৬ জুলাই ১৬	৮৭৬	১৪৭১ জুন ২০
৮৪১	১৪৩৭ জুলাই ৫	৮৭৭	১৪৭২ জুন ৮
৮৪২	১৪৩৮ জুন ২৪	৮৭৮	১৪৭৩ মে ২৯
৮৪৩	১৪৩৯ জুন১৪	৮৭৯	১৪৭৪ মে ১৮
৮৪৪	১৪৪০ জুন ২	৮৮০	১৪৭৫ মে ৭
৮৪৫	১৪৪১ মে ২২	৮৮১	১৪৭৬ এপ্রিল ২৬
৮৪৬	১৪৪২ মে ১২	৮৮২	১৪৭৭ এপ্রিল ১৫
৮৪৭	১৪৪৩ মে ১	৮৮৩	১৪৭৮ এপ্রিল ৪
৮৪৮	১৪৪৪ এপ্রিল ২০	৮৮৪	১৪৭৯ মার্চ ২৫
৮৪৯	১৪৪৪ এপ্রিল ৯	৮৮৫	১৪৮০ মার্চ ১৩
৮৫০	১৪৪৬ মার্চ ২৯	৮৮৬	১৪৮১ মার্চ ২
৮৫১	১৪৪৭ মার্চ ১৯	৮৮৭	১৪৮২ ফেব্রুয়ারি ২০
৮৫২	১৪৪৮ মার্চ ৭	৮৮৮	১৪৮৩ ফেব্রুয়ারি ৯

হিজরি সন ও খ্রিস্টাব্দের তুলনামূলক তালিকা

খ্রিস্টাব্দের যে যে মাসের যে দিনে হিজরি সন আরম্ভ তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে

হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ	হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ
৮৮৯	১৪৮৪ জানুয়ারি ৩০	৯২৫	১৫১৯ জানুয়ারি ৩
৮৯০	১৪৮৫ জানুয়ারি ১৮	৯২৬	১৫১৯ ডিসেম্বর ২৩
৮৯১	১৪৮৬ জানুয়ারি ৭	৯২৭	১৫২০ ডিসেম্বর ১২
৮৯২	১৪৮৬ ডিসেম্বর ২৮	৯২৮	১৫২১ ডিসেম্বর ১
৮৯৩	১৪৮৭ ডিসেম্বর ১৭	৯২৯	১৫২২ নভেম্বর ২০
৮৯৪	১৪৮৮ ডিসেম্বর ৫	৯৩০	১৫২৩ নভেম্বর ১০
৮৯৫	১৪৮৯ নভেম্বর ২৫	৯৩১	১৫২৪ অক্টোবর ২৯
৮৯৬	১৪৯০ নভেম্বর ১৪	৯৩২	১৫২৫ অক্টোবর ১৮
৮৯৭	১৪৯১ নভেম্বর ৪	৯৩৩	১৫২৬ অক্টোবর ৮
৮৯৮	১৪৯২ অক্টোবর ২৩	৯৩৪	১৫২৭ সেপ্টেম্বর ২৭
৮৯৯	১৪৯৩ অক্টোবর ১২	৯৩৫	১৫২৮ সেপ্টেম্বর ১৫
৯০০	১৪৯৪ অক্টোবর ২	৯৩৬	১৫২৯ সেপ্টেম্বর ৩
৯০১	১৪৯৫ সেপ্টেম্বর ২১	৯৩৭	১৫৩০ আগস্ট ২৫
৯০২	১৪৯৬ সেপ্টেম্বর ৯	৯৩৮	১৫৩১ আগস্ট ১৫
৯০৩	১৪৯৭ আগস্ট ২০	৯৩৯	১৫৩২ আগস্ট ৩
৯০৪	১৪৯৮ আগস্ট ১৯	৯৪০	১৫৩৩ জুলাই ২৩
৯০৫	১৪৯৯ আগস্ট ৮	৯৪১	১৫৩৪ জুলাই ১৩
৯০৬	১৫০০ জুলাই ২৮	৯৪২	১৫৩৫ জুলাই ২
৯০৭	১৫০১ জুলাই ১৭	৯৪৩	১৫৩৬ জুন ২০
৯০৮	১৫০২ জুলাই ৭	৯৪৪	১৫৩৭ জুন ১০
৯০৯	১৫০৩ জুন ২৬	৯৪৫	১৫৩৮ মে ৩০
৯১০	১৫০৪ জুন ১৭	৯৪৬	১৫৩৯ মে ১৯
৯১১	১৫০৫ জুন ৪	৯৪৭	১৫৪০ মে ৮

হিজরি সন ও খ্রিস্টাব্দের তুলনামূলক তালিকা

খ্রিস্টাব্দের যে যে মাসের যে দিনে হিজরি সন আরম্ভ তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে

হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ	হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ
৯১২	১৫০৬ মে ২৪	৯৪৮	১৫৪১ এপ্রিল ২৭
৯১৩	১৫০৭ মে ১৩	৯৪৯	১৫৪২ এপ্রিল ১৭
৯১৪	১৫০৮ মে ২	৯৫০	১৫৪৩ এপ্রিল ৬
৯১৫	১৫০৯ এপ্রিল ২১	৯৫১	১৫৪৪ মার্চ ২৫
৯১৬	১৫১০ এপ্রিল ১০	৯৫২	১৫৪৫ মার্চ ১৫
৯১৭	১৫১১ মার্চ ৩১	৯৫৩	১৫৪৬ মার্চ ৪
৯১৮	১৫১২ মার্চ ১৯	৯৫৪	১৫৪৭ ফেব্রুয়ারি ২১
৯১৯	১৫১৩ মার্চ ৯	৯৫৫	১৫৪৮ ফেব্রুয়ারি ১১
৯২০	১৫১৪ ফেব্রুয়ারি ২৬	৯৫৬	১৫৪৯ জানুয়ারি ৩০
৯২১	১৫১৫ ফেব্রুয়ারি ১৫	৯৫৭	১৫৫০ জানুয়ারি ২০
৯২২	১৫১৬ ফেব্রুয়ারি ৫	৯৫৮	১৫৫১ জানুয়ারি ৯
৯২৩	১৫১৭ জানুয়ারি ২৪	৯৫৯	১৫৫১ ডিসেম্বর ২৯
৯২৪	১৫১৮ জানুয়ারি ১৩	৯৬০	১৫৫২ ডিসেম্বর ১৮
৯২৪	১৫১৮ জানুয়ারি ১৩	৯৬১	১৫৫৩ ডিসেম্বর ৭
৯৬২	১৫৫৪ নভেম্বর ২৬	৯৯৯	১৫৯০ অক্টোবর ৩০
৯৬৩	১৫৫৫ নভেম্বর ১৬	১০০০	১৫৯১ অক্টোবর ১৯
৯৬৪	১৫৫৬ নভেম্বর ৪		
৯৬৫	১৫৫৭ অক্টোবর ২৪		
৯৬৬	১৫৫৮ অক্টোবর ১৪		
৯৬৭	১৫৫৯ অক্টোবর ৩		
৯৬৮	১৫৬০ সেপ্টেম্বর ২২		
৯৬৯	১৫৬১ সেপ্টেম্বর ২১		
৯৭০	১৫৬২ আগস্ট ৩১		
৯৭১	১৫৬৩ আগস্ট ৩১		

হিজরি সন ও খ্রিস্টাব্দের তুলনামূলক তালিকা

খ্রিস্টাব্দের যে যে মাসের যে দিনে হিজরি সন আরম্ভ তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে

হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ	হিজরি সন	খ্রিস্টাব্দ
৯৭২	১৫৬৪ আগস্ট ৯		
৯৭৩	১৫৬৫ জুলাই ২৯		
৯৭৪	১৫৬৬ জুলাই ১৯		
৯৭৫	১৫৬৭ জুলাই ৮	৯৯৯	১৫৯০ অক্টোবর ৩
৯৭৬	১৫৬৮ জুন ২৬	১০০০	১৫৯১ অক্টোবর ১৯
৯৭৭	১৫৬৯ জুন ১৬		
৯৭৮	১৫৭০ জুন ৫		
৯৭৯	১৫৭১ মে ২৬		
৯৮০	১৫৭২ মে ১৪		
৯৮১	১৫৭৩ মে ৩		
৯৮২	১৫৭৪ এপ্রিল ২৩		
৯৮৩	১৫৭৫ এপ্রিল ১২		
৯৮৪	১৫৭৬ মার্চ ৩১		
৯৮৫	১৫৭৭ মার্চ ২১		
৯৮৬	১৫৭৮ মার্চ ১০		
৯৮৭	১৫৭৯ ফেব্রুয়ারি ২৮		
৯৮৮	১৫৮০ ফেব্রুয়ারি ১৭		
৯৮৯	১৫৮১ ফেব্রুয়ারি ৫		
৯৯০	১৫৮২ জানুয়ারি ২৬		
৯৯১	১৫৮৩ জানুয়ারি ২৫		
৯৯২	১৫৮৪ জানুয়ারি ১৪		
৯৯৩	১৫৮৫ জানুয়ারি ৩		
৯৯৪	১৫৮৫ ডিসেম্বর ২৩		
৯৯৫	১৫৮৬ ডিসেম্বর ১২		
৯৯৬	১৫৮৭ ডিসেম্বর ২		
৯৯৭	১৫৮৮ নভেম্বর ২০		
৯৯৮	১৫৮৯ নভেম্বর ১০		

ঔরঙ্গাজেব কর্তৃক গোবিন্দমাণিক্যের নিকট লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ

অতুলনীয় উচ্চকুলোদ্ভব সৌভাগ্যবান রাজ্যেশ্বর বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য বাহাদুর-আল্লাতালা আপনার রাজ্য সুমঙ্গালে রক্ষা করুন।

আমি সুনিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি যে আমার চিরশত্রু সুজা ভবদীয় রাজ্যে গোপনে অবস্থান করিতেছে। মদীয় পূর্ব্বপুরুষের সম্মানিত মহোদয়গণের সহিত আপনার গৌরবান্বিত পূর্ব্বপুরুষগণের পরস্পর আত্মীয়তা ও প্রণয় থাকা বশত: আমাদিগের সহিত বিবাদে লিপ্ত দুর্ভাগ্য আফগানের ভবদীয়রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আপনার মহামান্যপূর্বপুরুষগণ অসিপ্রহারে যেরূপ সেই দুষ্টু আফগানদিগকে বঙ্গদেশে বিতাড়িত করিতেন বর্তমানে, আমিও তদ্রূপ আশা করি-আমার লিখানুসারে আপনি উক্ত শত্রু (সুজা) কে ধৃত করিয়া সত্তর আমার নিকট প্রেরণ করেন। যদি আপনার অভিমত হয়, তবে আমার সেনাপতিকে মুঙ্গেরে অপেক্ষা করাইব। তাহাকে ধৃত করিবার পর আপনার সেনাপতির রক্ষণাবেক্ষণে সাবধানে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন- যেন প্রাচীন বন্ধুতা স্থায়ী নহে। নতুবা ইহা নিশ্চয় জানিবেন-আপনার রাজ্যে উক্ত অপরিনামদর্শির অবস্থান করার জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগের পরস্পর-মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্য সংগঠিত হইবে। আমার লিপি অনুসারে কার্য হইবে বলিয়া আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।

পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য ও তৎসংলগ্ন স্থানের মানচিত্র

এযাবৎ শ্রীহট্টর কিছু অংশ, ত্রিপুরা জেলা, নোয়াখালী ও ফেনীর বৃহৎ ত্রিপুরা মহারাজের জমিদারীর চাকলা রোশনাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মধ্যযুগে ত্রিপুরা রাজ্য

রাজ্যের সীমা

ত্রিপুরা রাজ্য এবং চতুঃপার্শ্বস্থ জিলাসমূহের মানচিত্র

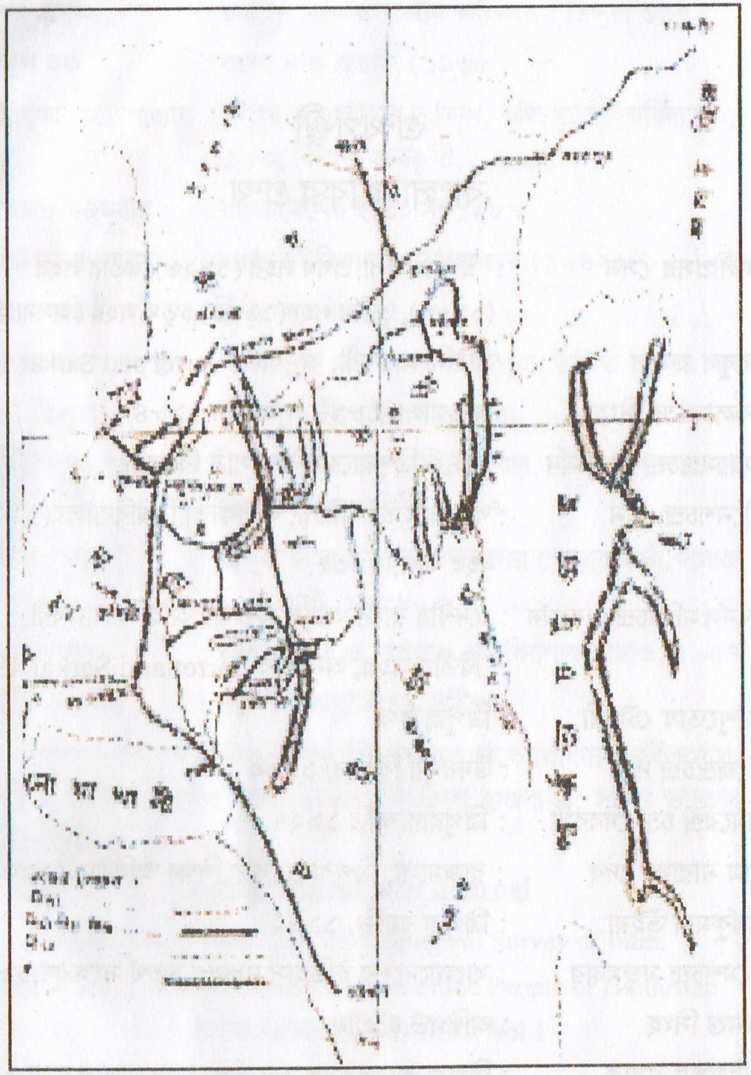

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা আকর গ্রন্থ

কালীপ্রসন্ন সেন : শ্রী রাজমালা, প্রথম লহর (১৯২৬),দ্বিতীয় লহর (১৯২৭), তৃতীয় লহর(১৯৩১),চতুর্থ লহর (অসমাপ্ত)

আবুল ফজল : আইনি আকবরী, অনুবাদক-Jarret and Sarkar 1942

কৈলাসচন্দ্র সিংহ : রাজমালা, ১৮৯৬, পুনমুদ্রণ ১৯৮৪

সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন :১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের সেনসাস বিবরণী

দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গাসাহিত্য পরিচয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়(১৯১৪), বৃহৎ বঙ্গা, ১৯৩৫,

কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মন : দেশীয় রাজ্য আবুল ফজল: আইনি আকবরী, দ্বিতীয় লহর, অনুবাদক-Jarret and Sarkar 1942

আশুতোষ চৌধুরী : ত্রিপুরা কথা

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত : উদয়পুর বিবরণ, ১৯৩০

সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা : ত্রিপুরার স্মৃতি ১৯২৭

রাম নারায়ণ দেব : রাজমালা, ত্রিপুরা সরকার,শিক্ষা অধিকার (১৯৬৭)

সূর্যকুমার ভুঁইয়া : ত্রিপুরা বুরঞ্জি, ১৯৬২

রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস,মধ্যযুগ,চতুর্থ সংস্করণ,১৯৮৭

অনন্ত সিংহ : অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম

হরিগঙ্গা বসাক : ত্রিপুরা রাজ্যে প্রজা আন্দোলনের গোড়ার কথা,১৯৬৫

দশরথ দেব : গণমুক্তি পরিষদের জন্মকথা, ১৯৭৪

বীরেন দত্ত : ত্রিপুরা জনতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ ও নির্বাচনোত্ত ত্রিপুরা, ত্রিপুরার কথা, শারদীয়া সংখ্যা,১৩৫৯

ত্রিপুরা প্রসঙ্গ : জন সংযোগ ও পর্যটন অধিকার : ত্রিপুরা ১৯৭৫

এনামুল হক : বঙ্গো সুফি প্রভাব, (১৯৩৫)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০, কিরাত-জনকৃতি

রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৮৭

সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৯৬২)

কার্তিক লাহিড়ী : ত্রিপুরার মন্দির

তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত : স্বাধীনতার আন্দোলন ও ত্রিপুরা, উন্নিতি ১৩৭৯ বাং

স্বাধীন ত্রিপুরা : গ্রাম্য মন্ডলী,আইন ১৩৫০ত্রিং

সরোজ চন্দ সত্যব্রত চক্রবর্তী: ত্রিপুরার সমাজ সংস্কৃতি,সন্ত্রাবাদ, পটভূমিকা, আন্দোলন এবং জনশিক্ষা সমিতি, ১৯৯৬

হরিগঙ্গা বসাক : ত্রিপুরা রাজ্য প্রজা আন্দোলনের গোড়ার কথা, সমাজ, ১৫ আগস্ট, ১৯৫৬

সত্যরঞ্জন বসু : দেশাত্মবোধ ও মহারাজ রাধাকিশোর, সমাজ, ১৯৫৭

ডঃ ননীরঞ্জন দত্ত : ত্রিপুরার অর্থনৈতিক সমীক্ষা

গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ও হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়: রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা,১৯৮৭ ডঃ জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুভূষণ হাজরা ড: সুচিন্ত ভট্টাচার্য ঃ দেশকাল-২০০৬

English Books and Journal

Annual Reports of the Archaeological Survey of India

Ashraf, K.M. : Life and condition of the People of Hindustan 1200-1250 J.A.S.B 1935, Vol 1

A.C.Bhattchharjee : Progressive Tripura,1930

Cunningham, A : Report of the Archaeological Survey of India, Vol.XV.District Gazetteers of Bengal and Assam

J.N.Sarkar, : History of Bengal Vol.II,Dacca University, 1948.

J.B.Ganguli : Economic Problems of the Jhumias of Tripura,1968.

K.D.Menon : Tripura District Gazetteer of Govt of Tripura1968.

Hunter W.W. : A statistical Account of Bengal, Reprinted 1973.

NaliniRanjanRoychoudhury : TripuraThrough the ages, 1983.

Suchintya Bhattacharya : Genesis of Tribal Exploitations in Tripura,1999.

The Kaipengs of Tripura,1991 Reprint

Window to the North-East, 2014.